প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
শ্রীপ্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

যাঁরা বিভীষণদের ঘৃণা কবেন
যাঁরা সমস্ত কুসংস্কার ও শোষণের বিপক্ষে
যাঁরা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও
দেশের স্বাধীনতা
অক্ষুণ্ণ রাখতে কৃত-সংকল্প
যাঁরা বহিরাগত অথবা তাদের আনুকুল্যকারী
দেশীয় মীরজাফরদের
সূচ্যগ্র মেদিনীও
ছেড়ে দিতে রাজী নন—

আমার সেই অনমনীয় সমাজ-সচেতন
ভারতবাসী ভাই-বোনদের হাতে
এই বই
তুলে দিলাম।

বিষয়

সঞ্জয় রহস্য

জয় পরাজয়

এক নজরে কুরুক্ষেত্র

কৌরব শিবিরভুক্ত রাজ্যগুলি

পাণ্ডব শিবিরভুক্ত রাজ্যগুলি

কয়েকটি প্রখ্যাত প্রাচীন জনপদ

কথারম্ভ

কথার আগেও কথা থাকে, ইতিহাসের আগে প্রাগেতিহাস।

মহাভারতের কথারম্ভ হয়েছে উপরিচর বসুর উপাখ্যান থেকে। কিন্তু তার আগেও ইতিহাস ছিল। ছিল ভারতবর্ষের আরও প্রাচীন কথা কাহিনী। ছিল উপনিষদ, বেদ, ঋগ্বেদ। যতই দিন যাচ্ছে, ততই আরও প্রাচীন কথার সন্ধান মিলছে। জানা যাচ্ছে আর্যপূর্ব আদি ভারতের কথা। পাওয়া যাচ্ছে মহাভারতীয় যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

কথা এমনি করে পিছু হঠতে হঠতে পাঁচশ কোটি বছর পিছিয়ে যেতে পারে। কেননা প্রবীণা এই পৃথিবীর বয়স ভূতাত্ত্বিকদের মতে সাড়ে চারশ থেকে পাঁচশ কোটি বছর। আবার সেটাও তার বয়ঃক্রমের পূর্ণ বিবরণ নয়। তারও আগের একশ কোটি বছরের পৃথিবী এখনো অজানা। আনুমানিক ধারণাও স্পষ্ট গড়ে ওঠেনি সেই অতি প্রাচীনার সৃষ্টিকাল সম্পর্কে। বিজ্ঞানীদের বিচার বলে, প্রথম প্রাণ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে প্রায়-নরাকার জীবের বিবর্তন ঘটতে সময় লেগেছিল অন্যূন তিনশ কোটি বছর। দশ লাখ বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে ধরিত্রী মায়ের মহা-আরণ্যক রোমশ শরীরের বন্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করেছে।—সে হিসেবে পূর্ণাবয়ব মানুষের বয়স তো নিতান্তই নগণ্য,—মাত্র লাখ খানেক বছর।

আর আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণসমৃদ্ধ ইতিহাস? বড় দীন, বড় দরিদ্র আমরা এ বিষয়ে। সম্বল মাত্র পাঁচ সাত হাজার বছর। আমরা ইতিহাস মাপি খ্রীষ্টীয় শতক দিয়ে। তার মধ্যে আবার ভারতের লিখিত স্বীকৃত ইতিহাসের বয়স শোচনীয়ভাবে অঙ্গুলীমেয়।

এই যখন অবস্থা, তখন মহাভারতের মলাট খুললে ভারি একটি সহজ হিসাব বেরিয়ে পড়ে। একেবারে লিখিত আকারে পেয়ে যাই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্মকথা। সৃষ্টিকর্তার সূতিগৃহের সংবাদ!

ব্যাপারটি সুতরাং অবশ্যই রহস্যময়। কেননা সৃষ্টিকর্তার জন্মরহস্য বলেছেন ভারত-ইতিবৃত্তকার মানবপুত্র বেদব্যাস।

'সৃষ্টি বর্ণন' অধ্যায়ে সেকথা সুরু হয়েছে এইভাবে:

"প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত,

অচিন্ত্যনীয়, অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ, নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।" (কালীপ্রসন্ন)।

মহাভারতের কথা মান্য করতে হলে মেনে নিতে হয়, অনাদি অনন্ত জগদীশ্বর কোনো এক বিশেষ ঝোঁকের মাথায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন একটি ভাসমান স্বুবর্ণ অণ্ডের ভিতর। তাঁর বিশ্বচরাচরের অপরাপর কাজ পড়ে রইল; পড়ে রইল নীলগর্ভ নক্ষত্রখচিত সীমাহীন মহাশূন্য। নিতান্ত খেয়ালের বসেই জগন্নাথ নেমে পড়লেন ভারত ভূখণ্ড-সংলগ্ন এক স্বুনীল সমুদ্র বক্ষে। সেখানে সংবৎসর ভাসমান অবস্থায় কালযাপনের পর উঠে এলেন তিনি হিমাচলের গিরি উপত্যকায়। কেননা মহাভারতের পরবর্তী শ্লোকাবলীতে ব্রহ্মার সভা ও শিবিরের বর্ণনা আছে। তিনি থাকতেন, গাড়োয়াল হিমালয়ের স্বুমেরু অঞ্চলে। আধুনিক মতে যে স্বুমেরু অঞ্চলটি বদ্রিনাথ চৌখাম্বা কেদারনাথ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

মহাবিশ্বের কথা না হয় বাদই রইল, এই বিশ্বেও জগদীশ্বর কেবলমাত্র তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে হিমালয় ও আর্যাবর্তকে বেছে নিলেন কেন, জিজ্ঞাস্ব মনে এসব প্রশ্ন উঁকি দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিরাকার প্রভু কেন হঠাৎ একজন সাকার ভদ্রমহোদয়ের শরীর ধারণ করে ভারতের ভূভার হরণের দায়িত্বকেই তাঁর একমাত্র করণীয় কর্ম বলে সাব্যস্ত করলেন? যদি বা তাঁর ভারতপ্রীতি অতি প্রবল হয়ে উঠেছিল বলে ধরে নেই, তাহলেও তো আরও একটি সমস্যার সমাধান সহজ মনে হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল ভারতবাসীকে সমান চক্ষে দেখলেন না, সভা ডেকে কেবলমাত্র আর্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বা ঘন ঘন মিটিং বৈঠক করতে লাগলেন কেন? কেনই বা তাঁর একমাত্র কর্ম হল, দেবতাদের ও ব্রাহ্মণদের সম্মেলনে বসে একটি সর্বধ্বংসী যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করা! জগদীশ্বরের স্নেহধন্য পুত্ররা হলেন কেন শুধু বাছা বাছা বাঘা বাঘা সব ব্রাহ্মণ দলপতি আর নির্লোম বিচিত্রবর্ণ উজ্জ্বল দেববৃন্দ? ভারতের অগণিত আদি বাসিন্দারা কোন্ সুবাদে তাঁর শত্রুপক্ষরূপে পরিগণিত হলেন?

মহাভারত বলেন, ব্রহ্মার সভা বসত স্বুমেরু পর্বতাঞ্চলে। সে বড় মনোরম স্থান। হিমালয়বাসী ব্রাহ্মণরা পার্বত্য পথ ভেঙে মিছিল করে জগদীশ্বরের সেই সভায় গিয়ে হাজির হতেন। ব্রহ্মার শিবিরেই বসে সভা। স্থানটির মাহাত্ম্য তাই ব্রহ্মলোক বলে প্রচারিত হয়।

মিছিলকারী ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মলোকের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য বর্ণনা করে রাজা পাণ্ডুকে

বলেছিলেন, "অন্ত অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে ; আমরা সর্বলোক পিতামহ ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি।" (আদিপর্ব/পৃঃ ১২৪/কালীপ্রসন্ন/সাক্ষরতা প্রকাশন, ১ম সং)।

তারপর তাঁরা সেই ব্রহ্মলোকের বর্ণনা করে বলেছিলেন : উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করলে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হওয়া যায়। চমৎকার শৈলাবাস সেটি।

ব্রহ্মার অভ্যস্ত শৈত্য সে দেশে বর্তমান। তাই আমাদের মত সমতলবাসীদের কাছে সেই দশ বার হাজার ফুট উচ্চতা হিমশীতল বোধ হলেও ব্রহ্মার পক্ষে পরিবেশটি উপযুক্ত ছিল।

তিনি যে-স্বর্গলোক থেকে স্বর্ণ অণ্ড মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, সম্ভবত সে জায়গাটি ছিল পর্বতময় এবং শীতপ্রধান। ব্রহ্মাজী তাই পাহাড়েই থাকতেন।

একবার কী মনে করে যেন তৎকালীন মৎস্যরাজ্যের (আ, রাজপুতানার) অন্তর্গত পুষ্কর হ্রদে এসে স্নান করে গেছলেন ব্রহ্মাজী। যাবার আগে সেখানেও তিনি সভা করেন, অর্থাৎ মহাভারত মতে যজ্ঞ করেন। মহামান্য জগদীশ্বরের সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেবতা ও আর্য ব্রাহ্মণরা। কেউ প্রধান অতিথি, কেউ ডেলিগেট, কেউ বা শুধুই অবজারভার। মৎস্যাধিপতিও নিশ্চয় ঈশ্বরের সম্মানার্থে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা তামাম ভারতবর্ষে একমাত্র তত্রত্য মনুষ্যেরাই ব্রহ্মার মন্দির বানান ও ব্রহ্মার পূজা করেন। জগদীশ্বর হলেও ভারতে ব্রহ্মাজীর মন্দির আর কোথাও বানানো হয়নি। ইতস্তত পুজো হয় বটে, তবে বছরে মাত্র একবার।[১] অণ্ড মধ্যে জাত জগদীশ্বর নিশ্চয় সংবৎসর ডিম্ববাস করে নিজের মাপ পরিসর এতই সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছিলেন যেজন্য ভারতে তাঁর পপুলারিটি সর্বজনীন হয়নি। মিত মিতপ্রায় হতে হতে অত্যন্ত বেশি সীমিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

কিন্তু বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মহান সেই ব্রহ্মাজী। সভা তিনি প্রায়ই করেন। বেশ কিছু শিবির-দুর্গ চোখে পড়ে। সেখানে দেবতারা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সঙ্গে যুগল নৃত্য ও আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন। সন্নিকটেই কুবেরোদ্যান (নন্দনবন ?)। গিরিগহ্বর থেকে হিমশীতল পার্বত্য নদী মহা কল কল স্বরে বহির্গত হয়। গাছপালা ও মৃগপক্ষিকুল অবশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না, কারণ জায়গাটি নিত্যহিমা অর্থাৎ বেশ ঠাণ্ডা। হবেই তো, কেননা বার হাজার ফুট উচ্চতায় বড় বড় গাছপালা অল্পই চোখে পড়ার কথা। সবচেয়ে বড় কথা, ব্রহ্মলোকে বেশ কিছু বিমানও চোখে পড়ে। তার মধ্যে কতকগুলি

উড়ে যায়, কতক অবতরণ করে, কতক অপেক্ষারত থাকে। অর্থাৎ কিনা ব্রহ্মলোকে বৈমানিক দেবতারা সর্বদাই খুব ব্যস্ত থাকেন।[২]

জগৎ স্রষ্টার এ হেন পার্বত্য সভায় পার্থিব মনুষ্যগণের সমাবেশে কোন্ পরমার্থ চর্চা হ'ত, রাজা পাণ্ডুর তা সরেজমিনে দেখে আসার সাধ ছিল। কিন্তু বদ্রিনাথের নিচের ধাপ পাণ্ডুকেশ্বর থেকে তাঁকে আর এগোতে দেওয়া হয়নি। যাবার সময় মিছিলকারী ব্রাহ্মণরা বলে গেছলেন সে বড় দুর্গম প্রদেশ, সুখ-লালিত রাজা ও রাজ-মহিষীদের পক্ষে অতদূর চড়াই ভাঙা সহজসাধ্য নয়। আসলে ব্রহ্মার সভাগুলি ছিল বেশ 'টপ সিক্রেট' রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা। পাণ্ডু রাজা তাই ব্রহ্মার দর্শন পাননি। ব্রহ্মা কিন্তু স্বয়ং স্থির করেছিলেন যে, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভজাত পুত্রদের হাতেই আর্যাবর্তের শাসনভার তুলে দেবেন। ভারতবর্ষে জগদীশ্বরের ক্রিয়াকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল তাই। সমগ্র মহাভারত জুড়ে জগৎ স্রষ্টার সেই লীলাই বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ ব্রহ্মার পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি। মহাভারত তারই রাজনৈতিক রূপায়ণের কাহিনী। অর্থাৎ মহাভারত পাঠ করলে পরিষ্কার জানা যায়, পরমার্থ-চর্চা নয়, ব্রহ্মার সভা বসত রাজনৈতিক মন্ত্রণার জন্যই।[৩]

এ হেন এক ব্রহ্মাকে নিয়ে মহাভারতের বিস্ময়কর 'সৃষ্টি বর্ণন' কথা তাই নিতান্তই দুর্বোধ্য। কিন্তু উপায় নেই, পুরাকথায় এমন ব্রহ্মা শুধু একজনই নন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌরাণিক যুগে একই ভাবে একাধিক ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের ঘিরে তৈরী হয়েছিল একই রকম রহস্যময় সৃষ্টিকথা।

অণ্ডস্ফুট হওয়ার পর ব্রহ্মা যেভাবে সৃষ্টি সম্পন্ন করেছিলেন তার সঙ্গে প্রাণী জন্ম সম্পর্কিত বিবর্তনতত্ত্বের যথেষ্ট গরমিল আছে। মহাভারত বলেন, স্থাণু, মনু, আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার প্রমুখের সৃষ্টির পর "অনেকানেক বিদ্বান মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঞ্জাত হইল।"

বিজ্ঞানীদের বিতর্কও তোলা থাক। মহাভারতের 'সৃষ্টি বর্ণনে'র গোড়ায় গলদ আমাদের মত সামান্য মানুষের চোখেই সুস্পষ্ট ধরা পড়ছে। আগে মানুষ, তারপর আকাশ বায়ু পৃথিবী! এ আবার কেমন কথা? এই অকল্পনীয় ব্যাপার যে যাদুকর ব্রহ্মাই ঘটিয়ে থাকুন না কেন, তিনি খুব বিশ্বাসযোগ্য কাজ করেছেন, এমন কথা বলা যায় না। বায়ুহীন পৃথিবীহীন এক মহাশূন্যে মনু-আদি মানবগণ এবং "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণও

সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন" বলে মানতে হলে মহাভারতের রাজর্ষি মহর্ষিদের শরীর যন্ত্রটির কলকব্জাগুলিকেও অতিলৌকিক বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু না ব্রহ্মা, না তাঁর সৃষ্টি, কোনটাই যে অলৌকিক বিষয় নয় সেটা মহাভারতের ইতিবৃত্ত সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায়। অতএব ব্রহ্মা এবং তাঁর সৃষ্টির কথা যে ভাবে মহাভারতে বর্ণিত আছে, বুঝতে হবে, তা নির্ভেজাল সত্য নয়; হয় কল্পগল্প, নয় গোঁজামিলে তৈরী গপ্পো কথা।

তাছাড়া মহাভারতের ব্রহ্মা আদি স্রষ্টাই বা হ'ন কোন্ সুবাদে? তাঁর আবির্ভাবের আগেও ছিল ইতিহাস এবং তারও আগে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাগেতিহাস।

ছিল উপনিষদ; ছিল বেদ-ঋগ্বেদ। খোঁজ খোঁজ করে মাথা খুঁড়লেও ভারতের সেই প্রাচীনতম পুঁথি ঋগ্বেদ, বেদ বা উপনিষদে কিন্তু ব্রহ্মার ঠিকুজি কোষ্ঠী জন্মকথা অথবা তাঁর সুবর্ণ অণ্ডের হদিশ পাওয়া যাবে না। ব্রহ্মাজী বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অর্বাচীন, যার অর্থ, তাঁর আগেও ছিলেন বেদস্রষ্টা ঋষিরা। সেই ঋষিরা জগদীশ্বরের মহান শক্তির ত্রিবিধ রূপ কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাকার ব্রহ্মাকে ডিম ফুটিয়ে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে দেখেননি। 'ব্রহ্মা' শব্দটির সঙ্গেও বৈদিক ঋষিদের পরিচয় ছিল না। বেদে 'ব্রহ্মা' নেই, নেই উপনিষদেও। উপনিষদে পরম ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধির জ্ঞানযোগ সাধনা আছে। বেদ বিষয়-ভাবনাতেই বিব্রত। জগতের একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক কার্যকারণতত্ত্ব বৈদিক-প্রজ্ঞায় ধরা পড়েছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, জগৎ সংসার, নিখিল মহাবিশ্ব একই নিয়মের অধীন। যে নিয়ম আকাশে, তা-ই অন্তরীক্ষে, সেটাই এই পার্থিব প্রকৃতির ওপরেও সমান বলবৎ। তাই বৈদিক কল্পনায় ঈশ্বর একের মধ্যে তিন। একং অদ্বিতীয়ম্ সত্তা। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে জগদীশ্বরের যে মহাশক্তি একই নিয়মানুবর্তী, সেই তিন শক্তি মূলত এক। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাক্যপুনিঃ। মুনিরাই পরবর্তী-কালে একেকে বহুধা বিখণ্ডিত করেছেন। তাই বলা হয়, একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। এক মহাশক্তির তিনটি প্রধান রূপ কল্পিত হয়েছে, যেমন, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরীক্ষ স্থানীয় দেবতা এবং দ্যু বা আকাশের দেবতা। নিরুক্তকার বলেন, তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা। পরমেশ্বর সর্বলোক-স্রষ্টার কল্পনায় তখনও পর্যন্ত কোনো 'ব্রহ্মা'র আমদানি ঘটেনি। সাকার দেবতার দখলদারি প্রতিষ্ঠিত না থাকার জন্য বৈদিক ঋষিরা মূর্তি পূজা বা মন্দির বানিয়ে দেব-আরাধনা করতেন না। পরবর্তীকালেও মূর্তি ও মন্দিরের আবির্ভাব

ঘটলে মন্দিরে গিয়ে মূর্তি-পূজা বৈদিক ঋষির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হত।[৪]

সুতরাং ব্রহ্মার অর্বাচীনত্বে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহাভারত এমন কি রামায়ণ অপেক্ষাও কাঁচা বয়সী। সাকার ব্রহ্মা যে লোকস্রষ্টা এ-ও এক ব্যাস-কূট। ব্যাসদেব স্বয়ং সুমেরু অঞ্চলের ব্রহ্মলোকে বসে সাকার ব্রহ্মার কাছেই জ্ঞানবান হয়েছিল।[৫] ব্রহ্মার লোকসৃষ্টির কথা তাঁরই রচনা। এই গ্রন্থে ব্যাসদেবের অদ্ভুত কূটনীতি ও রচনারীতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেটাই সম্ভবত মহাভারতোক্ত ব্যাস-কূট। ব্যাস শুধু বেদ বিভাগই করেননি, বৈদিক চিন্তাকে ঢেলে সেজেছেন। তিনি রাশিকৃত ঈশ্বরেরও সৃষ্টি করেছেন। এবং একে একে সব কজন ঈশ্বরকে গদীচ্যুত করে কৃষ্ণকে বানিয়েছেন জগদীশ্বর। অবশ্য এই কূটকর্ম কতটা ব্যাসকৃত আর কতখানি তাঁর পরবর্তী বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়াকাণ্ড তার বাছাই বিচার চলছে। তবে তাঁরই নামে যেহেতু মহাভারত, সেজন্য দায়িত্ব আপাতত তাঁর ওপরেই বর্তালো। ক্রমশ বিষয়টি গ্রন্থমধ্যে আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায়।

যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে মহাভারত দেবতা থিওরিতে 'রেভল্যুশন' এনে দিলেন। তিন দেবতা ব্রহ্মার যাদুতে তেত্রিশ শ' হয়েছেন। দেবতায় দেবতায় গাড়ওয়াল কুমায়ুন হিমাচলে জনবিস্ফোরণের মতই দেববিস্ফোরণ ঘটেছে। ফলত মাটির মানুষদের মত দেবতাদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি, রেশারেশি, দলাদলি, রাজনীতি ও ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরকে হিংস্র আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। বেচারী ব্রহ্মাজী বুদ্ধিতে যত পরিপক্ক ছিলেন, যুদ্ধে তত দক্ষ ছিলেন না। তাই বিষ্ণু ও শঙ্করে মিলে ব্রহ্মার মাথাও কেটেছেন, যার অর্থ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছাঁটাই করেছেন। ব্রহ্মার বাড়ন্ত প্রতিপত্তি সংবাৎসরিক পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

এমন এক ব্রহ্মার তাহলে প্রকৃত স্বরূপ কী? খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। কেননা ব্রহ্মাকে না বুঝলে সমগ্র মহাভারতই দুর্বোধ্য থেকে যায়। মহাভারতের সকল ঘটনাই যে ঘটেছে ব্রহ্মাজীর পরিকল্পনা-মাফিক।

ব্রহ্মাজী যদি স্বয়ং লোকস্রষ্টা নন, তবে তাঁর আলোকিত আবির্ভাবের অন্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি? পৃথিবীর পুরাণকথার দিকে তাকালে মনে হয়, সুবর্ণ অণ্ড থেকে তাঁর ঘটেছিল "তিমির বিদার অভ্যুদয়"। দেবতাদের তিনি ভারতবর্ষে আমদানি করেছিলেন এবং পৃথ্বীনারীদের গর্ভে দেবপুত্র ও ব্রাহ্মণপুত্র সৃষ্টির

(প্রাকৃতিক প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে) বিধান দিয়েছিলেন 'ভূভার হরণে'র মহান দায়িত্ববোধ থেকে।[৬] সেই হিসেবে অবশ্য তাঁকে লোকস্রষ্টাও বলা যায়, অন্তত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণরা তা-ই বলে গেছেন।

পৃথিবীর পুরাণকথা ঘাঁটলে একাধিক স্বর্ণ অণ্ড এবং সেই ডিম্বস্ফুটিত করে বিভিন্ন পৃথ্বীবাসী জাতির নিজস্ব ব্রহ্মাদের আগমন সংবাদ জানা যায়।

তিব্বতী লামা সম্প্রদায়ের প্রাচীন পুঁথি তাঞ্জুরের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে মহাজাগতিক অণ্ডের কথা। বলা হয়েছে, "মহাজাগতিক অণ্ডের কঠিন আবরণ বিদূরিত হবার পর অন্ধকারের ঘন কৃষ্ণ আবরণও ছিন্ন করলো স্বর্ণ অণ্ড, তারপর জল থেকে সৃষ্টি হল সর্ব বস্তুর। পৃথিবীর আদি পুরুষের আবির্ভাব ঘটলো স্বর্ণাণ্ড থেকে।"

"একটি শ্বেত আলোকের উৎপত্তি ঘটলো অস্পষ্ট জীব হতে এবং সেই আলোকের মূল বস্তু হতে নির্গত হল নিখুঁত একটি অণ্ড। রূপ তার অত্যুজ্জ্বল। আপাদমস্তক সে বস্তু উত্তম। তার ডানা ছিল না, কিন্তু উড়তে পারতো। তার মুখ, চোখ, মস্তক কিছুই ছিল না, তবু তার ভিতর হতে ধ্বনিত হত একটি কণ্ঠস্বর। পাঁচ মাস পরে অপূর্ব সে অণ্ড ভেঙে গেল, খুলে গেল একেবারে, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক পুরুষ।"

ব্রহ্মার ডিম্ববাসকালের মেয়াদ ছিল সংবৎসর, তিব্বতী ব্রহ্মা পাঁচ মাসের মধ্যেই ডিমের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে এসেছেন।

চীনা কিম্বদন্তীর কথা, "আমাদের পৃথিবী নির্গত হয়েছে একটি ডিমের ভিতর থেকে। প্রথম মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল একটি লালচে ডিমের ভেতরে শুয়ে। ডিমগুলোকে দেখতে ছিল প্রকাণ্ড হলদে থলের মতন।"

তিব্বতী ব্রহ্মা তাঞ্জুর যে ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন সেটিও ছিল সোনালি, অর্থাৎ হিরণ্য অণ্ড। আরও তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ এই যে, এমনি ডিমে ভরা ছিল বিদ্যুৎ। আর সেই ডিম বিনা পাখায় উড়ে যেতে পারত আকাশে।

ইণ্ডীয়দের পুরাকথা বলে, বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার, তখন আবির্ভূত হল এক 'সদন-সদৃশ' আধার। সেই আধারে লুকিয়ে ছিল আলো। তিমির বিদার করে সে আলোক প্রকাশিত হল এবং তমসাবৃতা ধরণী হলো আলোকিতা। মিসরীয় 'মৃতের পুঁথি'ও আর এক মহাজাগতিক অণ্ডের খবর দেয়, যা উড়ে বেড়াতো। জাপ নিহোঙ্গী মতে, একটি পদার্থপিণ্ডে সংহত ছিল যে মহাশক্তি তাই ভেঙে সৃষ্টি হয়েছিল স্বর্গ-মর্ত্য। আফ্রিকার পুরাকথায় আকাশ থেকে দেবতাদের দলে দলে পৃথ্বীপৃষ্ঠে অবতরণের সংবাদ আছে। আফ্রিকার

বাণ্টুদের পুরা-কাহিনীতেও পাওয়া যায় সেই আশ্চর্য স্বর্ণ অণ্ডের কথা। সেই ডিম্বাকৃতি বস্তুর গর্ভে ছিল বিদ্যুৎ ও অগ্নি। ভগ্ন অণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আনর্বচনীয় বস্তুরাজি। অণ্ডের ঊর্ধ্বভাগ আকাশে প্রত্যাবর্তন করল আর নিম্নভাগ রহে গেল পৃথিবীতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই যে সোনালি রঙের অণ্ডাকার ধাতব এবং অগ্নি ও বিদ্যুৎ-গর্ভ বস্তুর কথা ছড়ানো রয়েছে, সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে, তার আগেও নয়, পরেও নয়। যদিবা আগে কিছু ঘটে থাকে, পরে আর এমন উড়ন্ত গোলক থেকে সৃষ্টি-কর্তার আবির্ভাব সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে আজও প্রায়ই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উড়ন্ত চাকীর খবর চোখে পড়ে। যাঁরা নিয়মিত 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা পাঠ করেন, উড়ন্ত চাকীর সংবাদ তো বটেই, অতি সম্প্রতি আরও একটি ছোট্ট বিচিত্র সংবাদও নিশ্চয় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, জনৈক আর্জেন্টিনাবাসীকে কোনো এক অজানা উড়ন্ত যান পৃথ্বীপৃষ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে যায় আবার তাকে ফিরিয়ে দেয় ধরিত্রী মায়ের বুকে।[৭] বিখ্যাত বারমুডা ত্রিভুজের রহস্য কথার সঙ্গে যাঁরা অপরিচিত নন, তাঁদের জানা আছে, এই গোলকের মানুষ অজানা অপহরণ-কারীদের দ্বারা ক্ষেপে ক্ষেপে নিখোঁজ হয়ে গেছেন মহাকাশের শূন্যমার্গে।[৮] ঘটনাগুলি এখন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের বিশেষ কৌতূহল আকৃষ্ট করেছে। কেননা বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় অধিকাংশই একমত যে বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে।[৯] এমনই কোনো মহাজাগতিক মহাবিজ্ঞানীর দল অন্তত একবারের জন্যও পৃথিবীতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং মানুষের কাছে দেবতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এমন দেবতারাই পুনরায় তাঁদের অজানা উড়ন্ত আকাশযানে চেপে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি সুরু করেছেন কিনা বৈজ্ঞানিকরা তা-ও বিচার করে দেখছেন। তবে সেসব উচ্চপর্যায়ের অতি গোপনীয় ব্যাপার। তাই সব কথা আমাদের জানানো হচ্ছে না।

উদ্ধৃত বহির্ভারতীয় স্বর্ণ অণ্ডগুলির সংবাদ বিভিন্ন পুরাপুঁথি থেকে সংগ্রহ করে 'দেবতা গ্রহান্তরের মানুষ' অনুমিতির বিশ্বপ্রচারক এরিক ফন দানিকেন দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, ঐ স্বর্ণ অণ্ডও রকেট-সদৃশ যান, এককালে যেগুলিতে চেপে মহাকাশ থেকে ভিনগ্রহী দেবতারা ইতস্তত অবতরণ করেন।[১০]

মহাভারতের ব্রহ্মাও এইভাবে আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন কি তাঁর অণ্ডাকার মহাকাশযানে চেপে? বর্তমানে আমাদের মহাকাশচারীরাও

পৃথিবীতে যে রকেট ক্যাপস্যুলে করে মহাকাশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন সেগুলিও এসে নীলগর্ভ মহাসলিল অর্থাৎ সমুদ্রেই অবতরণ করে। প্রত্যাবৃত মহাকাশচারী বেরিয়ে আসেন তাঁর রকেটের ঢাকা খুলে ঠিক পৌরাণিক ব্রহ্মার মতই। পৌরাণিক যুগে ভিনগ্রহের কোনো মহাকাশচারীও অনুরূপভাবে আবির্ভূত হননি, এই মুহূর্তে তা জোর করে বলা যায় না। বিশেষত ব্রহ্মার ইতিহাস ও মহাভারতে বর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করলে তাঁকে বুদ্ধিমান নরাকার ব্যক্তি বলেই মনে হয়। দেবতারা ব্রহ্মাকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মাজীর সভা সমিতি, বাসস্থান, পুষ্কর হ্রদে স্নান ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্ব ঘটিয়ে তোলায় অদ্ভুত রাজনৈতিক অবদান, যে কথা আমরা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছি, তাঁর লৌকিক অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। ভিনগ্রহ থেকে সমুদ্রের নিরাপদ দূরত্বে সংবৎসর কাল সাবধানে অতিবাহিত করে, ভারতবাসীদের মতি গতি ক্ষমতার পরিমাপ করে তবেই কি তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর সুরক্ষিত ধাতব দুর্গ হিরণ্য অণ্ড থেকে ?

ব্রহ্মার সমৃদ্ধ প্রজ্ঞার সংস্পর্শে এসে বিস্মিত মানুষ জেনে ছিলেন বস্তুবিশ্ব ও নক্ষত্রলোক সম্পর্কে এমন অজানা সব জ্ঞানগর্ভ কথা, যার ফলে তাঁদের মনে হয়েছিল, অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হল। ব্রহ্মার প্রজ্ঞা নবজ্ঞান-পিপাসু গোপালক আর্যদের মধ্যে এমন এক সমীহার সৃষ্টি করল, যার ফলে তাঁদের মনে হল, তৎপূর্ববর্তী পৃথিবী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। আকাশ মাটির কোনো তত্ত্বই পরিষ্কার ছিল না। ব্রহ্মাই সকল বিশ্বচরাচর, গ্রহনক্ষত্র, দিবারাত্র, জন্মমৃত্যুর যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়ে অজ্ঞতার অবসান ঘটালেন। তাই ব্রহ্মা-ভক্তরা বললেন, ব্রহ্মাই সকল লোকস্রষ্টা, তিনিই সর্বলোককে অর্থময় করেছেন। ব্রহ্মার পরিকল্পনা মত দেবতা ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মাবাদীরা আদি ভারতীয়দের উৎসাদিত করে দেবপুত্র ও ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত একটি নতুন ভারতীয় জাতির সৃষ্টি করলেন। আদি ভারতীয়রা আপনাদের অর্জিত জ্ঞানবিদ্যাতেই ছিলেন সন্তুষ্ট। তাঁরা বহিরাগত ব্রহ্মা ও দেবতাদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। সুতরাং ব্রহ্মার মতে তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর ভারস্বরূপ। মহাভারতের 'ভূভার হরণ' অধ্যায়ে ব্রহ্মা দেবতা ও ব্রাহ্মণদের আদেশ দিলেন আর্যাবর্ত থেকে সেই মহাভার অপসারিত করার জন্য। পরিষ্কার ব্যবস্থা। ব্রহ্মার সেই পরিকল্পনা তার শেষ পরিণতি লাভ করল কুরুক্ষেত্ররণে আদি ভারতীয় বীরদের শ্মশানভূমি রচনা করে।

মহাভারতের ব্রহ্মার কার্যাবলী লক্ষ্য করলে এই ব্যাখ্যাই সমুচিত মনে

হয়। পাঠক ক্রমশ তা উপলব্ধি করবেন মহাভারতের ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করে।

যে ব্রহ্মা মনুকে সৃষ্টি করলেন বলে বলা হয়েছে, মনু সংহিতায় সেই ব্রহ্মারই জন্ম বৃত্তান্ত কথিত আছে। ব্রহ্মাসৃষ্ট মনু ব্যাখ্যা করলেন তাঁর স্রষ্টার জন্ম রহস্য। এমন রহস্য ভেদ করা বস্তুতই কঠিন। মনু বললেন: "এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার (এক সময়ে) তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা ছিল জ্ঞানের অতীত এবং তাহা কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় ছিল না বা অন্য কোন রূপে জানিবার যোগ্যও ছিল না, যেন সর্বতোভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। তৎপরে স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান মহাভূত প্রভৃতিকে প্রকাশিত করিয়া অপ্রতিহততেজাঃ এবং প্রলয়াবস্থার বিনাশকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন।"—

এখানেও সেই অজ্ঞানময় তমনাশকারী জ্ঞানবান পুরুষের আবির্ভাবের কথাই বলা হয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞানময় তেজদীপ্তি দ্বারা প্রলয় অর্থাৎ স্থাণুবৎ অজ্ঞতাকে দূর করলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে দেবগুরু মানুষ বৃহস্পতিকে এক ও অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদ ও সংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণে।

ব্রহ্মা সম্পর্কিত ধারণাটি ক্রমশ মহিমান্বিত হয়েছে ব্রহ্মানুরাগীদের দ্বারা।

পৌরাণিক দেবতাদের প্রত্যেকেরই ক্রমবিবর্তন আছে, আছে উত্থান পতনের ইতিহাস। এবং সেটাই তাঁদের পরমেশ্বরত্ব লাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ জগদীশ্বরের কোন উত্থান পতন, জন্মমৃত্যু বা বিবাহ নেই (ব্রহ্মার বিবাহ হয় গন্ধর্ব মতে, এবং কামুকতার জন্য তিনি অভিশপ্ত হন)। ব্রহ্মার জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে।

এমন ব্রহ্মাকে সর্বলোকেশ্বর বলে মান্য করা যায় না। বুঝতে হয়, তিনি কোনও এক পর্বতময় শীতপ্রধান লোক থেকে তাঁর অণ্ডাকৃতি উড়ন্ত যানে করে এই গ্রহে এসে অবতরণ করেছিলেন ও সুমেরু অঞ্চলে বসে ভিনগ্রহী দেবতা এবং গোপালক আর্যদের বুদ্ধিদাতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ভিন্‌গ্রহী পুরুষদের এই লোকে আগমনের কথা মহাকাশ বিজ্ঞানে উন্নতির পরই যে আমরা ভাবতে সুরু করেছি এমন নয়, খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশ বছর আগে দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যাণ্ডারও বলেছিলেন,—পৃথিবীই একমাত্র নয়, মহাবিশ্বে পৃথিবী ও মানুষ আছে আরও অসংখ্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশেষ কার্যকারণসূত্রে যেমন আমাদের সৌরজগতে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে, সেই একই কারণে নক্ষত্ররূপী আরও বহু সূর্যকে ঘিরে একই নিয়মে অন্যান্য গ্রহেও প্রাণোৎপত্তি সম্ভব। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের ছায়াপথেই

মানুষের মত বা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে লক্ষাধিক গ্রহে। "পৃথিবীর মত পরিবেশযুক্ত কোন গ্রহে প্রাণের বিবর্তন হয়তো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও এই বিবর্তনের ধারা হয়তো মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণী বসবাস করছে এবং আমাদের চেয়েও এক উন্নত সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। এই মহাবিশ্বে মানুষই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী এই দম্ভের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।"[৯]

বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞান যতই প্রসারিত ও পরিশীলিত হচ্ছে, জিজ্ঞাসুর মনে পুরানো ইতিহাসের মানেও ততই যাচ্ছে পাল্টে। পুরাগ্রন্থগুলির রহস্যভেদ ও সেখান থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের গুরুত্বও গেছে বেড়ে। এ বিষয়ে য়ুরোপ অনেক মোহমুক্ত। প্রখ্যাত রুশ গবেষক আলেকজান্দার কোনদ্রাতভ লিখেছেন: "মধ্যযুগে বাইবেলের সব কিছুকেই ধরা হত অভ্রান্ত, তর্কাতীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্দিগ্ধ চোখে বাইবেলের সমস্ত বর্ণনাই ছিল পরীদের গল্পের মতই অলীক। আজকে প্রাচ্য-বিশারদদের চোখে খৃষ্টান এবং ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল, অবশ্য একটু বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে।" শ্রীকোনদ্রাতভের ধারণা, পৃথিবীর পবিত্র পুরাকথাগুলির কাহিনীকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে "কাট ছাঁট করে নিলে, আদি যুগের রহস্যের আবিষ্কারে এর প্রত্যেকটি এক একটি অমূল্য দলিল।"[১১]

আমাদের পবিত্র মহাভারতে বিধৃত আছে সহস্রাধিক বছরের রাজবংশের ইতিহাস। আছে মহাকাশ থেকে আগত, শূন্যমার্গে ভ্রমণরত ও মহাকাশে প্রত্যাবর্তনকারী দেবতাদেরও ইতিহাস এবং ভারত ভূখণ্ডে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অত্যাদ্ভুত ব্যাস-কূট। সেই দুর্বোধ্য ব্যাস-কূটের রহস্যভেদ করতে হলে ব্রহ্মার আবির্ভাব-কথা থেকেই সে কথা আরম্ভ করতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেবভূমিকা আনুপূর্বিক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পুরাকালে ঘটিত একটি অত্যাশ্চর্য আন্তর্নাক্ষত্রিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সমর।

মহাভারত আমাদের 'ধর্মগ্রন্থ' এবং দেবতারা ঈশ্বরের শক্তিরূপ, কিছুক্ষণের জন্য এই প্রচলিত ধারণাকে সরিয়ে রেখে আসুন, আমরা যুদ্ধটিকে তার কার্যকারণ সূত্র ধরে বিচার করে দেখি, হয়ত সেখানে ভারতের পুরা-ইতিহাসের বন্ধমলাট খুলে যাবে আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের সামনে।

(১) মাঘী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মার পূজা হোত মনে হয়, তাও খুব অল্প সংখ্যায়। বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বৈশাখী পূর্ণিমায়, শ্রীরামপুরে শ্রাবণ মাসে, চব্বিশ পরগণার বাজপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় ও নবদ্বীপে ঝুলন পূর্ণিমায় ব্রহ্মার পূজা হয়।—হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ/হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।

(২) উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ।
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহুম্ বয়ম্॥
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্বাপ্সরাসাং তথা।

* * * *

উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ।
মহানদী নিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরাম্॥
সন্তি নিত্যহিমা দেশা নির্বিক্ষ মৃগপক্ষিণঃ।
সন্তি কেচিন্মহাবর্ষা দুর্গাঃ কেচিদ্দুরাসদাং॥

* * * *

বিমান শত সংবাধাং গীতস্বন নিনাদিতাম্।

(সিদ্ধান্তবাগীশ)

(৩) দানিকেনতত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা/বীরেন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য।

(৪) দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা/শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৫) বর্ত্তমান বদ্রিনাথ মন্দিরের কাছাকাছি আছে ব্যাসদেবের গুহা।

(৬) বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'দানিকেনতত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ।

(৭) "দি ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, ১৪।৬।৮০ তারিখে 'ইজা' এয়ারপোর্টের র‍্যাডারে একটি অজানা উড়ন্তযানের আগমন সংবাদ ধরা পড়ে। উরুগুয়েব চারটি শহরেও যানটিকে উড়ে যেতে দেখা যায়। আর্জেণ্টিনায় প্রায়ই এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ষ্টেটসম্যানের

অন্য সংবাদে সংবাদে প্রকাশ (এ. এফ. পি প্রচারিত) একটি *U. F. O.* জনৈক আর্জেণ্টিনাবাসীকে তুলে নিয়ে যায়, সে ব্যক্তি আবার প্রত্যাবর্তন করেছেন পৃথিবীতে।

(৮) "দানিকেনতত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা" দ্রঃ।

(৯) "মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ"/শঙ্কর চক্রবর্তী/মনীষা প্রকাশনী/আলোচনা দ্রঃ।

(১০) প্রমাণ/এরিক ফন দানিকেন/অনু, অজিত দত্ত।

(১১) তিন মহাসাগরের প্রহেলিকা/রুশ প্রকাশন/অনু, দিলীপ দাসগুপ্ত।

যুদ্ধের আকৃতি

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বহুকাল বিতর্ক ছিল। ভারততত্ত্বের চর্চা সুরু করেছিলেন বিদেশীরা। অনেক গূঢ় বিষয় তাঁরা অনেক বেশি সংস্কার-বর্জিত খোলা মন নিয়ে দেখার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মহাভারত যে ভারতবর্ষের এক অতীত ইতিহাসেরই কাব্যবিমণ্ডিত রূপ এ কথা প্রমাণ করার দায় দায়িত্ব ছিল না তাঁদের। তাঁরা বরং পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্র ধরে এবং নৃতাত্ত্বিক নজির জড় করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, ইতিহাস দূরের কথা, ভারতে মানুষই ছিল না। এদেশের আদিতম অধিবাসীরাও এসেছিলেন বিদেশ থেকে। আর্যরা তো বটেই।

আজকের ভারততাত্ত্বিকগণ কিন্তু সেসব ব্যাখ্যাকে ধ্রুবজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখতে সহজে রাজি নন। অনেকে নতুন যুক্তি সাজিয়ে বলছেন, ভারতভূমিই ছিল আর্যদের আদি নিবাস। ভারতীয় আর্যদের শাখা প্রশাখা পরে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

আজকের গবেষক ভারতের সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন ও আদি ভারতবাসীকে পৃথিবীর আদিতম পুরুষ বলে উল্লেখ করতেও কুণ্ঠিত নন। উনিশ শতকের তথ্যাদির ওপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলি বহুক্ষেত্রে পরিমার্জিত ও অনেকক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের ফলে অংশত অথবা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হচ্ছে। এখন সমুদ্র-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যার সাহায্যে আবিষ্কৃত হচ্ছে শত শত নয়া তথ্য। গবেষণায় সাহায্যকারী নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও ওলটপালট করে দিচ্ছে পুরাচর্চা বিষয়ক পুরোনো সিদ্ধান্তগুলি।[১৬]

রুশ গবেষক শ্রীআলেকজান্দার কোনদ্রাতভ তাঁর 'তিন মহাসাগরের প্রহেলিকা' গ্রন্থে দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি পুরুষদেরই প্রাচীনতম খাঁটি ভারতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। না, কোনো সাগর পার হয়ে তাঁরা আসেন নি এদেশে। বরং তাঁদেরই পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ ভারতে উঠে এসেছিলেন বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে ডুবে-যাওয়া ভারতেরই বিচ্ছিন্ন অংশ লিমুরিয়া থেকে। একাধিক নিবন্ধে কোনদ্রাতভ একথা খুবই জোরের সঙ্গে বলেছেন। এই লিমুরিয়া ভূ-খণ্ডের কথা আমাদের শোনান ডারউইন-সহযোগী টমাস হাক্সলে এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। উনিশ শতকের জীববিজ্ঞানী

হেকেল বললেন, লিমুরিয়ার সেই নরাকার জীবেরাই উত্তরপূর্ব ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিমে আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। আদি মানব সম্পর্কিত প্রবন্ধে পণ্ডিত রেশেতভ বিভিন্ন তথ্যাদি ঘেঁটে বললেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঐ লিমুরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় নরাকার আদি বানর-মানবরা ভারতে পৌঁছায়। এইসব তথ্য উদ্ধার করে এবং আরও অধুনাতন তথ্যাদির উল্লেখ করে কোনদ্রাতভ বলছেন, হয়ত সিন্ধু সভ্যতাও ভারতের আদি সভ্যতা নয়। তারও আগে ভারতীয় সভ্যতার জন্ম। তিনি বলছেন, বর্তমান দ্রাবিড় ভাষাভাষীরাও নন, বহু নৃতাত্ত্বিকের মতে ভারতের আদি পুরুষরা ছিলেন আদি দ্রাবিড়ীয়। তাঁদের রঙ ছিল আরও হাল্কা এবং উচ্চতা ছিল আরও বেশি। এঁরা ভারতে বহিরাগত এই হিসেবে যে লিমুরিয়া বর্তমানে ভারত ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও সাগরমগ্ন।

বিভিন্ন যুক্তি তর্ক ও তথ্যাদি সন্নিবেশ করে তাঁর প্রতিপাদ্যটি উপস্থাপিত করেও কোনদ্রাতভ বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের গর্ভে অনুসন্ধান চালান না হয় এবং মূল ভারতীয় সভ্যতার চিত্রাক্ষর রচনার পাঠোদ্ধার সম্ভব না হয়, ততদিন এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।"

অবশ্য নিশ্চিত প্রমাণাভাবে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলা যায় না বলেই নতুন চিন্তা ও আবিষ্কার চুপ করে থমকে থেমে দাঁড়ায় না। তেমন হলে আমরা পেছনের অন্ধকারকে যেমন পারতাম না আলোকিত করতে, জানতাম না আমাদের ইতিহাস, তেমনিই ব্যাহত হত আমাদের ভবিষ্যতের অগ্রগতি। সৌভাগ্যত মানুষ হতাশ নয়। সে খোঁজ করে, অজানাকে জানতে চায়। সেই আগ্রহ থেকেই পুরাচর্চা। পুরাচর্চায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যেমন প্রামাণ্য, তেমনই পুরাকথাও একটি বিশেষ সাহায্যকারী সূত্র। কোনদ্রাতভ পুরাকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করেন সকল গবেষকই। দুর্বোধ্যকে গণনার বাইরে রাখলে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না।

লালমুখ সাহেবরা যতটুকু ভারততত্ত্বের অনুশীলন করেছিলেন, শুধু ততটুকুকেই ধ্রুব বলে মান্য করতে বাধে। বাধে, মহাভারতকে নিছক কাব্য হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখতে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরকে সামান্য গোষ্ঠী লড়াই অথবা কাল্পনিক কাব্যকথা বলে চিরকাল মহাভারতের শ্লোকাবলীকে দ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা শ্রুত দৈববাণী হিসেবে অসহায়ভাবে মান্য করে চলাও সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে আজ অনেকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি জানাতে উৎসুক। তাঁরা এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা কাজ চালাচ্ছেন। আবিষ্কার

করার চেষ্টা করছেন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস। মুশকিল হয়েছে, মহাভারতের দেবতা গোষ্ঠীকে নিয়ে। এঁরা মহাভারতের গল্পভাগে এমন সুন্দরভাবে গা ঢাকা দিয়ে আছেন, এমন চমৎকার দুর্বোধ্য রূপকথার রেশমী বুননের মধ্যে সযত্নে মুড়ে রাখা হয়েছে এঁদের কীর্তিগুলি যে, সেগুলি আমাদের কাছে ব্যাখ্যাহীন রূপক ও রূপকথা বলেই মনে হয়। কিন্তু সেইসব রূপকথার জট ছাড়াতে পারলেই তৎকালীয় রাজনৈতিক পটভূমি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইতিহাস বেরিয়ে আসে রূপকথার মায়াদ্বার উদ্ঘাটিত করে।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ, 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা'-য় সেই দ্বারে করাঘাত করার চেষ্টা করেছি। দুর্বোধ্য দেবতা, স্বর্গ, দেবমানব ও দেবানুগৃহীত পুরোহিতদের চিহ্নিত করে তাঁদের একটি বিশেষকালের রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। বর্তমান রচনায় দেবভূমিকা-প্রধান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করব। তবে আলোচনার সময় ফিরে ফিরে দেবতা নামক বহিরাগত নভশ্চরদের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সেইসব তথ্যকে পুনশ্চ উত্থাপিত করব না। পাঠকের সুবিধার জন্য সেক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে আগের বইটি নির্দেশ করব মাত্র। ঐ গ্রন্থের নামটি আকারে বড়, তাই বন্ধনীর মধ্যে কেবলমাত্র (দা. ম. স্ব.) এই শব্দ তিনটি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র (হরফ প্রকাশনী) সঙ্গে সংযুক্ত তাঁর 'ঋগ্বেদ পরিচয়' নিবন্ধে লিখেছেন: "এখন মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়। তাতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকেও ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। …ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হ'ল, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে।"[২] ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ভারত ইতিহাসের ধারা টেনেছেন অর্জুনপৌত্র পরীক্ষিতের আমল থেকে। ডঃ পুশলকর তাঁর গবেষণা কাজকে সুরু করেছেন আরও ঢের পিছন থেকে। কালানুক্রম সাজিয়েছেন খৃঃ পূঃ তিন হাজার একশ অব্দ অর্থাৎ মহাপ্লাবন সমসাময়িক মনু বৈবস্বত থেকে।[১] ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতরা পরিশ্রম কম করছেন না।

একদিকে যখন প্রমাণ সংগ্রহের তাগিদ; তাগিদ, বিচার ও বিশ্লেষণকে ইতিহাস আবিষ্কারের লক্ষ্যাভিসারী করার, তখন অন্যদিকে আবার ইতস্তত বিতর্ক ও অসাবধানী বক্তব্য গ্রন্থিমোচনের কাজে নতুন জট পাকিয়ে তুলছে।

সাক্ষরতা প্রকাশন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারতের যে পাঁচটি খণ্ড (১ম সং ১৯৭৫) প্রকাশ করেছেন, তার পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের 'মহাভারত পাঠের প্রস্তুতি' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটিকে নগণ্য গোষ্ঠী লড়াই বা ট্রাইব্যাল ওয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছে।

একটি 'সহজ বুদ্ধি'র হিসাব উপস্থাপিত করে গোপাল হালদার লিখেছেন যে, কুরুক্ষেত্রের আমলে ভারতের লোকসংখ্যা পঁচাত্তর আশি লক্ষের বেশি হতে পারে না। সুতরাং একটা বড় যুদ্ধ অত কম লোকের দ্বারা বাধিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, মহাভারত এপিক। এপিকের লক্ষণানুসারে এবং মহাভারতের ক্রমবর্ধমানতা লক্ষ্য করে বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ছোট-খাটো যুদ্ধের স্মৃতি একত্রিত আকারে কুরুক্ষেত্রের বিশাল যুদ্ধ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীহালদার মনে করেন, বস্তুতপক্ষে গোধন অধিকারের জন্য বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠী লড়াই ছাড়া কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি।

প্রথমেই মনে হয়, আজকের জনসংখ্যার নিরিখে মহাভারতীয় জনসংখ্যা বিচার করা ঠিক নিরাপদ নয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদিও কোনো 'সহজ বুদ্ধি'র হিসাব সমর্থন করে না। মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা কম ছিল না। কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধবৃন্দের সংখ্যা তো হিসেব করেই দেখানো আছে। কুরুক্ষেত্রে লড়েছিল আঠারো অক্ষৌহিণী সেনা, যার মানে, মোট সেনানীর সংখ্যাই ছিল উনচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয় শত।[৩] এছাড়া ছিলেন রথী মহারথীরা। সেযুগে লড়াই ছিল কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ের পেশা। যোদ্ধাদের বায়সিক সীমা যদি তিরিশের নিচে ধরা যায়, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যে জনসংখ্যা, তাদের মধ্যে চাতুর্বর্গীয় সমাজের অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে পনেরর নিচে বয়স এমন ক্ষত্রিয়দেরও গণনার অন্তর্ভূক্ত করতে হয়। মহিলার সংখ্যা কি পুরুষ অপেক্ষা কিছু বেশি ধরাই যুক্তিসঙ্গত নয়? অসঙ্গত হবে না, যদি ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিকতর মনে করা হয়। কেন না ব্রাহ্মণরা ছিলেন পরান্নে পালিত পরশ্রমভোগী আয়েসী শ্রেণী। সাধারণকে শোষণ, যদৃচ্ছা জীবনযাপন এবং ফলত অবাধ যৌনাচারই সুবিধাভোগীর শ্রেণী-চরিত্র। সুতরাং এমত সম্প্রদায়, মনে করা যেতে পারে, তুলনামূলকভাবে অধিক সন্তানেরই জনক ছিলেন। কারণ প্রাণধারণের জন্য যাদের সংগ্রাম করতে হয় না, সমাজকে যারা খাটবার মতো হাত উপহার না-দেয় অথচ যাদের চর্ব্যচোষ্যের যোগান দিতে মেহনতী সমাজ বাধ্য থাকে তারা দায়িত্বহীনের মতো অবাধ যৌনলীলায় গা ভাসিয়ে সমাজের ঘাড়ে দিব্যি নিষ্কর্মা পেটের

সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে পারে নিশ্চিন্তে। (প্রসঙ্গত বলি, পথেঘাটে রোজদিন জনসংখ্যাবৃদ্ধিকারী ভিখারী পরিবারগুলির দিকে তাকালেও দায়িত্বহীন যৌনাচারের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে)। এই সহজ বুদ্ধির হিসাব মনে রাখলে রণক্ষেত্রে লড়িয়ে সেনা (৩৯,৩৭০০০) অপেক্ষা রণক্ষেত্রের বাইরের জনসংখ্যা আরো বেশিই গণনা করতে হয়। আরও মনে রাখতে হবে যে, এই সংখ্যাতাত্ত্বিক আনুমানিক হিসাব কেবলমাত্র যুদ্ধে যোগদানকারী আর্যাবর্তের রাজ্যগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তামাম ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অবশ্যই ঢের বেশি ছিল। কিন্তু যেভাবেই দেখা যাক, ব্যাপারটা হবে নিছকই অনুমাননির্ভর সংখ্যাতত্ত্ব, যার ওপর নির্ভর করে কুরুক্ষেত্র বা ভারত যুদ্ধের আকার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা যথেষ্ট নিরাপদ তো নয়ই, বৈজ্ঞানিকও হবে না সে অনুমান। তাছাড়া কেবলমাত্র লোকসংখ্যার ভিত্তিতেও একটি প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধের আকার সম্পর্কে মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। যুদ্ধাস্ত্র অসম্ভব শক্তিশালী হলে অতি অল্প যোদ্ধাও বিরাট ধ্বংসলীলা সংঘটিত করে তুলতে পারে। যে পারমাণবিক বিস্ফোরণে গত মহাযুদ্ধে জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই বোমা ফেলতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রয়োজন হয়নি। বাইবেলীয় সদোম গোমোরা জনপদ দুটি ধ্বংসের আলোচনায় (পূর্বে আলোচিত) তিনটি মাত্র পুরুষের দ্বারা দুটি নগরের ধ্বংসকার্যের কথা জানতে পারি আমরা।[১৪] লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যুদ্ধের আকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই তাই যথেষ্ট বাস্তব ও যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না।[৪]

যে এপিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভারত যুদ্ধের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন গোপালবাবু, মহাভারতীয় তথ্যাবলীতে তারও পক্ষে কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধসঙ্ঘর্ষ স্বতন্ত্র উল্লিখিত আছে। গোধন নিয়ে কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধও পেয়েছে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি। তাই একথা কী করে মেনে নেওয়া যায় যে, গোধন নিয়ে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী লড়াই এপিক মাহাত্ম্যে একত্রিত হয়ে একটি মাত্র কুরুক্ষেত্র রণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে? বরং দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে একেবারে আদি পর্বের আদি কথা থেকেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, এ যুদ্ধের পরিকল্পনা এমনকি পাণ্ডব জন্মেরও আগে নভশ্চর-দেবতাদের মূল ঘাঁটি হিমালয় শিবিরে তৈরী হয়েছিল।[১৪] পরিকল্পনাটি রচনা করেন নভশ্চর দেবতাদের সামরিক বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা নামক এক ভিনগ্রহবাসী ব্যক্তি। মহাভারতীয় কাহিনী ভারত যুদ্ধকে লক্ষ্যে রেখেই মূলত যাবতীয় তথ্যাবলীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। রাম না হতেই যেমন রামায়ণ, তেমনি পাণ্ডব জন্মের আগেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা। এসব

কথা ক্রমশ আলোচ্য। তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১৪]

যুদ্ধটি হয়েছিল দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে। যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন নর্মদা গোদাবরী তীরের কয়েকটি দক্ষিণী রাজ্যসহ গোটা আর্যাবর্ত। যুদ্ধপ্রস্তুতি, সন্ধিপ্রস্তাব, দূত প্রেরণ, দল গঠন ও দল ভাঙানোর চেষ্টা হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। তারপর আঠারো দিনের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে বিভিন্ন সেনাপতির পতন ও অপরের দায়িত্ব গ্রহণ, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা এবং লড়ায়ের দৈনন্দিন বর্ণনাও আছে বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে। মহাভারতের এই সকল সুস্পষ্ট তথ্যাবলী সত্ত্বেও পণ্ডিতী কষ্ট-কল্পনা কেবলমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির পাণ্ডিত্য প্রচারের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সাধারণের চিন্তাভাবনার ওপর কোনও প্রয়োজনীয় আলোকপাত করে না। মনে রাখতে হবে, আঠারো দিনের যুদ্ধও এমন কিছু ছোটখাটো লড়াই নয়, গোধনের জন্য তো নয়ই।

'কারণ' কাকতালীয় মনে হলেও এটাই ঘটনা যে, স্বাধীন ভারতে এ পর্যন্ত সংঘটিত কয়েকটি যুদ্ধসঙ্ঘর্ষই কমবেশি আঠারো দিন স্থায়িত্ব লাভ করে। এসব যুদ্ধে পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাঙ্কের কবরখানা ও শক্তিশালী বিমানের শোচনীয় পরাজয় ঘটে গেছে। ১৯৬২ সালের ভারত চীন সীমান্ত বিরোধে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হয়েছিল কুড়ি দিন, যদিও ত্রিশ দিন পর চীন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধাবস্থা স্থায়ী হয় আঠারো দিন। চোদ্দ দিন ধরে চলেছিল ১৯৭১ সালের পাক-ভারত সঙ্ঘর্ষ।[৫] বলা বাহুল্য, এগুলির কোনোটিকেই সামান্য গোষ্ঠী লড়াই আখ্যা দেওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতীয় জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। এই যুদ্ধ তামাম আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপকে সুদীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায়। সংস্কারগতভাবে আজও আমরা সেই ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপ, জাতিভেদ ও পুরোহিত-তন্ত্রর আওতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। মহাভারতীয় যুগের ব্যক্তিপূজার ব্যাধিতে আজও আমরা সমান জর্জরিত।

গোপালবাবুর আর একটি যুক্তি, "যুদ্ধে অশ্ব রথ প্রভৃতি থাকলেও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র খুব সহজলভ্য হওয়ার কথা নয়। বিজ্ঞান ততদূর অগ্রসর হয়নি। কারণ লৌহের প্রচলন ভারতবর্ষে তখনো খুব বেশি দিনের নয়, পরিমাণেও তা বেশি নয়।"

লৌহের কথা খুব বেশি বেশিই আছে কিন্তু মহাভারতে। গোপালবাবু সম্পাদিত মহাভারতেও। একটিমাত্র উদাহরণ, উদ্যোগ পর্বের ১৪৩, ১৪৪

পৃষ্ঠায় লৌহাস্ত্রের ফিরিস্তি (১৯৭৫ সং সাক্ষরতা, ৩য় খণ্ড)। অন্যত্রও লৌহাস্ত্রের একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু মহাভারতে কেন ঋগ্বেদেও আছে লৌহের উল্লেখ।[৬] মহাভারত সমসাময়িক ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে সোনা, রূপা, লোহা, টিন ও সীসা, এই পাঁচটি ধাতুর কথা। আর্যরা যদি মধ্যপ্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্য থেকে এসে থাকেন (এ সম্পর্কে মতভেদ আছে) তবে তাঁরা অবশ্যই লোহার ব্যবহার খুব ভালোভাবেই জেনে এসেছিলেন। কেননা "নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্র খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় মিলেনিয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে লৌহের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে দেখা যায়।" প্রকৃত লৌহযুগের সূত্রপাত আটশ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে না হলেও ধাতু হিসেবে লোহার জ্ঞান ও ব্যবহার ঢের পূর্ববর্তী। একথা জানিয়েছেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থে (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন ফর কাল্টিভেসন অব সায়েন্স সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত)। ডঃ পি. সি. ঘোষ জানিয়েছেন, "…যৌগিক পদার্থ থেকে লোহা তৈরীর প্রণালী অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।"[৭] এশিয়া মাইনর লৌহের ব্যবহার জানত দু' হাজার তিনশ খৃঃ পূর্বাব্দ নাগাদ। প্রাচীন গ্রীক রোমক চীনা ও ভারতীয়রা লোহা ব্যবহার করতেন।[৮] সুশ্রুত থেকে জানা যায়, হিন্দুরা উন্নত মানের ভালো ইস্পাতের অস্ত্রও তৈরী করতে পারতেন। দিল্লীর কুতুব মিনারের সন্নিকটস্থ চিরঅম্লান লৌহস্তম্ভটি লোহা প্রস্তুত বিষয়ে হিন্দু-পারদর্শিতার গৌরবময় সাক্ষ্য বহন করছে বলে সগর্বে উল্লেখ করেছেন ডঃ পি. সি. ঘোষ।[৯]

লৌহাস্ত্রের অভাব ছিল না তাই ভারত যুদ্ধে। আর আগ্রেস্ট এবং দানিকেনের অত্যাধুনিক তত্ত্বের আলোকে মহাভারতীয় ঘটনাবলীর পুনশ্চ পর্যালোচনা করলে সে যুদ্ধে ব্যবহৃত অনেক বিস্ময়কর অস্ত্রেরই আজ নতুন ব্যাখ্যা মিলে যাবে।[১৪] দেখা যাবে সে সব অস্ত্র বস্তুতই প্রযুক্তি ও প্রয়োগ সম্ভব। প্রাগেতিহাস সম্পর্কে আজ অবধি অনেক জল্পনা কল্পনা ও পণ্ডিতী ব্যাখ্যা হয়ে এসেছে। কোনোটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। রোজই আমাদের হাতে নতুন তথ্য জমা হবে। তাছাড়া ভারতে এখনো পূর্ণোদ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যই হয় নি। তাই অমুকটা ছিল না, একথা বলার (বিশেষত প্রাপ্ত পুরাতথ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও) অভিমান না রেখে আমাদের বরং খুঁজে দেখা উচিত সেই সব বিষয়, যা ছিল বলে পুরাপুঁথিগুলি জানাচ্ছে। যা ব্যাখ্যা করতে পারিনি তার অস্তিত্বই ছিল না, সম্ভবত কোনো বৈজ্ঞানিকই এই দৃষ্টিতে কোনো কিছু বিচার করবেন না।

• আগেই বলেছি, মহাভারতীয় তথ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাকে ছোট করে দেখার পক্ষে কোনও সাক্ষ্য রেখে যায়নি। সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই সেদিন সাজানো হয়েছিল রণাঙ্গন। সে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন আর্যাবর্তের সমস্ত রাজন্যবর্গ।

থানেশ্বরের দঃ-পশ্চিমে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রটি সমস্ত পঞ্চক। সমস্ত পঞ্চক এলাকা অর্থে দৈর্ঘ্যে পাঁচ যোজন, প্রস্থেও তাই। যোজন মানে চার ক্রোশ আর এক ক্রোশ হল চার হাজার গজ, অর্থাৎ দু মাইলের কিছু বেশি। বর্তমান থানেশ্বরের কাছে এই কুরুক্ষেত্র চক্র। ভারত ইতিহাসে যে রণক্ষেত্র বারবার উত্তর ভারতে বহিরাগত শক্তির মোকাবিলা করেছে, সেই পাণিপথের বিশ ক্রোশ উত্তরে কুরুক্ষেত্র জনপদটি অবস্থিত ছিল। 'উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী,' কুরুক্ষেত্রের অবস্থান সেই দুই নদীর মধ্যে। মনুসংহিতায় তারই নাম ব্রহ্মাবর্ত: ব্রহ্মাবর্ত 'দেবনির্মিতং দেশং'।

'দেবনির্মিত' কেন? দেবতারা এসে ভারতে দেশ গাঁও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন নাকি? সোজা উত্তর, শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর আরও বহু জায়গায় জনপদ নির্মাণ করেছিলেন দেবতারাই, পুরাপুঁথি ও লোককথা এতকাল তাই বলে আসছিল। সম্প্রতি ঐ দেবতাদের খোঁজ খবর সুরু হয়েছে।[১০] প্রশ্ন উঠেছে, দেবতা কারা? দেবতা তো মানুষের কল্পনার সৃষ্টি ঈশ্বর নন। তবে কোত্থেকে তাঁদের আবির্ভাব, কোথায় অন্তর্ধান? আগের রচনায় অর্থাৎ 'মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা' গ্রন্থে দেবতাদের স্বরূপ সন্ধান করে জানতে পেরেছি, তাঁরা যেখান থেকেই এসে থাকুন, তাঁরা ছিলেন দেহধারী। তাঁদের জন্মমৃত্যু ছিল, ছিল ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভয় ভীতি ও মর্ত্য-মানবের হাতে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা। তাঁরা যুদ্ধ করেছেন, মিত্রতা করেছেন, হাসপাতাল গড়ে চিকিৎসাও করেছেন মানুষের। যেখান থেকেই আসুন, পছন্দ করেছেন নির্জন পাথুরে জমি নিজেদের নিরাপদ অবস্থানের জন্য। মহাভারতীয় দেবতারা এইভাবে শিবির গেড়েছিলেন হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকায়। সেখানে বসে সেই দেবাশবিরের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা করেছিলেন একটি মহাসমরের পরিকল্পনা। সেই মহাসমরের নাম ভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যুদ্ধটির পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল সুমেরু পর্বতের কোনো উপত্যকায়, ব্রহ্মার শিবিরে। তাই দেবতারাও এ যুদ্ধে একটি পক্ষ। বস্তুতপক্ষে এ যুদ্ধ প্রধানত তাঁরাই লড়েছেন দুর্যোধন-গোষ্ঠীর সঙ্গে। তাই এ যুদ্ধও দেব-অসুরের যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ ঢের হয়েছিল সেদিনের দুনিয়ায়। সম্প্রতি একজোট বিজ্ঞানী এই দেবতাদের গ্রহান্তর থেকে আগত কতিপয় নভশ্চর বলে

সন্দেহ করতে সুরু করেছেন এবং তাঁদের সন্দেহের সমর্থনে আহরণ করেছেন অতি বিশ্বাসযোগ্য পুরাতথ্য ও পুরাবস্তুর খবরাখবর।[১৪]

দেবতারা যেহেতু হাত-পা-ওলা মনুষ্যোপম জীব,[১১] তাঁদের পক্ষে তাই পৃথ্বীপৃষ্ঠে দেশ নগর জনপদ বানানো ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। হিমালয়ের বহু স্থানকেই তাই ল্যাণ্ড অব দি গডস্ বা দেবভূমি বলা হয়। পর্যটন বিভাগের বিজ্ঞাপনে কুলু মানালিকে এই নামেই চিহ্নিত হতে দেখছি। কুরুক্ষেত্রের উত্তরস্থ উত্তর কুরুকেও বলা হয়, দি ল্যাণ্ড অব দি গডস। তাই প্রশ্ন স্বাভাবিক, দেবতারা কি সত্যিই নগর পত্তন করেছিলেন, যেমন ব্রহ্মাবর্ত বা অন্যান্য স্থানে? সত্যিই কি মানুষের সঙ্গে (দেববিরোধী হলে নাম হত অসুর, দানব, রাক্ষস) হয়েছিল তাঁদের সঙ্ঘর্ষ?

খনন কার্যের ফলে অনেক দেবনির্মিত শহর লুপ্ত ইতিহাসের কবর খুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। এমন একটি অন্যতম আবিষ্কার তিওতিহুয়াকান (Teotihuacan)। কেউ জানেন না, তিওতিহুয়াকান শহর বানিয়েছিলেন কারা। শুধু আজটেকদের পুরাপুঁথি রেকর্ড রেখে গেছে। কবর থেকে তিওতিহুয়াকানের আত্মপ্রকাশের আগেও তারা বলত মেক্সিকো উপত্যকার কাছাকাছি এক মস্ত প্রস্তরচত্বরে (মালভূমি) ছিল তাদের তোলান তিওতিহুয়াকান (Tollan Teotihuacan), যার মানে, 'যাঁরা দেবত্ব (Gods) লাভ করেছিলেন সেটা ছিল তাঁদেরই মহান নগর।' মধ্য আমেরিকার এই প্রাক-কলম্বীয় শহরটিতে ছড়িয়ে আছে সুন্দর পরিকল্পনার একটি মহানগরী, দুর্গ, বাসস্থান, বড় বড় অ্যাভিন্যু। আর আছে দুটি পিরামিড, সূর্য ও চন্দ্র। নগরটির পরিকল্পনা ও নির্মিতি হয়েছিল নক্ষত্রলোকের যথাযথ অবস্থিতির গাণিতিক অনুসরণে। নগরীর বয়স গণনা করা হয়েছে দু হাজার বছর। দু'শ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই নগরী ছিল সমৃদ্ধির শিখরে।[১২] 'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধেও দেবতাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, দেবতারা ঐ জায়গায় যজ্ঞ করেছিলেন। তাই তাকে বলা হয়, 'দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান।' স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে, দেবতা কারা? ধর্মই বা কি? যুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কোথায়? এসব প্রশ্ন পূর্ববর্তী গ্রন্থে আলোচনা করেছি।[১৪] আবারও সেসব কথা আলোচিত হবে। এখানে বলব, নরাকার দেহধারী সেই দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে বহিরাগত। এসেছিলেন মহাকাশ পথে। পুরাকথায় ও আমাদের মহাভারতে সেই অদ্ভুতকর্মা দেবতারা জমি দখলের লড়াই লড়েছেন। আর দেবস্তাবকরা সেই লড়াইকেই বলেছেন ধর্মযুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে বুঝতে হলে মহাভারতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক স্বরূপটি

বুঝতে হয়। আগেই আলোচনা করেছি, এখানে স্মরণ করব, আদিতে মহাভারত ছিল নিছক একটি যুদ্ধকাহিনী। পরে তাই হয়েছে লক্ষ শ্লোকের এক মহাকাব্য। আদি যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থটি ছিল পাণ্ডবদের বিজয়গাথা, যার নাম 'জয়'। বিজয়ী পাণ্ডবরা বহিরাগত শক্তিশিবিরের দেবতাদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে নির্মূল করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে নয়া পাণ্ডব শাসিত ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপ-পীড়িত ভারতবর্ষ সেই ভারত কাজেকাজেই বিজয়ী পাণ্ডবপক্ষকে ধর্মাবতার ও তাঁদের দ্বারা পূজিত বহিরাগত শিবিরকে দেবশিবির রূপে পূজা-প্রণাম জানাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বহিরাগত শক্তি বা দেবতারা এরপর যতকাল হিমালয় শিখরে ছিলেন (অন্তত যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানকাল পর্যন্ত) ততকাল নিরাপদ দেবভূমিতে সুখে রাজ্যপাট করেছেন। কেননা তারপর আর তাঁদের ওপর হামলা করার জন্য কোনোও শক্তিশালী নৃপতি আর্যাবর্তে ছিলেন না। অসুরের উৎপাত হাঙ্গামা এভাবেই দেবতারা ঠেকিয়েছিলেন। তারই জন্য ব্রহ্মার পরিকল্পনা, তারই জন্য কৃষ্ণার্জুনের দেবপ্রদত্ত অস্ত্রাদি লাভ; সেই কারণেই অর্জুনকে স্বর্গে অর্থাৎ হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে উন্নতমানের সমরশিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল।[১৪] চতুর আগন্তুকরা হিমালয়ে বসে লড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতবাসীকে একে অপরের বিরুদ্ধে, আর 'জয়'-এর পর আদায় করেছিলেন তাঁদের যুদ্ধে-লগ্নীকৃত মূলধন সুদে আসলে। উপনিবেশের শাসক তাঁরা হন-নি। বুদ্ধি ছিল ঢের বেশি। একেবারে মানুষের চরম দুর্বলতা ও কুসংস্কার ভাঙিয়ে নিজেদের স্থাপনা করেছিলেন তাঁরা দেবতার আসনে। আদায় করেছিলেন পূজাপ্রণামের খাজনা। সৃষ্টি করেছিলেন প্রচারবিদ এক পুরোহিত শ্রেণী আর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই পুরোহিতদের জন্য একটি পরশ্রমভোগী আরামের সুখস্বর্গ। এসব তথ্য জানা যায় মহাভারতের শ্লোক ঘাঁটিলে। এসব তথ্য পড়তে হয় নয়া দৃষ্টিকোণ থেকে। এ দৃষ্টি, এই চশমা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন মাটেস্ট আগ্রেস্ট ও দানিকেন।[১৪] দেবতাদের অতি-প্রাকৃত কোনো আজব ব্যাপার বলে এতদিন আমরা যা জেনে এসেছি, হয়ত সেই জানাই শেষ জানা নয়। জানার শেষ নেই। মহাভারতকে ফিরে পড়লে অনেক গুপ্তকথা অনেক না-জানা ইতিহাস জানা যাবে, যদি দেবতাদের কাণ্ডকারখানার প্রতি গোঁড়ামিহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাকানো যায়। সেই দৃষ্টিতে আজ তাই প্রয়োজন একটি পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়নের। আধুনিক সঞ্জয়ের চোখে জবাব দিতে হবে সেই মহা জিজ্ঞাসার, যা জানতে চেয়েছিল "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥"

ধার্তরাষ্ট্রীয়গণ ও পাণ্ডবরা অনেক কিছুই করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের লড়াই জেতার জন্য। সেনা সমাবেশ হয়েছিল আঠারো অক্ষৌহিণী (হিসেব আগে দিয়েছি)। কুরুপক্ষে যোগ দেন আর্যাবর্তের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ, কিন্তু ধর্মের নামে বহু ঢক্কানিনাদ ও প্রচার সত্ত্বেও পাণ্ডবরা জোটাতে পারেননি সেই তুলনায় দেশীয় রাজত্বগুলির সমর্থন।

কেন এমন হয়েছিল? যদি কুরুপক্ষই অধার্মিক, তবে সব রাজা গিয়ে (পাণ্ডবদের নিকটাত্মীয় সমেত) জুটলেন কেন দুর্যোধনের সঙ্গে? ক্রমশ সে কথাই বলব।

এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে চোখের ওপর রেখে মহাভারতের পাঠ গ্রহণ করলে আমরা আমাদের পুরা ইতিহাসকে পৌরাণিক গল্প গাথা থেকে উদ্ধার করতে পারি। এবার সেই অনুসন্ধানই সুরু করা যাক।

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ' কেবলমাত্র আর্যাবর্তের রাজন্যকুলই নন, সসৈন্যে কতিপয় রাজা ছুটে এসেছিলেন নর্মদা দক্ষিণাঞ্চল থেকেও। এসেছিলেন পূর্বাঞ্চল থেকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ।

সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে এই যে সমরায়োজন এ তো কোনো সামান্য গোষ্ঠী লড়াইয়ের চেহারা নয়। বিশ্বাস করা শক্ত, তাবৎ রাজন্যবর্গ সেদিন মরণপণ লড়াই লড়তে এসেছিলেন কুরু রাজ্যের জ্ঞাতিবিরোধে পক্ষাবলম্বন করার জন্যই। দুর্যোধন, না যুধিষ্ঠির? হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কে বসলেন, তাতে গোটা ভারতের উত্তরাখণ্ড উদ্বেলিত হয়ে উঠবে কেন? শ্রীমতী দ্রৌপদী তাঁর শ্বশুরালয়ে জ্ঞাতি দেবরদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন, তা তাতেই বা চতুর্দিকের রাজারাজড়া সর্বস্ব পণ করে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হবেন কেন? কী তাঁদের লাভালাভ? যে কালে মহাভারতে কূট রাজনীতির চূড়ান্ত চর্চা হয়েছে, সেই রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞ ভারতের রাজারা স্বজাতি ও স্বরাজ্যের লাভালাভ চিন্তা না করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এও কি সম্ভব, না তা বিশ্বাস করতে বললেই সুবোধ বালকের মত মেনে নেওয়া যায়?

যুধিষ্ঠিরকে পাঁচটি গ্রাম পাইয়ে দেওয়ার জন্য দ্রুপদ রাজার উদ্বেগ থাকতে পারে; তিনি দ্রৌপদীর গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়ে অবশ্যই চিন্তিত হবেন, কিন্তু অন্যান্যরা? তাছাড়া আরও একটা প্রশ্ন: মহাভারতের তিন প্রধান ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ যুদ্ধে তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারলেন না কেন? সম্পর্কে ঠাকুর্দা পরম ধার্মিক পুরুষ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল বিচিত্রবীর্যের বংশধারাকে রক্ষা করবেন। রাজ্যপাট আগলে রাখবেন। কিন্তু কার্যকালে একটা খোঁড়া আর ভোঁতা যুক্তি দিয়ে তিনি অস্ত্র ধারণ করলেন সেই বিচিত্রবীর্যেরই বংশধর পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে।

ব্যাপারটি খুবই রহস্যময় বলেই তো মনে হয়। ভীষ্মের উক্তি ছিল, মানুষ টাকার দাস, অন্নের দাস, তাই দাসত্ব নিবন্ধন তাঁকে দুর্যোধনের চাকরি করতে হচ্ছে। এও কি একটা যুক্তি? অন্তত সর্বত্যাগী ভীষ্মের মুখে এ যুক্তি বসালে কোন্ যুক্তিবাদীর সন্দেহ উদ্রেক না হয়ে পারে? দ্রোণ তো উভয় পক্ষেরই অস্ত্রগুরু! অর্জুন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। তা তিনিও কোন্ বিশেষ কারণে গেঁথে রইলেন রাজা দুর্যোধনের শিবিরে? শিক্ষাগুরু কৃপাচার্যের বৃদ্ধ বয়সেও কি লোভই ছিল নিরপেক্ষতা অবলম্বনের প্রধান বাধা? বোধহয় তা নয়। ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ করে যাওয়ার উপায় ছিল না তাঁদের। এই নিরুপায়তার কারণও লোভ অথবা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় নয়, কারণ ছিল অন্যত্র এবং রাজনৈতিক। যথাসময়ে সে কারণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে। প্রশ্ন আরও একটি, ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটিকে খল ও কপটতায় পূর্ণ বলেই মহাভারত পাঠকের অনুমান হতে পারে। অথচ মজা এই, সুরু থেকে মহাভারতের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত মর্যাদাসহই কীর্তিত। কেন? দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দানেই যদি কুরুক্ষেত্রের মহাবিনষ্টি অনিবার্য হয়ে থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্রই তো সর্বাধিক ধিকৃকৃত চরিত্র হওয়ার কথা। কিন্তু মহাভারতে তাঁর প্রতি 'দুরাত্মা' শব্দের প্রয়োগ দুর্লক্ষ্য এবং তাই মনে হয়, সব ব্যাপারটাই তালগোল পাকানো। অনেক জট, অনেকানেক জটিলতা। সেই জট ছাড়াতে পারলে আসল সত্যের আলো হয়ত রাখা-ঢাকা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যগুলিকে অর্থ দান করতে পারে।

যুযুধান শিবির দুটির দিকে তাকিয়ে অতঃপর আমরা আমাদের খোঁজ পরিষদের কাজ সুরু করি। আসুন, বিলুপ্ত ইতিহাসের সন্ধানে আপনিও আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে যোগ দিন আমার সঙ্গে। প্রশ্ন তুলুন, জবাব খুঁজুন।

১। The History & Culture of Indian People (The Vedic Age)—Ed. Dr. R. C. Majumdar—গ্রন্থে Dr. B. K. Ghose লিখিত The Aryan Problem নিবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত The Theory of Indigenous Origin of Aryans অংশ দ্রষ্টব্য।

২। কুরুক্ষেত্রে নিহত সেনানীর কঙ্কাল সম্পর্কে উল্লেখ আছে পরিব্রাজক জুয়ান চোয়েং-এর নথিতে।

ডঃ ভি. সি. পাণ্ডের মতে এসব তথ্যাবলী যুদ্ধের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ (আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদ থেকে)।

৩। এক অক্ষৌহিণীর মান: এক লক্ষ নয় হাজার তিনশ পঞ্চাশ পদাতিক, পঁয়ষট্টি হাজার ছয় শত দশ ঘোড়া, একুশ হাজার আটশ সত্তর হাতি ও সম-পরিমাণ রথ। মোট সৈন্য সংখ্যা, দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাত শত।

৪। অর্জুনকে নিবাতকবচ নামক দৈত্যাদি আক্রমণ করতে পাঠাবার সময় ইন্দ্র বলেছিলেন, তাদের সংখ্যা তিন কোটি। (বন ১৭৪ পৃঃ) একটি সীমিত দৈত্যরাজ্যের এই লোকসংখ্যার নিরিখে তৎকালীন আর্যাবর্তের 'সহজবুদ্ধি'র হিসাবটি কত হতে পারে?

৫। 'Kurukshetra War—a Military Study' by Major P. Sen Sharma।

৬। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে 'অশ্বিদ্বয় দেবতা' স্তবে বলা হয়েছে: রাজমহিষী বিশপলা কোনো যুদ্ধে একটি পা হারালে সেই রাত্রেই দেব চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার তাঁকে একটি 'লৌহময় জঙ্ঘা' অথবা লোহার পা পরিয়ে দেন। (১/১১৬/১৫)। এছাড়া লোহার কথা আছে অন্যান্য ঋকেও।

৭। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' দ্রঃ। বহু ঐতিহাসিকের মতে অশ্ব ও লৌহাস্ত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অধ্যাপক হুইলার হরপ্পা ধ্বংসের ব্যাপারে পুরন্দর ইন্দ্রকে দায়ী করেছেন।—Ancient India By R. E. M. Wheeler দ্রঃ।

৮। Children's Britannica, Vol. 9 দ্রঃ।

৯। প্রাচীন যে সব নজিরের ভিত্তিতে পশ্চিমী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকারগণ পুরাযুগে এই গোলকে ভিন্ গ্রহবাসীর সম্ভাব্য অবতরণ সম্পর্কিত তত্ত্বটি খাড়া করেছেন, আলোচ্য লৌহস্তম্ভটিকেও তাঁরা তেমনি এক নজির হিসেবে গণ্য করেন। In Search of Ancient Mysteries গ্রন্থে স্তম্ভটির স্থাপনাকাল পনেরশ খৃষ্ট পূর্বাব্দ বলে উল্লিখিত হয়েছে।

মহাভারত সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। যুক্তিতর্ক, এমন কি যুক্তির নামে মনগড়া গল্পেরও ছড়াছড়ি। সেই তর্কসভা থেকে কেবলমাত্র গোপালবাবুর বক্তব্যটুকুই এখানে বিশেষ আলোচ্য করার উদ্দেশ্য, সাধারণ পাঠক পাঠিকাকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করা। সাক্ষরতা প্রকাশিত মহাভারতের সুলভ সংস্করণ ইতিমধ্যে বহুজনের পাঠাগারে স্থান পেয়েছে। আমিও কালীপ্রসন্ন অনূদিত মহাভারতটিকেই আমার মূল অবলম্বন করেছি। এমন একটি বহুল প্রচারিত গ্রন্থের সঙ্গে গোপালবাবুর অভিনব যুক্তি সংযোজিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্পর্কে পাঠক মনে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুমানের ভিত্তিতে আমি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, তার চরিত্রটি এবং আকৃতিটি অনেক বড় এবং সেখানে গ্রহান্তর শিবিরেরই (দেবতাদের) মদতে যুদ্ধ লড়েছেন পাণ্ডবরা। সে যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, দেবানুচর পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা।

যুদ্ধের ক্ষুদ্রাকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নটি তাই এখানে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ক্ষুদ্র ও সাধারণ গোষ্ঠী লড়াই হিসেবে গণনা করার অর্থ, মহাভারতের সমগ্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা লালন করা।

১০। তৎপর খোঁজ চালাচ্ছেন সুইশ গবেষক এরিক ফন দানিকেন রুশ অধ্যাপক ম্যাটেষ্ট আগ্রেস্টের পন্থায়। আগ্রেস্টতত্ত্বের জন্য 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

১১। "The gods are described as born, though not simultaneously...In appearance they are human...they travel through the air in cars...the food of men becomes the food of the gods when offered in sacrifice,"—Dr. V. M. Apte, M. A., Phd. (Cantab), 'Vedic Age' দ্রঃ।

দেবতারা এক প্রকার উন্নত জীব। তাঁদের ঘাম হয় না। চোখে পলক নেই। পা মাটি স্পর্শ করে না। (বনপর্ব)। 'মহাভারতের সমাজ'—সুখময় ভট্টাচার্য (বিশ্বভারতী) লিখিত গ্রন্থে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনি আরও জানিয়েছেন, দেবতাদের জন্মমৃত্যু আছে, তবে তাঁরা দীর্ঘায়ু।

'সম্ভবত ইন্দ্র একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং আর্যদের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হইয়াছিল।' (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম খণ্ড, হরফ)। দেবরাজ, ইন্দ্রের উপাধি। মর্ত্যমানব রাজা নহুষও ইন্দ্রত্ব লাভ করেন (বনপর্ব, ১৭৯ অ)। ইন্দ্রের মন্ত্রীও মানুষ, বৃহস্পতি। তাছাড়া তাঁর সভায় এক সহস্র পণ্ডিত ছিলেন, তাই তিনি সহস্রাক্ষ। ইন্দ্র এক নন, মহাভারতে 'ইন্দ্রগণ' বলা হয়েছে (আদি, কালীপ্রসন্ন, ১ম সং ১৯৮, ১৯৯)। "Indra...became the god of battle and is more frequently invoked than any other deity as a helper in conflicts with earthly enemies...He protects the Aryan...and subjects the black skin (আমি ভারতীয়)...dispersed 50,000 of the black race"—Dr. A. A. Macdonell, A Hist. of Sanskrit Literature।

"আমি অনেক ভাষাবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করেছি, 'ঈশ্বর' শব্দটা কোথা থেকে এলো?...অতি প্রাচীন আরামীয় ও হিব্রু পুঁথি পত্তর ঘেঁটে তাঁরা বলেছেন...আদিতম ধারণার মোটামুটি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'যারা মেঘের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়, তাঁরাই দেবতা।" (দানিকেন, 'আমার পৃথিবী' অনুবাদ অজিত দত্ত।)

"The gods looked somewhat like their early followers, warriors wearing a short kilt. They were stylised 'Puntit beards, plaited and curved, thought to be symbolic of a goat as embodiment of fertility; behind them hung a bushy animal's tail. Throughout historic times the pharaohs wore kilt and tail, and the priests too, especially during the new kingdom, wore archaic costume. The goddesses wore simple anklelength dresses,"—Veronica Lons, Egyptian Mythology.

এই দেবতাদের অনেক ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটে গেছে। ঋগ্বেদীয় আমলে যাঁরা ছিলেন মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, পরবর্তীকালে, পুরাণ মহাভারতে তাঁদের দেখা গেল দেহবান লড়াকু চেহারায়। এই ধাঁধাই প্রাগেতিহাসের আসল ধাঁধা! ঐতিহাসিক ডক্টর এইচ. সি. রায়চৌধুরী লিখেছেন, "The religious ideas which the Mahabharata inculcates...are not mere replica of those prevailing in the vedic period. Great changes had taken place in the conception of the gods and problems of life. The old vedic gods had lost much of their...splendour and the presiding dieties of nature became quite human in dress, talk and action." (প্রশ্ন, কিন্তু কেন, এমন পরিবর্তন হল কেন? জবাব দেবে কুরুক্ষেত্র)।

১২। The world's last Mysteries, a Reader's Digest publication,

১৩। "Mahabharata, the 'Great Epic of India,' passing through the stages of 'Jaya' and 'Bharata', came to be developed from a small beginning.

first incorporating the story of the triumph of the Pandavas over the Kauravas, than the narrative in details of the entire Bharata race, and finally the present encyclopaedic satasahasri samhita..."—Dr. P. L. Vaidya, M. A., Phd., Hindu University, Banaras.

১৪। এই লেখকের "দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ।

১৫। বর্তমান রচনায় মহাভারতের সকল নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সাক্ষরতা প্রকাশনের পাঁচ খণ্ড কালীপ্রসন্ন মহাভারত থেকে। অবলম্বন করা হয়েছে, ১ম সংস্করণটি।

১৬। আর্য-পূর্ব ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "It was believed that all the better elements in Hindu religion and culture—its deeper philosophy, its finer literature, its more reasonable organization, everything in fact white was great and good and noble in it—came from the Aryans as a superior white race;...This view is now being gradually abandoned...the Dravidians contributed a great many elements of paramount importance in the evolution of Hindu civilization....The pre-Aryans of Mohenjodaro and Harappa were certainly in possession of a higher material culture than what the semi-nomadic Aryans could show."—Vedic Age.

ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ডের মতে, বাবিলনীয় মৃত্তিকায় যে সুমেরীয় সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তার প্রেরণাভূমি ছিল ভারতবর্ষ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত স্যার আর্থার কীথের একটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ—"প্রাচীন ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীণ পরিণতির উচ্চ শিখরে আসীন ছিল। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যত্র তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।...সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধানকারী হরপ্পা মহেনজোদড়োর সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত নগর নির্মাণ বিজ্ঞানের তুলনা মিশর ও মেসোপোটেমিয়াতে পাওয়া যায় নাই···মহেনজোদড়ো নির্মিত হইয়াছিল খৃঃ পূঃ ত্রয়োত্রিংশ শতকে ইজিপ্টের প্রথম ফ্যারাও বংশের প্রথম নরপতির রাজত্বকালে···।"—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/অনুবাদক। ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বক্তৃতামালা থেকে।

"মহেনজোদড়ো নির্মাণের যুগ মিশরের প্রথম পিরামিড যুগের সমসাময়িক। কিন্তু হরপ্পার উন্নত ধরনের পল্লী ও নগর নির্মাণের সূচনা হইয়াছিল প্রথম পিরামিড সৃষ্টির অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্বে।···সিন্ধু উপত্যকার খনন বিধিমত পরিচালিত হইলে হয়ত ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, ভারতের বহু প্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় ও মিশরীয় সংস্কৃতির অগ্রজ।"—দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা, ঐ।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি পুরাযুগে ভারতবর্ষে এক মহান সভ্যতার অস্তিত্বকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। শুধু সাদা চামড়ার চমৎকারিত্বে তাই আর ভারতের আদি ও লুপ্ত ইতিহাসকে অবহেলা করতে পারি না আমরা। বুঝতে পারি, সেই মহান সভ্যতাকে ধ্বংস ও অবলুপ্ত করে বহিরাগত শক্তি অতি অনায়াসে আর্যাবর্তে দখলদারি কায়েম করতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে লড়তে হয়েছিল ভূমিজদের সঙ্গে। কুরুক্ষেত্রের রণে এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলায় অতঃপর

শৌর্যশালী ভূমিজ রাজন্যবর্গের (দেবস্তাবক পুরোহিতবৃন্দ রণবিজয়ের পর যাঁদের অসুর দানব ও রাক্ষস সাজিয়ে সর্বসাধারণের চক্ষে হেয় করতে চেয়েছেন) এক শ্মশানভূমি রচনা করে বহিরাগতরা অনুতাপবিদ্ধ পাণ্ডবদের নামেমাত্র শাসক পদে বসিয়ে কার্যত পুরোহিতশোষিত এক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তার প্রধান শর্ত ছিল, সাধারণ্যের সকল স্বাধীনতা দেবতা (ভিন্‌গ্রহী বহিরাগত) ও ব্রাহ্মণদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। সেটাই গীতোক্ত ধর্ম, যা বলে, সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার পাদপদ্ম আশ্রয় কর। এ বাণী ঈশ্বরের বাণী নয়, এ সেই ভূমিগ্রাসী তথাকথিত দেবতাদের আদেশ, ধর্মের মোড়কে বিশ্বাসের মধু মাখিয়ে যা চতুর পুরোহিতবৃন্দ সাধারণ্যে বিলি করেছিলেন অপর সকল জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর আয়ত্তাধীনে রেখে। তাই বৈদিক জ্ঞান একমাত্র ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, আর পৌরাণিক রূপকথা সর্বসাধারণের চোখে মোহাঞ্জন লেপনের জন্য সৃষ্টি।

ইংরেজও এদেশে বহিরাগত। তারা অনুরূপভাবে আধুনিক ভারতবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিল, গর্ব করার মত কোনো ইতিহাস ঐতিহ্য কালা আদমি ভারতীয়দের ছিল না। ভারতের আদি পিতারাও ছিলেন বহিরাগত এবং যা কিছু সাদা চামড়ার কীর্তি, তা সকলই উন্নতমানের। আমাদের ইতিহাস-সন্ধানী মন, বলা বাহুল্য, এসব কথায় পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। যা একদিন বহিরাগত দেবতারা ভোলাতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের স্তাবক পুরোহিত শ্রেণীর মাধ্যমে, যা আধুনিককালে সাদা ইংরেজদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে আমাদের কাছে গালগল্প হয়ে থেকেছে, সেই লুপ্ত ইতিহাসকে আজ আমাদের খুজে বার করার সময়। সে কাজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের মাধ্যমেই সঠিক পথে এগোতে পারে।

দেবাসুর শিবির

তাকিয়ে দেখুন, যুদ্ধার্থী শিবির দুটির দিকে। উত্তর ভারতের বিশাল এক মানচিত্রে বিশিষ্ট রাজ্যগুলি দুই শিবিরে সমবেত হয়েছে। একদিকে কুরু বা ধার্তরাষ্ট্রগণ, অন্যদিকে পাণ্ডবরা এবং তাঁদের নেপথ্য পরিচালক হিমালয়স্থ দেবশিবির।

কুরুক্ষেত্রে একে একে এসে যোগ দিলেন উত্তর ভারতের গান্ধার বা আধুনিক পেশোয়ার (গান্ধারী ও শকুনি যে রাজ্যের পুত্রপুত্রী)। গান্ধার ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের সবকটি রাজ্যই যোগদান করে দুর্যোধন-শিবিরে কেবলমাত্র কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'অভিসার' নামক অঞ্চলটি তার সামরিক শক্তি নিয়ে পাণ্ডবদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে দুর্যোধনপক্ষে সমবেত হয়েছে কেকয় (গান্ধার বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী), ইরাবতী তীরস্থ মদ্র, সিন্ধুসৌবীর, অম্বোষ্ঠ। কেকয়রাজ শিবি, মদ্রাধিপতি শল্য, বিতস্তা-সিন্ধুর নিকটবর্তী সিন্ধুসৌবীরের রাজা জয়দ্রথ ও অম্বোষ্ঠরাজ ছিলেন শ্রুতায়ু।

শল্য সম্পর্কে যে গল্পই থাক, দুর্যোধনপক্ষে সসৈন্যে তাঁর যোগদান কিছু প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপিত করে। শল্য আত্মীয়তা সূত্রে পাণ্ডবদেরই কাছের জন। অন্য কেউ নন, মামা। গল্প হল, দুর্যোধনের পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে শল্য ভুল করে দুর্যোধন পক্ষে যোগ দেন এবং যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, শত্রু শিবিরে থেকেও তিনি যুধিষ্ঠিরের উপকারার্থে কর্ণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধের মতো একটা ব্যাপার, যেখানে দুপক্ষের সর্বস্ব পণ করা হয়েছে, প্রাণ নিয়ে শল্যই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন কিনা জানা নেই, জীবনের সেই চরম মুহূর্তে ভারতের সবকটি রাজা কি উন্মাদের মতো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মজা করতে পারেন? শল্য কাহিনী পড়লে একটা মজার গল্প বলেই মনে হয়। সেখানে মুখ ফসকে প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ ছিল, যে কোনো অজুহাতে তেমনিই তো সহজ ছিল আশীর্বাদকেও অভিশাপে পরিণত করা।

দুর্যোধনের চাতুরী ধরে ফেলার পর শল্য সে ভাবেই তাঁকে ত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাই মনে হয়, এসব গল্প কথকদেরই কারসাজি, বস্তুত ঘটনা নয়। ভাগ্নেদের অতবড় বিপদে শল্যর পক্ষে দুর্যোধন শিবিরে গিয়ে যোগদান করা বিশেষ কারণ ছাড়া সম্ভব নয়। দুর্যোধন পরিচর্যা

করলেন, তাই শল্য গদাই লস্করী চালে তাঁর সেনাপতি হয়ে নিজের ভাগ্নেদের দিকে মার মার করে তেড়ে গেলেন, না, তৎকালীন রাজনীতি অত কাঁচা ছিল না। সন্দেহ স্বাভাবিক, দুর্যোধন পক্ষে শল্যের যোগদানের অন্য রহস্য ছিল। পাণ্ডবদের চরবৃত্তি করার জন্যে শল্যের পক্ষে অস্ত্রধারণ, তাও সন্দেহজনক, অস্বাভাবিক। গল্পগত এই গোলমালের দিকে তাকালে মনে হয়, প্রকৃত ইতিহাস কথক ঠাকুরদের কৃপায় এ ক্ষেত্রেও কিছু অদল-বদল হয়েছে। কারণ হয়ত এই, শল্য যে তৎকালীন রাজনৈতিক আবর্তের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেই দুর্যোধন পক্ষে যোগদান শ্রেয় গণ্য করেছিলেন, পাণ্ডবদের ইমেজ বা ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য সেকথা একটি অবাস্তব গল্প ফেঁদে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতুল শল্যকে বাতুল বানিয়ে পাণ্ডবদের ভাবমূর্তির গায়ে আঘাত লাগতে দেওয়া হয়নি। যদি বলা হত, বহিরাগত হিমালয়শিবিরের (দেবতাদের) সহায়তায় দেশীয় রাজন্যবর্গের ওপর ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাণ্ডবরা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন বলেই অন্যান্য বহু ভারতীয় রাজাদের মতো শল্যও তা মেনে নিতে পারেননি ; সেজন্যই পাণ্ডব-পাঞ্চাল শক্তির সঙ্গে বহিরাগত নভশ্চর দেবতাদের আগ্রাসী অভিযান রুখতে উত্তরের অন্যান্য রাজার সঙ্গে খুবই সঙ্গত কারণে কুরু শিবিরেই যোগদান করেছিলেন পাণ্ডব মাতুল শল্যও ; তিনি ভাঁড় নন, স্বদেশপ্রেমিক এক আদি ভারতীয় রাজা ; তাহলে পাণ্ডবদের ভাবমূর্তি অম্লান থাকে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুনর্বিচারে যে দেবাসুর যুদ্ধের চেহারাটি আমার চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে শল্যের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমি এই উত্তরই পাই। এখানে আরও বলে রাখি, লক্ষণীয় এই যে, শল্য সম্পর্কেই মহাভারতের কথক ঠাকুরকে একটি গল্প রচনা করতে হয়েছে, অন্যান্য রাজাদের সম্পর্কে তা প্রয়োজন হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের সঙ্গে শল্যের যে বিতণ্ডা তা তো দুই বীর যোদ্ধার অহঙ্কারের প্রকাশও হতে পারে। কথক এই ঘটনাটিকে আপন প্রয়োজন সাধনের জন্য চরবৃত্তিরূপে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে পাণ্ডবদের চর হিসেবে দুর্যোধন-শিবিরের চরম ক্ষতি যদি কেউ করে থাকেন তবে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ভাই ও মন্ত্রী বিদুর। বিদুরের চক্রান্ত একেবারে দুর্যোধন জন্মের মুহূর্ত থেকেই সুরু হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র বুঝেও অনেক ক্ষেত্রে স্নেহবশে কিংবা বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে বিদুরের প্রতি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি।

কৌরব শিবিরে আরও সমবেত হয়েছিল উত্তর ভারত থেকে বাহ্লিক, কাঙ্গরা উপত্যকার কাছে ত্রিগর্ত ক্ষুদ্রক ও মল্ল (গোরখপুর)। দক্ষিণ

ভারত থেকে কৌরব-মিত্র হিসেবে এসেছিল নর্মদার উত্তরস্থ অবন্তী (মালওয়া), তাপ্তির দক্ষিণ তীরস্থ বিদর্ভ, এবং তারই দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ভোজ ও গোদাবরী নদীর উভয় তীরস্থ অশ্মক রাজ্য। ইন্দোরের মাইল চল্লিশ দক্ষিণে মাহিষ্মতী। সেখান থেকে যুদ্ধে যোগ দিতে এলেন নীল রাজা। কৃতবর্মা আসলেন বৃষ্ণি থেকে।

ভাঙন দেখা দিয়েছিল দ্বারকায়ও। যাদবকুলের সাধারণ সেনাবাহিনী দাঁড়ালেন দুর্যোধন পক্ষে। কৃষ্ণ স্বয়ং গেলেন পাণ্ডবসখা হয়ে বিপক্ষে। কৃষ্ণ অনুগত সাত্যকিও পাণ্ডব পক্ষেই যোগ দিলেন। কিন্তু বলরাম রইলেন নিরপেক্ষ। এ সম্পর্কে গল্প হল, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যাদব সৈন্য (নারায়ণী সেনা) বেঁটে দিলেন দুর্যোধন শিবিরে। কিন্তু ব্যবস্থাটি গোলমেলে। কৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে বটে, কিন্তু নিরস্ত্র বুদ্ধিদাতামাত্র। বলরাম বিরক্ত। অর্থাৎ যাদবরাও লড়লেন না পাণ্ডবদের হয়ে। কেন? কৃষ্ণ বললেন বলেই কি যাদবদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল কৃষ্ণসহ অর্জুন ও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা? যুদ্ধ কি ছেলেখেলা? আর কৃষ্ণ যতক্ষণ ভগবান নন (ভগবান কৃষ্ণ তো বংশীধারী) ততক্ষণ তাঁর পক্ষে নিজের বাহিনীকে নিজের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা কি বস্তুত সম্ভব? যাঁরা মহাভারতকে অবাস্তব গল্প গাথা বলে মনে করেন তাঁরা ইচ্ছেমত ভাবুন, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যেটি ছিল ঐতিহাসিক যুদ্ধ, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আটঘাট বেঁধেই কাজ করতেন, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। যখন তিনি দূত হিসেবে হস্তিনায় গেছেন, তখনও সঙ্গে তাঁর শক্তিশালী রক্ষী বাহিনী ছিল। আসলে যদুরা তখন দ্বিধাবিভক্ত। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন কৃষ্ণের নেতৃত্বে কিছু অনুগামীর দল; তেমনিই ছিলেন বিরোধী পক্ষ। এই বিরোধীরা দেব-ব্রাহ্মণদের আনুগত্য স্বীকার করতেন না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের অনুগামীরা কিন্তু দেব-ব্রাহ্মণ পক্ষই অবলম্বন করেন। তাই সেই রাজনৈতিক বিভাগটি যুদ্ধ শিবিরে যোগদানের প্রশ্নে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেববিরোধী যাদবরা কুরুপক্ষে যোগ দিলে কৃষ্ণের ইমেজ অম্লান রাখার জন্য কথকরা গল্প ফেঁদে বললেন, ভগবান কৃষ্ণই নারায়ণী সেনা বিভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য তথ্য যে সম্পূর্ণ উল্টো কথাই বলে পরে আমরা তার আরও পরিচয় পাব।

পূর্ব ভারতও অস্ত্র ধারণ করেনি পাণ্ডব পক্ষে। একমাত্র পশ্চিম মগধ পাণ্ডবদের হাতে সদ্য সদ্য পরাজিত হওয়ায় পাণ্ডব মিত্র বাহিনীতে যোগদান করতে সম্ভবত বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে দুর্যোধনের মিত্রপক্ষ ছড়িয়ে ছিলেন অঙ্গ (পূর্ব বিহার), বঙ্গ (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এবং কলিঙ্গে (উড়িষ্যায়)। কৌরব

শিবিরের দিকে তাকালে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহাজ্ঞানী কৃষ্ণসহ যুধিষ্ঠিরের তথাকথিত 'ধর্মযুদ্ধ'কে মহাভারতের কথক ঠাকুররা যতই কেননা গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে থাকুন, তৎকালীন আর্যাবর্তের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু সেই 'সাধু' উদ্দেশ্যে সাড়া দেননি। এমন কি কৃষ্ণ-সাত্যকি-গোষ্ঠী ছাড়া যদুকুলও অস্ত্র ধারণ করেছিলেন পাণ্ডবদেরই বিপক্ষে। সেই ঐতিহাসিক মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং সুস্পষ্ট বিভেদের জের চলেছিল দ্বারকায় ভারত যুদ্ধের পরও টানা চল্লিশ বছর ধরে। নভশ্চর দেবতাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করার অপরাধে অবশেষে যদুকুল ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বারকা হয়েছিল জলমগ্ন। কৃষ্ণের ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য কথক ঠাকুররা এখানেও অবশ্য একটি গল্প ফেঁদে ধর্মের জয়ঢাক বাজিয়েছেন।

আদিকথা

বাইবেলের সদাপ্রভু মিশরের ফারাওকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়েছিলেন, কিন্তু মিশরকে পুরোপুরি ধ্বংস করেননি।[১] অন্যদিকে হিমালয় শিবিরের দেবতারা একটি সার্বিক ধ্বংসকে এড়াতে পারেননি। এই ধ্বংস এড়ানোর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা যে কম ছিল এমন অপবাদ অবশ্য দেওয়া যায় না। চেষ্টা হয়েছিল, বহু যুগ ধরেই চেষ্টা হয়েছিল ধ্বংস এড়িয়ে একটা রফা বন্দোবস্তের। কিন্তু অসুর অর্থাৎ দেববিরোধী নৃপতিগণকে কোনক্রমেই বশীভূত করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীনতম কাল থেকে যদি আমাদের গল্প আরম্ভ নাও করি, তবু মহাভারতের মূল আখ্যানের সূত্রপাত যে উপরিচর বসুর কাহিনীকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় সংস্থাপিত করে সুরু হয়েছে, সেই পর্ব থেকে ইতিহাসের ধারা টানলেও দেখা যাবে, একটা সার্বিক ধ্বংস ছাড়া আর্যাবর্তে দেবব্রাহ্মণ শক্তিজোটের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। তাই নভশ্চর দেবতাদের মূল বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মাকে (যিনি পরবর্তীকালে প্রজাপতিরূপে ব্রাহ্মণগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) একটি সর্বগ্রাসী এবং সর্বশেষ ক্ষমতার লড়ায়ের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। এই অত্যদ্ভুত পরিকল্পনা আজকের সমস্ত পলিটিক্সকে হার মানায়। এ পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। একটি গোটা বংশধারা সৃষ্টি করে সুপরিকল্পিতভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত করার সে এক অভিনব এবং ঐতিহাসিক মানুষের দ্বারা এতাবৎকাল অপরীক্ষিত পরিকল্পনা। ভাবলেও অবাক লাগে, সেই দেবকুলের কাছে মর্ত্যবাসীর এক একটি বংশধারার সময়কাল ছিল কত নগণ্য। তাঁরা সম্পূর্ণ একটি মানুষ সৃষ্টি ও তার পূর্ণ বিকাশের মধ্যগা দীর্ঘকাল আনয়াসে অপেক্ষা করতে ও সেজন্য যথেষ্ট লগ্নী করতেও কিছুমাত্র পিছপাও ছিলেন না।[১]

অমৃত সমান মহাভারতকথা প্রথম গেয়েছিলেন বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের রাজসভায়। কথিত আছে, স্বয়ং ব্যাসদেবও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বৈশম্পায়ন মহাভারত কীর্তন করেন গুরু ব্যাসেরই আদেশে। এই ঘটনার অস্বাভাবিকতা আমাদের জিজ্ঞাসু করে। কারণ ব্যাস ও জনমেজয়ের মধ্যে সময়ের নদী বহু পুরুষকুল প্লাবিত করে গেছে। ব্যাস থেকে জনমেজয় ছয় পুরুষের ব্যবধান। ব্যাস ছিলেন অর্জুনের ঠাকুর্দা আর রাজা

জনমেজয় হলেন অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর নাতি। তাই সন্দেহ হয় এতকাল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত কীর্তনের আদেশ দান করার জন্য কি বেঁচে থাকতে পারেন ?

সেকালে অবশ্য দীর্ঘজীবী মানুষের অভাব ছিল না। শতবর্ষ আয়ু বর্তমান ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও দুর্লভ নয়। আর ইতিহাসের সেই প্রাচীন আমলে একশত বছরের পুরুষ তো হামেশাই পুত্রের জনক হতে পারতেন। এসব তথ্য আছে বাইবেলে, মহাভারতেও।

বাইবেলে যে বয়সের তালিকা পাওয়া যায়, স্বল্পায়ু আমাদের কাছে তা গাঁজাখোরি গল্প বলেই মনে হবে। কিন্তু পুরাপুঁথিতে যখন এক নয়, একাধিক পুরুষের জীবনান্তকাল সব ক্ষেত্রেই শ' বছর অতিক্রম করে, তখন একথা মেনে নিতেই হয়, তাঁদের সময় মানুষ বাঁচতেন দীর্ঘকাল, তাই আশীর্বচনও ছিল, দীর্ঘজীবী হও, হও শতপুত্রের জননী। দীর্ঘ জীবন লাভ না করলে তো (গান্ধারীর কথা স্বতন্ত্র) শতপুত্রের মাতৃত্বলাভ করা যায় না।

যাই হোক, দু-একটি বাইবেলীয় হিসেব এখানে তুলে দিচ্ছি। আদম বেঁচে ছিলেন নয় শত ত্রিশ বর্ষ। মহাভারতেও হাজার বছর আয়ুর উল্লেখ আছে। একশ তিরিশ বছর বয়সে আদম হয়েছিলেন তিন ছেলের বাবা। তস্য পুত্র শেথ ইনোশের জন্ম দান করেন একশ পাঁচ বছর বয়সে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ন'শ বারো বছর। ইনোশ বেঁচেছিলেন নশ পাঁচ বছর। তাঁর ছেলের মৃত্যু হয় আটশ পঁচানব্বই বছর বয়সে। নোয়ার বাবা লেমক পরলোক গমন করেছেন যখন বয়স ছিল তাঁর সাতশ সাতাত্তর। বয়স যখন পাঁচশ, নোয়া তখন হয়েছেন তিন ছেলের পিতা। মৃত্যুকালে নোয়ার বয়স ছিল ন'শ পঞ্চাশ বছর। এই হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের কাছে আট ন-শ বছর নেহাৎ-ই নস্যি। সুতরাং এভাবে দেখলে থাকুন না কেন বেদব্যাস যুগ যুগ ধরে; আপত্তি করবে কে ? কেনই বা বলব আমরা, বেদব্যাস বলে আদৌ কেউ ছিলেন না। কবিরা যুগে যুগে ঐ নামে নিজেদের আড়াল করেছেন ? দরকার নেই আমাদের অমনতর শেষ কথা কওয়ার। এই পৃথিবীর কতটুকু এ পর্যন্ত জানি ও জেনেছি ? আমাদের ইতিহাসই বা কদিনের ? ইতিহাসের মানুষ তো পৃথিবীর বয়সের তুলনায় নগণ্যও নয়।

আমরা অনুসন্ধানে বসেছি আজ থেকে মাত্র হাজার তিনেক বছর আগেকার ঘটনাবলীর। পৃথিবীর বয়সের অনুপাতে তাও গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবু আমরা তর্ক তুলি। এটা ছিল না, ওটা হতে পারে না। অর্বাচীনে অমন কত

কথাই বলে, অনাদি অনন্তকাল তাই শুনে অলক্ষ্যে হাসে। আমি অন্তত নিজেকে এই বুদ্ধিমান অহঙ্কারী সমাজের বাইরে রাখতে চাই।

কিন্তু যা বলছিলাম।

ব্যাসের মহাভারত প্রথম শোনান বৈশম্পায়ন। তাঁর কথিত বাণী কণ্ঠস্থ করে নেন সূতপুত্র সৌতি। মহাভারত বলছেন, নৈমিষারণ্যে সূতপুত্র সৌতির মুখে তারপর মহাভারত শ্রবণ করেন আগ্রহী শ্রোতৃমণ্ডলী। সেই মহাভারতই শ্রুত হয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। এর থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়, আদিতে মহাভারত নিশ্চয় লক্ষ শ্লোকে পল্লবিত ছিল না। পণ্ডিতদের হিসাব মতো আদি মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ছিল মাত্র আট থেকে দশ হাজার। সেই মহাভারত ছিল ইতিহাস। কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী। ভারত যুদ্ধ কথা। সেই ইতিকথার নাম ছিল, 'জয়'।[*] সেজন্যই প্রতি পর্বারম্ভে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করে মহাভারত পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই 'জয়' কাদের 'জয়'? দেবব্রাহ্মণদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার 'জয়'। উত্তর ভারতের তাবৎ দেববিদ্রোহী রাজন্যকুলকে নির্বংশ করে ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ-শাসিত সাম্রাজ্য কায়েম করার কথাই 'জয়'।

আদিতে মহাভারত 'ভারত যুদ্ধ' কেন্দ্রিক জয়গাথা হলেও যুগে যুগে পল্লবিত ও লক্ষ শ্লোকে বিধৃত এই মহাকাব্যের মধ্যে স্থান করে নেয় নিখিল ভারতের সামগ্রিক জীবনচর্যার কাহিনী। ইতিহাস অবলুপ্ত হয়ে যায় উদ্দেশ্যমূলক রূপকথার বিশাল স্তূপের নিচে।

তাই দেখি, "নিখিল বেদের সমষ্টিরূপ" মহাভারতের পরিচয় প্রদান করে বৈশম্পায়ন বলছেন: "এই গ্রন্থে ভারত বংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে।" অর্থাৎ মহাকাব্যটি যে প্রাচীন ভারতের ইতিকথা বই অন্য কিছু নয়, আদি গায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখতে চাননি। হতে পারে, সে যুগে ইতিহাস কথনের রীতি আজকের মত শুধু যুদ্ধের সন তারিখ উল্লেখেই পরিতৃপ্ত ছিল না। আজও তো একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় যাঁরা হাত দিয়েছেন তাঁদের লক্ষ লক্ষ শব্দই লিখতে হয়েছে। তবে আর মিছে সন্দেহ কেন অবুঝ পণ্ডিতী অহঙ্কার মেনে? পরবর্তী সৌতিও বলে গেছেন একই কথা। তিনি মহাভারতকে "ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রদীপ" রূপেই ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু সে ইতিহাসের প্রকৃত সুরু কোথায়? আদত সুরু কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে নয়। কথারম্ভে সবিস্তার বর্ণনীয় রাজা হিসেবে ইতিবৃত্তকার বেছে

নিয়েছেন রাজা উপরিচর বসুকে, যিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে একটি বিমান উপহার পান এবং সেই বিমানবাহিত হয়ে শূন্যপথে বিহার করার জন্য প্রখ্যাত হন উপরিচর বসু বা উপরে বিচরণশালী নৃপতি বসু নামে।

মহাভারতে ফ্ল্যাশ ব্যাক আছে অগুণতি। পিছু হঠতে হঠতে তা সৃষ্টির আদি পর্বে ফিরে গেছে। কিন্তু কথারম্ভ হয়েছে উপরিচর বসুকে নিয়েই। আমি মনে করি, এই ব্যাপারটা বিশেষ লক্ষণীয়। কেন, এমনটি হল কেন? কথা তো রাজা শান্তনু থেকেও সুরু হতে পারত। যে ভরত রাজা থেকে ভারত বংশধারা, কথা আরম্ভ হতে পারত তাঁকে ধরেও। কিন্তু তা হল না। ইতিবৃত্তকার সুরু করলেন উপরিচর বসুর কাহিনী থেকেই। অথচ রাজা হিসেবে ইনি কি খুব পরিচিত? মহাভারত যাঁরা শুধু লোকমুখেই শুনেছেন, কষ্ট করে পড়েননি, অথবা পড়তে ভুয়ো আত্মাভিমানে বাধো বাধো ঠেকেছে কিংবা বদ হজমের ভয়ে অতবড় পুস্তকটি খুলে ধরেননি কোনো দিন, তাঁরা তো বটেই; কিন্তু যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মধ্যেও খুব কমজনেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, মহাভারতের কথারম্ভ হয়েছে উপরিচর বসুর কাহিনী থেকেই। কেন এমনটি হল?

একটু মনোনিবেশ করলে দেখা যায়, সে যুগে রাজা বসুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল দেবপূজক ও দেবানুচর ব্রাহ্মণদের কাছে। কারণ বসু রাজার আমল থেকেই রীতিমত ভাবে প্রতীক সহযোগে ইন্দ্র পূজার প্রচলন হয়। ইন্দ্র স্বয়ং সশরীরে হিমালয় থেকে নেমে আসেন এবং মৈত্রী স্থাপনা করেন রাজা বসুর সঙ্গে।

আদি পর্বের ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে আছে উপরিচর বসুর কথা। মহাভারতের কথারম্ভ হয়েছে আদিপর্বের একষষ্টিতম অধ্যায় থেকে (আদি, কালীপ্রসন্ন, সাক্ষরতা ১ম সং)। বৈশম্পায়ন কথারম্ভ করেছেন কুরুপাণ্ডব শত্রুতার সূত্রপাত থেকে পাণ্ডবপক্ষ অর্থাৎ দেবব্রহ্মণ্যশক্তির জয়লাভ পর্যন্ত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে। ৬১-৬২ অধ্যায়ে কেবলমাত্র যুদ্ধের কারণ, সংঘাতের কাল ও জয়লাভ বর্ণনা করার পর কথক বিশাল মহাভারতকে একটি ইতিহাস বা ইতিবৃত্তরূপে উল্লেখ করেই ৬৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনীয় রাজা হিসেবে উল্লেখ-যোগ্য করলেন উপরিচর বসুকে। কথা সুরু হল এইভাবে: "পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন, তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন।"

রাজা বসুকে দিয়ে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকারভুক্ত করানোর জন্ম ইন্দ্রের মাথাব্যথা কেন? এর দ্বারা ইন্দ্র নামক ভদ্রলোকটির নিজস্ব উপকার কি? স্বার্থ কোথায়? উত্তরে ভক্ত বলবেন, রাজা বসু ধার্মিক ছিলেন, তাই ভগবানদের রাজা কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে দিয়ে চেদিরাজ্যটি (যমুনার দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের পূর্বাংশে নর্মদার উত্তরে অবস্থিত) অধিকার করিয়ে নেন, যাতে শস্যশ্যামলা সে রাজ্যে অন্নাভাব না থাকে। কিন্তু তর্ক ছাড়া যাঁরা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বলবেন, ভগবানের কাছে ধর্ম কী, ধার্মিকই বা কে? এক মুঠো চেদিরাজ্যের গুরুত্বই বা কোথায় কোটি কোটি নক্ষত্র ও সূর্য চন্দ্রের অধিপতির কাছে? ইন্দ্র যদি উন্নত বুদ্ধির অধিকারী দেহধারী জীব না হয়ে স্বয়ং জীবস্রষ্টা ঈশ্বর হতেন, তবে রাজা বসুর কাছে বিপদাপন্ন বিদেশী বসতকারীর মতো একটা বিমান উপহার নিয়েই বা সাধ্য সাধনা করতে আসবেন কেন তিনি? তাঁর রাজ্যপাটে কি এই পৃথিবীর অন্যান্যদের জন্য আর সব করণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছল? বেকার ঈশ্বর তাই এসেছিলেন রাজা বসুর সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি করতে? এই অবিশ্বাস্য অশ্রদ্ধেয় এবং হাস্যকর বচনে আজ শুধু কৌতুহলই জাগে, জানতে ইচ্ছে করে আসল রহস্যটা কোথায়?

তবে কি ধর্মের টানেই দেবরাজ ইন্দ্রকে আসতে হয়েছিল? কিন্তু ধর্ম যদি সদাচার হয়, তবে বসু রাজার তেমন কোনও গুণপনার উল্লেখ মহাভারতকার রাখেননি। বলা হয়েছে গুণ বলতে বিলাসী রাজার মতো তিনি ছিলেন মৃগয়াসক্ত, অর্থাৎ বন্য প্রাণী শিকারেও ছিল তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ। তা থাক, মহাভারত প্রাণ সংহারেরই কাব্য। মহাভারত পাঠকের কাছে প্রাণীবধ কোনও অপকর্ম নয়। সর্ব গাভী-রূপ উপনিষদ দোহন করে যে গীতার সৃষ্টি, সেই জ্ঞানদীপ্ত গীতাও (যা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত) বলেছেন, বধ্যকে বধ করায় পাপ নেই, কারণ প্রাণীর শরীর মায়া মাত্র। তা আগেও ছিল না (জন্মের আগে) পরেও থাকবে না (মৃত্যুর পর)। সুতরাং মাঝখানের এই থাকাটুকু বড় কথা নয়। হন্তা শরীরকেই মারতে পারে, আত্মা অবিনশ্বর। শরীর এক সময় না এক সময় মরবেই অর্থাৎ তা মরেই আছে, অতএব হত্যার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হলে তাও হন্তার ধর্ম। এ ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের। বুদ্ধিমান দেবানুচরদের। তাঁদের স্বার্থ ছিল ভারতের সেই সব রাজন্যবর্গের উৎসাদন, যাঁরা দেব-ব্রাহ্মণদের শোষণ শাসনকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। তাই সেই রাজন্যবর্গের শ্মশান বানিয়েছিলেন দেব-শিবিরের সামরিক শক্তিপুষ্ট দেবব্রাহ্মণ-অনুগৃহীত পাণ্ডবরা।

বহিরাগত দেবশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদয় আত্মীয়কুল ধ্বংস করার কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে তাই পাণ্ডবদের চালিকাশক্তি বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের। নিষ্ঠুর অযৌক্তিক হত্যালীলাকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দিতে হয়েছে দার্শনিক ব্যাখ্যা।

ব্রাহ্মণরা বোঝালেন, বসু রাজা মৃগয়া করেন তাই মস্ত ধার্মিক! শুধু বন্য পশুই নয়, মহারাজ সুন্দরী রমণীতেও বিশেষ আসক্ত। তবে এই আসক্তিও যদি অনুমোদিত কামক্রিয়া হয় তবে তাও ধর্ম।

তাই একদিন মৃগয়াকালে বনরাজিনীলা পরিব্যাপ্ত করে যখন ঋতুরাণী বসন্তের আগমন ঘটেছে তখন বসুরাজ "অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন" ('মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি' অ দ্রঃ, ঐ পৃঃ ৬৫)। "তাঁহার রেতঃস্খলন হইল"। এমনটি মহাভারতীয় মহাপুরুষদের প্রায়শই হতে দেখা যায়। মুনি ঋষি এমন কি দেবতাদেরও হয়ে থাকে। আর ইনি তো সামান্য রাজা। কিন্তু ব্যাপারটি তো, যাই হোক, খুব ধর্মকর্ম নয়। তাই যেহেতু বসু রাজার ইমেজটি ধরে রাখলে ব্রাহ্মণদের সুবিধে এ জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি রূপকথার গল্পও ফেঁদে ফেললেন কথক ঠাকুররা। আমাদের বোকা বোঝালেন এই বলে যে, "রেতঃ বিফল না হয়, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বীজ শোধন করিয়া…দ্রুতগামী এক শ্যেন পক্ষীকে বলিলেন, হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর!" অমনি শ্যেন পক্ষী তাই নিয়ে উড়ছুট দিল।

গল্পটা বেশ ওৎরাচ্ছিল, কিন্তু গল্প লিখেছেন রূপকথাকাররা, তাই বলে ইতিহাসের সূত্রকে একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করেও দেননি তাঁরা। রেখে গেছেন সেই সূত্র পরবর্তীকালে সমুচিত ব্যাখ্যার জন্য। তাই দেখা গেল, রূপকথাটা ওপরের সর হলেও অন্তের সারবস্তু যথাযথই আছে। আমরা দেখলাম, শ্যেন পক্ষীকে শেষ পর্যন্ত আর রাজমহিষীর কাছে পাঠানো হল না। বলা হল, শ্যেন পক্ষীর চঞ্চুতে সেই বস্তু দেখে অপর একটি শ্যেন পক্ষী বস্তুটিকে 'মাংসখণ্ড' মনে করে (কল্পনার ও বোকাভুলানোর কী অপূর্ব কারসাজি! পক্ষী-চঞ্চুমুখে রাজরেতঃ কীভাবে মাংসখণ্ডরূপে প্রতিভাত হতে পারে হয়ত সেকথা একমাত্র মহাভারত কথকই জানেন। আমাদের তা বুদ্ধির অগম্য) কাড়াকাড়ি শুরু করলে বস্তুটি টুপ করে 'যমুনার জলে পতিত হইল'। অমনি এক অপ্সরা (যে নাকি আবার ব্রহ্ম শাপে মৎস্যরূপা হয়ে ঐখানে বসবাস করছে), নাম অদ্রিকা, বস্তুটি "ভক্ষণ করিল"। ফলত অদ্রিকা, একটি কন্যা ও

একটি পুত্র প্রসব করল ঠিক দশ মাস পরে (এখানে আর রূপকথা নয়, গর্ভধারণের নিখুঁত সময়টি উল্লিখিত হয়েছে)। সেই কন্যাশিশুই মহাভারতে মৎস্যগন্ধা নামে প্রখ্যাতা। ইনি বেদব্যাসের জননী এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের ঠাকুমা, কেন না রাজা বিচিত্রবীর্যের আইনত সন্তান হলেও ওঁদের প্রকৃত পিতা ছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মৎস্যগন্ধা অবশ্য বিচিত্রবীর্যেরও জননী।

অর্থাৎ রূপকথাটি এবার পুনরায় বিশ্লেষণ করলে কি একথাই মনে হয় না যে, শ্যেনপক্ষীর উপাখ্যানটি স্রেফ ভাঁওতা? আসলে বসন্ত সমাগমে উৎফুল্ল বসুরাজ অসংযমবশত যমুনাতীরস্থ জনৈকা সুন্দরী ধীবরীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রাজা কর্তৃক ধর্ষিতা ধীবরীর গর্ভে মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি হয়। রাজা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে জেলে পাড়ায় ফেলে রেখে পুত্র সন্তানটিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

ব্যাপারটা ঘটে গেছে। উপায় নেই। শূদ্রা সত্যবতী ভাগ্যক্রমে হয়েছেন স্বয়ং মহাভারতকার বেদব্যাসের জননী। কিন্তু যে ব্রাহ্মণরা কর্ণকে নিয়ে মিছিমিছি অত কাণ্ড করেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের দাপটের জন্য ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদুরকে রাজা বানাতে পারেননি. তাঁরা মহর্ষি বেদব্যাসের মায়ের ইমেজ রক্ষা করার জন্যই কি শ্যেন পক্ষীর উদ্ভট গল্পটি সৃষ্টি করেছিলেন? ভক্ত যদি বলেন রূপক, তাহলেও প্রশ্ন হয়, এই সব রূপক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রেই বা বারম্বার সৃষ্টি করেছেন কেন তাঁরা? আর এমন ছেলে-ভুলানো গল্প অমন বুদ্ধিদীপ্ত বিশাল মহাভারতের মধ্যে ঢুকে পড়েই বা কী করে? অতিবড় বুদ্ধিমান কি এত বড় একটা ফালতু কাহিনী অমন একটি মূল্যবান ইতিবৃত্তে সংযোজিত করতে পারেন? স্পষ্ট কথা, ঢাকঢাক গুড়গুড় হয়েছে ব্রাহ্মণদের ঢাক পেটানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঢাকের কাঠি আবহমান কাল বাজিয়ে যাবে অথচ অক্ষয় ঢাক কখনই ফাঁসবে না, এমন তো হতে পারে না। আজকের মন মহাভারতের বুদ্ধিদীপ্ত রচনাবলীর মধ্যে বঙ্কিম কথিত কিছু 'গর্দভের রচনা'কে[*] যথোচিত ভাবে নির্বাচন করতে আরম্ভ করলে অবশ্যই রায় দিতে বাধ্য হবে যে, শ্যেনপক্ষীর রূপকথাটি বড বেশি রকমের ফেঁসো গপ্পো হয়ে গেছে। তা সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাই আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বুঝতে পারি, রাজা বসু ও সত্যবতীর ইমেজ ধরে রাখাই সেই আষাঢ়ে কাহিনী বা 'গর্দভের রচনা'র মূল উদ্দেশ্য ছিল।

রাজা বসু যেহেতু ইন্দ্রমিত্র এবং বেদব্যাস ও বিচিত্রবীর্যের দাদামহাশয়,

তাঁর অপকীর্তি ঢাকতে তাই কিছু অপকীর্তি করতেই হয়েছে। কেননা রাজাকে নিয়েই কথারম্ভ। এই কথারম্ভের কারণও এই যে, বসু রাজই প্রথম ইন্দ্রের প্রতিমা পূজার প্রচলন করেন। তাঁর আমল থেকে বহিরাগত দেবতারা আর্যাবর্তে ব্যাপক যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকামী হয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি কুরুক্ষেত্র। রাজা বসু থেকেই সেই কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতি পর্বের সূচনা।

আগের আলোচনায় রাজা উপরিচর বসুর যে মৃগয়াসক্ত অসংযমী চরিত্রের পরিচয় আমরা পেলাম, তাতে কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয় রাজাকে ধার্মিক আখ্যায় ভূষিত করতে রাজি হবেন না। অথচ মহাভারত নির্দ্বিধায় বেশ জোরের সঙ্গেই বসু রাজাকে ধার্মিক উপাধি দান করলেন এবং তাঁর এই ধার্মিকতা সম্পর্কে শ্রোতার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য কল্পিত আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদতেও দ্বিধা করলেন না। রাজার প্রতি এই অদ্ভুত প্রীতির কারণ কি ?

কারণ, মহাভারতের ধর্মাধর্ম একটিই মাত্র শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যিনি দেবব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর আনুগত্য স্বীকার করেছেন, তাঁর লক্ষ অপরাধও অধর্ম নয়। মহাভারত তাঁকে নির্বিচারে ধার্মিক চূড়ামণি হিসেবে ঘোষণা করে গেছেন। এ জন্যই শত অন্যায়কারী কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ ধার্মিকরূপে কীর্তিত। এজন্যই কুরুশিবিরে বসে কৌরবদের যিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে কেবলই ক্ষাত করে গেছেন ও পাণ্ডব এবং দেবপক্ষের গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন কুরুপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান মহামন্ত্রীর পদে আসীন থেকে, সেই বিদুরও মস্ত ধার্মিক।

বসুরাজ ইন্দ্রের পরামর্শক্রমে চেদিরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিই ইন্দ্রের প্রতীকী পূজার প্রচলনকারী। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে চেদিরাজকে উপহার দেন, যাকে রাজনৈতিক উপঢৌকনই বলা যায়, একটি মালা। এই অদ্ভুত মালাটি অঙ্গে ধারণ করলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্তন করা যায় (বর্ম ?)। বসুরাজা ভূপালগণের মধ্যে ইন্দ্রের প্রিয় সখা হিসেবে আদৃত হয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড় যে উপঢৌকনটি বসুরাজ দেবানুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন, সেটি একটি যান্ত্রিক বিমান। এই বিমানে আরোহণ করে রাজা আকাশ পরিক্রমা করতেন বলেই উপরিচর নামে (উপরে বিচরণশীল) খ্যাত হন তিনি। তাঁকে সবাই উপরিচর বসু নামেই জানে।

প্রতিদানে চতুর ইন্দ্র পরাক্রমশালী ভূপালের কাছে কী পেয়েছিলেন ? পেয়েছিলেন তিনি অনাক্রমণ চুক্তির আশ্বাস। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, বসু কখনো ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য হিমালয় অভিযান করবেন না। তাছাড়া উপরিচরকে চেদিরাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আর

একটি কারণও যা মহাভারত উল্লেখ করেছেন, তা হল চেদিরাজ্যে নভশ্চর দেবতারা দেবানুচর ব্রাহ্মণদের শোষণের বনিয়াদ চাতুর্বর্ণীয় সমাজের পত্তন আগেই করে রেখেছিলেন। বলা হয়েছে, সে রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, জাত পাঁতের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। মূলত জাতিভেদ প্রথার ওপরেই গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ। ব্রাহ্মণশাসিত সেই চেদিরাজ্যকে রক্ষা করার জন্য পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বহিরাগত নভশ্চরগণ (দেবতা) মিত্র-পক্ষীয় বসুরাজাকে চেদিরাজ্যের সিংহাসনে আসীন করান। স্তাবক রাজার দ্বারা এই আর্য-উপনিবেশটি রক্ষা করাই ছিল ইন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া বসুরাজের দ্বারা তিনি তো নিজের পূজারও প্রচলন করিয়ে নেন। বাইবেলীয় সদাপ্রভু বা লর্ড গড যেমন মোজেস প্রমুখ পয়গম্বরের মাধ্যমে এবং আব্রাহাম বংশের প্রতাপবৃদ্ধি করে নিজের ও সঙ্গীসাথী বহিরাগতদের নিরঙ্কুশ লর্ডশিপের প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন, হিমালয় শিবিরের প্রভুবৃন্দও তেমনি ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবদের সহায়তায় নিজেদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত বসবাসের সুযোগ করে নেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে যখন দেববিরোধী ভারতীয় বীরগণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হলেন, তখন দেব-প্রতিষ্ঠাও পূর্ণতা পেল। তার আগে দীর্ঘকাল দেবতা ইন্দ্রকে সমতলবাসী এবং পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণে বার বার উত্ত্যক্ত হতে হয়েছে। অনেক মর্ত্যবাসী বীরই কৌশলে দেবতা বা হিমালয়স্থ নভশ্চরবৃন্দের সর্বোচ্চ অধিনায়কদের তুষ্ট করে বিমান ও অস্ত্রশস্ত্র আদায় করেছেন। সখ্য স্থাপনের আশায় বহিরাগতরা দেশী বীরদের বার বারই বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষা দিয়েছেন, যাকে বলা হয়েছে, বর দান। কিন্তু শক্তি লাভের পর এই সব বীরবৃন্দ প্রলুব্ধ হয়েছেন হিমালয়ের দেবরাজ্য অধিকার করার জন্য। সুরু হয়েছে দেবশিবিরে শঙ্কা ও শক্তি পরীক্ষা। উপরিচর বসুর আগেও কিছু দেবানুরক্ত রাজা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হয়ত দেব-বিরুদ্ধ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হন-নি, কিন্তু আঘাত এসেছে পরবর্তীকালে। তবে যতদূর বোঝা যাচ্ছে, উপরি-চরের আগে ইন্দ্রমুগ্ধ কোনোও রাজা ইন্দ্রের প্রতীকী পূজার প্রচলন করেননি।

উপরিচরই তা করেছিলেন। অর্থাৎ পূর্ণ বশ্যতা উপরিচর বসুই স্বীকার করেন। তিনিই "ইন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী (চেদিরাজ্যই এখানে পৃথিবী) ধর্মতঃ (অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথাসহ ব্রাহ্মণ্যপ্রতাপ-স্বীকৃত দেব-বন্দিত উপায়ে) পালন করিতেন এবং সুরপতির (দেবরাজের) সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।" (আদি, কালী, সাক্ষরতা, ১ম সং পৃঃ ৬৪)।

ইন্দ্রোৎসব কী ভাবে উদ্‌যাপিত হত তারও ইতিহাস একই স্থানে লিখে

গেছেন মহাভারতকার। বলা হয়েছে, ইন্দ্র "শিষ্ট প্রতিপালিনী নামে এক বেণুযষ্টি (বাঁশের লাঠি) প্রদান করেন। সংবৎসর অতীত হইলে ভূপতি (বসুরাজ) শচীপতির (ইন্দ্রের) আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে (মাটিতে) প্রোথিত করিতেন। পর দিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন-ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপনপূর্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন।" (ঐ)

বংশদণ্ড পুঁতে ইন্দ্রপূজা এখনও কোথাও কোথাও চালু আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগে আর্যসমাজে প্রতিমা পূজা বা প্রতীক পূজার প্রচলন ছিল না। প্রতিমা পূজার প্রচলন হয়েছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগে। প্রতিমা পূজা বেদোক্ত নয়, পুরাণোক্ত। ডঃ পি. সি. ঘোষ লিখেছেন, "...পতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) শিব, স্কন্দ, প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা বিক্রির কথা লিখেছেন।"[৪] বৈদিক ঈশ্বর মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। ম্যাকডোনাল সাহেবের (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা) ভাষায়, "The higher gods of the Rigveda are almost entirely personification of natural phenomena, such as Sun, Dawn, Fire, Wind." সুতরাং বৈদিক ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতি বা প্রতিমা ছিল না। প্রশ্ন হল, পরবর্তী পুরাণ যুগে তা হলে হঠাৎ প্রতিমা পূজা সুরু হল কেন?

এর কারণ হয়ত এই যে, পুরাণ ও মহাভারতীয় যুগ থেকেই আর্য ব্রাহ্মণরা দেহধারী ব্যক্তিকে অবতার বা ভগবানের অংশস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিক কারণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবতারেরাও রাজনৈতিক কারণেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা লাভ করেছে। হিমালয়স্থ যে বহিরাগত শক্তি ব্রাহ্মণ্য প্রতাপকে আর্যাবর্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেন, সেই নভশ্চর দেবতারা কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা দেবতা ও দেবাবতার রূপে পৌরাণিক কথা কাহিনী ও রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যে স্থায়ী আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবতার সৃষ্টির ব্যাপারে যে বহুক্ষেত্রে দেবজন ও দেববিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে নিতে হয়েছে, তারও প্রমাণ কিছু অপ্রতুল নয়। বিজয়ী পক্ষ হলেও ব্রাহ্মণদের হয়ত প্রবল জনমতের চাপে পড়েই দুর্যোধনকেও কলির অবতার হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে হয়েছিল। তমসা নদীর পথে পথে দুর্যোধনের সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির আছে। দুর্যোধন কর্ণের মন্দিরগুলি প্রমাণ করে মহাভারত যা-ই বলুন, ভারতে সেদিন দুর্যোধন পূজারীর অভাব ছিল না। ডঃ ঘোষ লিখেছেন, "গীতার সম্ভবামি যুগে যুগে, এই বাক্য, অবতারবাদের স্পষ্ট আভাস দেন, যদিও গীতায় অবতার শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নি।" তিনি আরও

মন্তব্য করেছেন, "মহাভারতের শান্তি পর্বে ছয় অবতারের (বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম ও বাসুদেব কৃষ্ণ) উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ের কয়েক শ্লোক পরেই আবার …কৃষ্ণের পরে সর্বশেষে কল্কি অর্থাৎ দশ অবতারের উল্লেখ রয়েছে। হরিবংশেও ছয় অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয়, মহাভারতের দশ অবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকটি পরবর্তীকালে শান্তিপর্বে স্থান পেয়েছে।"[৪]

১। এই লেখকের 'শানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ।

২। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পি. এল. বৈদ্য হিসেব করে দেখিয়েছেন, আদি মহাভারত গ্রন্থনা হয় আট থেকে দশ হাজার শ্লোকে। তারপর শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় চব্বিশ হাজার। কৌরব পক্ষের ওপর পাণ্ডব পক্ষের এই বিজয় গাথা 'জয়' নামে পরিচিত ছিল। মূল আখ্যানের সঙ্গে অতঃপর যুক্ত হতে থাকে ভারত জাতির ইতিকথা ও আধিকরণের কাহিনী। যুক্ত হয় উপদেশাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক উপকথাগুলি। মূল আখ্যান দশ হাজার শ্লোক। যুদ্ধ কথা ২০%। উপদেশমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক গাথা ৩০%। মোট শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ।—The Cultural Heritage of India Vl. II দ্রঃ।

৩। 'কৃষ্ণচরিত্র'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্রঃ।

৪। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দ্রঃ।

পাণ্ডব পঞ্চক প্রত্যেকেই দেবপুত্র, এটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক্ষেত্রেও অব্যাখ্যাত অনেক কথাই মহাভারতের কথা-শিল্পীরা গোপন করে গেছেন। পাণ্ডব মহিমা প্রচারই যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে এবং মহাভারতের ঐতিহাসিক সত্যাসত্য বুঝতে হলে দেবতাদের মত দেবপুত্র কর্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবকেও তাই বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী গ্রন্থে দেহধারী দেবতাদের দ্বারা নিতান্ত প্রাকৃতিক উপায়ে এই দেবপুত্রদের জন্মকথার রহস্য উন্মোচন করেছি। এখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা পাঠককে জানিয়ে রাখতে চাই।

প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অবশ্যই ধর্মপুত্র। কিন্তু কে সেই ধর্ম? ধর্মরাজ যম, নাকি পাণ্ডুভ্রাতা বিদুরই সেই মহান ব্যক্তি?

পবন মহাপ্রভু কি বস্তুতই দেবজনভুক্ত? নাকি তিনি অনার্য দেবতা? পবন-পুত্র ভীমের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর মধ্যে অনার্যসুলভ গুণগুলিরই তো সমধিক প্রকাশ প্রকট হয়ে পড়ে!

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কি দেব-ঔরসজাত পৃথ্বীপুত্র নন? দেবতাদের মধ্যে তাঁদের স্থান করে দেওয়া হয়েছে। তবু কি জোরের সঙ্গে বলা যায়, এই দুই দেববৈদ্য, যাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তাঁরা বহিরাগত দেবতা-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভূ'ত ছিলেন?

মনে রাখতে হবে, হিমালয়স্থ দেবশিবিরের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা দেবস্বার্থ রক্ষাকল্পে কেবলমাত্র দেবতাদেরই দেবপুত্র সৃষ্টির আদেশ দেননি। তিনি ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ ও দেবমিত্র বিশিষ্টজনকেও এ কাজে নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য, কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরিব্যাক্তির দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে, কোথাও বা প্রাকৃতিক যৌন-মিলনের দ্বারা দেবানুগত দেবপুত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। (দা. ম. স্ব. দ্রঃ)। শুধু আর্যাবর্তেই নয়, বিভিন্ন পুরাগ্রন্থের সাক্ষ্য, এ কাজ বহিরাগত বৈজ্ঞানিক মহাকাশচারী দেবতারা পৃথিবীর সর্বত্রই করেছিলেন। বাইবেল বলেন, পৃথ্বী-নারীদের সুন্দরী বিবেচনা করে দেবতারা পৃথ্বীনারীদের সঙ্গে যথেচ্ছ যৌনমিলনের দ্বারা এই পৃথিবীর বুকেই একটি দেববংশেরও সৃষ্টি করেছিলেন। (আদিপুস্তক, বাইবেল, ৬।১৫.)। পৃথিবীর আদিপিতার, যাঁরা দেবতাদের অধীনতা স্বীকার

করে নিলেন, দেবতারা সেদিন তাঁদের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন ভূরাজ্য শাসনের ভার। অন্যদিকে বহিরাগত দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা স্বীকার করলেন না, বিঘ্নিত করলেন দেবশিবিরগুলির নিরাপত্তা, দেবতারা তাঁদের নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন ও ক্ষমতাচ্যুত করলেন। দুনিয়া জুড়ে এভাবেই একটা যুগে দেবস্তাবক পুরোহিত শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজারা পুরোহিতসেবক পুলিশী শাসকে পরিণত হয়েছেন। দুনিয়া শাসন করেছেন প্রকৃতপক্ষে দেব-আশিসধন্য পুরোহিতরাই। আর তাই নিয়েই হয়েছে দেবাসুর যুদ্ধ। হয়েছে ধর্ম অধর্মের অসি আস্ফালন। বহিরাগত দেবতাদের অনুশাসনই হয়েছে ধর্ম। বলবৎ হয়েছে ধর্মীয় আইন। ক্ষমতাহীন বা ক্ষমতাচ্যুতরা এযুগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা দেবশিবিরের। দেবশিবিরের সহায়তায় উদ্ধার করেছেন হৃতরাজ্য অথবা করায়ত্ত করেছেন দুর্লভ রাজকীয় ক্ষমতা।

মহারাজ পাণ্ডুর স্বেচ্ছা-বনবাসের কাহিনীটিকে একটু অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে: ধরা যাক, পাণ্ডু স্বেচ্ছায় রাজ্যসুখ ত্যাগ করে পর্বতবাসী হন নি, তিনি হয়েছিলেন রাজ্যচ্যুত। হয়ত রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে নিঃশব্দে বনবাসে চলে যেতে হয়। নিঃশব্দ বনগমন বলেই সকলে মনে করলেন, মহামতি রাজা পাণ্ডু গেছেন স্বেচ্ছা-বনবাসে। কিন্তু আমরা দেখলাম, পাণ্ডুর যথেষ্টই রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ছিল। রাজ্য লাভের আশায় তিনি হিমালয়ে দেবতাদের প্রসাদ লাভের জন্য তপস্যা বা যোগাযোগের চেষ্টা করেন। রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলে, কুন্তী ও মাদ্রীকে দেবতাদের উৎসর্গ করে দেবপুত্র লাভ করেন ও তারা রাজ্য লাভ করবে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহাভারতের উপাখ্যানভাগে নজর রেখে আমরা এমন একটি অনুমিতি কি গড়তে পারি না? ঘটনাক্রম বলে, পাণ্ডু যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তখন হস্তিনাপুরে পূর্ণ ক্ষমতা অধিকার করে বসে আছেন। দিগ্বিজয় থেকে পাণ্ডু প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, রাজক্ষমতা ধৃতরাষ্ট্রের কব্জায়। ন্যায়ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রেরই যদিও সিংহাসনে অগ্রাধিকার ছিল কিন্তু জন্মান্ধ হওয়ায় তিনি সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। রাজা হন পাণ্ডু। কিন্তু কুরুরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে পাণ্ডু দেখলেন তিনি ক্ষমতাচ্যুত। রাজা হয়ে বসেছেন ধৃতরাষ্ট্র। সিংহাসনে পাণ্ডুর অধিকার অস্বীকৃত। তারপর পাণ্ডুকে আপসে রাজি করিয়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে লোক লস্কর ও মাসোহারা দিয়ে নির্বাসনে পাঠালেন। পাণ্ডুকে মেনে নিতে হল সে আদেশ। কুন্তী ও মাদ্রীসহ তিনি শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়ে দেবশিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। উদ্দেশ্য

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার। কিন্তু দেবশিবির সরাসরি পাণ্ডুকে সাহায্য করলেন না। কেননা ইতিপূর্বেই দেববুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেছে। তিনি দেখেছেন সমতলের রাজন্যবর্গকে দেবশিবির বার বার অস্ত্রশস্ত্র দিলেও তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়ে বিফল হয়েছেন। সুতরাং সেই একই পথে দেবনিরাপত্তার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই সুমেরু পর্বতাঞ্চলে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে (দা. ম. শ. দ্রঃ ' বসে ব্রহ্মাজী ঠিক করলেন, এবার ক্ষমতা সরাসরি দেবপুত্রদের হাতেই তুলে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যও স্থায়ী হবে। কেননা খাঁটি পৃথ্বীপুত্রেরা দেবপুত্রদের সন্দেহের চোখে দেখবে। সুতরাং দেবপুত্রদের ক্ষেত্রে দেবনির্ভরতাও হবে অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই দেবপুত্র সৃষ্টির প্রয়োজন। আমরা অবশ্য পরে দেখব, মহাজ্ঞানী ব্রহ্মাজী এই দেবপুত্রদের ওপরও শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। আর্যাবর্তের সার্বিক ক্ষমতা তাই তাঁরা যুধিষ্ঠিরের হাতে না দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দেবস্তাবক পুরোহিত শ্রেণীর ওপরেই নির্ভরশীল করেছিলেন। নামে মাত্র সম্রাট হয়ে যুধিষ্ঠির আত্মগ্লানি অনুভব করেছেন। বিষণ্ণ হয়ে তিনি নিজের ভুল বুঝে রাজ্য পরিত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণসহ যাত্রা করেছেন। বহিরাগতের সাহায্যে স্বজাতিনিধনকারী ক্ষমতাসীন হলে বিশ্বাস-হন্তার সে ক্ষমতা যে গ্লানিমুক্ত ও নিরঙ্কুশ হয় না, ইতিহাসে তার নজিরের অভাব নেই। ইতিহাসের সেই অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে পাণ্ডবরাও নিস্তার পান নি। প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছে কুন্তী ও বিদুরকেও। জীবনের শেষ পৃষ্ঠাটি তাঁরা আত্মগ্লানির দীর্ঘশ্বাসে আচ্ছন্ন করে গেছেন।

প্রশ্ন জাগে, কর্ণও তো দেবপুত্র. তবে কর্ণের প্রতি দেবতারা অত নিষ্ঠুর ছিলেন কেন ? তাঁর জন্ম কি ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে হয় নি ?

নিশ্চয়ই হয়েছে। পাণ্ডুর ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে কুরু-পাণ্ডবকুলের সমস্ত ঘটনাবর্তই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হিমালয়স্থ দেবশিবির থেকে। স্পষ্টত উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রসঙ্গত আমরা রাজা দ্রুপদের কাহিনীটি স্মরণ করব। শৈশবকালের বন্ধু দ্রোণাচার্যকে দ্রুপদ অপমান করেছিলেন। কুরুকুমারদের অস্ত্রগুরু হওয়ার পর সামরিক বাহুবলের অধিকারী হয়ে দ্রোণ সেই অপমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করলে দ্রুপদ দেবশিবিরের আশ্রয় ভিক্ষা করে দ্রোণবধে বহিরাগতদের সাহায্য চান। সে সাহায্য তিনি পেয়েও ছিলেন। নিপুণ সেই দেবকাহিনী পরে বলব। দ্রুপদ-কাহিনীটির আলোকে তাই মনে হয় রাজা পাণ্ডুও হৃতরাজ্য

পুনরুদ্ধারের জন্য একই ভাবে দেবশিবিরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পার্বত্য এলাকায় তাঁর তপস্যা ও পাণ্ডুরই নিয়োগক্রমে কুন্তী-দেববৃন্দের সঙ্গমে জাত পঞ্চপাণ্ডবের আবির্ভাব পাণ্ডুর সঙ্গে দেবশিবিরের যোগাযোগ স্থাপনেরই পরিচায়ক। এ কাজে মূলত দেব-ইচ্ছাই রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে দুর্বাসা মুনি কুন্তীকে দীর্ঘকাল ধরে সুশিক্ষিত করে তোলেন। তারপর তাঁকে একটি দূরভাষ যন্ত্র (বেতার বা উয়্যারলেস) দান করেন তিনি। বলেন, ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে কুন্তী যখন যে দেবতাকে স্মরণ করবেন, তিনি তখনই কুন্তীর কাছে ছুটে এসে তাঁর গর্ভে দেবপুত্রের বীজ বপন করে যাবেন। (দা. ম. স্ব দ্রঃ) কুন্তী অধৈর্যবশত তাঁর কুমারী অবস্থায় সূর্যদেবকে আহ্বান করে বসেন। ফলে কর্ণের জন্ম। কুন্তীর দ্বারা ভবিষ্যতে দেব-উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে বলে দেবতাদের নির্দেশে কুন্তীকে এই অবৈধ সন্তানটিকে পরিত্যাগ করতে হয়। ব্রহ্মার পরিকল্পনা, কুন্তীই হবেন আর্যাবর্তের রাজচক্রবর্তীর জননী। কিন্তু অবৈধ সন্তানের জননী তিনি, একথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে জনগণের ভক্তি ও বিশ্বাস চঞ্চল হবে। রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী পাণ্ডবদের ও কুন্তীকে তাঁরা জাতিদ্রোহিতার জন্য এমনিই ভালো চোখে দেখবেন না, তারপর কুন্তীর ইমেজ খারাপ হলে তো কথা-ই নেই। এজন্যই যুদ্ধ জয়ের আগে পর্যন্ত সাধারণের কাছে কর্ণের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রাখা হয়েছিল। তা ছাড়াও মনে হয়, কুরুক্ষেত্রের সমসাময়িক কালে দেবশিবিরে সূর্যের চেয়ে ইন্দ্রের প্রতাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্দ্রের ঔরসজাত অর্জুনকেই প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বয়ং ইন্দ্র তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। কর্ণ জীবিত থাকলে পঞ্চপাণ্ডব নন, কর্ণই হতেন ভারতের রাজচক্রবর্তী। ইন্দ্র সে সুযোগ বানচাল করে দেন। তাছাড়া কর্ণ দেব উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছেন তাঁর নিজের চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের জন্যই। কর্ণ জাতিভেদ ও চাতুর্বর্ণ মানতেন না। বহিরাগতদের রাষ্ট্র-সামাজিক চিন্তায় চতুবর্ণীয় সমাজই ছিল অপরিহার্য। সে কারণেও কর্ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন দেবতারা। কর্ণজন্মকথা আদিপর্বে যেন শুধু স্পর্শ করে যাওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় বনপর্বের একেবারে শেষভাগে (কালীপ্রসন্ন সাক্ষরতা সংস্করণের ৩১১-৩১৩ পৃঃ) ; কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকথা শুরুতেই সবিস্তারে বর্ণিত আছে। অর্জুনের কথা তো একটি অধ্যায় জুড়ে।

সূর্যের মত ধর্মরাজও যে রক্ত-মাংসের দেহধারী জীব, এসেছিলেন নীল শূন্য উদ্ভাসিত করে তাঁর অজানা উড়ন্ত দেববিমানে চেপে, একথা আগেই বলেছি। (দা. ম. স্ব. দ্রঃ)।

এবার ধর্মপুত্রের ঠিকুজি-কোষ্ঠী নেড়ে চেড়ে দেখা যাক।

আজ অবধি কোনও রূপকথার রাজপুত্তুরের ঠিকুজি-কোষ্ঠীর হদিস মিলেছে বলে আমার জানা নেই। কোনও রূপকথাকার তাঁর রাজপুত্তুরের জন্মলগ্নে উদিত নক্ষত্রাদির কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়ারও কিছুমাত্র সার্থকতা অনুভব করেন নি। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী সিদ্ধান্ত-বাগীশের মহাভরতম্ থেকে আমরা পেতে পারি। যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের বাস্তবতা বোধহয় তার দ্বারাও অনেকাংশে প্রমাণিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে সিংহ লগ্নে রবির ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। শনি উচ্চস্থ। জন্ম সময়, ষোড়দণ্ড। তাঁর রাক্ষস গণ এবং বিপ্র বর্ণ। তিথি পূর্ণিমা।

শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে, বলা হয়েছে, যুধিষ্ঠির দুমাস আট দিনের বড়। এহেন যুধিষ্ঠিরকে নিছক কবি-কল্পিত চরিত্র এবং তাঁর জন্মকথাকে কল্প-কাহিনী ভেবে আমরা আমাদের লুপ্ত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অবহেলাই করে এসেছি। ফলে যুধিষ্ঠির হয়েছেন এক শ্রদ্ধেয় দেবপুত্র এবং যেহেতু ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মত ঈশ্বরও সকল অন্যায়ের উর্ধ্বে তাই পঞ্চপাণ্ডবের সকল কীর্তিকেই সাশ্রু নয়নে শ্রবণ করাও আমাদের আবহমানের ধর্মজ্ঞান। অতঃপর আমি কিন্তু নির্দ্বিধায় বলব, এ ধরনের মানসিকতা জ্ঞানলব্ধ তো নয়ই, অজ্ঞানপ্রসূত কুসংস্কারমাত্র। মহান যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আদালতে সোপর্দ করতে সুতরাং আমি কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নই। কোনও ঐতিহাসিক রাজপুরুষের দার্শনিকতায় বিমুগ্ধ তুরীয়ানন্দ উপভোগ করতেও আমি অক্ষম। আমি বলব, ধর্মপুত্রের অধর্ম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক সমুন্নত অবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেছে। সেকথা সেদিন যাঁরা মনে প্রাণে বুঝেছিলেন, আগেই বলেছি, তাঁরা পঞ্চ-পাণ্ডবের নয়, আজও দুর্যোধনের মন্দিরেই পূজার্ঘ্য নিবেদন করেন। দুর্যোধনকে ডাকেন তাঁরা বাপের দেওয়া স্নেহের নামে। বলেন, সুযোধন। দুর্যোধনের কাষ্ঠ-নির্মিত সুন্দর মন্দির আছে। আজও সেখানে আঞ্চলিক অধিবাসীরা পূজা প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেকথা সেদিন যাঁরা রাজনৈতিক আক্রমণরূপে গণনা করতে ভুল করেন নি, আর্যাবর্তের সেইসব ভারতীয় রাজন্যবর্গ একজোটে কুরু শিবিরে যোগ দিয়ে আগ্রাসী দেব-ব্রাহ্মণ-পাণ্ডবদের অগ্রগতি রুখতে এবং নিজেদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

গাড়োয়াল হিমালয়ের পথে শুধু দুর্যোধনই নয়, কুরুবান্ধব কর্ণেরও মন্দির আছে। সে মন্দিরগুলির সংখ্যাও এক নয়, একাধিক। উত্তরকাশীর ধরাসু থেকে দুটি পথ দুদিকে গেছে। পুবে ভাগীরথীর কোল ধরে সোজা গঙ্গোত্রী,

আর পশ্চিমে বারকোট হয়ে যমুনার উচ্ছল ধারাস্রোতকে সঙ্গিনী করে অপূর্ব পার্বত্য শোভাময়ী পথ উঠে গেছে যমুনোত্রী পর্যন্ত। যমুনা নদীর উৎপত্তি-স্থল বন্দরপুঁছ হিমবাহ। তমসা নদীর উৎসও ঐ বন্দরপুঁছ হিমবাহ! অবশ্য রুইসাড়া গাড ও হরকিদুন নালার সঙ্গমস্থল হরকিদুন এবং ওসলার মধ্যবর্তী পার্বত্য উপত্যকাই প্রকৃত পক্ষে তমসার বা টনস্ নদীর উৎপত্তি-স্থল। এ পথে আসতে হয় মুসৌরী থেকে নওগাঁ হয়ে। যমুনা পার হয়ে পুরৌলা জারমোলা মোরী। তারপর তমসাকে পাশে রেখে এপথ চলে গেছে সেই রূপসী তমসার উৎপত্তি-স্থল রুইসারা গাড-এর দিকে। এ পথ স্বর্গারোহিণী পর্বতশিখর অভিমুখে চড়াই ভাঙছে। স্বর্গারোহিণীর উত্তরে যমদ্বার হিমবাহ। মহাভারতের দ্বিস্রোতা ভাবধারার স্মরণচিহ্ন ছড়িয়ে আছে এই ঐতিহ্যময়ী পথে।

তমসা নদীর দুই পার্বত্য তীরভূমিকে ঘিরে মহাভারতীয় জনজীবনের দুটি সুস্পষ্ট ধারা আজও তার সকল ধর্মীয়-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিঃশব্দে সহাবস্থান করে চলেছে। ঐ মনোরম অথচ দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীর আনাগোনা নেই; তাই তমসার জীবনধারার সঙ্গে আমরা খুব কমই পরিচিত। সম্প্রতি শ্রীবৈতালিকের "রূপবতী তমসা" আমাদের কিছু দুর্লভ তথ্য উপহার দিয়েছে। তিনি ঐ পথে কর্ণ ও দুর্যোধনের মন্দিরগুলি দেখে এসেছেন। এ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-ও দুর্যোধনের মন্দিরের ছবি তুলে গাড়োয়াল হিমালয়ের ওপর গৃহীত তথ্যচিত্রের একটি প্রদর্শনীতে তা দেখিয়েছিলেন। সে মন্দিরের কথা আমি আমার আগের বই-এ লিখেছি। বৈতালিকের কাছে আরও কিছু তথ্য পেলাম।

তমসা নদীর উত্তরাংশে আছে কর্ণ-দুর্যোধন-পূজক রাওয়াই সম্প্রদায়ভুক্ত পার্বত্য অধিবাসীদের গ্রাম। তাঁরা আজও কর্ণ-দুর্যোধনের মতাদর্শে বিশ্বাসী। ঐ দুই মহাভারতীয় মহাপুরুষই রাওয়াইদের দেবতা। গ্রামে গ্রামে দেবতা বলতে তাঁরা কর্ণ ও দুর্যোধনেরই সেবাপূজা করেন। তাঁদের মতোই রাওয়াই-রাও মানেন না কোনো সঙ্কীর্ণ জাতিভেদপ্রথা। নৈটৈয়ার থেকে উচ্চ তমসার দিকে গেলে পাওয়া যাবে শাঁকড়ি, ওসলা ও সিমার নামক জনপদগুলি। এখানের মানুষ কুরুপক্ষাবলম্বী। সেই কবে কুরুক্ষেত্রে বিধ্বংসী যুদ্ধ ঘটে গেছে। সে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর্যাবর্তের কুরুমিত্র সভ্যতা। গঙ্গার দুই তটভূমি প্লাবিত করে ধেয়ে গেছে আর্যিকরণের তীব্রস্রোতা ঢেউগুলি। কিন্তু সমস্ত বিপরীত তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করে আজও দুর্যোধনের চিন্তাদর্শকে রাওয়াইরা তাঁদের আপন সংস্কৃতির ধারায় সযত্নে প্রবাহিত রেখেছেন। এই অনমনীয় রাও-

য়াইদের মনে শ্রীকৃষ্ণেরও কোনো প্রভাব নেই। তাঁদের কাছে কৃষ্ণ অনেক পাণ্ডব-পক্ষীয় রাজনৈতিক নেতা মাত্র। তাঁর পূজার আসন তাই এদের মনের আকাশ-কে মেঘলা ও আচ্ছন্ন করে নি। নৈটেয়ারের মাইল খানেক ওপরে, দেওয়া গ্রামে আছে রাওয়াই-দেবতা কর্ণের মন্দির। মন্দিরটি কাষ্ঠনির্মিত, শিল্পছাঁদ প্যাগোডার আকৃতিবিশিষ্ট। গ্রাম্য প্রথানুসারে কর্ণদেবতার মূর্তি তাঁরা এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে পূজা করেন। তমসার কোলে সর্বত্রই কুরুপতি দুর্যোধনের আধিপত্য যুগযুগান্ত অতিক্রম করে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। রাওয়াইদের তিনিই পরমেশ্বর, একই দেহে নর-নারায়ণ, রাজা ও ভগবান। দুর্যোধনই তাঁদের সকল পাপপুণ্যের বিচারক, তিনিই মোক্ষদাতা।

অন্যদিকে নিম্নতমসার বাসিন্দারা আবার জাতিভেদ-বিশ্বাসী পাণ্ডবপূজক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের নাম, জৌনসারী।

যে দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্র-সামাজিক চিন্তাদর্শের কথাকে আমরা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেও মানুষের মনে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না, পারছি না তাঁদের মন থেকে আবহমানের কুসংস্কারের বোঝা নামিয়ে দিতে, তমসার রাওয়াই ও জৌনসারীরা তাঁদের অস্তিত্ব দিয়ে সেই ঐতিহাসিক সত্যকেই আপন আপন চেতনার মধ্যে আজও লালন করে রেখেছেন। ওঁদের অস্তিত্বই নিঃসন্দেহে মহাভারতীয় সমাজের দুই বিপরীত কোটির রাষ্ট্র-সামাজিক ভাবনার সজ্মবকে প্রমাণ করে। প্রমাণ করে, বিজয়ী পাণ্ডবদের একদেশদর্শী ইতিবৃত্ত, যার নাম, মহাভারত, তা আদৌ কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়; নয় তা অধর্মের বিনাশের জন্য পবিত্র ধর্মযুদ্ধ; সেটি নিছকই একটি জাতির উত্থানপতনের ইতিহাস, সুচতুর ব্রাহ্মণরা যাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যথেচ্ছা পরিবর্ধিত করে একটি দুর্বোধ্য রূপকথায় পরিণত করেছিলেন। সুযোগসন্ধানী একদল উন্নত-বুদ্ধির নভশ্চর হিমালয়শীর্ষে উপনিবেশ গড়ে ক্ষমতালোভী অথচ ক্ষমতাহীন একগোষ্ঠী পশুপালককে কৃষিনির্ভর আদি ভারতীয় সভ্যতার শ্মশান-ভূমিতে ক্ষমতাবান শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করলে কৃতজ্ঞ সেই সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী পশুপালক আর্যরা হিমালয়বাসী প্রভুদের দেবতা বানিয়ে তাঁদের অনুশাসনকেই সত্য ও ধর্মরূপে প্রচার করেছেন। যারা সে ধর্ম মানে নি, অনুগৃহীতদের অভিধানে তারা বিধর্মী হিসাবে চিহ্নিত। আর এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য লক্ষশ্লোকে কোটি কোটি মিথ্যা উচ্চারণ করে গেছেন তাঁরা।

দুর্যোধন কর্ণকে খাটো করার জন্য মিথ্যা কথার জাল-বোনা অনেক হয়েছে। ওদিকে পাণ্ডবদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য পাণ্ডব প্রসঙ্গেও মিথ্যা ভাষণ

কম হয় নি। তাঁরা সকলেই দেবপুত্র। উৎপন্ন হয়েছিলেন অলৌকিক যোগবলে, এসব কথাও মহাভারতকারের উদ্দেশ্যমূলক রূপকথা মাত্র। এবার সে কথায় আসি।

চিরকালের পরিচিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয় নিয়ে সম্প্রতি বেশ কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছে। গোলমাল যে বিশেষ কেউ তাঁর নিজস্ব পাণ্ডিত্য প্রচারের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নয়। বিভ্রান্তির মূল মহাভারতীয় তথ্যের মধ্যেই নিহিত আছে; আছে আদিপর্বে এবং তারই জোরদার সমর্থনে স্বয়ং ব্যাসদেবের বক্তব্য শ্লোকবদ্ধ করা হয়েছে বহু পরবর্তী আশ্রমবাসিক পর্বে।

মহাভারত বললেন, "সুর-শ্রেষ্ঠ ধর্ম সূর্যোপম জ্বলদনলসন্নিভ (প্রজ্বলিত অগ্নিহেন) বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার (কুন্তীর) সমীপে সমুপস্থিত হইলেন" (আদি, কালী, পৃঃ ১২৭) এবং 'পাণ্ডোরর্থে মহাভাগা কুন্তী ধর্মমুপাগমৎ' বা পাণ্ডুর জন্য মহাভাগা কুন্তী ধর্মের সঙ্গে মিলিত হলেন। ধর্ম নামক কোনো উজ্জ্বল পুরুষ কুন্তীর আমন্ত্রণে যান্ত্রিক বিমানযোগে শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে নামেন ও বিভিন্ন রসালাপের পর পুত্রার্থিনী কুন্তীর সঙ্গে যৌনযোগে মিলিত হন, যার ফলশ্রুতিতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। (আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ দ্রঃ)।

মহাভারতে অপর চমকপ্রদ কাহিনী বলছে, বিদুরই স্বয়ং ধর্ম এবং তিনিই 'যোগবলে' যুধিষ্ঠিরকে উৎপন্ন করেন। যুধিষ্ঠির-জন্ম নিয়ে এই বিভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীমতী ডঃ ইরাবতী কার্ভে তাঁর 'যুগান্ত, এ্যান এণ্ড অব এ্যান ইপক' গ্রন্থে যথার্থ যুক্তিসম্মত তর্ক উত্থাপন করে প্রশ্ন রাখলেন, তবে কি বিদুরই যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পিতা? বিদুরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের পিতৃত্বের দাবীদার হওয়ার একাধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

সেকালে যৌন-অক্ষম স্বামীর ক্ষেত্রে স্বামী অথবা শ্বশুরালয়ের সম্মতিতে পরপুরুষের দ্বারা পুত্রলাভের প্রথা প্রচলিত ছিল, বলা হত, নিয়োগ প্রথা। এই নিয়োগ প্রথার দ্বারাই বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে সত্যবতীর ও ভীষ্মের অনুমোদনক্রমে বেদব্যাসের ঔরসে জন্ম হয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের। আবার পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে কুন্তী বিভিন্ন দেবতার ঔরসে গর্ভবতী হন। জন্ম লাভ করেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং তাঁদের সবার আগে কুন্তীর কুমারী অবস্থায় কর্ণ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে পাণ্ডুর অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে জন্মান নকুল ও সহদেব।

শ্রীমতী কার্ভের যুক্তি: মহাভারতীয় যুগের নিয়োগ প্রথানুসারে যেহেতু দেবরই নিয়োগের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত, তাই কুন্তীর দেবর হিসাবে বিদুরের

পক্ষে যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করার সম্ভাব্যতাও খুবই বেশি। তাছাড়া মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে অণীমাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে শূদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ যিনি ধর্মরাজ তিনিই বিদুর।

বিদুরই যে যুধিষ্ঠিরের পিতা, আশ্রমবাসিক পর্বে স্বয়ং বেদব্যাস তা ব্যাখ্যা করে রাজ্যহারা বনবাসী ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, "ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম (বিদুর) যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন।" অতঃপর ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ব্যাসদেব পুনশ্চ বলেছেন, "যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।" (আশ্রম, কালী, ১৯)।

আরও তর্কের মধ্যে পৌঁছাবার আগে এই রহস্যটি নিয়ে একটু অনুসন্ধান করে নিই আমরা। বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদে বসাবার পক্ষে স্বয়ং বেদব্যাসের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং এখানে একটু থেমে আমরা আবার আলোচ্য-প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যসুষমামণ্ডিত 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন, "শ্রীমতী কার্ভের অনুমিতিটি মনোরম·· কিন্তু কল্পনাবিলাসের প্রথম কয়েকটি সুখকর মুহূর্ত কেটে যাবার পরেই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করে।" বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেববাবু কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক যুক্তি দূরের কথা কোনো শক্ত ও সমর্থ যুক্তিও উত্থাপন করেন নি, বরং বুদ্ধদেবের বক্তব্যই অপেক্ষাকৃত অনুমিতিনির্ভর এবং কিছুটা পাঠকের ওপর জোর করে চাপিয়ে-দেওয়া আপন-সুখী বক্তব্য। শ্রীমতী কার্ভে তুলেছেন মহাভারতীয় তথ্য তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে, বুদ্ধদেব নাকচ করেছেন সে বক্তব্য তাঁর দার্শনিক কবি মেজাজ নিয়ে। বুদ্ধদেব লিখলেন : "কুন্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোদ্ভূত—নগণ্য মাদ্রীতনয়েরাও তাই—এই অবস্থায় যিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহলে সেটা হ'ত সমগ্র মহাভারতের পক্ষে দূরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা—কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে সেটা গোপন রাখা কোনোমতেই সম্ভব হ'ত না। ধরে নেওয়া যায়, কর্ণের জন্ম-কথার মতই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হ'ত অনেকবার, একবার হয়ত কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম।"

প্রথাবদ্ধ রীতিতে মহাভারতীয় বিষয়াবলীর বিচারে বসলে তার্কিক মনে এ ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। মনে হতে পারে, কর্ণজন্মকথা যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরের জন্মকথাই বা তেমন হ'ল না কেন?

প্রশ্নটি কবির, এ প্রশ্ন জাগতে পারে ঔপন্যাসিকের মনে। প্রচলিত সংস্কার

যে দার্শনিক-মনকে অভিভূত করে তার কাছে মহাভারতের বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার্য না হতে পারে। তিনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন এই ভেবে যে "যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে মহাভারতের একটি ভিত্তি-প্রস্তর সরিয়ে নেওয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই বিরাট অট্টালিকা, যা ধর্মবকের ঘটনা থেকে —সত্যি বলতে, নহুষ যুধিষ্ঠির সংলাপ থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন কবিরা, এবং যার উচ্চতম শিখরদেশে যুধিষ্ঠিরের কুক্কুরচিহ্নিত জয়ধ্বজাটি উড্ডীন।" (মহাভারতের কথা)।

মহাভারতের কথা এমনভাবে শুনতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু সেই প্রথাবদ্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে চিরকাল একই সংস্কারবদ্ধ দৃষ্টিতে যদি আর না তাকাতে পারি, যদি সেজন্য বস্তুতই ধ্বসে পড়ে কবি-কল্পিত কল্পকাহিনীর মশলায় গাঁথা একটি সুরম্য অট্টালিকা এবং যদি সেই ধ্বংসাবশেষের মাটি খুঁড়ে পেতে পারি আমরা আমাদের এক কবরস্থ পুরা-ইতিহাস, তবে কে চায় সেই ইতিহাসের সন্ধান না করে কথকতার আখড়ায় বসে আজগুবি গপ্পো শুনতে? মানুষকে হাতের কাছে পেয়েও মানুষের পিতা হিসেবে একটি কল্পিত বক ও কুকুরের রূপক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার দিনগুলি আজ বোধহয় সীমিত হয়ে এসেছে। অতঃপর প্রাপ্ত বিশ্বাস নিয়ে কাব্যামোদে আর তৃপ্তি নেই, এখন সত্যকে ভেঙে চুরে দেখার সময়।

বিদুরই যুধিষ্ঠিরের পিতা একথা ফাঁস হয়ে গেলে বস্তুতই সেদিন ঘটনাবলীর স্রোতধারা হয়ত সরল পথেই অগ্রসর হতে পারত। বিদুরের বিশ্বাসঘাতকতার মস্ত প্রস্তরখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তৎকালের রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত হয়ত দেব-পাণ্ডব-ব্রাহ্মণদের যুদ্ধজয়ে একটি সহায়ক শক্তিরূপে অবাধে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পেত না। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা থেকে বিদুর শুধু বিতাড়িতই হতেন না, শত্রুপক্ষের চর হিসেবে হয়ত তাঁকে সেকালে প্রচলিত শাস্তিও ভোগ করতে হত। বিদুরের সৌভাগ্য, পাণ্ডবপক্ষে প্রকৃত বীর যোদ্ধার অনটন যেমনই থেকে থাক, ধুরন্ধর কূটনৈতিকের আদৌ অসদ্ভাব ছিল না। তাঁদের বুদ্ধি-দাতা ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসহ আরও একাধিক মহর্ষি এবং চতুর রাজনীতিজ্ঞ বেদব্যাসপুত্র বিদুরও। দেব-ব্রাহ্মণগোষ্ঠী বিদুরকে বসিয়ে রেখেছিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মহামন্ত্রী পদে। দুর্যোধন-শিবিরে বসে আপন পদমর্যাদার সুযোগে বিদুর দুর্যোধন-জন্ম-সময় থেকেই অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে বিদুরের একমাত্র চেষ্টা ছিল ধৃতরাষ্ট্রের মনোবল ভেঙে দিয়ে ও দুর্যোধনের প্রতি তাঁকে বীতরাগ করিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসানো। এ জন্য স্ব-সৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ-সৃষ্ট ধর্মকথা তিনি অহোরাত্র ধৃতরাষ্ট্রের কানের কাছে আউড়ে গেছেন।

দুর্যোধনবিরোধী এক সভাসদ্-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন ও রাজধানীতে বসে থেকে একটি সু-শিক্ষিত চরবাহিনীর সাহায্যে সব রকমভাবে সহায়তা প্রেরণ করেছেন পাণ্ডবদের কাছে। বিদুর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় সময় আমরা দেখতে পাব দেব-ব্রাহ্মণ এবং দেব-মনোনীত কুন্তীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির-জন্মের ঢের আগে থেকেই বিদুর রাজনৈতিক 'হট লাইন' এবং গোপন যোগসূত্র রক্ষা করে চলতেন। আমরা প্রমাণ পাব, কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের ছিল একটি অতি গোপন প্রণয়-সম্পর্ক। তাই তো বিদুরের স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কে অমন একটি স্ফীত-কলেবর মহাভারতও নীরব। অথচ কুন্তী-বিদুর কথা এবং বিদুর-যুধিষ্ঠির সম্পর্ক কাব্যে বেশ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু সে সম্পর্ক যদি সর্বসাধারণ্যে ধরা পড়ে যেত সেদিন, তাহলে বস্তুতই মহাভারতের ঘটনাস্রোতও অনেকাংশেই পাল্টে যেত। বিদুরকে সঠিক চিনতে ও বুঝতে পেরেছিলেন দুর্যোধন এবং কর্ণ। হয়ত বিদুরের আচরণ সম্পর্কে পিতামহ ভীষ্মও অনবহিত ছিলেন না। কিন্তু ভীষ্ম ছিলেন রাজনৈতিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের শিকার। যুদ্ধের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত এবং যুদ্ধচলাকালীন এমন কি তাঁর মৃত্যুশয্যায়ও ভীষ্মের সেই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে নি। বীরশ্রেষ্ঠরূপে বহুবন্দিত বৃদ্ধ পিতামহ সম্পূর্ণরূপে না পাণ্ডব, না কুরু কোন শিবিরের সঙ্গেই একাত্ম হতে পারেন নি। তিনি ব্রাহ্মণ্য প্রচারের দ্বারা বার বারই আপন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কৃষ্ণকূটনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছেন। কুরু শিবিরের অপর দুই বৃদ্ধ রক্ষক দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের মধ্যেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই। তাঁদের মনে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতেও বুদ্ধিজীবী বিদুরের অবদান অসামান্য।

বিদুর চরিত্রের পূর্বাপর আচরণ বিশ্লেষণ করলে কুন্তীর প্রতি তাঁর গোপন প্রণয়ের চিত্রটি খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে। পাণ্ডুর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কুন্তীর গর্ভে প্রথম পাণ্ডবকে জন্মদান করা তাই বিদুরের পক্ষে মোটেও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। শ্রীমতী কার্ভে তিনটি মহাভারতীয় সু-স্পষ্ট যুক্তির উল্লেখ করেছেন, আমরা অস্পষ্ট কারণগুলি এর পর খোঁজ করব। যদি তার ফলে মহাভারতের সুরম্য অট্টালিকাটি ধ্বসে পড়ে, তবে সে দায়িত্ব আমাদের নয়। যারা যুগ যুগ অগণিত ভারতবাসীকে প্রথাবদ্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন করে রূপকথা রচনার দ্বারা একটি দেবানুগত ও ব্রাহ্মণপ্রধান সংস্কৃতির ধারায় স্নান করিয়ে আজগুবি গল্পকে দেবকাহিনীরূপে প্রচার করে এসেছেন, বিধ্বস্ত অট্টালিকায় চাপা পড়ে তাঁদের সেই চতুরালি নিষ্পিষ্ট হবে, কিন্তু তার ফলে মহাভারত

যতটুকু পুরা ইতিহাস, ততটুকু বেরিয়ে আসবে স্পষ্ট দিবালোকের পাদপীঠের সামনে। সে তো কম বড় লাভ নয়।

অপসংস্কৃতির অন্ধকার থেকে চৈতন্যমুক্তির এ সুযোগ কি আমরা সুন্দর সুন্দর কাব্যকথার দার্শনিকতার তলায় চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারি? সুন্দর কথার চেয়ে কঠিন সত্য অনেক অনেক বেশি পবিত্র নয় কি?

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু শুধু কবি বা দার্শনিক নন, তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত। 'মহাভারতের কথা' তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ। একবার নয়, বার বার পড়ার মত বই। গদ্যে লেখা সে গ্রন্থ যেন আর একটি সুখপাঠ্য কাব্য। কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর রচনার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ এক কথা, আর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মনের মিল ঘটানো আর এক কথা। আগেই বলেছি, তাঁর কবি-সুলভ দৃষ্টি কাব্য-সৌন্দর্যের প্রতিই আকৃষ্ট। মহাভারতীয় কথাকে তিনি বিচার করেছেন আবহমানের প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তাই মনে হয়েছে, সামান্য মাদ্রীপুত্ররাও যখন দেব-ঔরসজাত তখন মান্যবর যুধিষ্ঠিরকে কেমন করে বিদুরতনয় ভাবা যেতে পারে?

ভাবাভাবির কোনো কথা নয়, আমাদের বিচার্য মহাভারতীয় তথ্যাবলী। যে কথা বেদব্যাস স্বয়ং বলছেন, তাকে অস্বীকার করতে হলে যুক্তির ধার চাই অনেক বেশি। অথচ উপরে উদ্ধৃত যুক্তিকে তো তেমন টেঁকসই মনে হয় না। কুন্তী-পুত্রকে দেব-ঔরসজাত হতেই হবে এমন দাবি আমাদের রাখা অনুচিত। তাছাড়া মাদ্রীপুত্ররাও যে খাঁটি দেব-সন্তান সে কথাই বা কেমন করে স্বীকার করি? অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে কি খাঁটি দেবতা বলে মেনে নেওয়া যায়? দেবতা বলতে আমরা যে বহিরাগত উজ্জ্বল নভশ্চর পুরুষদের বোঝবার চেষ্টা করে এসেছি (এই লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সেরকম খাঁটি বহিরাগত পুরুষ বলে দাবি করা যায় না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম পৃথিবীতে। বিশ্বকর্মা তাঁদের দাদামশায়। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যদেবের বিবাহ হয়েছিল। উত্তরকুরুবর্ষে পতিগৃহ-পরিত্যক্তা সংজ্ঞা যখন অশ্বিনীর ছদ্মবেশে অবস্থান করছেন তখন সূর্য অশ্বের ছদ্মবেশে (ব্যাপারটি দুর্বোধ্য) উত্তরকুরুতে গিয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। মিলনের ফলে জন্মগ্রহণ করেন যমজপুত্র অশ্বিনী ও রেবন্ত। এঁরা সর্বদা একই সঙ্গে থাকতেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে এঁরা হয়েছিলেন দেবতাদের ডাক্তার বা দেব-বৈদ্য। 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' নামে যমজ ভ্রাতা-রচিত একটি গ্রন্থের কথাও জানা যায়। যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন ও সংজ্ঞা এবং

সূর্যের সঙ্গমের ফলে উত্তরকুরুবর্ষে ভূমিষ্ঠ হন, তাঁরা 'ট্যাস' দেবতা। খাঁটি দেবতা ছিলেন না। একথা মেনে নিলে, বুদ্ধদেববাবু যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার ভার কিছুটা হাল্কা হতে পারে হয়ত।

বেদে অবশ্য অশ্বিনীকুমারদেরও ঈশ্বরীয় মর্যাদা স্বীকৃত।

বেদোক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য ও চন্দ্র। নিরুক্তকারের মতে এঁরা ইন্দ্র ও সূর্য। বৈদিক অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবার কখনো পৃথিবী ও স্বর্গ, কখনো বা দিন ও রাত্রি। কিন্তু বৈদিক দেবতারা পৌরাণিক যুগে দেহধারী দেবতায় পরিণত হন। বেদের দেবতারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ওপর আরোপিত চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে কল্পিত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ম্যাকডোনেল সাহেবের ভাষায়, "The higher gods of the Rigveda are almost entirely personifications of natural phenomena, such as Sun, Dawn, Fire, Wind." শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('বিশ্বকোষ', ১ম খণ্ড) যথার্থই লিখেছেন, "তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রাকৃতিক পটভূমির বিচারে তাঁরা অস্বচ্ছ শ্রেণীর দেবতা।" সুতরাং পৌরাণিক যুগের অশ্বিনীকুমার, যাঁরা 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' গ্রন্থ রচনা করেন, 'শল্য চিকিৎসা' করে কাটা পা জোড়া লাগিয়ে দেন, প্লাস্টিক সার্জারি করে বার্ধক্যের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেন, বৈদিক শ্লোকের মধ্যে তাঁদের দিন-রাত্রি, স্বর্গমর্ত্য রূপে খোঁজ করতে যাওয়ার অর্থ হয় না। পৌরাণিক কর্মকর্তা দেবতাদের মধ্যেও পরম রূপবান অশ্বিনীদ্বয়কে এমন কোনো মর্যাদাবান পদ দেওয়া হয় নি যেজন্য মনে হতে পারে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর বা ইন্দ্রের সমতুল্য দুজন নভশ্চর ছিলেন তাঁরাও। বরং সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে উত্তরকুরুবর্ষে তাঁরা জন্মগ্রহণ করে তথাকথিত দেবতাদের শিবিরে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়েছিলেন বলে অনুমান করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত। এবং সেই হিসেবে বলতে পারি, মাদ্রীতনয়রা প্রথম শ্রেণীর দেবপুত্র ছিলেন না। কুন্তী-পুত্রদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দেবপুত্র বলতে আমি দুজনকেই বুঝি, কর্ণ ও অর্জুন।

মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক্রমশ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে, সেই যুদ্ধে কুন্তীর ঐ দুই ছেলে, কর্ণ ও অর্জুন বস্তুতপক্ষে নায়ক। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছেন তাঁরাই। যুধিষ্ঠির নিমিত্তের ভাগী।

অশ্বিনীদ্বয় যে শ্রেণীর দেবজনই হয়ে থাকুন কর্ণের মত তাঁরাও সূর্যপুত্র এবং অশেষ গুণসম্পন্ন। শুধু উত্তম চিকিৎসক নন, এঁরা ছিলেন যন্ত্রবিদ বা ইঞ্জিনীয়ার। বৈদিক সূক্ত থেকে জানা যায়, ভ্রাতৃযুগল বিশেষ ধরণের অনশ্ব রথ বা অশ্ববিহীন রথ চালনা করতেন। অর্থাৎ আবার সেই উড্ডীন

যানের কথা। যে পথে পশুতে টানা যান গমনাগমনের সুযোগ ছিল না, অশ্বিনীদ্বয় সে পথ অতিক্রম করতেন উড্ডীন যানে চেপে। সে কেমন যান? ঋগ্বেদে তারও আভাস ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। রথ ছিল ত্রিকোণাকার এবং তার চাকাও ছিল তিনটি (ঋ. ১ম. মণ্ডল. ৩৪ সূত্র, ২রক)। এরোপ্লেনের ডানাদুটি থেকে তার লেজ পর্যন্ত রেখা টানলে বিমানের আকার ত্রিকোণ বিশিষ্টই তো হয়। যে পথে মানুষ ও পশু চলতে পারে না, বিমান বা হেলিকপ্টার ছাড়া সে পথ আর কোন্ যান অতিক্রম করতে পারে? তাছাড়া সে যান তো অনশ্বযানও বটে। আর উপরোক্ত উড্ডীন যানের চাকার সংখ্যাও থাকে তিনটি।

ঋগ্বেদের একটি কাহিনী বলেঃ রাজা তুগ্র পুত্র ভুজ্যুকে শত্রুনাশকল্পে সমুদ্রাভিযানে পাঠান। ভুজ্যু সমুদ্রে বিপদাপন্ন হলে অশ্বিনীদ্বয় সমুদ্রবক্ষ থেকে 'উপরে' (শূন্যমার্গে) তুলে নিয়ে উদ্ধার করেন তাঁকে অর্থাৎ অশ্বিনীকুমাররা উড্ডীন যানেই তাঁদের উত্থিত করেছিলেন।

মাদ্রীর আহ্বানে শতশৃঙ্গ পর্বতেও তাঁরা বিমানযোগেই এসেছিলেন। জানা যায়, তাঁরা জানতেন, ভূক্ষেত্র পরিমাপ করতে (মানচিত্র অঙ্কন?) এবং সিভিল ইঞ্জিনীয়ারদের মতো হিমালয়ের বিভিন্ন পার্বত্য পথকেও তাঁরাই সুগম করেছিলেন। একথা জানতেন দেবশিবিরে যাতায়াতকারী ঋষিরা।

যে বেদ একবার তাঁদের পৃথিবী ও স্বর্গ, দিন ও রাত্রি বলছেন অর্থাৎ দুজনকে অবাস্তব প্রাকৃতিক অচেতন বস্তুরূপে বন্দনা করছেন, সেই ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে তাঁরাই আবার ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী গুণবান পুরুষ হিসেবে কীর্তিত। এরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু যে অশ্বিনী-যুগল পার্থিব কাজ-কারবার করেন ও দেবজন হওয়া সত্ত্বেও মানবী মাদ্রীর আহ্বানে ব্রহ্মার পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য বিমানযোগে ছুটে আসেন, তাঁদের কোনোভাবেই কল্পনাপ্রসূত অচেতন বস্তুরূপে ভাবতে পারি না। আবার তিন প্রধান দেবনায়কদের মধ্যেও তাঁদের কোনো স্থান আছে বলেও জানতে পারি না। সুতরাং তাঁদের খাঁটি দেবতার তালিকায় না ফেলে দেবজন-গোষ্ঠীর মধ্যে গণনা করাই ভালো। সে হিসেবে মাদ্রীতনয়রা যে বিদুরপুত্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা বলারও আর অবকাশ কোথায়?

দেবতাদের (প্রথম শ্রেণীর বহিরাগতদের) মধ্যে ধর্ম ও পবনের স্থানও ইন্দ্র ও সূর্যের সমান ছিল বলে স্বীকার করা যায় না। পবনপুত্র ভীমের চরিত্রে আর্য অপেক্ষা অনার্য চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যই বেশি। ভীমের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড, যেমন

অতিভোজন, গাছের গুঁড়ি নিয়ে যুদ্ধ, সর্বক্ষেত্রে অনার্য রাক্ষস-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মোকাবিলা করা, একটুতেই ক্রোধান্বিত হওয়া, প্রণয়মত্ততা অথবা নাগেদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক বা রাক্ষস সন্তানের জন্মদান করা প্রভৃতি সবই অনার্য-সুলভ আচরণ। বিশিষ্ট আর্যা এবং রাজমহিষী হয়েও কুন্তী অনার্যা রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের বিবাহে কিছুমাত্র ইতস্তত না করে রাজি হয়ে গেছলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী। ভীম সম্পর্কে তাঁর এই ঔদার্য নিশ্চয়ই অকারণে হয় নি। ভীমকেও তাই খাঁটি দেবঔরসজাত বলতে দ্বিধা হয়। অর্থাৎ, ধর্মবককে যুধিষ্ঠিরের পিতা বলে আমাদের মেনে নিতেই হবে, কারণ কুন্তী ও মাদ্রীর অন্যান্য পুত্ররাও দেবপুত্র, বুদ্ধদেববাবুর এই যুক্তির বিপক্ষে একাধিক তার্কিক প্রতিবন্ধক আছে।

বুদ্ধদেববাবুর অপর যুক্তি, যুধিষ্ঠির বিদুরপুত্র হলে 'সেটা হত মহাভারতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা' এবং 'কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা কোনো মতেই সম্ভব হোত না।' তিনি তাই মনে করেন, কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হতো অনেকবার, একবার হয়ত কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম।

বুদ্ধদেববাবুর এই আপাত-সহজ যুক্তিগুলি চট করে মনে ধরে যাবার মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভীর অনুসন্ধানে তাদের কোনটাকেই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। মহাভারতের রাজনৈতিক পটভূমিটি এমনই চমৎকার, তৎকালীন কূটনীতি এতই সূক্ষ্ম যে কর্ণজন্মকথা এবং যুধিষ্ঠির-জন্মের নেপথ্যসত্য যুদ্ধের আগে বা আরও সঠিকভাবে বললে, 'যুদ্ধজয়ের আগে' তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে পড়লে তারই ফল বরং হত সুদূরপ্রসারী। সেক্ষেত্রে কুন্তীর ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যেত যা দেবতা ও ব্রাহ্মণরা আদৌ চান নি এবং যে কারণে সূর্যপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কর্ণকে আজীবন শুধু লাঞ্ছনাই ভোগ করে যেতে হয়েছে। পিতা সূর্য কর্ণের সবচেয়ে সংকটকালে ছদ্মবেশে চোরের মত দেখা করে গেছেন তবু বলতে পারেন নি, হে কর্ণ, অহং তে জনকস্তাত! আমিই তোমার পিতা। কুন্তী শত ইচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ নিবারণের জন্য কর্ণকে তাঁর আসল পরিচয় জ্ঞাপন করতে পারেন নি। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে অর্জুনের জন্য দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর মাতৃত্ব আশংকায় দুর্বল হয়ে পড়েছে একমাত্র তখনই তিনি ছুটে গেছলেন কর্ণের কাছে, তবে তাও অতি সংগোপনে। কর্ণের মহত্ত্ব অনন্যসুলভ, তাই কুন্তীর কীর্তি তিনি জন-সমক্ষে ফাঁস করে দেন নি (পাণ্ডবরা হলে তখনই ঢাকঢোল নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়তেন। প্রচার এক শক্তি-শালী হাতিয়ার একথা

দেবব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয় পাণ্ডবরাও সম্যক বুঝে ফেলেছিলেন)। এই ঘটনা-বলীর সূত্রে আমরা জানতে পারি, কর্ণের জন্মকথা (জন্মবিষয়ক সত্যকথা) মোটেও বহুবার উল্লিখিত বা বর্ণিত হয় নি। সেকথা দেবতা ব্রাহ্মণ এবং স্বয়ং কুন্তী খুবই সযত্নে গোপন করেই রেখেছিলেন। আদিখণ্ডে জন্মকথা পর্বে সকল রাজারই জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। অংশটি সমগ্র মহাভারত কাহিনীর সূচক, তা ঘটনাক্রম নয়। সে সূচক পাঠে ধর্মরূপী বিদুরের অণীমাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে মনুষ্যজন্মগ্রহণ অথবা কর্ণজন্মকথা (যা বর্ণিত আছে) তার কোনোটাই ঘটনাক্রমে উল্লিখিত বিবরণ নয়, ঘটনাশেষে রচিত কাহিনীর সূচকমাত্র। তাই একথা বলা যায় না যে, কর্ণজন্মকথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। স্বীকার করি, একবার কুন্তী স্বয়ং কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানান, এবং সেই প্রথমবার। কিন্তু সে কথাও তো পাঁচকান হয় নি। কাহিনী-পাঠক হিসেবে আজ আমরা যা আগেভাগে জানার সুযোগ পেয়েছি, সে রহস্যের সংবাদ তখন এমন পরিষ্কারভাবে কেউই জানতেন না। জানতেন শুধু দেবগণ, সূর্য কুন্তী এবং দুর্বাসা। মনে হয়, স্বয়ং বেদব্যাসও (দেবশিবিরের যত কাছের মানুষই তিনি হন না কেন) কর্ণজন্মরহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যুধিষ্ঠির যে বিদুরপুত্র, একমাত্র যুদ্ধের পরই একথা জানিয়েছেন তিনি খুবই সাবধানে। পাছে কুন্তীর ইমেজ নষ্ট হয়, তাই আরও বলেছেন, অবশ্য বিদুর যোগবলেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম দেন। সূর্য সম্পর্কেও যোগবলের গল্প খাড়া করা হয়েছে, অথচ কুন্তী-সূর্য সঙ্গমের প্রাকৃতিক বর্ণনাও আছে। তাছাড়া আমরা দেখব, দেবতারাও যোগবলে কিছুই করতে পারেন না, বিদুর তো সামান্য।

মহাভারত বলেছেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই ধর্ম।

ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে কেবলমাত্র দেবতারাই নন, গন্ধর্ব অপ্সরা এবং অন্যান্য দেব-মনোনীত এবং দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণরাও দেবপুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিদুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেবব্রাহ্মণ পক্ষের জয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। দুর্যোধন-শিবিরে বসে সেই শিবিরের সবরকম পরাজয়ের জন্য দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন পরম ধার্মিক বলে কথিত বিদুর মহারাজ। শূদ্রা-গর্ভজাত হলেও ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে সার্থক ও সফলভাবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে কজন বিশিষ্ট রূপকারের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিদুর তাঁদের কেবলমাত্র অন্যতমই নন, তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান। ধৃতরাষ্ট্রকে উৎখাত করে পাণ্ডুকে

তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসাতে পারেন নি বটে, কিন্তু বহু যত্ন পরিশ্রম ও পরিকল্পনার শেষে পাণ্ডুর প্রথমজাত তনয় যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই অধিষ্ঠিত করিয়েছিলেন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত রাজচক্রবর্তীর আসনে। দেবব্রাহ্মণদের জয়ে বিদুরের অসামান্য সাহায্যই তাঁকে 'ধর্ম' নামক দেবতার পদে উন্নীত করে। সন্তুষ্ট দেবপক্ষ তাই কি তাঁকে স্বয়ং 'ধর্ম' এই পদমর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন? সেজন্যই কি তিনিই ধর্ম এবং ধর্মই বিদুর?

ধর্ম বা ধর্মরাজ বলতে কী বুঝি?

'হরফ' প্রকাশনী ঋগ্বেদ সংহিতার যে সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তার প্রথম খণ্ডে আছে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ, 'ঋগ্বেদ পরিচয়'। ঋগ্বেদীয় দেবতাদের বাছাই ও শ্রেণী-বিন্যাস করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকাটি এই প্রবন্ধে সংযুক্ত করেছেন তার মধ্যে 'যম' দেবতার উল্লেখ থাকলেও ধর্ম নামক কোনো দেবতার উল্লেখ নেই। বস্তুতপক্ষে ধর্ম বলতে আমরা কিন্তু 'যম' দেবতাকেই বুঝি।

ঋগ্বেদ দেবতা বলতে কোন বিষয়কে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সরলভাবে তা আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন: "ঋগ্বেদের প্রকৃত দেবতা অর্থে বুঝি পৃথিবী বা দ্যুলোকের এমন সব প্রাকৃতিক বিষয় যাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাঁদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিলেন।" (অর্থাৎ ম্যাকডোনেল সাহেবেরই বক্তব্য যা আগে জানিয়েছি)।

সাধারণভাবে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে ঋগ্বেদীয় দেবগণের কল্পনা,—একথা সম্যক বোঝার পরও প্রশ্ন থাকে। কিছু কিছু সূক্তে দেবচরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও তাঁদের কথোপকথন এমনভাবে বিবৃত আছে যে সন্দেহ হয়, দেবতারা যখন দেহবান নভশ্চরের দ্বারা তাঁদের কল্পিত স্বর্গীয় আসন থেকে বিচ্যুত হলেন এবং শরীরধারীরা সে জায়গা দখল করলেন সেই সময়ে রচিত শ্লোকাবলীও হয়ত বেদে সঙ্কলিত সূক্তগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। সেইসব সূক্ত, যেখানে অশ্বিনীদ্বয়ের ডাক্তারী ও কারিগরির কথা আছে, যেখানে আছে যম-যমীর (সঙ্গম বিষয়ক) বিতর্ক, আছে ইন্দ্র কর্তৃক অনার্য নিধনের গল্প, সেইসব সূক্তের মাধ্যমে দেহধারী দেবতাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেদেও। তাই কি 'ত্রিস্র এব দেবতা' তেত্রিশ ও ততধিক হয়েছেন? একমাত্র 'পুরুষ শক্তি' হয়ে গেছেন একাধিক দেবশক্তি?

যম মহাপ্রভুকে অন্তত কি প্রাকৃতিক শক্তির ওপর আরোপিত দেহবান দেবতা বলে মানতেই হবে? যমের ওপর ঋগ্বেদে মাত্র দুই তিনটি সূক্ত আছে।

আছে ১০ম মণ্ডলে। যে সূক্তে যম সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় সেই সূক্তটির বক্তব্য কোনো প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্তাকে পরিস্ফুট করে না। জানানো হয়, যম পিতৃলোকের রাজা। যম নিযুক্ত দুটি কুকুর সেই পিতৃলোকের দ্বার-রক্ষক। তিনি 'সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিদের সুখের দেশে নিয়ে যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করে দেন।' অবশ্য এই সূক্তে একটি কল্পিত পরলোকের কথাও আছে। কিন্তু সেই স্বর্গ নরকের ধারণা সেদিন শুধু নির্ভেজাল কল্পনা থেকেই জন্ম লাভ করেছিল, নাকি তার পেছনেও ছিল কিছু বাস্তব ঘটনা যা ঋষিদের স্বর্গ ও নরক কল্পনা করতে সাহায্য করেছিল? মহাভারতে স্বর্গের ধারণা কেমনভাবে আস্তে আস্তে পাল্টে গেছে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে, সে সব কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছি আমার আগের বই-এ। এখানে যমের রাজ্যটি বর্ণনা করলে স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে আমাদের চিন্তা নতুন করে আলোকিত হতে পারে।

বেদ বললেন, যম পিতৃলোকের রাজা। সুতরাং পিতৃলোকটা এই ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে একবার সবাই মিলে ঘুরে আসি। যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয় বোধহয় সেই পরিশ্রমী ভ্রমণের দ্বারা নতুন করে আবিষ্কার করা সম্ভব।

অনেক খেটেখুটে শ্রীযুত রাজেশ্বর মিত্র স্বর্গ নরকের একটি সুস্পষ্ট পথ-মানচিত্র ছকে দিয়েছেন তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থে। আমরা সেই গাইড ম্যাপ সামনে রেখে স্বর্গারোহণ করলে যম মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন অবশ্যই পেয়ে যাব।

বেদে স্বর্গীয় পথ চারটি: আপথ; বিপথ (এই পথে দেব-মনোনয়ন বা ছাড়পত্র লাভ করেননি এমন অনাহূত ব্যক্তি প্রবেশ করলে তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হত) ও, কঠিন পর্বতগাত্র খনন করে নির্মিত হত ছিদ্রপথ। তাছাড়া ছিল, অনুপথ। স্বর্গলোক (হিমালয়) থেকে মর্ত্যলোক (আর্যাবর্ত) পর্যন্ত পথগুলি দুটি প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একটি দেবলোকের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত দেবযান (পথ) এবং অপরটি ছিল পিতৃলোকের রাজা যমের খবরদারিতে নিয়ন্ত্রিত পিতৃযান (পথ)। দেবজনের অধিকার ছিল দুটি পথই ব্যবহার করার। এই গোলকের মনুষ্য সন্তানরা কিন্তু বিশেষ সীমানার পর আর পার্বত্য প্রদেশে স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরার সুযোগ পেতেন না। দেহরক্ষী ও যমরক্ষীরা সেই স্বর্গীয় পথ সর্বদা কড়া পাহারায় সুরক্ষিত রাখতেন।

দেবতাদের পরিচয় নানাভাবে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। পিতৃগণ বলতে কী বোঝায় অতঃপর তার কিছু খোঁজ নেওয়া দরকার।

অথর্ববেদ থেকে জানা যায়, দেবভূমিরও উর্ধ্বস্তরে ছিল পিতৃলোক অথবা দ্যুলোক। পিতৃগণ বলতে বাছা বাছা ও বাঘা বাঘা ঋষি ও ঋষিপরিবারগণকে বোঝায়। এঁরা তখন হিমালায়ে গিয়ে জুটেছেন। দেব শিবিরের সঙ্গে খুব দহরম মহরম। এইসব পথ নির্মিত হয় দেবলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের বাণিজ্য ব্যবসায় চালু রাখার জন্য। পথনির্মাণ ও পরিকল্পনাকারী ছিলেন অশ্বিনী-কুমার। পিতৃগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অথর্বণ গোষ্ঠী। তাঁদেরই একজন মহামান্য ইন্দ্রদেবকে 'বণিক' আখ্যায় বিভূষিত করেছেন (অথর্ববেদ)। বলেছেন, হে ইন্দ্র 'তোমার আনুকূল্যে আমাদের মঙ্গল হোক, সফল হোক আমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বাণিজ্য।' হিমালয়ে বসবাসকারী দেবতাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তাই নির্মিত হয়েছিল পার্বত্য পথগুলি এবং ভরণ-পোষণের জন্য দরকার ছিল বাণিজ্যের। পাহাড়ের ওপর অধিত্যকা উপত্যকাপ্রদেশে কৃষিকাজ এবং সোপান চাষের দ্বারা ভালই ফলন হত। তাছাড়া ছিল অঢেল বনজ সম্পদ। সুতরাং বাণিজ্য করার সম্পদ অপ্রতুল ছিল না। বাণিজ্যের জন্য যাঁরা নিচে থেকে ওপরে যেতেন বিশেষ বিশেষ পথের মোড়ে তাঁদের দিতে হত 'টোল ট্যাক্স' এবং যমকে প্রদেয় কর (অথর্ব, ৬/১১৭)। কর শুধু সমতলবাসীদেরই নয়. বণিক দেবতাদেরও গুণে দিতে হত পাই পয়সার হিসেবে। অথর্ব বেদে (৬।১১৮।২) বলা হয়েছে, কর আদায়ের জন্য প্রত্যেক প্রধান মার্গে কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। এঁরাই যমবাহিনী। দেবতা ঋণী হলে তাঁকে বেঁধে নিয়ে পাঠানো হত কালেক্টার সাহেবের কাছারিতে অর্থাৎ যমপুরীতে। আর যারা মর্ত্যবাসী তাদের শাস্তি বিধান করতেন যমানুচরবৃন্দ। রাজেন্দ্রশ্বর মিত্র লিখেছেন. "তাঁদের (ঐ যমানুচরদের) ঐতিহ্য থেকেই যমদূত আখ্যাটি প্রচলিত হয়ে এসেছে।" (ঐ)। সম্ভবত যমানুচরদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীই 'নরক যন্ত্রণা' রূপে পরবর্তীকালে বর্ণিত হয়েছে। অনেক বন্দী হয়ত প্রাণও হারাতেন। তাই যমদূত মৃত্যুর দূত।

বণিক মর্ত্যবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য পথ পরিক্রমা করতেন। কেননা হাঁটা পথে বার চোদ্দ হাজার ফুট ওঠা তো সহজসাধ্য নয়, তাছাড়া সব ঋতু পাহাড়ী পথকে সুগম রাখে না। বর্ষা ও শীতে তো নয়ই। রাত্রেও পথ চলা অসম্ভব। প্রজ্বলিত অগ্নিকে ঘিরে স্বর্গারোহণকারী বণিকদের পার্বত্য গুহাগুলিতে সারারাত্রি অপেক্ষা করতে হত। ভোর হলেই পুনশ্চ পর্বতারোহণ সুরু হত এক একটি দলের। সঙ্গে থাকত বাণিজ্যবহী পার্বত্য অশ্ব, গবাদি পশু ও পার্বত্য ছাগ। আর এইসব আগন্তুক দলের ওপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল

নিয়ামক ও কর সংগ্রাহক যমরাজের ওপর। যমবাহিনী ছাড়াও অলক্ষ্য পর্বতাঞ্চল থেকে অগ্রসরমান মর্ত্যবাসীর ওপর দৃষ্টি রাখতেন দেবরক্ষীরাও। অথর্ব বেদ দেবগুপ্তচরদের সম্পর্কে বলেছেন, "ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পর্শ ইহ যে চরন্তি" (১৮/১/৯)। অর্থাৎ এখানে দেবতাদের স্পর্শ বা গুপ্তচর (ইং, স্পাই) ঘুমিয়ে অথবা চুপ করে বসে নেই। স্পর্শরা বিশ্বাসঘাতক দেবতা (দেবজন)-কেও নজর করতেন এবং দোষী সাব্যস্ত হলে সেই দেবতা বা দেবপীযুংদের নির্বাসিত করা হত স্বর্গলোক থেকে সমতলের মর্ত্য সীমানায়।

ওদিকে যমের অধীনস্থ পিতৃযানগুলিতে কেবলমাত্র যমানুচর যমদূতরাই পাহারায় থাকতেন এমন নয়, যমের ছিল একদল হিংস্র কুক্কুরবাহিনী। আগন্তুক মর্ত্যবাসীদের অনুসরণ করে সেই সুশিক্ষিত পাহারাদার সারমেয়রা সঙ্গে সঙ্গে যেত। ধর্মানুগত অর্থাৎ দেবতাদের অনুগত নয়, এমন মনুষ্যদল কুকুরদের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বর্গলোকের পথে অগ্রসর হতে পারত না।

যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন, মহাভারতে কথিত আছে, তখন একটি কুকুর তাঁকে সারা পথ অনুসরণ করে। কুকুরটি যে যমেরই সারমেয়-প্রহরী অতঃপর এ-বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে আসে। অথচ কোনও বুদ্ধিমান কবির বাখানিতে ঐ কুকুরই স্বয়ং ধর্মরাজ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন! অথর্ব বেদ কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন যে, ধর্মরাজ হলেন একজন কুকুরপালক মাত্র।

বিভ্রান্তিবশত অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে কুকুরটিকেই স্বয়ং যম বা ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন বিভ্রান্তিকর বচনের সমাহারেই তো মহাভারত অনন্য, মহান এবং স্ফীত কলেবর।

সংস্কারমুক্ত মনে তাই যমরাজকে আমরা পিতৃযানের রক্ষক, নিয়ামক এবং ট্যাক্স কলেক্টর রূপেই দেখতে পাই। তিনিই স্বয়ং ধর্ম, কেননা দেববিরোধী 'অধার্মিক'দের তিনি দিতেন শাস্তি, এবং দেবানুগত 'ধার্মিকরা' তাঁর কাছে পেত দেবলোকে গমনের ছাড়পত্র। দেবকার্য সাধনে যমরাজের ভূমিকা ছিল সবিশেষ মূল্যবান। পিতৃগণও যেহেতু দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক ছিলেন, দেবাধিনায়কদের কাছে তাই তাঁরাও ছিলেন আদরণীয় ও বিশেষ খাতিরের পাত্র। এজন্যই "যে দেবতা দেববন্ধু ব্রাহ্মণকে হিংসা করত…সে পিতৃযানও অনুসন্ধান করে পেত না।"

কবিকৃপায় যম মহাপ্রভুর অস্বাভাবিক পদাবনতি ঘটলেও মহাভারতীয় উদ্দেশ্য কিন্তু তাতে ঠিক ঠিকই সাধিত হয়েছে। প্রহরী আর তার মনিব অর্থাৎ কুকুর ও যমকে একাধারে মিলিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে অলৌকিকতা।

দেবলোক পিতৃলোকের পাহারাদার কুকুরবাহিনীর কথা সাধারণ মনুষ্য সমাজে প্রচার করতে হয়ত নারাজ ছিলেন ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা। কেননা জনস্বার্থে নয়, ব্রাহ্মণস্বার্থেই 'মহাভারতে'র সৃষ্টি। দেব ও ব্রাহ্মণের প্রতি একটি সর্বজনীন অচলা ও প্রশ্নহীন ভক্তি জাগরুক করাই সেই মহাকাব্যের লক্ষ্য। 'যমপ্রহরী সারমেয়বাহিনী হইতে সাবধান' এমন জনহিতৈষী প্রচার মহাভারতে আমরা তাই আশা করতে পারি না। বরং যমরাজ যোগবলে কখনো কুকুর কখনো ধর্মবকের রূপধারণ করতে পারতেন একথা বললে যমের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সে কথা শুনলে সাধারণ মানুষ যমরাজকে অতিমানবীয় গুণসম্পন্ন এক স্বর্গীয় পুরুষ বলেই গণ্য করবেন। তাই হয়ত প্রয়োজন ছিল, যমপ্রহরী কুকুরের 'টপ সিক্রেট' অস্তিত্বকে ঐভাবে গোপন করার। সাধারণের কাছ থেকে সত্য গোপন করতে বহিরাগত দেবতারাই শিখিয়েছিলেন। সত্যকে গোপন করার জন্যই মন্ত্রগুপ্তি। সে কারণেই বেদ উপনিষদকে দেবতাদের অতি বিশ্বস্ত দেবজন ও ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর সিন্দুকে তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়েছিল। সত্য ও জ্ঞানকে গায়েব করে সাধারণ, এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মণ শ্রেণীকেও শোনানো হত ভেজাল পৌরাণিক কথকতা। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রগাঢ় পণ্ডিতেই তৈরী করে দিতেন সেই গল্প। শোনাতেন তা শিষ্যসম্প্রদায়কে। তারপর সেই গল্প সূতমুখে চাউর হত চতুর্দিকে। ব্রাহ্মণরাও গোল হয়ে বসে নৈমিষারণ্যের মতো শান্ত পরিবেশে তা শুনতেন। তারপর সেকথাই প্রচার করে বেড়াতেন গৃহীদের ঘরে ঘরে। এই রিলে প্রথায় কাহিনীর বিস্তার ও বিকৃতি ঘটত যথেচ্ছ ভাবে। বেদ উপনিষদের বাণী সরাসরি শুনলে সাধারণ্যে এমন অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারত যা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানরত দেবব্রাহ্মণদের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

সাধারণ মানুষ সেদিন যে কী নির্মমভাবে অবহেলিত ছিলেন তা স্পষ্টতই অনুমান করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে অথবা পুরাণে মহাভারতে সাধারণ জনতার কোথাও কোনো অবিকৃত চিত্র নেই। অতি সাধারণের মধ্যে যে দু-একজনের কথা খুঁজে পেতে মেলে, দেখা যায়, সে মানুষও উল্লেখ্য হয়েছেন তাঁর দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি এবং তাঁদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের গুণে। তাই বলছি, কুকুরের 'টপ সিক্রেট' অস্তিত্বকে ইচ্ছে করেই গায়েব করা হয়েছে। কাণ্ডটি করেছেন মাতব্বর মহর্ষিরা, পরবর্তী কথক ঠাকুরগণ তারই ওপর চড়িয়ে গেছেন বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ।

বলা হয়েছে, যমরাজ অধার্মিককে দেন কঠোর সাজা আর ধার্মিককে সাহায্য

করেন স্বর্গারোহণে। খুবই সত্য কথা। এ কথার মধ্যে কিছুমাত্র ফাঁক ও ফাঁকি নেই। কেবলমাত্র গোল বাধিয়েছে ঐ দুটি শব্দ, ধার্মিক ও অধার্মিক। শব্দ দুটির উদ্দিষ্টকে বুঝতে পারলেই যমের কর্তব্য কর্মটিও সরল ভাবেই বোধগম্য হয়।

দেবব্রাহ্মণের স্বার্থ সাধনে যাঁরা সহায়তাকারী, মহর্ষি বচনে তাঁরাই ধার্মিক। তাঁদের মধ্যে আবার যিনি শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় এবং দেবতাদের বিশেষ বিশ্বস্ত, গিরিনদী অলকানন্দা পার হয়ে তাঁরাই একমাত্র পৌঁছতে পারতেন স্বর্গে অর্থাৎ সেই নারায়ণ পর্বতের সানুদেশে অথবা সুমেরুর পার্বত্য এলাকায়। সেখানেই তা ছিল দেবলোক, ব্রহ্মলোক। সেখানেই সেই দেবতাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে কেদারনাথ মন্দিরের আদিরূপ; বহিরাগত নারায়ণের উদ্দেশ্যে নির্মিত বদরিকা মন্দিরে নিত্যদিন পূজা চড়িয়ে যাচ্ছেন কেরালার নাম্বুদিরিপাদ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের থেকে মনোনীত পূজারী। এ ব্যবস্থা করে গেছেন স্বয়ং আদিগুরু শঙ্করাচার্যজী। আদিগুরু শঙ্করাচার্য নিজেও ঐ নাম্বুদিরিপাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূজারী নিযুক্ত হচ্ছেন বংশানুক্রমে। চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। একটি বিশেষ শ্রেণীও নয়, একটি বিশেষ বংশের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা। সুব্যবস্থা। তবে রাওয়ালজী বা পূজারীকে জানতে হয় দেবভাষা সংস্কৃত এবং থাকতে হয় অবিবাহিত। যাই হোক বদ্রিবিশালজী যেখানে বদ্রিকাফল খেয়ে জীবনধারণ করেছেন, ব্রহ্মা যেখানে বুদ্ধিজীবীদের সভা ডেকেছেন, দেবতাদের সঙ্গে অপ্সরাগণ যেখানে নৃত্যগীতে সুখাদ্য ও সুপেয় গ্রহণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন গাড়োয়াল হিমালয়ের সেই শীর্ষলোকে পথপ্রহরীকলের প্রধান যমরাজের ছাড়পত্র নিয়েই শুধুমাত্র পৌঁছানো যেত। এ নিয়ম যাঁরা বেনিয়ম করার ফিকির খুঁজতেন, সেই বিধর্মী অধার্মিকদের কঠোর সাজা পেতে হত যমের যন্ত্রণাগারে। সে যে কী দারুণ 'থার্ড ডিগ্রী মেজার' ছিল, নরক সম্পর্কে অনেক গাল-গল্পে তারই ভয়াবহ অত্যাচারের কিছু কিছু ইতিহাস ভয়াল স্মৃতিস্বরূপ থেকে গেছে।

এই পার্থিব স্বর্গ আর পার্থিব নরকের দ্বাররক্ষক দিকপাল ছিলেন গন্ধর্বকুমার যমরাজ। ইনি রক্ষক, ইনিই নিয়ামক এবং ইনিই বাণিজ্যকারী যাত্রীদের কাছ থেকে আদায়ী করের সংগ্রাহক অর্থাৎ কালেক্টর। হ্যাঁ, যাঁরা আসতেন পার্বত্য পথ ভেঙে, যমরাজের কর্মচারীদের কাছে তাঁদের দিতে হত ট্যাক্স। খুবই ন্যায্য দাবি। অশ্বিনীকুমারদের মাধ্যমে সেই দেবযান পিতৃযানের পথ সুগম রাখতে বেশ মোটা খরচ করতে হত দেবতাদের, সুতরাং পথিকদের কাছে কর না নিলে সে খরচ চলবে কেন। ব্যবস্থা সবই ছিল। ছিল চমৎকার আইনকানুন, ব্যবসা-

বাণিজ্য। মাঝে থেকে গেছে শুধু একটু বোঝাবুঝির ভুল। ইতিহাস হয়ে গেছে অলৌকিক দেবকাহিনী, আনুগত্যের নামকরণ করা হয়েছে ভক্তি। করদান প্রথাকে বুঝেছি আমরা নৈবেদ্য নিবেদন রীতি বলে। এবং প্রতিদানকে প্রচার করেছি আশীর্বাদ বা বরদান শব্দে মহিমান্বিত করে। উত্তম স্তাবকের কাজই হল, তার প্রভুকে মহিমান্বিত করা।

ধার্মিক কে, অধার্মিক বলতে কাকে চিহ্নিত করব ? এসব কথা যদি বুঝে থাকি, যদি যমরাজকে একঠেঙে দাঁড়িয়ে থাকা ধর্মবক বা চতুষ্পদ সারমেয় বলে মেনে নিতে মন আর সায় না দেয়, তবে একথাও এবার বোঝা সম্ভব যে 'ধর্ম' কোনো বিশেষ দেবতার নাম নয়, ঐ শব্দটি ছিল হয়ত পদমর্যাদার প্রতীক। দেবকার্যসাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করায় বিদুরও লাভ করেছিলেন ঐ পদবী।

ব্রহ্মাপুরা অথবা গাড়োয়াল হিমালয়ের পথে পথে যমদূত ও কুকুর বাহিনীর মাধ্যমে যে দেবগুপ্তচর বাহিনীর প্রধান, পিতৃলোকাধিপ যম দেবস্বার্থ বা ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পদপরিচয় বা ডেসিগনেশন ছিল, ধর্মরাজ। অন্যদিকে সমতল আর্যাবর্তে রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রস্থল হস্তিনাপুরে বসে যিনি দলবৃদ্ধি করে ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদবৃন্দের মধ্যেই তৈরী করে ফেলেছিলেন একটি শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ, সমতলের সেই দেবরক্ষীবাহিনীর কর্তা বিদুরও 'ধর্ম' পদবী লাভ করেছেন। তবে তিনি ধর্মরাজ নন। ধর্মরাজ খেতাবটি শাসক পদমর্যাদার। বিদুর করতেন চরবৃত্তি। অর্থাৎ মর্যাদায় নিম্ন পদস্থ। পরবর্তীকালে আর্যাবর্তে দেবরাজ্য শাসকের পদটি যখন যুধিষ্ঠির পেলেন তখন তাঁরও পদমর্যাদা হল, ধর্মরাজ।

মহাভারত বলেছেন, কুন্তী 'ধর্মের' সঙ্গে সহবাসের দ্বারা লাভ করেছিলেন পুত্র যুধিষ্ঠিরকে। বলা হয়নি 'ধর্মরাজ' কুন্তীর সঙ্গে উপগত হয়েছেন। হতে পারে পাণ্ডু হয়ত ধর্মরাজ দেবতা যমকেই (সমতলবাসী তো তাঁকেও দেবতা রূপেই বুঝতেন) আহ্বান করতে অনুরোধ করেন। ডাকবার সময় 'ধর্মরাজ' না বলে কুন্তী হয়ত শুধুই 'ধর্ম' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন অথবা বিদুরও যে সমতল আর্যাবর্তে দেবগণ কর্তৃক 'ধর্ম' খেতাবে ভূষিত, কুন্তীর সেই গূঢ়তত্ত্বও জানা থাকতে পারে এবং জেনে বুঝেই হয়ত তিনি তাঁর প্রথম বৈধ সন্তানটিকে নিজের গোপন প্রেমাস্পদ দেবর বিদুরের ঔরসেই লাভ করতে চেয়েছিলে।। যদি তাই-ই হয়ে থাকে, তবুও কুন্তীকে স্বামীবাক্য লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধিনী করা যায় না। সেযুগে স্বামীবাক্যও বেদবাক্য। লঙ্ঘন করলেও মহাপাপ। কিন্তু 'ধর্ম' খেতাবধারী বিদুরকে আবাহন জানিয়ে থাকলেও কুন্তী স্বামীর আদেশই পালন

করেছেন। কেননা পাণ্ডু 'ধর্ম'কেই আহ্বান করতে বলেন। তিনি তো বিশেষভাবে বলে দেননি যে সে ধর্ম কোন্ ব্যক্তি। তিনি হিমালয়স্থ দেবরক্ষী প্রধান যমরাজ, নাকি হস্তিনাপুরের দেবগুপ্তচর বাহিনীর নেতা বিদুর। ওদিকে হয়ত 'ধর্ম'কে আহ্বান জানানোয় দেবশিবির বিদুরকেই প্রেরণ করেন। বিদুরও তো এক দেবজন, দেব স্বার্থের রক্ষক। (দা. ম স. দ্রঃ)

বিদুরই যে যুধিষ্ঠিরের পিতা, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রণয় সম্পর্ক, এই ব্যাপারটি আরও একটু ভালো করে বোঝার জন্য মহাত্মা বিদুরের কার্য-কলাপ নিয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা এখানে সেরে রাখা যাক। পরে প্রসঙ্গত অন্যতর আলোচনাও করা যাবে।

শতশৃঙ্গ পর্বতে যেদিন কুন্তীপুত্র ভীমসেন ভূমিষ্ঠ হলেন, হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে সেই দিনই জন্মগ্রহণ করেন সুযোধন। সুযোধনের সঙ্গে পরিচয় নেই ভারতবাসীর ; কারণ তৎকালীন ভারত, যার নাম, আর্যাবর্ত, সেই ভারতভূমি ও ভারতবাসীর পুরা-ইতিহাস যে ক্ষমতাসীন শাসকদল রচনা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের মহাশত্রু ধৃতরাষ্ট্রতনয় সুযোধনকে সর্বদাই দুরাত্মা দুর্যোধন নামে অভিহিত করে গেছেন। 'সুযোধন' নামটি কচিৎ তাঁর স্নেহশীল অন্ধ পিতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মহা কলরবের শাব্দিক উত্তেজনার তলায় পিতার সেই সস্নেহ সম্ভাষণ অতলে তলিয়ে গেছে। তবু ইতিহাসকে বহু প্রযত্নেও কোনোকালেই হয়ত একেবারে মুছে ফেলা যায় না। অলক্ষ্যে কোথাও কোথাও কেউ ইতিহাসের সত্যকে আঁচল চাপা দিয়ে রক্ষা করেন। উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের অনুকূল আবহাওয়ায় সেই লুকানো ইতিকথার অবগুণ্ঠন আপনি অপসারিত হয়ে যায়। সত্য তখন স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ব্রহ্মণ্যপ্রতাপের হিটলারি দাপট কমে এলে মুখ খোলে মূক মুখগুলি। ইতিহাস কথা কয়ে ওঠে আবার। পুজো সুরু হয় সত্য ঘটনার !

ঠিক সেইভাবেই বিস্মৃত সুযোধনের মন্দিরে বেজে উঠেছিল কাঁসর ঘণ্টা ঢাক বাদ্যি। সুযোধন-ভক্ত-সমাজ দেবব্রাহ্মণ দাপটের আওতা থেকে বার হয়ে সুযোধনের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছেন। মহাভারতে যিনি তাঁর জন্মমুহূর্ত থেকেই দুরাত্মা দুর্যোধন, পরবর্তীকালে তাঁর জন্যও নির্মিত হয়েছে মন্দির। তবে প্রচারের অভাবে সেসব খোঁজ কেউ রাখে না।

সুযোধনকে দুরাত্মা দুর্যোধন বানানোর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যাঁর, তিনি দেব-ব্রাহ্মণ পক্ষের ছদ্মবেশী গুপ্তচর মহাধার্মিক ও অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি হিসেবে প্রচারিত বিদুর মহারাজ। কুরু সভায় বসে এই কুরুবংশনাশী ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতা বিদুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবাধে এবং বার বার দুরাত্মা দুর্যোধন নামে উল্লেখ করতেন।

ধৃতরাষ্ট্র-পোষ্য বিদুরকে নিবারণের কোনো উপায় অন্ধরাজার ছিল না। কারণ মহারাজের প্রখর রাজনীতিজ্ঞান জানতো বিদুরের ছিল ব্রাহ্মণ প্রজাবর্গের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব। রাজমন্ত্রী হ'য়েও তাই বিদুর পারতেন রাজস্বার্থবিরোধী আচরণ করতে। বিদুরের পেছনে ছিল ক্ষমতালোভী এক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী আর ছিল হিমালয়স্থ দেবশিবির। কিন্তু সেই রাজনৈতিক ব্যাখ্যার আগে সুযোধনের জন্মপর্বে বিদুরের আচরণ সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখা দরকার।

গান্ধারী যে সময় গর্ভবতী (ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে) সেই সময় শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে সংবাদ আসে, পাণ্ডুপত্নী রানী কুন্তী তাঁর প্রথম সন্তান যুধিষ্ঠিরকে (কর্ণ কুন্তীর অনূঢ়া অবস্থায় জাত) জন্মদান করেছেন। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে এহেন সংবাদ মোটেও সুখকর ছিল না। বংশে প্রথম জাত হওয়ায় সিংহাসনের ওপর যুধিষ্ঠিরের দাবিই অগ্রগণ্য। সুতরাং গান্ধারীপুত্রের জন্মের আগে কুন্তী-পুত্রের জন্মসংবাদের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ধৃতরাষ্ট্র যদি কুরুরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন আইন-মাফিক, তাহলে আগেই হোক অথবা পরেই হোক গান্ধারীতনয় দুর্যোধনের সিংহাসনলাভে বাধা থাকত না। কিন্তু অন্ধতার জন্য ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি সিংহাসনের প্রাথমিক অধিকার অর্জনে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন পাণ্ডু মহাভারতে এমন প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক রাজদণ্ড থেকে গিয়েছিল শক্ত মানুষ ধৃতরাষ্ট্রেরই করায়ত্ত। তত্রাচ সিংহাসনের অধিকারী হিসেবে ব্রাহ্মণরা পাণ্ডু পুত্রের দাবিকেই অগ্রগণ্য করেছিলেন। দাবি আরও জোরদার হয়েছে যুধিষ্ঠির কুরুবংশে প্রথমজাত পুত্র হওয়ায়। একথা যেমন জানতেন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তেমনিই তা বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধারী। তাই যুধিষ্ঠির জন্মের সংবাদ হস্তিনাপুরে পৌঁছালে, রাগে ক্ষোভে হতাশায় গান্ধারী স্বেচ্ছায় নিজের গর্ভপাত ঘটান। ফলে প্রসূত হয় একটি মাংসপিণ্ড। মহর্ষি ব্যাসদেব সেই মাংসপিণ্ডটির ওপর বিশেষ তরল পদার্থ সিঞ্চন করায় মাংসপিণ্ডটি একশত একভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যাসের নির্দেশে বিশেষ ঘৃতজাতীয় ওষধিসহ বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডগুলিকে একশত একটি স্বতন্ত্র পাত্রে দুবছর লালন করা হলে সেই পরীক্ষা পাত্রগুলি (টেস্ট টিউব) থেকে শতপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। ঠিক একইভাবে 'দ্রোণ' বা পাত্রের মধ্যে বর্ধমান শুক্রকীট থেকে জন্মলাভ করেন দ্রোণাচার্য। এসব ব্যাপার কয়েকদিন আগেও অসম্ভব মনে হতো। সম্ভবত এখন আর তা অলৌকিক কোনো ক্রিয়াকলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারব না আমরা। কেননা অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নলজাতক-এর সৃষ্টি সম্ভবপর করে তুলেছেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম।

ক্ষুব্ধ ও হতাশ গান্ধারীর প্রথমপুত্র কুম্ভজাতক (টেস্ট টিউব চাইল্ড) দুর্যোধনের জন্ম হল যুধিষ্ঠির জন্মের দু বছর পরে। তিনি ভীমের সমবয়স্ক।

পুত্রজন্মের সংবাদে গান্ধারীর মতই দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর স্নেহের সুযোধনের ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তা। তাই পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর রাজসভার সকল প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন সভাগৃহে। একে একে সভায় উপস্থিত হলেন, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ।

সভাসদবৃন্দকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করেছিলেন, "মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন। রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন. তদ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কি না? আপনারা কি বিবেচনা করেন. বলুন।" (আদিপর্ব)

অস্বীকার করার উপায় নেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এমত আচরণ যথার্থ গণতান্ত্রিক। তিনি আপন পুত্রের অধিকার বিধিমত আহূত সভার দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের অগ্রাধিকারকেও নিজেই তাঁর কথারম্ভে মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই সভা যদি সেদিন বিদুর-গোষ্ঠীর প্রভাবে একটি অত্যন্ত অমানবিক ও নিষ্ঠুর রায় দিয়ে না বসত, তাহলে হয়ত খণ্ডিত ইন্দ্রপ্রস্থের নয়, সমগ্র কুরু রাজ্যেরই সম্রাট হতেন যুধিষ্ঠির। কোনো গোল বাধত না। কারণ সে ব্যাপারে পূর্ণ অনুমতি ছিল ক্ষমতাসীন শাসক ধৃতরাষ্ট্রের। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সযত্নে যে প্রশ্নটিকে লালন করে এনেছিলেন সভাগৃহে, যে প্রশ্নটির ওপর সভাসদবৃন্দের সুচিন্তিত অনুমোদন আশা করছিলেন সাগ্রহে ও অপেক্ষারত কাম্পিতবক্ষে, বিদুরচক্রের অপ্রত্যাশিত এক অকল্পনীয় নিষ্ঠুর প্রস্তাবে রাজার সেই সদিচ্ছা শতধারায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ধার্মিক বিদুর রাজপ্রশ্নের উত্তরে সভায় রাখলেন একটি নির্দয় প্রস্তাব। ভবিষ্যতে কে রাজা হবেন, সে তো অনেকদূরের কথা, বিদুর তাঁর শিখাধারী ব্রাহ্মণগোষ্ঠীসহ উত্থাপন করলেন অদ্ভুত দাবি। বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উচিত, এই মুহূর্তে তাঁর প্রথমজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করা। কেননা সন্তানটি বিবিধ দুর্লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তার জন্মমুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সমূহ অশুভ চিহ্ন।

কী সেই দুর্লক্ষণ?

মহাভারত বলেছেন, "সে সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল ; দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল।"

হতে পারে দুর্যোধন-জন্মকালে প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রাঘাত হয়েছিল। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা। কৃষ্ণজন্মের রাত্রেও হয়েছে অজস্র ধারায় বারিপাত। কারও জন্মমুহূর্তে ভূকম্পন হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকে বগলদাবা করে কেউ কখনো প্রকৃতির রাজত্বে জন্মগ্রহণ করতে পারে না।

দুর্যোধনের জন্ম হয়েছিল চৈত্র মাসের কাকভোরে (রাত্রি ছয় ঘটিকায়)। চৈত্রে 'বায়ু প্রবলবেগে বহিতে' সুরু করলে তার দায়দায়িত্ব কোনো মূঢ় ব্যক্তি যে ভূমিষ্ঠ শিশুর ওপর আরোপ করতে পারেন, মহামান্য ধর্ম, বিদুর মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা ছাড়া তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু দুর্যোধনের আপন কাকা এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বিদুর সেদিন নির্লজ্জের মত ঐ অশ্রদ্ধেয় ব্যাখ্যাই হাজির করেছিলেন এবং তাঁর হাত-তোলা ব্রাহ্মণ সমর্থকবৃন্দের উচ্চকিত সমর্থনে সভাগৃহটি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দেবস্তাবক ব্রাহ্মণনেতা বিদুরের মুখে কোনো আগল ছিল না। মন্ত্রণাসভায় ভোটের জোরে তিনি প্রস্তাব রাখলেন, অমন দুর্লক্ষণ নিয়ে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে সে পাপাত্মা, দুরাত্মা। যদি ধৃতরাষ্ট্র নিজের ও তাঁর বংশের মঙ্গল চান, তবে যেন সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর সদ্যজাত পুত্রটিকে পরিত্যাগ করেন।

একথায় আমরা বুঝতে পারলাম কী গভীর এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আগে থেকেই তৈরী রেখেছিলেন ষড়যন্ত্রী বিদুর। সততার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে তলে তলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদবৃন্দকে নিজের দলভুক্ত করে নিয়েছেন। তাই দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন শোনামাত্রই ব্রাহ্মণরা একস্বরে দুর্যোধনের নির্বাসন দাবি করে বসেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয়নি, উত্তর যেন তৈরীই ছিল, এ বিষয়ে এবং এতবড় একটি বিষয়ে কোথাও কোনো বিতর্ক বা প্রতিবাদও উত্থাপিত হল না। কেউ মুখ খুললেন না বিদুরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এমন কি স্বয়ং কুরুপিতামহ ভীষ্মও নীরব শ্রোতামাত্র। অতবড় সভা-গৃহে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন বান্ধবহীন একান্ত একাকী। বিদুর-বাক্যের পিঠে বিতর্কের সুযোগ ছিল না। তাই রাজসভায় বসে হেঁট মুণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রকে শুনতে হল, "রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ কর্তব্য; রাখিলে মহান অনর্থ ঘটিবে।

।

মহীপাল ! যদি বংশরক্ষা করিবার বাসনা থাকে তবে এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন ।"

এই সভাপর্বে খুব সহজেই নেপথ্য চক্রান্তটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ বাক্য তো রাজহিতার্থে মন্ত্রণা নয়, ঐ বাক্যে যে বিদ্বেষ ও শাসানি আছে, তা বক্তার ক্রুর উদ্দেশ্যকে কোনক্রমেই লুকিয়ে রাখতে পারে না। কুরু সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে যুধিষ্ঠিরের দাবি নিষ্কণ্টক করাই ষড়যন্ত্রীদের অভিপ্রায় ছিল। বয়স্ক কিন্তু নির্বিবেক ঐ শিখাধারী রাজনীতিবিদ্‌রা স্বার্থের প্রশ্নে কতদূর হীন-মতি ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, সমবেতভাবে তাঁরা অপাপবিদ্ধ একটি সদ্যজাত শিশুকে 'দুরাত্মা' বলে অভিহিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি।

কোনো মানুষ দুরাত্মা বা পুণ্যাত্মা হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মানবসন্তান প্রত্যেকেই তাদের জন্মমুহূর্তে নিষ্পাপ আদম আর ইভ। নিরাবরণ দেহমাত্র সম্বল করে যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, যার বোধ বুদ্ধি দৃষ্টি, কোনো কিছুরই বিকাশ ঘটেনি, যে আত্মপর জ্ঞানবর্জিত, কেবলমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া যার তখনও পর্যন্ত এই পৃথ্বীমায়ের কাছে অপর কোনো দাবি নেই, সে কেমন করে দুরাত্মা অথবা পুণ্যাত্মা হয় ! যে আর্যসভ্যতা জগৎবাসীর কাছে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছে, মা হিংসী অথবা অপরকে হিংসা করো না বলে, সেই আর্যপ্রজ্ঞা একটি শিশুর প্রতি অমন উৎকট বিদ্বেষ যখন প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে শিশুটি থেকে ভবিষ্যতে আর্য এস্‌ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কা ছিল, না হলে 'জন্মমাত্রেন কিং কশ্চিৎ হন্যতে পূজাতে ক্বচিৎ। ব্যবহারং পরিজ্ঞেয় হন্য অথবা পূজ্য ভবেৎ' এই কথার অন্যথা ঘটল কেন দুর্যোধন জন্মের ব্যাপারে ? বস্তুত জন্মের লক্ষণ বিচারের দ্বারা তো কেউ হন্য অথবা পূজ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন না। উত্তরজীবনে তাঁর কার্যাবলী, পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও প্রতিবেশীর সঙ্গে স্বার্থ সংঘর্ষেই উপস্থিত হয় সমস্যা। তখন শত্রুর দ্বারা তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা ও মিত্রপক্ষের দ্বারা পূজাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে। তবে দুর্যোধনের বেলায় অন্যথা ঘটল কেন ? তার কারণ কুটিল রাজনীতি। তার কারণ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন শক্ত মানুষ। অনমনীয়। দেবদ্বিজের প্রতি তিনি তাঁর স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেননি। তাই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রও ছিলেন দেবদ্বিজের অপসন্দ্।

নেপথ্যীরা যে সক্রিয়, সম্ভবত গুপ্তচর মুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পুত্রজন্মের অব্যবহিত পরেই তড়িঘড়ি একটা সভা আহ্বান করে সভার দ্বারা ভবিষ্যতে দুর্যোধনের সিংহাসন লাভের ব্যাপারটা

অনুমোদন করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, বিদুরচক্র এমন একটি প্রস্তাব সম্পর্কে নিশ্চয় আগেভাগে তৈরী থাকবেন না আর সেই সুযোগে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পর দুর্যোধনের দাবিটির পক্ষে সভার অনুমোদন আদায় করে নিতে পারবেন।

কিন্তু ভুল ছিল হিসেবে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তখনো জানতেন না যে ব্রহ্মলোকের গোপন পার্বত্য সভায় ইতিপূর্বেই হস্তিনাপুরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে ব্রহ্মাস্ত্র অনুসারেই জন্মগ্রহণ করেছেন যুধিষ্ঠির। সুতরাং ঘোর কাল ঘনিয়ে এসেছে।

বিদুরের বাক্যে, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, কোনোরকম সুচিন্তিত মন্ত্রণা ছিল না, ছিল সুস্পষ্ট চোখ-রাঙানি। বিদুর সদলে দাবি তুলেছিলেন দুর্যোধনের নির্বাসনের জন্য এবং রাজসভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমতাসীন রাজনকে শাসিয়ে বলেছিলেন, যদি নিজের ও নিজের বংশের মঙ্গল চান, তবে পরিত্যাগ করুন আপনার বংশজকে। না হলে নির্বংশ হবেন! যুধিষ্ঠিরকে একটি নিষ্কণ্টক সিংহাসন উপহার দেওয়ার জন্য বিদুর আমরণ পরিশ্রম করেছেন। প্রথম পাণ্ডবের প্রতি তাঁর স্নেহ পিতৃস্নেহেরই সমতুল্য। তাঁকে আর্যাবর্তের শাসক বানানোই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম।

বিদুরকুন্তীর ঘনিষ্ঠতার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। ভীমসেন নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে কুন্তীদেবী তাঁর ক্ষত্তা দেবর বিদুরকে যে গোপন পরামর্শে আহ্বান করেছিলেন সে কথা অবশ্য উপযুক্ত অবসরে বলব। এখানে কুন্তীর পরিচর্যায় শশব্যস্ত বিদুরের একটি ক্ষণিক চিত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কুরুকিশোররা দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যায় সমুচিত শিক্ষা লাভ করলে একটি কৃত্রিম যুদ্ধক্রীডাঙ্গন প্রস্তুত করে রাজ্যবাসীর কাছে রাজকুমারদের বীরত্ব প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। তৈরী হয়েছিল প্রশস্ত শস্ত্র-ক্রীড়াভূমি। দ্রোণাচার্য নিজে সেই রাজকীয় ক্রীড়াভূমির সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। বিদুরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল দর্শক গ্যালারি। "রাজ-শিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র-শস্ত্র-পরিপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ-সকল নির্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।" (আদি)।

এখানে জনসভা, দর্শকবৃন্দ এবং আসর অনুষ্ঠানের বর্ণনা হুবহু একটি ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের আকারে লিখিত। শুধু কাল্পনিক কাব্য কথায় এমন খুঁটিনাটি ডিটেলস রচনা তৎকালে নিশ্চয় সম্ভব ছিল না। জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমি যাঁরা না দেখেছেন আজকের তেমন কোনো প্রতিবেদন রচনাকারীও কি পারেন সেই ক্রীড়াঙ্গনের কথাচিত্র সৃষ্টি করতে? বর্ণনার বাস্তবতা তাই ঘটনার বাস্তবতাকেও প্রমাণ করে।

রঙ্গভূমে রাজকুমারদের বলবিক্রম প্রদর্শনীর বর্ণনাও ঐ একই কথার পুনরুক্তি করে। কোথাও বাড়তি বর্ণনা নেই, আবার কোথাও প্রয়োজনীয় বাক্যটিকে অসাবধানতাবশত ছেড়ে যাওয়াও হয়নি। অনুষ্ঠানটির সম্পূর্ণ অথচ একটি অতি-সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট চমৎকারভাবে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। এই অংশ মহাকবির সাংবাদিক দক্ষতার এক অপূর্ব নজির; যদিও তাও অন্যতম নিদর্শনমাত্র। কেননা, মহাভারতে ডিটেলের ব্যবহার প্রচুর এবং তা ঘটনাবলীর বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন।

যাই হোক, এই রঙ্গভূমির সকল ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করল মহাবীর কর্ণের অনাহূত অকস্মাৎ অনধিকার প্রবেশ।

রঙ্গভূমিতে কর্ণের প্রবেশ বর্ণনা করে কথক বৈশম্পায়ন বলেছেন, "তদীয় (কর্ণের) মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত (কালীপ্রসন্ন মহাভারতের পাদটীকায় 'সহজাত' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, যা 'আজন্ম ধৃত—জন্মকাল হইতে পরিহিত'। অর্থাৎ জন্মকালে দেহমধ্যে সংযুক্ত নয়) কবচ (বর্ম) ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (লক্ষণীয়, এখানেও 'ঔরস' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয়নি, 'যোগবল')।…দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি সূর্য, চন্দ্র ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি (অসীমভক্তি) সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে প্রণাম করিলেন।"

কর্ণ শুধু বীর নন, সুসভ্য বিনীত ও গুরুজনে প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল। কর্ণের আচরণে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। এমন একটি আকর্ষণীয় তরুণের উচ্চকিত প্রবেশে দর্শকবৃন্দের মধ্যেও বিস্মিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তাই, "রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল এবং ইনি কে, ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইল।"

পরিচয় কর্ণ নিজেই দিলেন। যুদ্ধ ক্রীড়াচ্ছলে অর্জুন যে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন কর্ণও অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত অস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের অবাক করলেন। অর্জুনদীপ্তি কর্ণতেজে ম্লান হয়ে গেল।

এই অবমাননা অস্থির করে তুলল অর্জুনকে। অর্জুন স্বপ্ন দেখেন তিনিই হবেন জগতের সেরা বীর। বীরশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সাধনায় কখনো ক্লান্তি ছিল না তাঁর। তবু অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করেও অর্জুন কারো কারো থেকে ঢের পিছিয়ে ছিলেন। নিষাদরাজপুত্র একলব্যের একক নির্জন সাধনাও ছিল অর্জুন অপেক্ষা অনেক বেশি সার্থক। তারই সন্ধান পেয়ে একাকী একলব্যকে গুরু দ্রোণসহ আটক করে প্রভুত্ববিলাসী নির্মম অর্জুন কেটে এনেছিলেন একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

কর্ণের বীরত্বকে সসম্মানে অভিনন্দিত করতে পেরেছিলেন শুধু দুর্যোধন। ঐ রঙ্গভূমিতেই তিনি বন্ধুতা পাশে আলিঙ্গন করে নিলেন অজ্ঞাতকুলশীল সেই তরুণ বীরকে। কোনো উচ্চবর্ণের অহঙ্কার অথবা রাজকীয় সংস্কার এই সখ্যের পথে

প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল না। রাজাসন থেকে নেমে এসে দুর্যোধন তাঁর দু হাত প্রসারিত করে কর্ণকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

অর্জুন কিন্তু কিছুমাত্র সৌজন্য প্রকাশেরও প্রয়োজন অনুভব করেননি। একটিও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেননি সেই বীর তরুণ আগন্তুকের প্রতি। রাগে ও হিংসায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে কর্ণকে বললেন, "···যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব।"

সেই উদ্ধত বাক্যের প্রত্যুত্তরে কর্ণের প্রতিসম্ভাষণ কিন্তু অনেক বেশি মার্জিত সংযত ও বুদ্ধিদীপ্ত। কেবলমাত্র বাক্যযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে কর্ণ ও দুর্যোধনের যুক্তিপূর্ণ সংযমী বক্তব্যের কাছে অর্জুন তথা দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকে অবশ্যই পরাজিত হতে হত। শতশৃঙ্গ পর্বতে ঋষিকুলের মধ্যে কৈশোরকাল অতিবাহিত করলেও ঐ দুই পাণ্ডব যথেষ্ট সংযত আচরণ করার শিক্ষা পাননি, মহাভারতে এও এক চমকপ্রদ ঘটনা। হয়ত সেই কুন্তিভোজবাক্যই এ ক্ষেত্রে সমান প্রয়োগযোগ্য। দুর্বাসার আগমনে কম্পিত-ওষ্ঠ রাজা কুন্তিভোজ রাজকুমারী কুন্তীকে বলেছিলেন, রাজগৃহে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরা সহজেই কোপনস্বভাব। আগমন ঘটেছে সেই মূর্তিমান কোপের। অর্জুন ভীম অমন কোপন স্বভাব হয়ে উঠেছিলেন হয়ত কতিপয় পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে শৈশবকাল কাটিয়ে।

যাই হোক, অর্জুনের কথার বিষ আক্রমণোদ্যত হলেও কর্ণ কিন্তু ধীরভাবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যই রাখলেন। বললেন, "হে অর্জুন! দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত, সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোনো প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্মও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি তাবৎ আর বিফল স্বরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।" না, অর্জুনের মত সভাস্থল ও পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিবর্জিত হয়ে কর্ণ একটিও শ্রুতিকটু দুর্বাক্য উচ্চারণ করেননি। বলেননি, তোকে নরকে পাঠাব। উত্তেজনার মুহূর্তেও উপস্থিত ভূপালগণ এবং গুরুজনদের বিস্মৃত হননি তিনি। সমঝে দিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি "সাধারণ্যে অধিকৃত" সেখানে কারও রাজন্য প্রতাপ চলবে না।

অথচ পাঠক নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং স্বীকার করবেন যে মহাভারতের কবি কর্ণের প্রতি পক্ষপাত করে তাঁর মুখে ঐ মার্জিত বচন বসিয়ে দেননি। কর্ণ তো নিম্ন শ্রেণীজ হিসেবেই পরিচিত। তিনি দেবজনগোষ্ঠীর পোষ্য

নন, দেব-বিরোধী দুর্যোধনের মিত্রপক্ষ। তাহলে? তাহলে সেদিন কর্ণার্জুনে যে বাক্যবিনিময় হয়েছিল সৎ প্রতিবেদন প্রদানকারী কবি নিশ্চয় তাই হুবহু পুঁথিবদ্ধ করে গেছেন। পরবর্তী ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরাও এই বাক্যযুদ্ধের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈষম্য স্বপ্রকাশ, হয়ত তার ফলাফলের কথা চিন্তাও করেননি। করলে কর্ণের কথা অর্জুনের ঠোঁটে নিশ্চয় বসিয়ে দিতেন তাঁরা।

কর্ণার্জুনে এইভাবে প্রিয় সম্ভাষণের পর পরস্পরের শরযুদ্ধ আর ঠেকানো গেল না। ক্রীড়াস্থলে বেধে গেল সত্যকার একটি দ্বন্দ্বসমর।

"যেদিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্তরাষ্ট্রবা, যেদিকে অর্জুন, দ্রোণ কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি সেদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল।" (ঐ)।

সেদিন সেই দ্বৈরথ যুদ্ধের, প্রথম কর্ণার্জুন যুদ্ধের, ফলাফল যে অর্জুনের অনুকূলগামী হত না, তা প্রায় সভাস্থ সকলেই টের পেয়েছিলেন। মহাভারতীয় তথ্যাবলী আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে আমরাও বুঝতে পারি, দূর অতীতের সেই রঙ্গভূমিতে অর্জুনের পরাজয়ই ছিল অনিবার্য, কারণ সেপর্যন্ত অর্জুন হিমালয়স্থ দেবশিবিরের সমরশিক্ষায় ও অস্ত্রবলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন নি।

এই নিদারুণ ফলাফলের কথা বুঝতে পেরেছিলেন উপস্থিত রথী মহারথীরা। এমনই আশঙ্কা ছিল দর্শকবৃন্দের। ঘটনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে তাই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন কুন্তীদেবী।

কুন্তী ছাড়া সেখানে আর কে-ই বা জানেন সেই গোপন কাহিনী। কর্ণ যে কুন্তীরই প্রথম সন্তান। কিন্তু সেই কলঙ্ককথা প্রকাশ করার উপায় নেই কুরুকুলবধূর। হয়ত তার প্রয়োজনও নেই। কুন্তী অর্জুনকে নিয়েই সুখী। অর্জুনকেই তিনি লালন করেছেন। অর্জুনই তাঁর বৈধ সন্তান।

কেবলমাত্র জৈবিক নাড়ির টান বলে কোনো বিশেষ মজ্জাগত অনুভূতি আছে কি মানুষের? রক্তের টান কি কথার কথা নয়? অহং আর স্বার্থবোধ থেকেই তো আসে মানুষের সন্তান-প্রীতি। কোনো শিশুর জন্মমুহূর্তে তার মায়ের অজ্ঞাতে শিশু সন্তানটিকে বদলে দিলে মা 'আমার সন্তান' এই অহংবোধ থেকে যাকে মানুষ করে তুলবেন, সমস্ত বাৎসল্য কি তারই ওপর বর্ষিত হবে না? মানুষের জাত বে-জাত তো ঐ অহং-কার থেকেই সৃষ্ট। জন্মমুহূর্তে কোনো শিশুর জাত বে-জাত, ধর্মাধর্ম বা বিশিষ্ট পরিচয় নেই। পরিবেশ, পারিবারিক আবহাওয়া, জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীর যে আধারে শিশুটিকে রেখে দেওয়া হবে সে

সেই আধারেরই ছাপ ও পরিচয় নিয়ে বড় হয়ে উঠবে, আত্মীয়তা গড়ে উঠবে তাদেরই সঙ্গে এবং যে মা নিজের দেহনিষিক্ত রসধারা পান করিয়ে শিশুটিকে বড় করে তুলবেন সেই মায়ের অহংবোধ পালিত-শিশুর সঙ্গেই ঐকান্তিকতা অনুভব করবে। এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। রক্তের টান নয়, স্বার্থের সম্পর্কই এক্ষেত্রেও মূল কথা। সেই অমোঘ নিয়মের বশবর্তী কুন্তীও। টান তাঁর অর্জুনের ওপর সমধিক হতে বাধ্য, কেননা কর্ণের সঙ্গে নয়, অর্জুনের সঙ্গেই কুন্তীর জীবন জড়িয়ে গেছে। রক্তের টানই যদি হ'ত স্নেহের উৎসস্থল, তাহলে কুন্তী এই মুহূর্তে শুধুমাত্র অর্জুনের মঙ্গল-চিন্তায় কাতর ও মূর্ছিত হয়ে পড়তেন না। তাঁর জৈব সংস্কার থেকেই রক্ষা করতে উদ্যত হতেন সমানভাবে দুই ছেলেকেই।

এ বিষয়ে কয়েকটি মহাজন-উক্তির উদ্ধার এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে রচিত তাঁর 'সাংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার ডঃ দত্তের মন্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এই 'রক্তের টান' বিষয়ক আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকে সংস্কৃত করার চেষ্টা করেছেন।

জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রচলিত বুর্জোয়া ধারণার সমালোচনা করে বলা হয়েছে, "অমুক জাতির (race) মানসিক ধর্ম এইরূপ—এ ধরনের কথা বলার মানে—মানবচিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন প্রথার প্রাধান্যকে অস্বীকার করা। স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরাই এইরূপ 'জাতি ধর্মের' উপর জোর দেন ;—সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রভুজাতি' আর শোষিতরা 'দাসজাতি', সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানা ভাবে প্রমাণ করা একটা নিয়ম। হিটলারী 'রক্তের মাহাত্ম্যবাদ' বা 'ব্লাড থিওরি' উহারই চরম রূপমাত্র।"

কর্ণার্জুন সাক্ষাৎকারের প্রথম দৃশ্যেই ধরা পড়ে গেছে সেই সাম্রাজ্যবাদী চতুরালি। কর্ণ রঙ্গভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করুন, পরাজিত হন অর্জুন, এমন অঘটন নিবারণের জন্য তাই সশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সবাই। কুন্তী মূর্ছা গেছেন একদিকে অর্জুনের জীবনাশঙ্কা করে, অপর দিকে তাঁরই নিজের জীবনের এক গোপন রহস্যের হঠাৎ আক্রমণের রক্তোচ্ছ্বাসে। রক্তের চাপবৃদ্ধিতে ব্লাড প্রেসারের রোগী যেমন মূর্ছা যায়, কুন্তীর অসুস্থতাও তেমনি।

কিন্তু কর্ণের প্রতাপ লক্ষ্য করে এস্ট্যাবলিশমেণ্টের রক্ষকরা, উচ্চবর্গীয় স্বার্থের পরিপোষকবৃন্দ বিচলিত হয়ে উঠেছেন গূঢ় রাজনৈতিক কারণে। বিচলিত

হয়েছেন ধার্মিক বিদুর, পরম বিবেচক পিতামহ ভীষ্ম, এস্ট্যাবলিশমেণ্টের রক্ষক শস্ত্রবীর দ্রোণাচার্য এবং বুদ্ধিজীবী কৃপ।

বিদুরের উদ্বেগ আবার কুন্তীকে কেন্দ্র করেও। উনি রাজাদেশ ও রাজকার্য ফেলে মহিলামহলে মহিষীদের জন্য নির্মিত মঞ্চেই তখন উপস্থিত ছিলেন। কেননা কুন্তী মূর্ছিতা হয়েছেন শোনামাত্রই বিদুরকে আমরা তাঁর পাশে পরিচর্যারত অবস্থায় দেখতে পাই। অথচ এই অনুষ্ঠানে বিদুরের থাকার কথা অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাশে। ঘটনাবলী 'রিলে' করবার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল। 'কুরুক্ষেত্রে'র আগে কর্ণার্জুনের এই 'মিনিয়েচার' যুদ্ধে ধারাবিবরণী শোনানোর জন্য কোন সঞ্জয়ের নিযুক্তি হয় নি: মহামন্ত্রী বিদুরের ওপরই অর্পিত ছিল সেদিনকার সেই দায়িত্ব।

কিন্তু আমরা বিদুরকে কোথায় দেখতে পেলাম ?

মহাভারত বলছেন, "এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ দুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন। সর্বধর্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মূর্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জলসেচন দ্বারা পরিচর্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন।" (আদি)।

বড় ভালোমানুষ বিদুর সর্ববিষয়ে বড়ই তৎপর। কৌপীন ধারণ করলেই মানুষটি সদাশিব এবং প্রচলিত অর্থে মহাত্মা ও ধর্মভাবে একটি নিঃস্বার্থ সরলীকৃত পুরুষ, এ ধারণা ভারতবাসীর সংস্কারগত। ধারণাটি যে বিদুর-চাণক্যের যুগ থেকেই কতকালের ভ্রান্তি বহন করে করে ন্যুব্জপৃষ্ঠ হয়ে গেছে, না বর্তমান, না অতীত, কোনো কালেই সম্যক দৃষ্টিপাত করে আমরা তা বোঝবার চেষ্টা করি নি। বিদুরকে বুঝলে আমাদের সেই আবহমানের ভ্রান্তি, যার ঋণের বোঝা আজও আমরা সুদে আসলে গুণে যাচ্ছি, তা পরিষ্কার হবে। অতঃপর সেকথাই বোঝবার চেষ্টা করব।

কুন্তীর সমস্ত বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান বিদুর। কুন্তীর যত সলাপরামর্শ সবই ঐ ক্ষত্তা দেবর বিদুরের সঙ্গে। রাজকার্যের নেপথ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মহামন্ত্রীর সঙ্গে রাজকুলবধূ কুন্তীর এই যে অতি গোপন একটি নিবিড় যোগসূত্র, এ কী শুধুই বিদুরের মহত্ত্ব এবং কুন্তীর অসহায়তার দুই উপান্তে মহৎ মানবিকতার সংযোগ মাত্র? শুধু দয়ার্দ্র ধর্মভাবই কি বিদুরকে অসহায়া কুন্তীর রক্ষণাবেক্ষণে অমন সজাগ সতর্ক রেখেছিল ?

মহাভারতের আদ্যন্ত পাঠের পর মনে হয়: না, এ সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন হয়েছিল আরও নিবিড় কোনো মধুর প্রণয়পাশে। তাই বিদুর অমন সর্বত্যাগী,

সংসারবিবাগী। নিজের জন্য বিদুরের নেই কোনো বিশেষ চাহিদা, নেই কোনো রাজনৈতিক উচ্চাশা। বিদুরকে আমরা ভাবতে দেখি নি নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা। সংগ্রহ করতে দেখি নি কিছুই। আজীবন তিনি শুধু কুন্তী ও কুন্তীপুত্রদের নয়নের মণি করে তাঁর সকল ক্রিয়াকর্মকে একদেশদর্শী করে তুলেছিলেন। বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। তাঁর যত উদ্বেগ, যত উৎকণ্ঠা, যত ব্যাকুলতা সবই ছিল সেই পরমাসুন্দরী ভ্রাতৃবধূ কুন্তীর জন্যই। শুধু কর্তব্যের তাড়না তাঁর জীবনকে অমনভাবে তন্ময় করে নি, এই তন্ময়তা এসেছিল নিবিড় আসক্তি এবং প্রণয়ভাব থেকেই। মাফ করবেন, যদি বলি, এ জাতীয় তন্ময়তা অনেক বেশি তীব্রতা লাভ করে স্বাভাবিক অপেক্ষা অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রেই। আর তেমন অবস্থায় যা হয়, চতুর রমণী তাঁর স্তাবক অবৈধ প্রেমিককে ব্যবহার করেন, যতটুকু দেন তার চেয়ে গুছিয়ে নেন ঢের বেশি। বিদুরের প্রণয়পূজার প্রত্যুত্তরে কুন্তীরও ছিল ঠিক ঐ রকমই প্রতিক্রিয়া। একই প্রতিক্রিয়া দেখি ভীমের প্রতি দ্রৌপদীরও। বিদুরকে কুন্তী ব্যবহার করেছেন নিঃসঙ্কোচে একটি প্রতিষ্ঠিত দাবির উচ্চাসন থেকে। প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছেন, সাহায্য নিয়েছেন, গুছিয়েছেন আপন স্বার্থ। কোনোদিন বিদুর বা বিদুর-পরিবার সম্পর্কে কুন্তীকে কোনো কুশল প্রশ্ন করতে শোনা যায় নি। এমন অদ্ভুত সম্পর্ক আমাদের বিস্মিত ও প্রশ্নাতুর করে না কি? অথচ সে প্রশ্ন উত্থাপনের মত সাহস সঞ্চার করতে পারি নি কেউ। সংস্কারবদ্ধ দৃষ্টিতে ঐ বিপুল মহাভারত কাব্যের দিকে তাকালে ওসব প্রশ্ন তোলার কথাই ওঠে না। কিন্তু যখন সেই "অমৃতসমান পবিত্রকথা"কে আমাদের এক বিস্মৃত যুগের পুরা-ইতিবৃত্ত বলে গণনা করে তার পুনর্মূল্যায়নে বসি, তখন অমন অনেক কথাই ভিড় করে সামনে এসে দাঁড়ায়। ব্যাখ্যা চায়। মহাভারতের চরিতাবলী স্বাভাবিক মানুষের সকল গুণাগুণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে হাজির হয়। মুছে যাওয়া কালের মন্দীভূত দীপশিখা এ যুগের তীব্র মঞ্চালোকের ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিদুরের প্রণয়যাতনা এবং কুন্তীর আত্মপরায়ণতা আর লুকানো থাকে না, ধরা পড়ে যায় সবার কাছে।

মহামন্ত্রী বিদুরের যখন থাকার কথা অন্ধ রাজন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে পাশে, তখন তাঁকে আমরা 'বিমুগ্ধ' কুন্তীর শুশ্রূষায় শশব্যস্ত দেখতে পাই!

রাজমহিষীদের জন্য নির্মিত মণ্ডপটি মহারাজের মঞ্চের পাশাপাশি বসানো হয়ে থাকলেও এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে যেতে বিদুরের তো সময় অবশ্যই দরকার হত। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে যিনি ধারাবিবরণী শোনাচ্ছেন, কুন্তী 'বিমুগ্ধা' হওয়া মাত্রই সেই বিদুরকে আমরা কুন্তীর পাশে দেখতে পেলাম কী করে?

তবে কি ধরে নেব, রাজকার্য ফাঁকি দিয়ে বিদুর তখন ঘুর ঘুর করছিলেন মনোহারিণী কুন্তীর আশেপাশে ? ভাবতে খারাপ লাগে, কিন্তু মহাভারত এ ভাবেই ভাবিয়েছেন, সামান্য আমি নিরুপায়। আমাকে বুঝতে হচ্ছে, পরম সাধু, প্রায় ব্রহ্মচারীসমান স্বয়ং ধর্ম বিদুরের অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণীয় স্থান ছিল মহিলা-মঞ্চটি। অবশ্য সকল মহিলার প্রতি বিদুরের যে সমান দৃষ্টি ছিল না তাও বুঝি। গান্ধারী অথবা বিদুরপত্নীর কথা তাই বোধ হয় একবারও উচ্চারিত হয় নি এই পর্বে।

বিদুর কুন্তীর মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। সান্ত্বনা দিয়ে এসময় তিনি কী বলেছিলেন, মহাভারতকার সে সব অন্তরঙ্গ কথা অবশ্য পাঁচকান করেন নি। তবে বিদুরের সান্ত্বনা-বাক্যের পরেই ক্রীড়াঙ্গনে এস্টাবলিশমেন্টের নতুন খেলা সুরু হয়ে গেছল। বিদুরের আশ্বাসবাক্য কার্যে পরিণত করার জন্য হঠাৎ সেই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাজস্বার্থরক্ষক বুদ্ধিজীবী কৃপাচার্য।

অর্জুন ও কর্ণ তখন সম্মুখ সমরে উপস্থিত। দুজনেই প্রস্তুত। এমন সময় অঙ্গনে নেমে পড়লেন কৃপাচার্য।

কর্ণকে বললেন কৃপ: “কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং কোন রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না; কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।”

চমৎকার যুক্তি! সংগ্রামেও জাতপাঁতের বিচার! বিদুর-কৃপাচার্যের এসটাবলিশমেণ্ট যদি নিম্নজাতির দ্বারা আক্রান্ত হত, তবে কি ঐ যুক্তিবলেই শত্রুপক্ষকে থমকে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হত? শত্রুপক্ষ কি কৃপের বক্তৃতার পর ব্রাহ্মণের পদলেহন করে মানে মানে প্রত্যাবর্তন করতেন? এসব বুজরুকী কেবল যতক্ষণ ক্ষমতায় ততক্ষণই শোভা পায়। আক্রান্ত হলে সূতপুত্র কর্ণকেই কিন্তু এঁরা বানান সেনাপতি। পৈতেধারী দ্রোণ কৃপ একই শিবিরে দাঁড়িয়ে অবাধে লড়াই করেন; আবার কুন্তীদেবী ছুটে যান তাঁর স্নেহের দুলাল অর্জুনের প্রাণভিক্ষা করতে সেই সূতবংশজাত বলে সর্বত্র পরিচিত কর্ণের কাছেই। নির্লজ্জ মিথ্যাচারের ওপর এ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সর্বকালের ক্ষমতাধীশ শাসন শোষণ ও তার স্বপক্ষে ব্যাখ্যা।

কর্ণের প্রতিপালক পিতা সূত অধিরথ কুরুরাজগৃহে অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধিরথপুত্র হিসেবে কর্ণকে নিশ্চয় কেউ কেউ চিনতেনও এবং কর্ণের শৌর্য-বীর্যের কথাও রাজপরিবারে নিশ্চয় অজ্ঞাত ছিল না। ক্রীড়াঙ্গনে কর্ণ যখন প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পরিচয় প্রদান করে মহাভারতে বলা হয়েছে, "তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না।" হতে পারে, উত্তরজীবনে কর্ণ হয়ে ওঠেন যশোবন্ত, বৈশম্পায়ন হয়ত সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন ; তবু যে কর্ণকে দেখে বিপদ গণনা করেছেন বিদুর কৃপরা তিনি একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি একথাও তো ভাবা যায় না। সুতরাং কর্ণের পরিচয় অল্পবিস্তর জানাই ছিল। তবু বুদ্ধিমানের চাতুরী কর্ণকে না চেনার ভান করে সভামধ্যে তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করতে বলল। অর্থাৎ কর্ণ যে তাঁর পিতৃপরিচয় সূত্রে অযোগ্য ব্যক্তি, কৃপর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে সেটাই সভায় প্রচার করা, তারপর ('দূর হ' ছোটলোক, তুই অচ্ছুত, তোকে শরাগ্রভাগ দিয়েও ছোঁব না' জাতীয়) একটা ওজর তুলে সমস্ত সমরায়োজন ব্যর্থ করে দেওয়া। এ ভাবেই তো সমাজশিরোমণিরা নিজেদের গায়ের মোটা চামড়া সর্বদা বাঁচিয়ে এসেছেন। আজও কোথাও উপবীত কোথাও তকমা ধারণ করে ধুকপুকে সেই প্রথাটিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

কৃপর কথায় সমস্ত ক্রীড়াভূমি স্তব্ধ ও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ক্ষমতাধীশদের ব্যবস্থা ছিল এমনই পাকাপোক্ত যে, ক্রীড়ামোদ-উপভোগকারী বহু নিম্নশ্রেণীর দর্শক সেদিন সেই অপমান হেঁটমুণ্ডে মেনে নিয়েছিলেন। কর্ণ নিজেও পারেন নি অমানবিক সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে। অথচ বস্তুত লড়াই হলে অকম্পিত কর্ণ পারতেন যে কোনো বীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে। কিশোর বয়সেও কর্ণের ছিল অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ও আত্মবিশ্বাস। ছিল সবার সম্মুখে সত্যকে, তা সে সত্য যত কঠোরই হোক না কেন, অবাধে স্বীকার করার সৎসাহস।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তখনই কর্ণ কোনো জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর পালক পিতা অধিরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে কাঁপতে কাঁপতে রঙ্গভূমিতে এসে প্রবেশ করলেন, সেই মুহূর্তে কর্ণ সভাস্থলে অবনত মস্তকে পিতাকে প্রণাম করে জানিয়ে দিলেন, আমি কর্ণ, আমি সূতবংশজ, আমি সামান্য অধিরথ-পুত্র ; কিন্তু এজন্য আমি গর্বিত, কিছুমাত্র লজ্জিত নই। জানি না, তাঁর সেই উন্নত মস্তকের বলিষ্ঠ অপরূপ ভঙ্গিমার পাশে এস্ট্যাবলিশমেন্টের কুচক্রী নেতৃবর্গ এবং রণছোড় আস্ফালন-সর্বস্ব পাণ্ডবদের সেদিন কতই না ক্ষুদ্রাকৃতি দেখাচ্ছিল।

আজ হাজার তিনেক বছরের দূরত্ব ভেদ করে সেই ক্রীড়াভূমির দিকে তাকালেও বুঝতে পারি, ক্রীড়াঙ্গনে সেদিন নায়কের স্থান অধিকার করেছিলেন কর্ণ, আর তাঁরই পাশাপাশি শোভা পাচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধন, ক্রীড়াঙ্গনে যাঁর মর্যাদাপূর্ণ বক্তৃতা সমস্ত সভাস্থলকে বিমুগ্ধ করেছিল।

কটূক্তি উচ্চারণ করে ওঁদের দুজনের পাশে ম্লান হয়ে গেছলেন রাজপুত্র অর্জুন। আর অমার্জিত ঔদ্ধত্যের চরম প্রকাশ প্রদর্শন করেছিলেন ভীমসেন। কর্ণ যখন নিঃসঙ্কোচে অধিরথের পদধূলি গ্রহণ করে তাঁর আচরণের মাধ্যমে সকলকে নিজের পিতৃপরিচয় জানিয়ে দিলেন দুর্যোধনের দ্বারা রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার পরেও, ভীমসেন তখন এস্‌ট্যাবলিশমেণ্টের ছত্রচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট মিথ্যা অহংকার সম্বল করে বিকৃত ভাষণে সমস্ত সভাস্থলের গাম্ভীর্যটুকু ভেঙেচুরে কদর্য করে তুললেন।

"ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, 'রে সূতনন্দন! রণে অর্জুনহস্তে প্রাণ বিসর্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপ শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বলগা গ্রহণ কর্। রে নরাধম! হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুকুরের অবলেহনযোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস।"

ভীমার্জুনের কদর্য উক্তি থেকেই পাণ্ডব তথা ব্রহ্মণ্য এস্‌ট্যাবলিশমেণ্টের মানসিকতা পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে। নির্জিত শ্রেণী সৃষ্টি করে আপন শ্রেণীর অপদার্থতাকে তাঁরা এভাবেই আড়াল করতেন। মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণাই ছিল এঁদের তখ্‌ত-এ-তাউস রক্ষা করার প্রধান উপায়। অথচ এই উপায় যে কত অন্তঃসারশূন্য, কত অলীক ও মিথ্যার নড়বড়ে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐ সভাই তা যেন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। ব্রহ্মণ্য এস্‌ট্যাবলিশ-মেণ্টের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ওপর পূর্ণজ্যোতি প্রসারিত করে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সূর্যপুত্র কর্ণ। কর্ণের অস্তিত্বই প্রমাণ করছে জাতপাঁতের সমস্ত ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ণ কুন্তীরই গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু লোকে জানে তিনি সূতপুত্র। সেই জানাটুকুই সব। তারই জন্য তাঁর জীবনভোর জীবনযন্ত্রণা। যে ব্রহ্মণ্য প্রতাপ প্রচার করেছিল ভগবান জাতিভেদ সৃষ্টি করেছেন, এ সভাই অর্থাৎ মহাভারতের মুখবন্ধেই সেই মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। জন্ম তো নয়ই, জাতিগত বা বৃত্তিগত ভেদাভেদও প্রকৃতিদত্ত কোনো গুণাগুণ নয়। সব মিথ্যে, সব ফাঁকি। এক শ্রেণীকে শোষিত ও পদানত করে রাখার জন্য ভগবানের নামে ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যাচারের অপরাধ করেছিল

সেদিন কতকগুলো ক্ষমতালোভী বুদ্ধিমান আর্যনেতা। আর তাদের সেই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে শক্ত সমর্থ সোচ্চার বিদ্রোহীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুর্যোধন, কুচক্রীদের দ্বারা ভূভারতে চিরকাল যিনি দুরাত্মারূপে কুখ্যাত।

ভীমসেনের গালিগালাজ সহ্য করতে পারলেন না তিনি। সভাস্থলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন: "হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে।" (কত মার্জিত কত রাজোচিত ভাষণ!) বললেন, "ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবেন।"

বোঝা গেল সূত অধিরথও ক্ষত্রিয়। নীচ জাতি হিসাবেও নয়, কর্ণ সমস্ত লাঞ্ছনার শিকার শুধুমাত্র এই কারণে যে কর্ণের পালক পিতার জীবিকা ও বৃত্তি সূতগিরি, তিনি পদস্থ ক্ষত্রিয় নন।

ক্ষমতাসীনরা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে চিরকাল আপন স্বার্থ টিকিয়ে রাখে। তাদের সমস্ত নিয়ম-কানুনই ফাঁক ও ফাঁকিতে ঠাসা।

দুর্যোধন সেই বিরাট ফাঁকির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সমস্ত সভাস্থলকে বিমুগ্ধ করলেন সেদিন, তাঁর বক্তব্যের উল্টোপিঠে রাখার মত বক্তব্য তখন বিদুর মহারাজও খুঁজে পান নি।

দুর্যোধন বললেন, "যাহারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ...আর তোমাদিগের যেরূপে জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা আমাদিগের অগোচর নাই।" তারপর যুদ্ধে পরাঙ্মুখ আস্ফালন-সর্বস্ব পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।"

কিন্তু সেই দুর্জয় সাহস ছিল না অর্জুনের, ছিল না তাঁর রক্ষকদেরও। তাই দুর্যোধনের বক্তৃতার পর "...পাণ্ডবেরা দ্রোণ কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন" ও কর্ণসহ ধার্তরাষ্ট্রদের সভাস্থলে বীরত্বব্যঞ্জক অবস্থান সেই দিনই দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর চেহারাকে সুস্পষ্ট করে তুলল। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুই গোষ্ঠীর দুই বিপরীত মনোভঙ্গিও।

মহাভারত পাণ্ডব বিজয়ের পর রচিত পাণ্ডবদের জয়গাথা তবুও কিন্তু ইতিবৃত্তকার সেদিনকার সেই সভাস্থলের কথা অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢেকেঢুকে বললেও এই ইঙ্গিত রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ব্রহ্মণ্য গোষ্ঠীর আপন স্বার্থে বিরচিত আইন-কানুনের প্রতি ভারতবাসীর সেকালেও কোনো শ্রদ্ধা ছিল না।

মহাভারত থেকেই তুলে দিই সেই চমকপ্রদ বিবরণ যার প্রতি যুগ যুগ অতিক্রান্ত হলেও কেউ কখনো নজর করেন নি। পণ্ডিতেরা যখন মহাভারতের ব্যাখ্যা করেছেন তখন দেব ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবদের প্রতি অকারণে ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে কেবল অশ্রু বিসর্জন করে গেছেন। জাতিকে মহৎ সত্য জানানোর দায়িত্বের কথা সেই ভক্তির প্রাবল্যে হয়ত তাঁদের মনেই পড়ে নি।

দুর্যোধনের বক্তৃতা শেষ হলে সভার অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছিল তারই বর্ণনা করে কবি বলেছেন: "অনন্তর (তখন) রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদ সহকৃত হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল।" অর্থাৎ সভাস্থ জনগণ একবাক্যে সমর্থন জানালেন দুর্যোধনের বক্তব্যকেই। তখন হেঁট মুণ্ডে সভাস্থল ত্যাগ করলেন দ্রোণ কৃপ বিদুর ভীষ্ম ও পাণ্ডবরা।

সুরু হল ভাঙা সভার জটলা:

"দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিল।" (আদি, কালীপ্রসন্ন সপ্তত্রিংশদধিক-শততম অ)।

মহাভারত ক্ষমতাসীনের আশ্রিত কবিদ্বারা রচিত ইতিবৃত্ত। এখানে সাধারণ জনতার চিত্র বড় একটা নেই। এই সভার বর্ণনায় আমরা কিন্তু একটি দুর্লভ জনতাচিত্রও পেয়ে গেলাম। সে চিত্র আমাদের জানালো, দুর্যোধনেরও সমর্থক এবং স্তুতিকারের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। বিদুরের ক্ষমতাবান পার্ষদরা রাজসভায় ভোটাভুটির খেলা যেমনই খেলে থাকুন, গণভোট গ্রহণ করলে সেদিন বিদ্রোহী দুর্যোধনই হয়ত নায়কের সম্মান লাভ করতেন। তাঁর উদার মানবতাবাদী চিন্তা সাধারণ্যে অনাদরণীয় ছিল না।

দুর্যোধনের তো অনেক দুর্নাম। সে দুরাত্মা। তার ন্যায়পরায়ণ সুবোধ শান্ত খুড়তুতো ভায়েদের খুন করে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দখল করতে চায় সে। স্বয়ং কাকিমা কুন্তী রাজগৃহের নির্জন প্রাঙ্গণে ক্ষত্তা দেবর বিদুরকে পাশে বসিয়ে এই সব অনুযোগ করেন। বিদুর সান্ত্বনা দেন পৃথাকে: ভাবনার কিছু নেই, তোমার ছেলেপুলেদের ওপর স্বয়ং দেবদ্বিজের নজর আছে, ওদের কিছু মাত্র অনিষ্ট হবে না।

এই তো গল্প। মুনিতে বানানো এবং বিদুর বাহিনীর দ্বারা ফলাও প্রচারিত এ গল্প ভারতবাসীর কানে আবহমান জপমন্ত্রের মত ঢেলে আসা হয়েছে। অথচ যতটা রটনা তার শতভাগও ঘটনা ছিল না।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সপত্নী মাদ্রীকে স্বামীর শবদেহের সঙ্গে সহমরণে পাঠিয়ে

দেবী কুন্তী ছেলেদের হাত ধরে তাড়াতাড়ি শ্বশুরের রাজত্ব হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। এসেই রাজ্যপাট বুঝে নিতে চাইলেন তিনি। সপুত্র কুন্তীর আগমনে রাজপরিবারে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল সাধারণ পারিবারিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হয়।

রাজপুত্র ধার্তরাষ্ট্রগণের সঙ্গে প্রবাসী পাণ্ডবদের সেই প্রথম পরিচয়। জেঠতুতো খুড়তুতো ভায়েরা ইতিপূর্বে কেউ কারো মুখ দেখে নি। শৈশবকালটা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের কেটেছে রাজসুখে, পাণ্ডুপুত্ররা সে সময় প্রকৃতির কোলে গিরিনদী নির্ঝরিণীর মোহময় লীলাক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠেছেন। স্বভাবতই কুরু পাণ্ডবের আচার আচরণ ও মানসিকতাও হয়েছে বিভিন্ন। কৈশোরে সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতার মধ্যে সমঝোতা করে নেওয়া খুবই কঠিন। সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাই স্বাভাবিক কারণেই। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে আদৌ কোনো রাজনীতির গন্ধ ছিল না। তাছাড়া ছেলেদের তখন বয়সই বা কত। যুধিষ্ঠির বোধ হয় ষোল, ভীম দুর্যোধন চোদ্দ, অর্জুন তের। এ বয়সটা তো মারাত্মক কুটিলতার বয়স নয়। (অবশ্য সাধারণ মানবপুত্র ও রাজপুত্রে তফাত আছে। আকবর শা কিংবা সিরাজদৌল্লার কথা ভাবলে তের চোদ্দ বছরও নিতান্ত সামান্য মনে হয় না।)

যাই হোক, পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে এলে রাজপ্রাসাদে তাদের কিন্তু সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েই গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বারদেশ থেকে অভ্যর্থনা করে জ্ঞাতি-কুলকে রাজগৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও ধার্তরাষ্ট্রগণ। ছেলেরা নতুন খেলার সাথী পেয়ে সেদিন খুশিই হয়েছিল মনে মনে।

মহাভারত বলেন, "তাঁহারা (পাণ্ডবগণ) দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরম সুখে ক্রীড়া করিতেন।" (আদি)।

কিন্তু ক্রমেই ভীমের দৌরাত্ম্য অত্যাচারের সামিল হয়ে উঠল। পাণ্ডবদের জয়গায়ক মহাভারতকারকেও স্বীকার করতে হয়েছে: "যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরম আহ্লাদে ক্রীড়া করিত বৃকোদর (ভীম) তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘর্ষণ করিয়া দিতেন।" কিন্তু মজা এই যে, যেহেতু এজাতীয় অত্যাচার দেবদ্বিজের প্রিয়পাত্র পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ভীমের কীর্তি, তাই ভীমের সকল অন্যায় আচরণকেও মহাভারতকার সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। এমন কাজ দুর্যোধনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে সেই অপকীর্তি গাইতে 'দুরাত্মা' শব্দযুক্ত সহস্র শ্লোক লেখা হয়ে যেত। কিন্তু ভীমের দৌরাত্ম্যকে বেশ প্রশ্রয়ের

স্বরেই বর্ণনা করে কবি বললেন: "তিনি (ভীম) কখন কখন তাহাদিগকে (দুর্যোধনভ্রাতাদের) ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ-পূর্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষত-মস্তক, কেহ বা ক্ষতস্কন্ধ হইয়া প্রাণ-নাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্তস্বরে চীৎকার করিত। জলক্রীড়ার সময় তিনি এককালে তাহাদের দশজনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। পরিশেষে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাহারা ফলচয়ণার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিত, ভীমসেন সেই সময় পদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন। তাহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইত।"

বোঝা গেল, ভীমসেন ছিলেন দারুণ পালোয়ান। তিমি অনুজদের সর্বদাই লাঞ্ছিত করতেন; তবে সেই লাঞ্ছনার লক্ষ্য ছিলেন শুধুমাত্র ধার্তরাষ্ট্ররা। দ্বিতীয় পাণ্ডব নিজের ছোট তিন ভাই, অর্জুন নকুল ও সহদেবের কিন্তু গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দিতেন না এবং যেহেতু এসব ঘটনা একান্নবর্তী পরিবারে চাপা ঢাকা থাকার বিষয় নয়, সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ভীমের দৌরাত্ম্যের খবর জেঠিমা গান্ধারী, মাতা কুন্তী, কাকা বিদুর এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা ন্যায়াধীশ ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের অগোচর ছিল না। কিন্তু কৈ কেউ-ই তো ভীমকে তিরস্কার করে তাঁর সেই অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন নি। বিদুর কাকা আর কুন্তীর চুপ করে থাকার অর্থ কি পরিবারে কলহসূত্র বাড়িয়ে দেওয়া নয়? যুধিষ্ঠির বোধহয় জেঠতুতো ভাইদের ওপর অত্যাচারটি কখনই কোনো অত্যাচার বলে গণ্য করতেন না। কুন্তী মজা দেখতেন। বিদুর হয়ত অপেক্ষা করতেন আর ভাবতেন, একবার লাগুক না গৃহ-বিবাদ, তাতে প্রচারের সুবিধে হবে। লোকজনকে ফিসফাস করে বলা যাবে, বাপমরা ছেলেপুলেগুলোর ওপর ধৃতরাষ্ট্রের শয়তান দুরাত্মা পুত্রটি বড়ই অত্যাচার করছে। গড়ে তোলা যাবে দুর্যোধনবিরোধী জনমত। মনে মনে এই কদভিপ্রায় না থাকলে কুচক্রী বিদুর ও কুন্তী নিশ্চয় বৃকোদরের উৎপাত ধমকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। সুযোগ খুঁজেছেন ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষ থেকে একটা প্রত্যাঘাতের। সেই প্রত্যাঘাত এলেই দেবর বৌদি কোমর বেঁধে অপপ্রচারে নেমে পড়তেন; সফল করে তুলতেন তাঁদের ষড়যন্ত্রী উদ্দেশ্য।

অতএব মহাভারতে গান্ধারী মহারানী হয়েও অতি সম্ভ্রমশীলা ও সর্বংসহা রমণী। কুন্তীর মত তিনি বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে কোন্দল করতে ভালবাসতেন না। নিশ্চয়ই দেবরপুত্র ভীমের উপদ্রবের কথা তাঁর কানে গেছে। শুনেছেন

তিনি ছেলেদের অভিযোগ, কিন্তু এই নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে গোপন চক্রান্ত করতে বসেন নি।

অথচ যে কুন্তী নিজের ছেলের দোষ দেখতে পান না, ভাশুরপুত্র দুর্যোধন সম্পর্কে তিনি কি বললেন সেদিন ?

তবে গল্পটা বলি :

ভায়েদের এইভাবে নিগৃহীত হতে দেখে এবং এ বিষয়ে প্রায় নিজেদের রক্ষকবিহীন বিবেচনা করে রাজকুমার দুর্যোধন ছোট ভায়েদের ভীমের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটা কূটনৈতিক ফন্দি আঁটলেন। সাধারণের ক্ষেত্রে সেই মারাত্মক ফন্দি যতই কেননা ভীষণ ভয়ানক বোধ হোক, এক রাজপুত্রের পক্ষে ঐ জাতীয় পন্থা গ্রহণই ছিল স্বাভাবিক। তরুণ রাজপুত্র জ্বলছেন তখন চরম অবমাননার জ্বালায়। পাণ্ডবরা আসায় দুর্যোধন প্রমুখের একছত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ণ তো হয়েইছে, উপরন্তু ভীমের দৌরাত্ম্যে কেউ তাকে দুরাত্মা না বলে সব সময় বিদুরমন্ত্রণা-প্রভাবে দোষারোপ করছেন দুর্যোধনকেই। এমন এক পরিস্থিতির মোকাবিলা সুতরাং রাজকীয় পদ্ধতিতেই করতে চেয়েছিলেন দুর্যোধন। পদ্ধতিটি ছিল কৌশলে ও সুনিপুণ রাজনৈতিক উপায়ে ভীমকে গুপ্তভাবে হত্যা করা। দুর্যোধনের এই চরম প্রতিক্রিয়ার পেছনে ছিল লাঞ্ছনার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। ঐ বয়সে যে কোনো রাজপুত্রের পক্ষে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়।

মহাভারতের পণ্ডিত কথকবৃন্দ কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে রাজ্যলিপ্সার আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেলেন। আসলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং সে সময় এমনই ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছিলেন যে, যে কোনো আচরণকেই তাঁদের সম্পত্তি বিষয়ক আচরণ বলে মনে হয়েছে। নিজেদের মনের ক্লেদ তাঁরা মাখিয়ে দিতে চেয়েছেন কুমার দুর্যোধনের মুখে।

এজন্য তাঁরা বললেন, "ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দুর্যোধন সর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্মতি, পাপাচারী ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান, বিক্রমশালী ও শৌর্যযুক্ত; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে, অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব। পাপাত্মা দুর্যোধন মনে মনে এইরূপ

দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্বদা যত্ন করিতে লাগিল।”

অন্যায় করলেন ভীমসেন। দেবদ্বিজ সম্প্রদায় সেজন্য ভীমকে ভূষিত করলেন ‘মহাত্মা’ আখ্যায়। ওদিকে ভীমের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় কিশোর দুর্যোধন যে মৎলব আঁটলেন তার মধ্যে দ্বিজগণ কিন্তু কিছুমাত্র ‘বালসুলভ’ চপলতা সন্ধান করে দুর্যোধনের প্রতি সস্নেহ তিরস্কার বর্ষণ করার মত মানসিক উদারতাও প্রদর্শন করতে পারলেন না। সুরু করে দিলেন অপপ্রচার। চিহ্নিত করলেন তাঁকে ক্রূর, দুর্মতি, পাপাচারী, ঐশ্বর্যলুব্ধ এবং পাপাত্মা বলে। শব্দগুলি যেন দুর্যোধনের জন্যই মহাভারতীয় কারিগরদ্বারা বিশেষভাবে তৈরী। যত রকম গালিগালাজ তাঁদের অভিধানে সন্ধান করে পাওয়া সম্ভব বিশাল মহাভারতে সর্বপ্রযত্নে তাঁরা সে সবগুলিরই অকৃপণ ব্যবহার করেছেন দুর্যোধনকে দানবাকার করে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। দেবদ্বিজপক্ষীয় বুদ্ধিজীবীদের এই সচেতন প্রয়াসই প্রমাণ করে যে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করার পেছনে ছিল সুচিন্তিত গভীর চক্রান্ত ও স্বার্থচিন্তা।

দশাসই ভীমসেনের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে দুর্যোধন রাজোচিত উপায়ে তার ছোট ছোট ভাইগুলিকে ভীমের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। এক অসতর্ক মুহূর্তে ভীমকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে বেঁধে ফেললেন ধার্তরাষ্ট্ররা। তারপর তাঁকে সবাই মিলে চুপি চুপি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলেন রাজ-প্রাসাদে। কুরু পাণ্ডবরা সেদিন একত্রে গঙ্গাতীরে এক রমণীয় স্থানে বনভোজনে গেছলেন। খেলার শেষে প্রাসাদে ফিরলেন সবাই, ফিরে এলেন না শুধু ভীমসেন।

কুন্তী খবর পাঠালেন দেবর বিদুরের কাছে। খবর পেয়ে বিদুর এসে রাজ-প্রাঙ্গণের এক গোপনীয় স্থানে মিলিত হলেন ভোজরাজ দুহিতা পৃথার সঙ্গে। এভাবেই তাঁরা মিলিত হতেন।

পৃথা দেবর বিদুরকে ডাকতেন, ‘ক্ষত্তঃ’ নামে। বিদুর উপস্থিত হলে পৃথা বললেন, “ক্ষত্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল। সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এ পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই।”

এই যখন অবস্থা তখন কুন্তী কেবলমাত্র সন্দেহপরবশ হয়েই শাপ-শাপান্ত সুরু করলেন দুর্যোধনকে। বললেন, ঐ পাপাত্মাই “আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে।” বিদুর বললেন, “হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না।”

ভীমের অদর্শনের কারণ দুর্যোধনের চক্রান্ত একথা অনেক পরে জানা গেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার আগেই নিভৃত আলাপে কাকা ও কাকিমা বিদুর-কুন্তী দুর্যোধনের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেছেন তা অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ ও শত্রুভাবাপন্ন। একটি কিশোরের প্রতি এ জাতীয় মনোভাব পোষণ করাও মহত্ত্বের লক্ষণ নয়। মহাভারত কিন্তু বলবেন, পাণ্ডবপক্ষ মহদাচরণ ছাড়া কখনই অসদাচরণ করেন না, পৃথিবীর যত পাপ, সবই দুর্মতি দুর্যোধনের উষ্ণীষের নিচে আশ্রিত।

যিনি রাজক্ষমতায় আসীন তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার চক্রান্ত হলে ক্ষমতাসীন রাজা চক্রান্তকারীদের বুকে জড়িয়ে সাদর আলিঙ্গন জানাবেন এমন কথা ভূ-ভারতের কোনো শাস্ত্রগ্রন্থেই লেখা নেই। ধর্মগ্রন্থগুলি বরং আত্মরক্ষার যাবতীয় উপায় নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে বেশি। আলোচনা করেছে শত্রুনিধনের জন্য করণীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে। বেদে দেবতার কাছে শুধু এই প্রার্থনাই আছে, আমায় বাঁচাও, আমার শত্রুকে ধ্বংস করো। একথা যেমন আছে আমাদের বেদবেদান্তে তেমনি আছে রামায়ণ মহাভারতে, বিশেষত মহাভারত তো শত্রুনিধনেরই ইতিবৃত্ত। গীতার বাণীও বলছে, যতবড় আত্মীয়ই হোক সে, তোমার শত্রুকে বিনাশ করো।

এই যখন মহাজনের বাণী, তখন পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলছে সংবাদ পেয়েও রাজকুমার দুর্যোধন যদি নিষ্ক্রিয় থাকতেন তবে সেটাই হত তাঁর পক্ষে সবচেয়ে অমর্যাদাকর প্রতিক্রিয়া। দুর্যোধন স্বয়ং এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যা করেছেন, কখনই সেজন্য তাই তাঁকে বিচলিত, লজ্জিত অথবা অনুতপ্ত হতে দেখা যায় নি। বরং মৃত্যু যখন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘাতক পাণ্ডবগণ জড় হয়েছেন দুর্যোধনের নিঃসঙ্গ আহত দেহ ঘিরে, তখনও সগর্বে দুর্যোধনকে বলতে শোনা গেছে, আমি যা করেছি সেজন্য আমি স্বর্গেই যাব, তোমরা দ্যাখো। আমি বীরের মতই মরণকে আলিঙ্গন করে আছি। স্বজনহত্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে বসে এখন, হে পাণ্ডবগণ, তোমরা শাসন কর শ্মশানভূমি। যুধিষ্ঠিরের মত একবারও দুর্যোধন কোন রকম অনুতাপের কথা উচ্চারণ করেননি। স্বর্গে যেতে পারবেন কি পারবেন না, এ নিয়েও তাঁর তিলমাত্র মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি। অথচ মহাধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে আমরা অনুতাপে বিদ্ধ হতে দেখেছি। স্বর্গলাভ বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহও বর্তমান ছিল। তিনি যে স্বর্গে সশরীরে গেছলেন বলে সগৌরবে মহাভারতে ঘোষণা রেখে গেছেন, আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের সেই স্বর্গ-লোকটি সম্পর্কে অনেক যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি। সেখানে মহাভারতীয় তথ্যাদির বিশ্লেষণে পরিষ্কার বোঝা গেছে, দেবতা নামক আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রভুরা হিমালয়শিখর থেকে বিশেষ মহাকাশযানে চাপিয়ে যুধিষ্ঠিরকে মহাকাশে তুলে

নিয়ে যান। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাকাশযাত্রাকেই বিভ্রান্তিবশত মহাভারতকার বা মহাভারতের কবিরা স্বর্গযাত্রা বলে ভুল বুঝেছিলেন। নক্ষত্র-লোকের দুর্লক্ষ্য শূন্যমার্গ ধরে যুধিষ্ঠিরের মহাশূন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার অর্থ স্বর্গ-গমন, এছাড়া সেদিনের মানুষ অন্য কিছু ভাববার সুযোগ পাননি। যাই হোক, সে অনেক তর্কের কথা। সে প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি স্বর্গদেবতা পর্বে। দেবস্বরূপ ও দেবকীর্তির সেই চমকপ্রদ বিবরণ পাঠক আমার উল্লিখিত গ্রন্থটি থেকেই দেখে নেবেন, এখানে তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

সুতরাং দুর্যোধনের মনে জ্ঞানত কোনো পাপবোধ ছিল না। পাপবোধ থাকলে নিজের প্রত্যেক আচরণকে তিনি অমন সোচ্চারে ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাতে পারতেন না।

জতুগৃহে পাণ্ডবদের গুপ্তভাবে হত্যা করার জন্য দুর্যোধন যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনেও ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত, তৎসমকালে যাকে রাজদ্রোহ বলেই গণ্য করতে হয়। ক্ষমতাসীন ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বিদুরচক্রের তৎপরতা যখন প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্র-বিরোধী প্রচারে মুখর হয়ে উঠেছে তখন সেই সংকটজনক পরিস্থিতির সমুচিত মোকাবিলার উপায় নির্ধারণ করতে হয়েছিল যুবরাজ দুর্যোধনকে। কী পরিস্থিতিতে দুর্যোধন সেই নিষ্ঠুর পরিকল্পনাটি সফল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন মহাভারতকার নিজেই সে ইতিহাস শ্লোকবদ্ধ করে গেছেন।

আগে বলেছি, দুর্যোধন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সপারিষদ বিদুর দুর্যোধনের নির্বাসন চেয়েছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। সেই নিষ্ঠুর দাবির পিছনে ছিল যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনারূঢ় করার পরিকল্পনা। শেষে যখন বিদুর-মহারাজের সেই পরিকল্পনাটি টিকল না, তখন তলে তলে তিনি ধৃতরাষ্ট্র-বিরোধী জনমত গঠনে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং আমরা, মহাভারত-পাঠকগণ জানি, প্রচার ও জনমত গঠনকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সর্বদাই পাণ্ডবপক্ষ ব্যবহার করেছেন। বিদুরের কুরুবিরোধী প্রচার ক্রমশই প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করছিল।

মহাভারত বলেছেন, "...যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, 'মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠিরই রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন?

সত্য প্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না। অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্মাত্মা পাণ্ডব জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।…"

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, পুরবাসী ও সাধারণ জনগণ কিন্তু একবাক্যে দুর্যোধনবিরোধী ও পাণ্ডব-সমর্থক ছিলেন না। বরং কুমারদের জন্য প্রস্তুত কৃত্রিম ক্রীড়াঙ্গনে দুর্যোধন যখন কর্ণের পক্ষ সমর্থন করে ভাষণ দেন তখন সমবেত জনতা দুর্যোধনকেই সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন এবং পাণ্ডব-সমর্থকরা সেই সভায় এমনই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন যে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণসহ পাণ্ডবদের বিদুরের নেতৃত্বে সভাস্থল ত্যাগ করে নিঃশব্দে পলায়ন করতে হয়। সুতরাং মহাভারতীয় বচন হলেও 'যাবতীয় পুরবাসী'ই যে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাবার জন্য সোৎসুক ছিলেন, এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্যকে আমরা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারি না। যে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন, যিনি ক্ষণিকের জন্য রাজক্ষমতা পেলেই ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি জেরাত এবং গোধন দান করতেন, রাজকোষ থেকে তাঁদের জন্য নিয়মিত মাসোহারার বন্দোবস্ত করে প্রজাশোষিত অর্থ ব্রাহ্মণ সেবায় নিঃশেষ করে তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর সমর্থন বজায় রাখতেন, অব্রাহ্মণ শোষিতশ্রেণী তাঁকে রাজারূপে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এমন কথা বিশ্বাস করাব যথেষ্ট কারণ নেই।

সেকালে জনশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। জনসংযোগের সহজ মাধ্যমও ছিল কম। কুসংস্কার এবং ভয়ভীতিরদ্বারা জনগণ আচ্ছন্ন থাকতেন। তেমন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাহিনীর পক্ষে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে প্রচার করে বেড়ানোর সুবিধা ছিল অনেক। জনগণকে বিভ্রান্ত করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। এজন্য মহাভারতে সর্বোত্তম চররূপে ব্রাহ্মণদেরই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ব্রাহ্মণদের রাজ্যব্যাপী সর্বত্রই ছিল অবাধ গতি এবং পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় হওয়ায় এদের রুজিরোজগার বা জীবিকার জন্য বিশেষ জায়গায় বসবাস করারও বাধ্যবাধকতা ছিল না। অবাধ বিচরণশীল ব্রাহ্মণরা তাই দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রচার করে বেড়াতে পারতেন। রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও এমন প্রচারকবাহিনী দুর্যোধনের পক্ষে নিয়োগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ রাজার প্রচারককে ও চরবৃন্দকে মোটা বেতন দিয়ে পুষতে হত। সে তো সামান্য খরচ নয়। কিন্তু নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র বেতন দানের সমস্যা ছিল না। তাঁরা গুরুভজা বাহিনীতে জোটবদ্ধ হয়ে এক-একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীকে নেতা বানিয়ে দিব্যি বিনা পরিশ্রমে জীবন কাটিয়ে দিতেন। তবু

ব্রাহ্মণবাহিনীর অবিরত প্রচার সত্ত্বেও আমরা দেখেছি দুর্যোধন-সমর্থকের সংখ্যা রাজ্যে কম তো ছিলই না, ছিল বরং বেশি।

যে পুরবাসীরা সভামণ্ডপের চত্বরে, রাজসভায় এবং যত্রতত্র যুধিষ্ঠিরের পক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, তাঁদের সেই রাজদ্রোহের সংবাদ চরমুখে রাজকুমার দুর্যোধনের কাছে এসেও পৌঁছেছিল। মহাভারত সেকথাও জানিয়েছেন আমাদের। সেই সঙ্গে রাজ্যে যে যুধিষ্ঠিরানুগত একটি রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটছিল কবি তারও ইঙ্গিত রেখে গেছেন। আদিপর্বে জতুগৃহ পর্বাধ্যায়ে সেকথা এই-ভাবে বলা হয়েছে, "মূঢ়মতি দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরানুগত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল এবং সত্বর স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্বক কহিতে লাগিল, "হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে। রাজ্যভোগ-পরাঙ্মুখ ভীষ্মের উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। দেখুন, পূর্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন। আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিলাম।..."

এ তো স্বাভাবিক রাজনৈতিক মন্ত্রণা। এর জন্য দুরাত্মা পাপাত্মা পাষণ্ড ইত্যাকার বিশেষণ কেবলমাত্র দুর্যোধনের ওপর তাঁরাই প্রয়োগ করবেন যাঁরা পাণ্ডব-দলভুক্ত। নিরপেক্ষ সাধারণ নিশ্চয় বলবেন, উভয় পক্ষেই ছিল তীব্র রাজ্যাকাঙ্ক্ষা। সেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দেশে দলাদলি ও সংকট ঘনীভূত করে তুলেছে। রাজ্য নিয়ে এমন বিবাদ মানবেতিহাসে বারম্বার ঘটে গেছে। সুতরাং যা একটি নিছক রাজ্য দখলের ইতিহাস তাকে হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম অধর্মের লড়াই হিসেবে নির্বিচারে অনন্তকাল একদেশদর্শী দৃষ্টিতে বিচার করে আসব কেন? কেন প্রশ্ন উঠবে না, যা ইতিহাস, তাকে ব্রাহ্মণকথিত ধর্মকথা বলে প্রচার করা হলে আমরা যুগ যুগ সেই বিভ্রান্তিকর প্রচারের সত্যমিথ্যা একাকার করে ব্রাহ্মণ-উদ্দিষ্ট পথেই শ্রেয়র সন্ধান করে বেড়াব কেন?

কেন একবার ভেবে দেখব না, কেন বসব না তার পুনর্বিচারে?

বিশেষ এক বিজয়ীগোষ্ঠী আপন গোষ্ঠীস্বার্থে যা কিছু ধর্ম বলে নির্দেশ করেছে, মানসিকভাবে সাবালক হওয়ার পর সেই সবকিছুর মধ্য থেকে আমাদের নিশ্চয়ই শ্রেয় ও অশ্রদ্ধেয়কে বাছাই করে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে

তার জন্য আমাদের আবহমানের সংস্কারকে আঘাতও করতে হবে। কেননা মানুষের ধর্ম তাই, যা সর্বমানবের মঙ্গল করে। আমাদের দেখতে হবে, জনগণের মঙ্গলবিধানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সেই সর্বজনীন দৃষ্টি ছিল কিনা। থাকলে ভালো, না থাকলে তাঁদের ধর্মকথাকে বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক মতলবী নীতিশাস্ত্র হিসেবেই বিচার করতে হবে।

এই ভাবে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধটা যে ধর্ম-অধর্মের রূপক রূপকথা নয়, তার প্রমাণ মহাভারতের পাতায় পাতায় পল্লবিত হয়ে আছে। দুঃখের বিষয় সেই কূটরাজনীতির দিকে হিন্দু ভারতের দৃষ্টিকে মহাজনেরা আকর্ষণ না করে রাজনৈতিক ইতিবৃত্তটিকে সকলের কাছে মহান ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই তুলে ধরেছেন। বাস্তবিক বাহাদুরি ছিল তাঁদের। অধর্মের ওপর ধর্মের জয় ঘোষণা করার জন্য ভাববাদী দার্শনিকরা যুগ যুগ ধরে লক্ষ শ্লোক রচনা করেছেন, পরিশ্রম করেছেন দীর্ঘকালব্যাপী। জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এমন অপূর্ব কৌশল যাঁরা করেছিলেন, সকল বুদ্ধিজীবীর দেমাক তাঁদের সেই সুচতুর কৃতিত্বের কাছে চিরকাল নতজানু হতে বাধ্য। মহাভারত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে এতোকাল আমরা কত না ভয় পেয়েছি। কয়েকটি রাজারাজড়াকে বসিয়ে রেখেছি ভগবানের অর্থাৎ পরমেশ্বরের 'ভগ' বা অংশবানের আসনে। তাই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের আরাধ্য দেবতা, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীও তাই, পার্থ যুধিষ্ঠিরাদিরও নিত্যদিন পুষ্পচন্দন ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি প্রাপ্য। কুরুক্ষেত্র আমাদের তীর্থক্ষেত্র!

কিন্তু যুদ্ধটা নিছক রাজনৈতিক কারণেই ঘটেছিল। এমন সূক্ষ্ম রাজনৈতিক পটভূমির ওপর কোনোও ধার্মিক রূপক রূপকথা সৃজন করা সম্ভব নয়। জতুগৃহের নির্জন প্রবাসে ধর্মধ্বজীদের গুপ্তহত্যা-পর্ব সমাধা করার আগে দরকার ছিল না তথাকথিত অধার্মিকদের রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধা নিয়ে অত শত কথার জাল বোনা। এবং সেসব কথা যদি শুধু গল্পকথাই হত, তবে তার মধ্যে কার্যকারণের অমন বাস্তবসম্মত পারম্পর্য বজায় রাখাও তো ছিল নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। পাঁচালী লিখতে রাজনীতির পাঞ্জা উভয় পক্ষে কেমনভাবে কষা হয়েছিল তাই নিয়ে কবি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদানের দিকে নজর দিতেন কি? অকারণ প্রযত্ন করতেন কি অমন গূঢ় চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করার জন্য?

অথচ মহাভারতে সে সবই আছে। রাজনীতির কথা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বর্ণিত আছে, ধর্মের কথা তেমনিই অবিশ্বাস্য অলৌকিক কথাকাহিনীর মাধ্যমে আছে জবরদস্তি চাপানো, আছে পরশ্রমভোগী একটি সমাজসৃষ্টির প্রযত্ন।

জতুগৃহে পাণ্ডবদের গোপন ষড়যন্ত্রে হত্যা করার পরিকল্পনাটি রচিত হওয়ার আগে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনচ্যুত করার যে রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছিল আমরা তা নজর করেছি। যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনের জন্মেরও প্রাক্কালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেছে, খুঁজে পেতে বেছে বার করেছি সেসব ঘটনাবলীও। এরপর মহাভারতকার জানাচ্ছেন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতাসীন ধৃতরাষ্ট্রের কি রাজনৈতিক সুবিধা ও অসুবিধা ছিল এবং সেই প্রতিবন্ধকগুলি অলঙ্ঘনীয় হওয়ার জন্যই একটি জতুগৃহ নির্মাণের অদ্ভুত পরিকল্পনা কেমনভাবে তৈরী করতে হয় সপারিষদ দুর্যোধনকে।

ক্ষমতাসীন ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেবদ্বিজ-বিদুর-চক্রের চক্রান্ত যখন ক্ষমতার আসন ধরে আকর্ষণ করতে সুরু করেছে, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী কণিকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। ঘরে বাইরে শত্রুপক্ষ তৎপর, এখন রাজার কর্তব্য কি?

কণিক মহাভারতীয় রীতিতে প্রলম্ব বক্তৃতা করার পর ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "...দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদান-পূর্বক অনুগ্রহ করেন তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।" রাজ-কর্তব্য ব্যাখ্যা করে কণিক আরও বললেন, "...অনাগত কার্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্বক তাহার অনুসরণ করিবে।...আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে।...শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না; কারণ তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে...পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউন না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্বিবাদে আপনার কার্যসাধন করিতে পারিবেন।...অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়কল্প হয়, করুন।"

মহাভারতীয় কালে কেন, একালেও শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার করার এই তো হল 'ন্যায়ানুগত' পদ্ধতি। এ পদ্ধতি যেমন জানতেন দুর্যোধন তেমনি কণিক, বিদুর, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণও। শত্রুপক্ষকে উৎসাদিত করার ব্যাপারে তাঁরা কখনো 'উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন' করেননি। শত্রুর সমকক্ষ শক্তি সঞ্চয় করার জন্য এবং উপযুক্ত অবসরের আশায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্রয়োজনীয় সময়কাল দেরী করেছেন শুধু যুধিষ্ঠির। মুনিরা যাই বলুন, সেই কালহরণের পেছনে একটাই কারণ ছিল, শক্তিসঞ্চয় ও প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা

করা। মুনিরা সেই কালহরণকেই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে বলেছেন, যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবলমাত্র পাকেচক্রে যুদ্ধে নামতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু মহাভারতীয় তথ্য একবারও সে ব্যাখ্যা সমর্থন করে না। স্বয়ং যুধিষ্ঠির একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে, রাজ্যলোভে স্বজন হত্যা করে তিনি ভুল করেছিলেন। মহাপাতক হয়েছেন। কেন এই বিমর্ষ স্বীকৃতি? কই দুর্যোধন কর্ণ তো তেমন কোনো স্বীকারোক্তি কোথাও রেখে যাননি। তাঁরা বরং আমরণ বলে গেছেন, ভুল নয়, অন্যায় নয়, তাঁরা ন্যায়যুদ্ধই করেছিলেন। তাই অনুতপ্ত নন তাঁরা। তাঁদের স্থির বিশ্বাস, বীরের মত ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে স্বর্গবাসী হবেন।

যাক যা বলছিলাম :

কণিকের মন্ত্রণার পর আমরা দেখলাম, বদ্ধদুয়ার কক্ষে কর্ণ, শকুনি ও দুর্যোধনকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র আসন্ন রাজদ্রোহ সম্পর্কে গোপন পরামর্শ-সভা বসিয়েছেন। পরামর্শের পর যুবরাজ দুর্যোধন পিতাকে বলছেন, "হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোনো কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ থাকে না।"

হস্তিনাপুরের বাইরে পাণ্ডবদের প্রেরণ করার সিদ্ধান্তে বেশ বোঝা যায়, প্রকাশ্যে পাণ্ডবদের ওপর বলপ্রয়োগে অসুবিধা ছিল। রাজদ্রোহীরাও অল্প শক্তিমান ছিলেন না। তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নিশ্চয় তার প্রতিক্রিয়া খুব সুখকর হত না, এটা সম্যক বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা। দুর্যোধন-প্রস্তাবটি বিবেচনা করে ধৃতরাষ্ট্রও সে কথাই বলেছেন। তাঁর মনে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। অন্ধ হলেও ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বৃদ্ধপিতা। মহাভারতেও তাই তাঁর নামের আগে সর্বদাই 'প্রজ্ঞচক্ষু' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, কাজটি আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ যুধিষ্ঠিরও বেশ 'সহায়সম্পন্ন'। তিনি বললেন, "আমি কি প্রকারে তাঁহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারিব? পাণ্ডু পূর্বে অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্র সকলকে পরম যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।"

পিতার আশঙ্কা যে অমূলক নয়, বুদ্ধিমান দুর্যোধন তা স্বীকার করে বললেন, ধনাগার এখন কুরুকুলের করায়ত্ত। সুতরাং সৈন্য সামন্ত ও অমাত্যকুলকে

উপঢৌকন প্রদান করে এখন তিনিই বশীভূত করতে পারেন। অতএব ওদিকটা তিনিই দেখবেন যদি মহারাজ পাণ্ডবদের কোন সহজ কৌশল দ্বারা···"বারণাবত নগরে প্রেরণ করেন।"

ধৃতরাষ্ট্র ইতস্তত করেন। পাণ্ডবদের প্রকাশ্যেই হোক অথবা কৌশলেই হোক, হস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে এই নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে। অবস্থা যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে না তাই বা কে বলবে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যরাও কি ব্যাপারটা মুখ বুজে মেনে নেবেন?

কিন্তু দুর্যোধনও তো একেবারে অনভিজ্ঞ বা অপরিপক্ক রাজনীতিক নন। তিনি বললেন, "পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয়পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনিও আমার পক্ষে হইবেন।" এই গণনা যে নির্ভুলই ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঐ তিন বৃদ্ধ বীরকে নিজের পতাকাতলে সমবেত করে দুর্যোধন তার প্রমাণ রেখে গেছেন। বিদুর সম্পর্কেও প্রথমাবধি তাঁর ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। কাকার সম্বন্ধে পিতাকে তিনি বলেছেন, "ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে; যাহা হউক তিনি কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।" (আদি, জতুগৃহপর্বাধ্যায়)।

সকল রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক মন্ত্রণা-সভায় পাণ্ডবদের বেশ কিছুদিনের জন্য বারণাবতে গোপনে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু জতুগৃহের কথা স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও জানতেন না। দুর্যোধন তাঁর বিশ্বস্ত পুরোচনের সঙ্গে একান্তে ও অন্যের অজ্ঞাতে জতুগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

হিমালয়স্থ দেবশিবিরকে পাহারা দেওয়ার জন্য হিমালয়ের বা ব্রহ্মপুরার পথে পথে ধর্মরাজ যম যেমন মোতায়েন রাখতেন তাঁর চরবাহিনী ও সারমেয় প্রহরীদের, হস্তিনাপুরে তেমনি আর এক 'ধর্ম' উপাধিধারী দেবানুচর বিদুরের ওপর ন্যস্ত ছিল দেবপুত্র পাণ্ডবদের রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব। বিরাট এক চরবাহিনী বিদুরও মোতায়েন করেছিলেন ক্ষমতাসীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও যুবরাজ দুর্যোধনের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি নজর রাখার জন্য।

বিভিন্ন সূত্রে ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে, মহাভারতীয় কালেও

উৎকোচ প্রদানের দ্বারা সহজেই কার্যোদ্ধার সাধন করা যেত। ঘুষপ্রথা সেই দ্বাপর সত্যযুগ থেকেই চলে আসছে। রাজনৈতিক চরবাহিনী পোষণের জন্য সুতরাং প্রচুর অর্থব্যয় সেকালেও বিশেষ দরকার ছিল। প্রশ্ন জাগে, বিদুর সেই বিপুল ব্যয়ভার কিভাবে বহন করতেন। গল্প তো বলে, বিদুর ছিলেন নির্লোভী এবং তাঁর খুদকুঁড়ো একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে আছে। তাহলে চরবাহিনী পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের সংস্থান তিনি করতেন কী ভাবে? সে অর্থ কি তবে দেবশিবির থেকেই তাঁর হাতে এসে পৌঁছাতো? জতুগৃহপর্বে, শুধু অর্থ নয়, দেখা গেছে, বিদুর একটি গোপন ষড়যন্ত্রকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই ব্যবহার করেছিলেন।

দুর্যোধনের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ পুরোচন সপরিবারে পাণ্ডবদের গুপ্তহত্যার জন্য যে সহজদাহ্য জতুগৃহ নির্মাণ করান বারণাবত নগরে, সেই জতুগৃহেব বিষয় গোপন তথ্যাদি তাঁর চরবাহিনীর মারফৎ সংগ্রহ করেছিলেন বিদুর। তিনিই বারণাবতে পাঠিয়েছিলেন একজন সুদক্ষ খনককে। পাণ্ডবদের উদ্ধার করার জন্য খনক জতুগৃহেব মধ্যে সবার অলক্ষ্যে একটি সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করেন। পথটি যে বেশ প্রশস্ত ছিল তাও সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা জতুগৃহে বাসকালে পাণ্ডবরা সেই সুড়ঙ্গ পথেই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন। আশ্চর্যের কথা, এমন একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ বিদুর-প্রেরিত খনক অতি অল্প সময়ে সকলের অলক্ষ্যে খুঁড়ে ফেললেন একটা পরিখা খননের নাম করে। কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। যে যুগে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশী ছিল না বলে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির অনুমান, সে যুগে অমন একটি খননকাজ কী করে সম্ভবপর হয়েছিল?

মহাভারতীয় যুগে লোহা ও ইস্পাত যে সুপ্রচলিতই ছিল কিছু প্রমাণ উল্লেখ করে সে তর্ক আমি আগেই তুলে ধরেছি। কথায় কথায় যন্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ মহাভারতে হামেশাই খুঁজে পাওয়া যায়, তাও দেখিয়েছি। বলেছি, 'সমুদ্র মন্থন' নামক ওষধি প্রস্তুতের ক্রিয়াকাণ্ডও মহাভারত বলেছেন, 'যন্ত্র সহযোগে'ই সঙ্ঘটিত হয়েছিল। সুতরাং জতুগৃহপর্বে সুড়ঙ্গ খননে যে অত্যুন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই ব্যবহৃত হয়েছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। (দা. ম স্ব. দ্র।)

সুড়ঙ্গ পথে পাণ্ডবরা যখন জতুগৃহ থেকে পলায়ন করেন তখন বিদুরপ্রেরিত একটি যন্ত্রচালিত নৌকা করে তাঁদের ভাগীরথী পার করে দেন বিদুরের চরবাহিনী। মহাভারতীয় তথ্য বলে: "পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর হইতে বনে পলায়ন করিলে মহাত্মা বিদুর একজন বিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে মাতৃসমবেত

পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাপ করিতেছেন। অলৌকিক ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও বুঝিতে পারে···সুতরাং তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমারুতগামিনী যন্ত্রপতাকাশালিনী (যন্ত্রচালিত ও পালযুক্ত) বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল।" (আদি, কালীপ্রসন্ন)

মনের মত দ্রুতগামী যন্ত্রচালিত ও বাতসহা পালযুক্ত নৌকা? এ নৌকা কি আধুনিক মোটর-বোট বা তার থেকে উন্নতধরনের প্রযুক্তিবিদ্যায় নির্মিত কোনো জলযান নয়? বাতসহা পাল কি বানানো হত কোনো প্যারাসুট জাতীয় চাদরে?

জতুগৃহে বিদুর প্রেরিত খনক যে সুড়ঙ্গটি নিঃশব্দে ও শত্রুপক্ষের অগোচরে অত্যল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ করে যান, সেটি নিশ্চয় অলৌকিক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা নির্মিত হয়নি। তেমন হলে বিদুরকে বিশেষজ্ঞ কোনও বিশ্বস্ত খনক প্রেরণ করতে হত না। তা হলে কোন্ বিশেষ যান্ত্রিক সহায়তায় অমন একটি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হয়েছিল? একজন নয়, পাঁচ পাণ্ডবসহ কুন্তীদেবী সেই সুড়ঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। গুহার আকৃতি অতএব বেশ বড়ই ছিল বলতে হবে এবং তা উত্তমভাবে নিশ্চয় পরিষ্কৃতও ছিল। বিদুর কুন্তী ও কুন্তীপুত্রদের দুঃখ-কষ্ট একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তাঁদের জন্য ব্যবস্থা নিশ্চয় বেশ পাকাভাবেই করা হয়েছিল।

সুড়ঙ্গ খননে লেসরের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকলে নিঃশব্দে এবং খনিত মাটি ও আবর্জনার সমস্যা সমাধান করে একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গ বানানো হয়ত অসম্ভব ছিল না। দানিকেন পুরাযুগে সুড়ঙ্গ খননের প্রসঙ্গে দুটি অত্যাধুনিক প্রাযুক্তিক উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরে হাজার মাইলব্যাপী এক সুড়ঙ্গশ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে। হোয়ান মরিস আবিষ্কৃত সেই সুদীর্ঘ ও বিশাল প্রাগৈতিহাসিক বস্তুসম্ভারসমৃদ্ধ গুহাশ্রেণীর মধ্যে অবতরণ করেন দানিকেন। অতি অদ্ভুত সুড়ঙ্গনগরটি কীভাবে বানানো হয়েছিল সে সম্পর্কে দানিকেনের মনে প্রশ্ন জাগে।

ভেবে-চিন্তে দানিকেনের মনে হয়, অমন পাতালপ্রাসাদ তৈরী করা সম্ভব একমাত্র Thermal drill অথবা Mini atomic reactor-এর সাহায্যে। অন্তত আমাদের বিজ্ঞান ঐ ব্যাপারে এমনি অত্যাধুনিক পন্থা আবিষ্কার করেছে। দানিকেন গ্রন্থের ('বীজ ও মহাবিশ্ব') অনুবাদক অজিত দত্ত

এইভাবে প্রসঙ্গটি পরিবেশন করেছেন: "সুড়ঙ্গ (হোয়ান মরিসের পাতাল প্রাসাদ) কাটতে গিয়ে মাটি, পাথরের আবর্জনার যে পাহাড় বেরিয়েছিল, তা নিয়ে তারা নিশ্চয় জবর মুস্কিলে পড়েনি। তাদের হাতে যে অকল্পনীয় উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল, তারই দ্বারা (সেকালের নভশ্চর ইশ্বীয় দেবতারা) আবর্জনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।" (ব্রাকেট আমার)।

এমন একটি সিদ্ধান্তে দানিকেন উপনীত হয়েছেন ঐ 'থারমল ড্রিল' ও 'মিনি অ্যাটোমিক রি-অ্যাকটরে'র কথা ভেবেই।

"১৯৭২ সালের ২রা এপ্রিলের দ্যের স্পীগেল-এ (Der Spigel) সর্বাধুনিক একটা আবিষ্কারের কথা লিখেছিল। তার নাম, 'তাপ-বেধক' (Thermal drill); সম্ভবত সেই রকম যন্ত্র তাদেরও হাতে ছিল।...

"(এই যন্ত্র দিয়ে) গর্ত খুঁড়লে কোনো আবর্জনা বেরিয়ে আসবে না। পাথর ফুটো করার সময় 'তাপ-বেধক' তাকে গলিয়ে ফুটো করে, এবং গলিত প্রস্তরকে গর্তের গায়ে চেপে দেয়। অর্থাৎ গলা পাথর গর্তের গায়েই জমে যায়। 'দ্যের স্পীগেল' লিখছে, প্রথম পরীক্ষামূলক যন্ত্রটি একটি বারো ফুট পুরু পাথরকে ফুটো করে ফেলেছিল প্রায় নিঃশব্দে।" (ঐ॥ ব্রাকেট আমার)

মিনি অ্যাটোমিক রি-অ্যাক্টরের সাহায্যে পরিচালিত আর এক ধরনের তাপ-বেধকের ক্ষমতা ঢের বেশি। সেই বেধক পারবে পঁচিশ মাইল পুরু ভূত্বক ভেদ করে সুড়ঙ্গ বানাতে।

এ ছাড়া ইলেকট্রন রশ্মির কথাও বলেছেন এরিক ফন দানিকেন। তবে এই রশ্মি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রাদি সংযোগী, জতুগৃহের সুড়ঙ্গ খননে তার ব্যবহার সম্ভবপর ছিল না। ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে পাতাল নগরী বানানো যায়। কে বলতে পারে, জলের তলায় পাতাল নগরী বানিয়ে সেদিন যাঁরা বসবাস করেছেন তাঁদের হাতে ঐসব কৌশল ছিল কি না।

যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে পুরোচন জতুগৃহটি প্রস্তুত করান তাও যে সামান্য কর্ম নয় অথচ অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডও নয়, আজকের সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হয়ত এ প্রশ্নে আমার সঙ্গে কোনও মতদ্বৈধ রাখবেন না।

জতুগৃহপর্বটিও জাগতিক ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও হিংসাহিংসীর ইতিবৃত্ত, কোনো ধর্মাধর্মের রূপক কথাকাহিনী নয়। এই পর্বাধ্যায় থেকেই দেবশিবির পরোক্ষ-ভাবে পাণ্ডবদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। দেবানুচর বিদুর সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ক্ষমতাসীন দুর্যোধনের রাজনৈতিক আঘাতগুলি প্রতিহত করার জন্য। যে যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও কারিগর দ্বারা বিদুর রাজদ্রোহীদের সহায়তায়

সাফল্যলাভ করেছেন, সেগুলির বিস্ময়কর ক্ষমতা তৎকালীন ভারতীয় রাজন্য-বর্গেরও কল্পনাতীত ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের বেতনভুক বিদুর সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তাহলে অধিকতর কোনো উন্নত শক্তিশিবিরের কাছ থেকেই। দেবশিবির ভিন্ন এ শক্তি তাঁকে আর কে-ই-বা প্রেরণ করার ক্ষমতা রাখতেন ?

মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পাঁচটি ছেলের হাত ধরে যে ক্ষুধার্ত্ত নিষাদমাতা অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে জতুগৃহে পাণ্ডবজননী কুন্তীর আশাতীত আতিথ্য লাভ করেছিলেন, বিদুরপ্রেরিত চরবাহিনীই তাঁদের খুঁজে পেতে ও প্রলোভিত করে জতুগৃহে এনে পৌঁছে দেন। দেবী কুন্তী বলির পাঁঠার মত সেই ছয়জন নির্বোধ অনার্যকে পেট পুরে খাইয়ে ও সুরাপানে উৎসাহিত করে মৃতপ্রায় করেন। তারপর শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে। নিরপরাধ সপুত্র নিষাদজননী পুড়ে মরলেন পঞ্চ পাণ্ডবদের প্রক্সি হিসেবে। মহাভারতকার সেই লোকান্তরিত আত্মাগুলির জন্য একবিন্দু চোখের জলেরও ব্যবস্থা রাখেননি। রাজমাতা কুন্তী সপুত্র সুস্থ আছেন, এই সংবাদটি জানানো হল মহা সাড়ম্বরে। পাণ্ডবদের জীবনের দাম ন্যায়নীতি অপেক্ষা অনেক বড়।

পাণ্ডবসহায় ব্যাসদেব

দেবচর বাহিনীর প্রধান ধর্মরাজ যম পাহারা দিতেন ব্রহ্মপুরা হিমালয়ের পার্বত্য দেবলোক। মর্ত্যলোক আর্যাবর্তে দেবস্বার্থ গুছিয়ে তোলার জন্য বিরাট এক চরবাহিনী পরিচালনা করতেন ধর্মখেতাবধারী বিদুর এবং সেই দুই ভুবনের সঙ্গে রীতিমত গোপন যোগাযোগ বজায় রেখে আর যে দুজন প্রথম শ্রেণীর পুরুষ ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সর্বদা বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের একজন দুর্বাসা, অপর প্রধান স্বয়ং কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। দেবকার্য সাধনে এঁদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। ইতিপূর্বে বর্তমান রচনাবলীর জায়গায় জায়গায় এবং আমার অগ্রবর্তী গ্রন্থে সেসব আলোচনা করেছি। ব্রহ্মার পরিকল্পনা সফল করার জন্য দুর্বাসা আবিষ্কার করেন কুন্তীকে। তাঁর প্রদত্ত দূরভাষ যন্ত্র ব্যবহার করে দেব-ঔরসে কুন্তী লাভ করেন তিন পাণ্ডব এবং কর্ণকে। বেদব্যাসের ভূমিকা সে পর্যন্ত খুব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। বেদব্যাসের ভূমিকা প্রথম প্রত্যক্ষ (যদিও দুর্লক্ষ্য) হয়ে ওঠে যখন তিনি মাতা সত্যবতীকে হস্তিনাপুর থেকে হঠাৎ-ই সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখনও কুরু পাণ্ডব কুমারদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ দানা বাঁধেনি। যুদ্ধের কোনো দূর সম্ভাবনাও ছিল না। তবুও বেদব্যাস সত্যবতীকে বললেন, তিনি জানতে পেরেছেন কুরুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং সত্যবতীর উচিত সেই নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা সুরু হওয়ার আগেই হস্তিনাপুর ত্যাগ করা। কোথায় জানলেন তিনি এ সংবাদ? ব্রহ্মার পরিকল্পনার শেষ পরিণতির কথা কি বেদব্যাস আগেই জেনেছিলেন? তিনি কি দেবানুচর? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগে। ঐ সময় থেকে বেদব্যাসের ক্রিয়া-কর্ম রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওদিকে জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবদের উদ্ধার করে তাঁদের যন্ত্রচালিত নৌকায় (স্পীড বোট?) তুলে দিয়ে গঙ্গাপারের জন্য হস্তিনাপুর থেকে বারণাবতে বিশ্বস্ত চরবাহিনীর সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রেরণ করেছিলেন বিদুর মহারাজ! পাণ্ডবরা রক্ষা পেয়ে রাজনৈতিক গুপ্তঘাতকের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারলেন। এর পরেই বেদব্যাসের ভূমিকা। দেবশিবির অতঃপর পাণ্ডবদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের হাতে।

খুব ধীর ভাবে চিন্তা করার পরই এই দায়িত্বভার হস্তান্তরিত করা হয়েছিল।

দেবতারা জানতেন, পাণ্ডবদের অতঃপর কুরু রাজ্যের সীমান্ত পার হয়ে বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে পৌঁছাতে হবে দেবানুগৃহীত এমন একটি রাজ্যে, যে দেশের রাজা মনে মনে অন্যতম কুরু-সেনাধিনায়ক দ্রোণাচার্যের প্রতি গভীর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। অতএব সেই দীর্ঘ পথপরিক্রমার কালে পাণ্ডবদের কাছে বিদুরের সাহায্য প্রেরণে অনেক বাধা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। অপর রাজ্যের মধ্য দিয়ে কুরু রাজ্যের মহামন্ত্রীর পক্ষে সাহায্য প্রেরণের কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। অপর রাজ্যের সতর্ক প্রহরীবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যেতে পারেন বিদুরবাহিনী এবং স্বয়ং বিদুরের পক্ষে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের অজ্ঞাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে পররাজ্যে গিয়ে সাক্ষাৎকার করাও সম্ভবপর নয়। মনে হয় এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই এরপর পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য নিয়োগ করা হয় ব্যাসদেবকে। তাঁর মত এক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানর্ষির পক্ষে তৎকালে যে কোনো রাজ্যে অবাধ বিচরণ করায় কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটবে না; বেদব্যাস কোথাও কোনো রাজ্যে কোনোরকম রাজনৈতিক পদমর্যাদায় সমাসীন নন। দুর্বাসার মত কোনো সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর দলপতিও নন তিনি। সুতরাং পাণ্ডবদের সাবধানে সবার অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বেদব্যাসই তখন সর্বোত্তম পুরুষ। চতুর দেবশিবির তাই এই পর্বের সমস্ত দেবপরিকল্পনা রূপায়ণের গুরু দায়িত্ব বেদব্যাসের ওপর অর্পণ করে অদ্ভুত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন। প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের জন্য তাঁরা নির্বাচন করেছেন সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। সার্থকতাও তাই হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। এসব পরিকল্পনা বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মাজীর শিবির থেকেই তৈরী হয়েছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সেই প্রখ্যাত ত্রিমূর্তিতে মিলে এই বিজাতীয় ব্রহ্মাণ্ডের এক পার্বত্য প্রদেশে বসে মুষ্টিমেয় স্বজাতীয়কে (দেবগণ) নিয়ে শাসন করে যেতে পেরেছেন আর্যাবর্তের তদানীন্তন মহাশক্তিশালী দেশীয় রাজন্যবর্গকে। তাই তো দেববাহিনীতে তাঁরা তিনজনই বিধাতাপুরুষ এবং পরম বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা সকল পরিকল্পনার জনক হিসেবে 'প্রজাপিতা' আখ্যায় বিভূষিত (প্রসঙ্গত, মর্ত্যবাসীর দ্বারা প্রদত্ত 'জাতির পিতা' খেতাবটি স্মরণীয়। আমরাও আমাদের পরিচালক-বৃন্দকে 'পিতা' অভিধায় সম্মানিত করি)।

বারণাবতের জতুগৃহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর বিভিন্ন বনপথে পাণ্ডবদের গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এই সময় হিড়িম্ব রাক্ষসরাজের পরমাসুন্দরী ভগ্নী হিড়িম্বার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন। ভীমের মধ্যে যে অনার্যসুলভ চারিত্র্যধর্ম সর্বদাই পরিস্ফুট, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে

তাই একটি তর্ক রেখেছিলাম। প্রশ্ন ছিল, ভীম কি কোনো দেবপ্রিয় অনার্য বীরের বীর্যসম্ভূত? কুন্তী যুধিষ্ঠির বিনা তর্কে ভীমকে অনার্যা কন্যা হিড়িম্বার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পাণ্ডব ভ্রাতৃপঞ্চকের মধ্যে ভীমই প্রথম বিবাহের অধিকার ভোগ করলেন। যুধিষ্ঠিরের আগে ভীমের বিবাহ নিয়ে কোনো প্রশ্নও উত্থাপিত হল না। ভীম যেন পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম হয়েও সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র। তিনি পরাক্রমশালী রাক্ষসপুত্র ঘটোৎকচের জনক। কিন্তু বায়ু-দেবতার কুলজি সম্যক ঘাঁটাঘাঁটি না করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো মতামত নথিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই সন্দেহটির উল্লেখ রেখেছি ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য।

কিন্তু সে যাই হোক, সংক্ষেপে ঘটোৎকচ জন্মের খবর দিয়েই কথক বৈশম্পায়ন প্রসঙ্গান্তরে গেছেন। যে জনমেজয় প্রতিটি ঘটনাকে সবিস্তারে বর্ণনার জন্য প্রতিক্ষেত্রে আবেদন রেখেছেন, ভীম-হিড়িম্বা-ঘটোৎকচপর্ব নিয়ে দেখলাম, জনমেজয়ও বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করলেন না। অথচ ভীমও মহাবীর। কুরুক্ষেত্রে তিনি একা যে লড়াইটা লড়েছেন, দৈব্যাস্ত্রে সজ্জিত ও দেবসমর-কুশলতায় সুশিক্ষিত অর্জুনও পারেননি সেই পরাক্রম প্রদর্শন করতে। মহাবীর জরাসন্ধকে তো ভীমই বধ করেছেন। দুর্যোধনও তাঁরই হাতে নিহত হন। তবু কি আশ্চর্য, অর্জুনকে হিরো বানাবার জন্য মহাভারতকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। এমনভাবে প্রতি পদক্ষেপে মহাকবির পৃষ্ঠপোষণা লাভের সৌভাগ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্যেও জোটেনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'অথর ব্যাকড' চরিত্রদ্বয় বোধ হয় পার্থ ও তদীয় সারথি শ্রীকৃষ্ণ। তা তাঁদের মধ্যেও পার্থই প্রধান।

ঘটোৎকচ জন্মের পর জননী কুন্তীকে নিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবরা যখন বন থেকে বনান্তর, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; পেরিয়ে গেলেন মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি রাজ্যের সীমানা, সহসা তখনই একদিন ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অন্তত গল্পকে সেভাবেই সযত্নে সাজানো হয়েছে, কিন্তু যিনি সতর্ক পাঠক, তাঁর কাছে মহাভারতকারও ফাঁকি দিতে পারেননি। স্বয়ং ব্যাসের বক্তব্যেই জানা যায়, সহসা নয়, পাণ্ডবদের খবরাখবর অলক্ষ্য থেকে ব্যাসদেব নিয়মিতই সংগ্রহ করতেন। কোনোও নেপথ্য দৃষ্টি সর্বদাই পাণ্ডবদের চোখে চোখে রেখেছিল। আর সেই অজ্ঞাত পাহারাদার যখন যেমন ঠিক তখন তেমনভাবেই তাদের খুঁটিনাটি সংবাদ প্রেরণ করতেন দেব-শিবিরে। ব্যাস সেই সংবাদসূত্র ধরেই উপস্থিত হয়েছেন পাণ্ডবদের মধ্যে।

উপযুক্ত সম্ভাষণাদির পর সেজন্যই আমরা ব্যাসদেবকে বলতে শুনলাম, "ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা তোমাদের যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বে

বুঝিতে পারিয়াছি, (কী করে? দূত মারফৎ?) এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধন মানসে এ স্থানে উপস্থিত হইলাম।" সান্ত্বনা দান করে তিনি আরও বললেন, "হে বৎসগণ! বিষণ্ণ হইও না; তোমরা পরিণামে সুখী হইবে।" যাবার সময় বলে গেলেন, শীঘ্রই আমি আবার আসব। যে পর্যন্ত না আসি, আমার জন্য সে পর্যন্ত তোমরা এখানেই প্রতীক্ষায় থাকো। (আদিপর্ব)। বোঝা গেল, পরিণামে ভারতের সিংহাসন পাণ্ডবদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে দেবশিবিরে।

একচক্রা নগরীতে পাণ্ডবদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন বাসস্থানের বন্দোবস্ত ব্যাসদেবই করে দিলেন। ব্যাসের আপন গোষ্ঠীভুক্ত এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন মাতাসহ পঞ্চপাণ্ডব। দেবশিবিরের পক্ষে ব্যাসদেবের দৌতকার্যের কথা ইতিপূর্বেও বলেছি। এখন থেকে সেই দূতিয়ালী অনেক বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

ব্যাসদেবের পুনরাগমনের কথা মাসখানেক পরে। কিন্তু তার আগেই পাণ্ডবদের গোপন আবাসে আর এক ব্রাহ্মণের পদার্পণ ঘটল।

মহাভারতে কোনো চরিত্রই অকারণে বা মহাকাব্যের খাতিরে উদিত অথবা অস্তমিত হন নি। পাণ্ডবদের অনুসরণ করে সকল মহাত্মাই আবির্ভূত হয়েছেন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, আগন্তুক ব্রাহ্মণটিও কোনোও নেপথ্য শক্তির দ্বারা নিযুক্ত হয়েই পাণ্ডবালয়ে সেদিন পদার্পণ করেছিলেন।

পাণ্ডবদের শিখিয়ে গেলেন তিনি আর্যাবর্তের ইতিহাস ভূগোল। দেশের রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে শীঘ্রই পঞ্চপাণ্ডব ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়তে চলেছেন। সুতরাং রাজনীতি, ইতিহাস ও ভূগোলে তাঁদের সম্যক জ্ঞান খুবই আবশ্যক। তাই দেখা গেল, হঠাৎ আবির্ভূত সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতার গৃহে থেকে গেলেন এবং পাণ্ডবদের নিয়ে সেখানে বসালেন একটি জরুরী পাঠচক্র।

মহাভারত জানাচ্ছেন: "ব্রাহ্মণ···অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ ব্যাপার সমুদয় কীর্তন করিলেন।" জ্ঞাতব্য সকল জ্ঞান প্রদানের পর তিনি পাড়লেন একেবারে আসল কথা। ব্রহ্মার পরিকল্পনার এটি তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে দুর্বাসার দৌত্যের ফলে কুন্তীর নির্বাচন এবং মানবীগর্ভে দেবপুত্র লাভের উপায় সম্পর্কে তাঁকে মন্ত্রণা দান করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদুরের পরামর্শক্রমে বরকর্তা ভীষ্ম কুন্তীকেই পাণ্ডুপত্নী হিসেবে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে বরণ করে আনেন। তৃতীয় অধ্যায়ে নামগুপ্ত ব্রাহ্মণটি পাণ্ডবদের প্রয়োজনীয়

শিক্ষা দান করে সংবাদ দিয়ে গেলেন আর এক রাজপুত্রীর, দেবশিবির যাঁকে আগে ভাগেই পাণ্ডব মহিষীরূপে তৈরী করে রেখেছেন। তিনি দ্রৌপদী।

কুন্তী যেমন দেব-মনোনীতা, দ্রৌপদীও তাই। বিবাহের বহু পূর্বেই দ্রৌপদী পাণ্ডবদের বাগদত্তা হয়ে আছেন। আশ্চর্য এই, বাগদান করেছেন স্বয়ং দেবাধি-নায়ক শঙ্করজীউ। এই বিবাহে পাত্রপক্ষের একমাত্র অভিভাবিকা কুন্তীর তাই করণীয় কিছুই ছিল না, তেমনিই দ্রৌপদীর পালক পিতা দ্রুপদেরও কোনো মতামত গৃহীত হয় নি। দেবশিবিরে পাণ্ডবজন্মের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবের জন্য তেমনিই মনোনীতা হয়েছিলেন একমাত্র একজনই নারী, যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা কিন্তু অরক্ষণীয়া এবং দেব-ইচ্ছায় যাঁকে শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়পত্নীই হতে হয় নি, মেনে নিতে হয়েছিল একই সঙ্গে পাঁচ পাঁচটি পুরুষের মালিকানা। পাঁচ ভাইকে একই সূত্রে গেঁথে তাদের মাঝে দেবতারা লকেটের মত ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণকন্যা দ্রৌপদীকে। একই নারীর বক্ষেনয়নে পঞ্চপাণ্ডবকে বেঁধে দেওয়া হল। চতুর বুদ্ধিমতী ও কুন্তীসমা লাস্যময়ী দ্রৌপদী আগলে রাখলেন তাঁদের সারা দিনমান তো বটেই, গভীর রাত্রেও ঐ পঞ্চপুরুষকে একের পর এক বাহুবন্ধনে বেঁধে রাখার গুরু দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত রইল। তাঁর অদ্ভুত মোহিনী মায়ার আবেষ্টনী ছাড়িয়ে কোনো একটি ভাইও অপরের থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার সুযোগ পেলেন না। শিয়রে কুন্তী, পাশে ও পদতলে দ্রৌপদী, এই মহাবন্ধনে আটকে রইলেন পাঁচ ভাই।

দ্রুপদ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞবেদি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন সালঙ্কারা দ্রৌপদী আর তাই তাঁর অন্য নাম, যাজ্ঞসেনী।

রূপকথার গল্পে যাঁদের আকর্ষণ, তাঁদের কাছে এ কাহিনী খুব চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। সেদিনের ধর্মান্ধ জনগণ তো বটেই, স্বয়ং রাজা জনমেজয়ও বিশ্বাস করেছিলেন যজ্ঞকুণ্ড থেকে রথারোহী বর্মখড়্গধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর আবির্ভাব-কাহিনী। কিন্তু মহাভারত কথকতা এবং তার নেপথ্য ইতিকথার মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য আমরা সন্ধান করে খুঁজে পেয়েছি, সেই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের পর যজ্ঞসেন ও যাজ্ঞসেনীকে বিনা তর্কে মেনে নিতে পারছি না। চতুর দেবশিবির এই পর্বেও যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন আমাদের দুর্বিনীত চোখে তাও ধরা পড়ে যাচ্ছে। আবহমানের বিশ্বাসকে এভাবে বারংবার আহত করার জন্য ভক্তিমান পাঠক পাঠিকার কাছে ক্ষমা চাই। বলি, ক্ষমা করবেন, যদি মিথ্যার মেঘ সরিয়ে সত্যের আলোকচ্ছটায় স্তম্ভিত হতেও হয়, তবু ক্ষণকালের জন্য মোহাবেশ কাটিয়ে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন, আপনার পূর্বপুরুষগণের কীর্তি ; বুঝতে পারবেন, দুর্লক্ষ্য বায়ুস্তরের মত পরতে পরতে চাপানো কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হালকা মিথ্যারাজিকে ন্যুব্জপৃষ্ঠে যুগ যুগান্ত বহন করে আসছি আমরা। বইতে বইতে সর্বংসহ বাহক যেমন ভুলে যায় তার বোঝার ভার, মুখ থুবড়ে না পড়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না কখন সে ভার গুরুভারে পরিণত হয়েছে, বিশ্বাসীর মানসিক অবস্থাও ঠিক সেভাবেই অচেতন হয়ে থাকে। আঘাত জোরদার না-হলে সে-ও সত্য মিথ্যার ফারাক বোঝে না।

রাজা দ্রুপদ এককালে ছিলেন দ্রোণাচার্যের প্রিয় সখা। রাজ্যলাভের পর দরিদ্র দ্রোণের বন্ধুত্ব তিনি সঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। আর কুরু রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু হওয়ার পর দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ করে দ্রুপদের অর্ধেক রাজত্ব কেড়ে নিয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন দ্রোণাচার্য। তখন থেকে দ্রুপদের অন্তঃকরণ দ্বেষ হিংসা ও অবমাননায় পুড়ে পুড়ে উত্তপ্ত হচ্ছিল। একমাত্র চিন্তা, দ্রোণের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? নিজের যা মুরোদ, তাতে দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদ কোনদিনই এঁটে উঠতে পারবেন না। তাই চিরাচরিত ভারতীয় চরিত্র দ্রুপদের মধ্যেও ফুঁশে উঠল।

চললেন তিনি বহিঃশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে। ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা আলেকজান্দারের আমল থেকে বার বার ঘটেছে। প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ আত্মসমর্পণ করেছেন বৈদেশিক শক্তির কাছে। মীরজাফর শুধু বাঙলারই কলঙ্ক নন, ভারতের ইতিহাসে রাজা-রাজড়া আমীর ওমরাহ, এমন কি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে শত শত মীরজাফর আকছার ছড়িয়ে আছে। সামান্য স্বার্থ পূরণের জন্য অমন অনায়াস অবহেলায় বোধহয় পৃথ্বীবাসী আর কেউ কোথাও তাদের জাতীয় স্বার্থকে ষড়যন্ত্র করে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। পাণ্ডব ও পাঞ্চালরা একদিন সেই পাপই করেছিলেন। রাজা দ্রুপদ সেই কুকর্মের অন্যতম পাণ্ডা।

হিমালয়ের দেবশিবিরে আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রভুরা সমাসীন (দা. ম. স্ব. দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণরা ঐ দেবশক্তির স্তাবকতা করে গড়ে তুলেছেন দেবভজনাকারী এক পুরোহিত গোষ্ঠী। বুদ্ধিমান দেহধারী দেবতারাও আশ্বাস দিয়েছেন তাঁদের ভারতের সর্বময় ক্ষমতা তাঁরা তুলে দেবেন পুরোহিত শ্রেণীরই হাতে। পুরোহিতরা তাই দেবশিবিরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এজেন্টের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। দেবশিবিরের সাহায্য পেতে হলে প্রয়োজন হয় এজেন্ট পুরোহিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার।

রাজা দ্রুপদ তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য একদিন খুঁজতে বের হলেন তেমনিই একজন ক্ষমতাবান এজেন্টকে।

ভাগীরথী তীরে কল্মাষীর সন্নিকটে যাজ ও উপযাজের আশ্রম। পাঞ্চালরাজ কল্মাষপাদের মহর্ষি উপযাজকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনোরূপ দৈবকার্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্বুদ গো দান করিব, অঙ্গীকার করিতেছি। অথবা আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই।'

উপযাজ সৎ ব্যক্তি। সরাসরি দ্রোণবিনাশের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। হতাশ রাজাকে ফিরে যেতে হল ভাঙা মনে। কিন্তু বছর খানেক পরে দ্রুপদের কাছে উপযাজই একটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি নতুন যেসব শর্ত রাজাকে নিবেদন করে যান সেগুলি পরে রাজার নিজস্ব স্বীকৃতিতে জানানো হলেও ঘটনা পরম্পরায় আমরা বুঝতে পারলাম, রাজা দ্রুপদ উপযাজের শর্তগুলিই মেনে নিয়ে উপস্থিত হন দেবকার্য সাধনে—নির্বিচারী উপযাজভ্রাতা যাজের কাছে।

উপযাজকে দ্রুপদ এক অর্বুদ গো দানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নতুন শর্তে তা

আটগুণ বর্ধিত হল। দ্রুপদ কবুল করলেন, কার্যোদ্ধার হলে ব্রাহ্মণ যাজকে তিনি দেবেন 'অষ্ট অর্বুদ' গোধন। দ্রুপদ ব্রাহ্মণের 'ফী' বাড়িয়ে আটগুণ বা দশগুণ করলেও আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু চমকে উঠলাম তখন, দ্রুপদ যখন দ্বিতীয় অথচ প্রধান এক শর্ত মেনে নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে সরাসরি এক ষড়যন্ত্রে সামিল হয়ে কেবলমাত্র নিজের প্রতিহিংসা মেটানোর জন্য পাঞ্চালের সমস্ত স্বাধীনতাকে ব্রাহ্মণ্যপ্রতাপের তথা দেবশিবিরের কাছে অক্লেশে সমর্পণ করে বললেন, 'হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রতেজ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-তেজই উৎকৃষ্ট (দ্রুপদ নিজে ক্ষত্রিয়) অতএব আমি ক্ষত্রিয় বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশায় আপনাকে অষ্ট অর্বুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি······"

পাক্কা এক বছর পর উপযাজ দ্রুপদগৃহে এসে রাজাকে যাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা পাকাপাকি করে নিতে বলেন। এসব ঘটনা লক্ষ্য করলে মনে হয়, দ্রুপদের প্রস্তাবটি নিয়ে যাজ উপযাজ এবং তাঁদের রক্ষক দেবশিবিরের মধ্যে দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা হয়েছিল। মনে হয়, সেই আলোচনারই ফলশ্রুতি উপযাজের দ্রুপদরাজগৃহে আগমন ও নতুন প্রস্তাব উত্থাপন। নতুন প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ তথা দেবশিবিরের কাছে পাঞ্চালপতির নিঃশর্ত বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। দ্রুপদের কথায়ও এ ঘটনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। দ্রুপদ বলেছেন, 'ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি।' অর্থাৎ বেশ উল্টেপাল্টে ভেবেই সঙ্কল্প স্থির করেছিলেন তিনি। দ্রোণ বধের জন্য তাঁর রাজশক্তিকে তিনি ব্রহ্মতেজের পদানত করতেও কুণ্ঠিত হননি। একেই বলে, সর্ব ধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অর্থাৎ আর সব কিছু ত্যাগ করে কেবলমাত্র 'আমার' (দেবশক্তির) আশ্রয় গ্রহণ কর, অভীষ্ট ফল লাভ হবে। দ্রোণবধের জন্য দুর্বল দ্রুপদ তাঁর ক্ষাত্রতেজকে ব্রহ্মতেজের পাদমূলে সমর্পণ করে তবেই লাভ করেছেন দৈব-প্রসাদ। সে বস্তু কেমন, এবার সে কথায় আসা যাক।

পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ হল মহাসমারোহে। কিন্তু যজ্ঞ বলতে আজ আমরা যে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতিকে বুঝি, সেকালেও যজ্ঞ যে তাই ছিল এমন নয়। যজ্ঞ বলতে আড়ম্বরপূর্ণ সভাকে বোঝাতো। তাতে আমন্ত্রিত হতেন রাজা ও মহামান্য ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও হিমালয়-প্রবাসী ভিনগ্রহের দেবতা নামক বিশেষ বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষগণ।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি অথর্ববেদে সে সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

যজ্ঞ সম্পর্কে 'অথর্ববেদের বিশ্লেষণ আমি শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থটি থেকে সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি।

শ্রীমিত্র লিখেছেন: "যজ্ঞ বলতে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে ঠিক কি বোঝাতো ...অথর্ববেদ এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।...পূর্বে যেখানে দেবজাতীয় সাধ্যগণ ছিলেন সেখানেই প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান হয়।" এ কথার অর্থ কি? যজ্ঞানুষ্ঠান জিনিসটি কি পৃথিবী নামক এই নীল গ্রহের আচরণীয় কোনো ব্যাপার ছিল না, দেবগণই এই আনুষ্ঠানিক রীতিটি পৃথিবীতে আনয়ন করেন অন্য কোনো লোক থেকে (গ্রহান্তর থেকে)?

দেবতারা যে আকাশপথে আকাশযানে চেপে একদিন মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন এবং মর্ত্য-অমর্ত্যবাসীদের (দেবতাদের) মধ্যে পার্থক্য ছিল গ্রহান্তর-প্রমাণ, অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের দশম সূক্তে আছে তারও আভাস। মর্ত্যাগমনের পর দেবসভ্যতা ও মানবসভ্যতার মিলন ও আদান-প্রদান ঘটতে থাকলে অথর্ববেদ সে ইতিহাস এই ভাবে ধরে রাখলেন: অমর্ত্যঃ মর্ত্যেনা সযোনিঃ (৯।১০।১৬)।

অমর্ত্যগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মর্ত্যে আগমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে মর্ত্যবাসী তখন অনভিজ্ঞ। তাই দেবতারা অনায়াসে পৃথিবী পরিক্রমায় এসেছেন, কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট মানবকে তাঁরা মহাকাশে তুলে নিয়ে গেলেও মর্ত্যবাসীরা দেবতাদের বাসস্থান সেই গ্রহে যাওয়ার প্রাযুক্তিক উপায় উদ্ভাবন করতে পারেননি। (দা-ম-স্ব-দ্রঃ)। অথচ দেবলোকে গিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা মর্ত্যবাসী চিরকাল মনে মনে পোষণ করেছেন। অথর্ববেদে তাই প্রার্থনা আছে, "হে অগ্নি, তুমি আমাদের সেই পথ চিনিয়ে দাও। আমরাও সূর্যরশ্মিতে উদ্ভাসিত সেই স্বর্গলোকে গিয়ে যজ্ঞ করব, তুমি আমাদের সাহায্য কর।" (অ-১১।১।৩৬)।

শ্রীমিত্র লিখেছেন: "পূর্বে যেখানে দেবজাতীয় সাধ্যগণ ছিলেন, সেখানেই প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান হয়।" জানিয়েছেন, "আদিতে যজ্ঞে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না। এটি ছিল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী কালের মত বৃহদায়তন অনুষ্ঠানও এটি ছিল না। দেবতা ও দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপর জাতীয় নেতাগণ নানা উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। তখন তাঁরা সোমপাত্র ও সমারোহপূর্বক আহারাদি ও বিবিধ উৎসবের আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে ভক্ত সম্মেলনের নেতাকে বিশেষভাবে সোমরস প্রদান করা হ'ত মাননীয় অতিথি হিসাবে।" এর পর শ্রীমিত্র তাঁর অপূর্ব ও যথার্থ ব্যাখ্যাটি

হাজির করে বলেছেন, "মর্ত্যবাসীরা যখন দেখলেন বিবিধ আহার্য উৎসর্গ করলে শক্তিমান দেবলোকের সহায়তা পাওয়া যায় তখন তাঁরা দেবতাদের আহ্বান করে এইরকম আহার্য ও উপঢৌকন প্রদান করতে লাগলেন।"

বাইবেলের কোনো কোনো অংশ উদ্ধার করে পূর্ববর্তী গ্রন্থে আমি বলেছি, দেবতা নামক ভিনগ্রহীদের তুষ্টি বিধানের জন্য উপঢৌকন ও আহার উৎসর্গের রীতি শুধু ভারতেই নয়, সেকালে অন্যত্রও সুপ্রচলিত হয়েছিল। অধিকতর ক্ষমতাশালী তথাকথিত দেবগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শীতল পার্বত্য প্রদেশে (সম্ভবতঃ তাঁরা এসেছিলেন শীতপ্রধান পর্বতময় কোনো গ্রহলোক থেকে) শিবির গেড়ে বিভিন্ন জাতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীব্যাপী তাই তো এতো জাতি, আর এতো বিভিন্ন দেবতা। এতো ভাষা ও এতো ধর্ম।

যাই হোক, কথা হচ্ছিল যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে। শ্রীমিত্র লিখেছেন, "পরবর্তীকালে যেমন সব বিষয়ে হয়েছে তেমনি এই ব্যাপারটিও (যজ্ঞানুষ্ঠান) একটি সুবিস্তৃত পূজার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।" বলাই বাহুল্য, শ্রীমিত্রের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র মতপার্থক্য ঘটার কারণ নেই। আমরাও বলছিলাম, দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কোনও অলৌকিক পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত্র-প্রাপ্তির ব্যাপার নয়, এটিও ছিল একটি মহাসম্মিলন, এই সম্মেলনে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের জন্য চর্বচোষ্য পেয় ও প্রদানযোগ্য সামগ্রীর আয়োজনও ছিল বেশ বৃহদাকার। কিন্তু এই যজ্ঞে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ নেই। এই ব্যতিক্রমটি লক্ষণীয়। সাধারণত যজ্ঞানুষ্ঠানে এমন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমনটি যখন ঘটেছিল তখন বুঝতে হয়, যজ্ঞ হয়েছিল বেশ গোপনতা বজায় রেখেই। যজ্ঞে সঠিক কারা উপস্থিত ছিলেন, কারা সে যজ্ঞের সাক্ষী, মহাভারত তা উল্লেখ করেননি। বলা হয়েছে, যজ্ঞে শুধু পাঞ্চালদেশীয় ইতর সাধারণ উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধিমান চতুর ও রাজনীতি-অভিজ্ঞ মান্যগণ্যদের সাবধানে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যজ্ঞভূমি থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর উদ্ভব ব্যাপারটির ফাঁক ফাঁকি পাছে ধরা পড়ে যায় সম্ভবত সেইজন্যই অমন সাবধানতা।

বলা হয়েছে, যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রথারোহণে বর্ম-খড়্গাধারী পূর্ণ যুবাপুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহনাদ করতে করতে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন। তারপর সর্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটল যজ্ঞবেদী থেকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তৎকালীন ইতর সাধারণকে এই সামান্য ম্যাজিকটুকু দেখানো এমন কিছু ব্যাপার ছিল না। আজকের একজন সাধারণ শ্রেণীর যাদুকরও পারেন হাজার দর্শকের সামনে স্টেজের ওপর সাজানো ফাঁকা বাক্স থেকে হঠাৎ কোনো

সুন্দরীকে বার করে দিতে। যা 'অনলমধ্য হইতে উত্থান', তা তো প্রজ্বলিত অগ্নির নেপথ্যে আবির্ভাবও হতে পারে।

পুরোহিত উপযাজ যখন তাঁর যাদু-ভেল্কির আয়োজন সাজিয়ে রাজমহিষীকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান জানালেন, আশ্চর্য, সে আহ্বান কিন্তু দ্রুপদমহিষী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্ভবত তিনি বয়স্ক দত্তক পুত্রের জননী হতে রাজী ছিলেন না। রাজমহিষীর এমত আচরণে ক্ষুব্ধ যাজ বলেছেন, "হে রাজপত্নি! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপযাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না। অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে।" এ কথার সরল অর্থ তো এই: রাজা দ্রুপদ এখন আমাদের অধীন, হে রাজরাণি, তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা আর ফলপ্রসূ নয়। এখন আমরা আমাদের অভীষ্ট অবশ্যই 'সম্পাদন করিব'। এবং বস্তুত তা-ই হ'ল। দ্রুপদ চেয়েছিলেন দ্রোণবিনাশকারী শক্তিধর এক পুত্র। দেবব্রাহ্মণরা তাঁর ওপর চাপিয়ে দিলেন একটি দেবকন্যাকেও। ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা সেই দেবকন্যা দ্রৌপদী ব্রহ্মার পরিকল্পনা অর্থাৎ দেবকার্য সাধনে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিলেন, যা নভশ্চর দেবতারা ব্যবহার করেছেন পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে একসূত্রে আবদ্ধ করে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য। দ্রৌপদীকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। পাণ্ডবদের আদেশ করা হয়েছিল, বিধিবহির্ভূত হলেও একমাত্র দ্রৌপদীকেই পাঁচ ভাইয়ের সহধর্মিণীর মর্যাদা দান করতে হবে। দেবপক্ষ-প্রেরিতা দ্রৌপদী দিবারাত্র পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গিনী হিসেবে তাঁদের সর্বদা চোখে চোখে রেখেছেন। নিরুৎসাহী হলে তিনিই তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন যুদ্ধোন্মাদনার উৎসাহ। প্রভাব বিস্তার করেছেন প্রত্যেকের ওপর। তাঁর কুলশীল পরিচয়, সুতরাং, আমাদের এর পর ভালোভাবে জানা দরকার।

"তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ এক ক্রোশ পর্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, মানুষী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (আদিপর্ব, কালীপ্রসন্ন)।

নভশ্চর দেবতাদের পুরোপুরি স্বজাতীয়া হ'ন বা না হ'ন, এই কন্যার জন্ম যদি পৃথ্বীমানবের সঙ্গে দেবজাতীয়া নারীর মিলনের ফলশ্রুতি হ'য়ে থাকে তবে সেটাও কিছুমাত্র আশ্চর্যের ঘটনা হয়নি।

শ্যামলবর্ণা, তাই নাম তাঁর কৃষ্ণা; পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দত্তক কন্যা, তাই অন্য নাম, পাঞ্চালী ও দ্রৌপদী। কিন্তু তিনি যে খাঁটি মানবী, অর্থাৎ এই গ্রহের

নরনারীর মিলন সহবাসে জাত, এমন কথা সুস্পষ্টভাবে লিখিত নেই। কন্যার কেশবর্ণের বর্ণনা করে মহাভারত বলেছেন, চুল তাঁর ঘন নীল এবং আকুঞ্চিত। নীল-নয়না নারীর খবর আমরা জানি, কিন্তু নীল আকুঞ্চিত কেশের অধিকারিণীর সংবাদ পাইনি কোথাও। দ্রৌপদীর চুল নীল কেন? কেনই বা তাঁর পটের ছবিতে আঁকা দেবীমূর্তির চোখের মতো অতি বিস্তীর্ণ আঁখিপদ্মের বর্ণনা পাওয়া গেল মহাভারতের শ্লোক মধ্যে? তবে কি তিনি সাধারণ মানবী অপেক্ষা স্বতন্ত্র? মহাভারত বলে, মানুষী মূর্তিতে তিনি যেন দেবকন্যা। সন্দেহ মনে চেপে বসে আরও দু'একটি কার্য-কারণ লক্ষ্য করে। সবারই ঠিকুজি কোষ্ঠী কুলজি এবং জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মহাভারত ত্রুটিহীনভাবে নাড়াচাড়া করে গেছেন, কিন্তু যে দ্রৌপদী মহাভারতে অন্যতম এক বিশিষ্ট চরিত্র, তাঁর পিতা-মাতার সুস্পষ্ট কোনো সংবাদ ঐ প্রকাণ্ড ইতিকথায় যথেষ্ট বিবৃত নেই! দ্রৌপদী সম্পর্কে প্রাথমিক সংবাদ সেই নামগুপ্ত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন পৃথা এবং পার্থগণ। শ্যামলবরণী কৃষ্ণার দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা তাঁর শ্রীমুখ থেকেই শোনা গেছে। যা জানা যায়নি, তা হ'ল কন্যার পিতা বা মাতার নাম ও কুলজি। ব্যাপারটি মহাভারতীয় তথ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম।

কৃষ্ণাকথা এর পর আমাদের শোনালেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তা তিনিও আলোচ্য ব্যাপারে অদ্ভুত রকম নীরব। ব্যাসদেব উপাখ্যানটি শোনাবার জন্যই সহসা পাণ্ডবালয়ে পুনরাগমন করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাছেও সঠিক কিছু উল্লেখ না করে তিনি শুধু বললেন, "কোন তপোবনে সর্বাঙ্গসুন্দরী সর্বগুণসম্পন্ন এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভর্তৃলাভে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি···পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন···। দেবাদিদেব মহাদেব··সন্তুষ্ট হইয়া··কহিলেন, 'হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চস্বামিলাভ হইবে।"

বেদব্যাসের এই ব্যাখ্যায় বোঝা গেল, তথাকথিত ঐ ঋষিকন্যাকে নভশ্চর দেবতাদের অধিনায়ক শঙ্কর আগে ভাগেই পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এই মনোনয়নের পরই সম্ভবত দেবানুচর ব্যাসদেবকে সংবাদটি পাণ্ডবদের গোচরীভূত করে আসার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। আদেশকালে দ্রৌপদীর সঠিক পরিচয় দেবশিবির স্বয়ং বেদব্যাসকেও হয় জানাননি, নয়ত তাঁর আসল পরিচয় পাণ্ডবদের কাছে গোপন রাখার জন্য বেদব্যাসের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, কোন এক তপোবনে কোন

এক ঋষিকন্যা বাস করতেন। এমনভাবে আর কোন বিশিষ্ট চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় কথা হ'ল, বলা হয়েছে, সে কন্যা খুবই দুর্ভাগিনী ছিলেন আর সেই দুর্ভাগ্যের অবসান কামনায় তাঁকে বেশ কিছুকাল ধরে মহাদেবকে তুষ্ট করতে হয়।

দ্রৌপদী-জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেবাধিনায়ক সেই রূপবতী অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি যথেষ্ট ঔদার্য প্রদর্শন করেননি। দ্রৌপদী-জীবনে দুর্ভাগ্যের অবসান তো হয়ইনি, বরং মেয়েটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণা চেয়েছিলেন এক স্বামী। তাঁকে বাধ্য করা হ'ল পঞ্চ ভ্রাতার অঙ্কশায়িনী হতে। কৃষ্ণা যখন সকাতরে বললেন, 'ভগবন্! আপনার নিকটে আমি সর্ব্বগুণপেত একমাত্র পতিলাভের বাসনা করি।' নিষ্ঠুর ভগবন্ সেই আবেদনে সাড়া দিলেন না।

মহাদেবের আদেশ জ্ঞাপন করে ব্যাসদেব কুন্তী ও পাণ্ডবদের বলেছেন, "সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্মিণী হইবেন ; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর।"

দেবতাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার রহস্য ও ধাপ্পাটি এ পর্বে পরিষ্কার হয়ে গেল। কৃষ্ণা দ্রুপদরাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেননি, যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নও জন্মগ্রহণ করেননি পাঞ্চাল রাজ্যে। তাঁরা দুজনেই পূর্ণ যুবক ও যুবতী অবস্থায় নভশ্চর দেবতাদের শিবির থেকে দ্রুপদের যজ্ঞে অর্থাৎ দ্রুপদ কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রেরিত হ'ন। জন্ম তাঁদের অন্যত্র। কোথায় এবং কার ঔরসে কার গর্ভে শুধু সে কথাই বলা হয়নি। দেববাহিনী প্রেরিত এই দুজন দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করলেন, এই সুস্পষ্ট বাক্যটিকে অবশ্য মিথ্যাচার না বলে তৎকালীন এক পুরোহিত-উক্তি বলেও ভাবা যেতে পারে। দত্তক পুত্রকন্যা দত্তক-গ্রহণকারীরই বংশাবলীর পরিচয় ধারণ করে। জন্মগ্রহণ করতে যা বোঝায় এক্ষেত্রে তা হয়নি। মহাভারতীয় তথ্যেই সে কথা জানা যাচ্ছে। আরও জানা যাচ্ছে, দ্রুপদ শুধু একটি পুত্র চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ওপর এক কন্যাকেও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আগেই বলেছি, এমন বয়স্ক পুত্রকন্যার জননী হওয়ার বাসনা দ্রুপদমহিষীর ছিল না। সেজন্য আহূত হলেও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হননি তিনি। পুরোহিত যাজ তখন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, রাজমহিষীর ইচ্ছা অনিচ্ছায় অতঃপর কিছুই এসে যায় না। কারণ দ্রুপদ ব্রহ্মণ্যপ্রতাপের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। এর পর ভেল্কি দেখিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণাকে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত করা হলে রাজমহিষী

একবার সেখানে উপস্থিত হন এবং সেই বর্ম-খড়্গাধারী এক পুত্র ও সালঙ্করা কৃষ্ণাকে দেখে অগত্যা পুরোহিত যাজকে বলেন, 'হে যাজ! ইহারা আমা ভিন্ন কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে।' পুরোহিত এই কথাটিই তো শুনতে চাইছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 'তথাস্তু।'

এই তো ঘটনা। কিন্তু রটনা হ'ল, যজ্ঞের ফলে দ্রুপদরাজার পুত্র ও কন্যা জন্মেছেন। এই অদ্ভুত কথা সেদিন সবাই বিশ্বাস করেছিলেন। আজকের এই যুক্তিতর্কের যুগেও যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করুন, দ্রৌপদী কে? অম্লান বদনে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জবাবে আপনাকে ঐ অবিশ্বাস্য গল্পটিই বিশ্বাস করতে বলবেন। বলবেন, কেন, দ্রৌপদী তো দ্রুপদকন্যা। উদ্ভূত হয়েছিলেন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মুনিকর্মের প্রভাবে। গল্প এভাবেই যুগান্তর পেরিয়ে গড়িয়ে চলছে। আর সেই গুরুভারে চাপা পড়ে থাকছে ইতিহাস।

ব্যাসদেবও বলেছেন, দ্রৌপদী দেবরূপিণী। সন্দেহ হয়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়েই হয়ত দেবজন গোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে। ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি দেখতে ছিলেন 'অতি ভয়ঙ্কর'। এমন সব মানব-মানবী হয় দেবদানব মিলনের ফলে জাত, অথবা দেবগোষ্ঠীরই কেউ।

দ্রৌপদী যে দেবজন গোষ্ঠীরই একজন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনীতে তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। সে কাহিনী আর এক চমকপ্রদ গল্প বলে। দ্রৌপদী নাকি সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাতে ছায়াসীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী। তবে কি বুঝতে হবে এই কালত্রয় যাবৎ একই দেবকন্যা দেবকার্য সাধনের জন্য গুপ্তচর হিসেবে তিনবার প্রেরিত হ'ন? ছায়াসীতা ও দ্রৌপদীরূপে তাঁকে রাজ-নৈতিক ঘটনাবর্তে বিজড়িত করা হয়। আসল সীতাকে সরিয়ে ফেলে রাবণের সঙ্গে তাল ঠুকে রাবণবধের ব্যবস্থা পাকা করেন ইনি। আবার কুরুবংশ ধ্বংস করার জন্য এঁকেই বরণ করে নিতে হয় পঞ্চ পুরুষের শয্যাসঙ্গিনীর জীবন। বন-বাদাড়ে ও পরপুরুষের অন্তঃপুরে বসবাস করে কাজ হাঁসিল করার জন্য এই রমণী কি বিশেষভাবে শিক্ষিতা ছিলেন? দেবচর বাহিনীর ট্রেনিং শিবির থেকে তাই কি এঁকে রাবণবধে ও কুরুবংশ বিনাশের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল? রমণী হয়েও উপযুক্ত ঘর সংসার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। সে কারণেই কি কৃষ্ণা ছিলেন দুর্ভাগিনী? রামায়ণ ও মহাভারত দুই যুগের কাহিনী। এই দুই যুগের কালগত ফারাক সেকালের হিসেবে হয়ত খুব বেশিও নয়। দুই গ্রন্থেই বহু চরিত্রের উল্লেখ আছে। তাঁরা রামায়ণ ও মহাভারত দুই যুগেই বর্তমান। আমাদের যুগাস্ত হয় বার বছরে। তৎকালে অতি সামান্য সময়। মানুষের জীবন তখন অনেক বেশি

দীর্ঘ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের সময় যুগান্তের কাল পরিমাণ কত ছিল ? প্রায় সমসাময়িক হলে দ্রৌপদীর পক্ষে সীতা হওয়াও অসম্ভব নয়।

সীতারূপিণী দ্রৌপদীর গল্পটি আমাদের সন্দেহকে অনেকাংশেই সমর্থন করবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী বলে : রামসীতা যখন বনবাসী তখন অগ্নি এলেন রামচন্দ্রের কাছে। বললেন, সাতদিনের মধ্যেই রাবণ সীতা হরণ করতে আসবেন। সুতরাং আপনি সীতাকে গোপনে লুকিয়ে রাখুন। রাম সীতাকে রক্ষার ভার গ্রহণ করার জন্য অগ্নিকেই অনুরোধ করলেন। অগ্নি আসল সীতাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন এবং রামচন্দ্রের কাছে রেখে গেলেন নকল সীতা বা এক ছায়া সীতাকে।

এইবার আমাদের বক্তব্যর সঙ্গে গল্পটি মিলিয়ে পড়া যাক। অগ্নি অর্থাৎ দেবতাদের প্রধান দূত দেবশিবিরের গুপ্তচরবিদ্যায় সুশিক্ষিত এক নারীকে রাজকন্যা সীতার জায়গায় নিযুক্ত করে যান। উদ্দেশ্য ছিল রাবণপুরীতে কৌশলে দেবগুপ্তচর প্রেরণ করে রাবণের ভাই বিভীষণের সঙ্গে লঙ্কাভাগের চক্রান্তটিকে ঐ কৰিতকর্মা নারীর মাধ্যমে বেশ আঁটো-সাঁটো করে তোলা। পরে রামচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষার ছল করে ছায়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত বলেন, অগ্নি পরীক্ষার সময় অগ্নি ছায়া সীতাকে নিয়ে যান ও আসল সীতাকে ফিরিয়ে দেন। দেবতাদের অদ্ভুতকর্মা সেই নারী-গুপ্তচরই পুনরায় দ্রৌপদী রূপে দেবকার্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিতা হন।

দেববিরোধী শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য দেবতারা বস্তুতই অভাবনীয় রাজনীতির খেলা খেলে গেছেন। এমন কৌশলী ও সুদূরপ্রসারী ভাবনায় লালিত রাজনীতি আমরা আজও আয়ত্ত করতে পারিনি।

'ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ'

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূরের মত মহাভারতীয় মহাত্মারা যখনই তর্কে সুবিধা করে উঠতে পারেননি তখনই বলেছেন, 'ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না।' উক্তিটি বিশেষ করে স্বয়ং ধর্ম যুধিষ্ঠিরের বাণী হিসেবে মহাভারতে লিখিত থাকায় অধিকতর চমকের সৃষ্টি করেছে। বাস্তবিক, যিনি দেবানুমোদিত ধর্মের ধারকবাহক হ'তে চলেছেন, তাঁর মুখে এমন অন্ধ অসহায় উক্তি চমকপ্রদ বৈকি। এ উক্তি ক্ষমার অযোগ্যও বটে। প্রকৃত অসহায়তার ক্ষমা আছে। কিন্তু যিনি ধর্মরাজরূপে অপরের পথপ্রদর্শক হতে চান, তাঁর মুখে এমন কথা বিরক্তির কারণ ঘটায় না কি? অসহায় যুধিষ্ঠির নিজে ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণে অক্ষম, অথচ প্রতি মুহূর্তে লঘুগুরু নির্বিশেষে তিনি ধর্মজ্ঞান বিতরণ করে থাকেন আত্মতুষ্ট ও আপনাকে আপনি প্রদত্ত এক সার্টিফিকেটের বলে। আশ্চর্য! এই ধর্মতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন।

রাজা দ্রুপদ যখন প্রস্তাব করলেন, পঞ্চ ভ্রাতা নয়, একমাত্র অর্জুনই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন, যুধিষ্ঠির তখন একটি প্রলম্ব বক্তৃতা করে রাজাকে স্তব্ধ করে দিলেন। বললেন, 'দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন।' কারণ, আগেই এ বিষয়ে জননী কুন্তী তাঁর অনুমতি প্রদান করেছেন। তাছাড়া তাঁরা পঞ্চ ভ্রাতা সর্বদাই সকল উৎকৃষ্ট বস্তু একসঙ্গে ভোগ করে থাকেন। এই চির-আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করা যাবে না। এটাই ধর্ম।

দ্রুপদ তাঁর সর্বস্ব দেবব্রাহ্মণ্যশক্তির কাছে সঁপে দিয়ে শূন্যগর্ভ রাজ-আড়ম্বর নিয়ে বসে আছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির তাঁকে বাগে পেয়ে যা ইচ্ছে হুকুম করতে পারেন বৈকি। হুকুম অবশ্য তাঁর নয়, স্বয়ং শঙ্করের। কুন্তীর অনুমতি অথবা পঞ্চ ভ্রাতার উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগের চির-আচরিত প্রথা কোনো যুক্তিই নয়, যুধিষ্ঠির এমন একটি প্রচলিত বিধিবিধান-বহির্ভূত দাবি উত্থাপনের জোর পেয়েছিলেন স্বয়ং দেবানুচর বেদব্যাসের কাছ থেকেই। একচক্রা নগরীতে ব্যাসদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নভশ্চর দেবতাদের নির্দেশ তাঁকে জানিয়ে গেছলেন। কুন্তীকেও বলে গেছলেন, দ্রৌপদী একই সংগে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী হবেন। সুতরাং কুন্তীর অনুমতিরও প্রশ্নই ওঠে না। বেদব্যাসের আদেশ মৌন-ভাবে মেনে নিতে হয়েছিল কুন্তীকে। তাছাড়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগ করা আর পাঁচ

ভাইয়ে মিলে দ্রৌপদীকে ভোগ করা নিশ্চয় একই ধরনের আচরণ নয়। সুতরাং যুক্তি হিসেবে কোনটিই না সৎ না জবরদস্ত। আসল কথা, ভীরু যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের মদতে রাজাকে আচ্ছা করে চোখ রাঙিয়ে দিলেন।

আমাদের সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আরও বললেন, 'আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ।' সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যুধিষ্ঠির না হয় কোনো হিড়িম্বার মনোহরণ করতে পারেননি, কিন্তু কদিন আগেই তো তিনি অনার্য কন্যা হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করতে ভীমকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য যথামতে সেই নৈনীতাল-কন্যা আদিবাসী পাহাড়িয়া সুন্দরী হিড়িম্বার সংগে ভীমের বিবাহ হয়নি। তা না হোক, স্বয়ং ভীম হিড়িম্বাকে বলেছিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব।" পৃথা ও পার্থগণসাক্ষাতে না হোক, ভীমের কথায় বোঝা যায়, অন্যত্র ভীম হিড়িম্বা হস্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন! তা না হলে ঘটোৎকচকে বৈধ সন্তান বলা যায়!

পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্ম অধর্ম লোকাচারের গতি প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। বড় বেশি সূক্ষ্ম তার স্বভাব। তাই দেখা যায়, একমাত্র যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর চার ভাইয়ের সংগে প্রচলিত বিধি বিধান মেনে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন না হলেও দ্রৌপদীকে পঞ্চ ভ্রাতার সহধর্মিণী হিসেবে সম্মানিত আসন দান করা হয়েছে। আদিপর্বে 'দ্রৌপদীর বিবাহ' অনুষ্ঠানের (কালীপ্রসন্ন) যে তথ্যাদি লিখিত আছে, তার থেকে জানা যায়, "বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন।" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিবাহ দানের পর পুরোহিত আর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন না। জানানো হ'ল, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরিণয়-পর্ব শেষ হতেই "অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।" তাহলে কি বুঝতে হবে, এই গর্হিত বা প্রথাবিরুদ্ধ বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণে পুরোহিত স্বয়ং অসম্মত ছিলেন এবং প্রথম পাণ্ডবের বিবাহ দিয়ে তাই তিনি রাজগৃহ পরিত্যাগ করেন? তাহলে কি বুঝব, বাকি চার পাণ্ডবের সঙ্গে প্রথামতে দ্রৌপদীর বিবাহই হয়নি? ঋষি বৈশম্পায়ন যখন অন্য কোনো তথ্য জ্ঞাপন করেননি, তখন সেটাই মানতে হয়। আর তাই মেনে নিলে, দ্রৌপদীর প্রতি প্রযুক্ত কৌরব পক্ষের কিছু কটূ উক্তি কেন পাণ্ডবরা মাথা নিচু করে হজম করেছিলেন, সেই গূঢ় রহস্যটিও অনেকটা যেন

পরিষ্কার হয়ে আসে। বুঝতে পারি, কৌরব পক্ষের ঘাড়ে দোষের বোঝা যত ভারি করে তোলা হয়েছে, বস্তুত ততটা দুষ্ট ছিলেন না কর্ণসহ ধার্তরাষ্ট্রগণ।

যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্ম ধর্মের কিছু পরিচয় সংগ্রহ করা গেল। এবার ফিরে আসি দ্রৌপদী বিবাহ বিষয়ক দ্রুপদের বক্তব্যে।

যুধিষ্ঠিরের যুক্তি রাজা দ্রুপদ মানতে পারেননি। তৎকালীন প্রথার উল্লেখ করে দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি শ্রবণগোচর করি নাই। আপনি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্মিক, আপনার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ আপনার উচিত হয় না।"

তখন তর্কে থেই না পেয়ে যুধিষ্ঠির গম্ভীর ভাবে বললেন, "ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না। পূর্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতি ক্রমেই চলিয়া থাকি।" (শেষ উক্তিতে ফাঁকি আছে, পূর্ব রীতি ছিল বৈদিক)। তারপর বললেন, "আমার মুখে অনৃত (মিথ্যা) বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না।" (পূর্ববর্তী আলোচনার দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের এই মূল্যবান বচনের যাথার্থ্য কি আমরা মেনে নিতে পারি?)

অবশেষে আদেশ দিলেন তিনি, "ইহা সনাতন ধর্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না।" যুধিষ্ঠির দেবশিবিরের বলে বলীয়ান, তাই বড় নিঃশঙ্ক বোধ করছেন। কিন্তু যা বেদবিরুদ্ধ, লোকাচার-বিরুদ্ধ অধর্ম বলে দ্রুপদ জানেন, তা কি তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে করতে পারেন? নাকি যুধিষ্ঠির বলছেন বলেই আমাদেরও মেনে নিতে হবে দ্রৌপদীর ঐ বহুপতি গ্রহণ সেকালে সনাতন প্রথানুযায়ী কাজই হয়েছিল? তবু দ্রুপদকেও মাথা হেঁট করে সেই অপ্রিয় কর্মটিই মান্য করতে হল যখন স্বয়ং ব্যাসদেব বিতণ্ডার মধ্যে এসে রাজাকে বললেন, দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গেই থাকতে হবে, কেননা সেটাই দেবাধিনায়ক শঙ্করের আদেশ।

আমরা শ্বাস রুদ্ধ করে ঘটনাক্রম লক্ষ্য করছিলাম। বেদব্যাসের কথায় বুঝলাম, নভশ্চর দেবতাদের অভিসন্ধিপূরণে যা-ই কর্তব্য, মহাভারতীয় পর্বে তাকেই সনাতন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরাণ মহাভারতে বেদ উপনিষদের কথা নতুন করে লেখা হয়েছে, কারণ সেটাই ছিল হিমালয়স্থ দেবশিবির তথা তদীয় পুরোহিতশ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক। আর সেজন্যই "ধর্ম

একটি সূক্ষ্ম পদার্থে" পরিণত হয়েছে। নিরাবয়ব এই ধর্মকে পরশ্রমভোগী একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি অবয়ব দান করা হয়েছিল।

যুধিষ্ঠিরের দার্শনিকতায় বিমুগ্ধ বুদ্ধদেব বসুও ('মহাভারতের কথা', ধর্ম: অধর্ম: স্বধর্ম—দ্রঃ) মহাভারতে বারম্বার উক্ত 'ধর্ম' শব্দটির ধাক্কায় কম আহত হননি। তিনি লিখেছেন, "সহস্রবার আবৃত্ত হ'লো কথাটা, নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও বিমর্দিত হ'লো। আর সেই বিতণ্ডা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারলাম শুধু এই কথাটুকু যে 'ধর্মের গতি সূক্ষ্ম!' সূক্ষ্ম—অনির্ণেয়—আমাদের পক্ষে প্রায়শই বিভ্রান্তিজনক! যা ঘটছে এবং মুখে যা বলা হচ্ছে সে দুটোর তুলনা করে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি যে ধর্ম এক বহুরূপী ধারণা; তা পারে অনেক বিপরীত আচরণকে সমর্থন যোগাতে…কত অনিশ্চিত এই ধর্ম, সংকটকালে কত অনির্ভরযোগ্য, তা মর্মে মর্মে আমরা অনুভব করলাম দ্যূত সভায়, যখন দ্রৌপদীর আর্তিময় প্রশ্ন শুনে কুরুবৃদ্ধেরা নীরব রইলেন, যুধিষ্ঠির নিঃস্পন্দ, মহামতি ভীষ্মের মুখে কোনো সদুত্তর যোগাল না।"

মহাভারতের বহুরূপী সেই ধর্ম যুগে যুগে আমাদের ক্ষুব্ধ ও প্রশ্নাতুর করেছে এভাবেই। প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি। কারণ যেমন জোরের সঙ্গে ধর্ম-সম্পর্কিত প্রশ্নটির জট ছাড়াতে হয়, তেমন জোর আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। আমরা বিনা প্রশ্নে আগেই মেনে নিয়েছি, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্ম, যুদ্ধবাজ তথাকথিত দেবতারা হিমালয়ের ধাপে ধাপে ছড়ানো মুঠো মুঠো ঈশ্বর। অর্থাৎ যে আমরা আগেই আত্মসমর্পিত, সেই আমাদের প্রশ্ন উত্থাপনের যোগ্যতা নেই। অতএব মন মানুক চাই না মানুক, মহাজনবাণী মেনে মহাভারতের ধর্মের যখন যে রূপটি বর্ণিত হয়েছে, ঢোঁক গিলে তা-ই মান্য করে এসেছি সবাই, পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে। আর এজন্যই ঐ সব ধর্ম-ধ্বজীদের সমর্থনে আমাদের নব নব গুরু পণ্ডিতরা চিত্তমনোহারী আনকোরা সব ব্যাখ্যা নব নব পাত্রে সাজিয়ে তুলে ধরেছেন। সংশয়কে অপ্রকাশিত রাখতে তাঁরাও পারেননি, কিন্তু সংস্কারের বশে তাঁরাই আবার আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন সেই সব সংশয়গুলিকেই ভালোতর যুক্তির সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অর্থাৎ দেবশিবির থেকে প্রাপ্তির ধারা বহুকাল শুষ্ক হয়ে গেলেও আবহমানকাল অদ্ভুত মোহগ্রস্তের মত আমরা দেবানুচরবৃত্তিই পালন করে আসছি। মনে মনে আশা, হাতে কিছু পাই না পাই, এভাবে দেবতোষণের ফলে মৃত্যুর পরপারে

উপস্থিত হয়ে অবশ্যই কিছু পারিতোষিক লাভ করা যাবে। হায়, বৃথা আশা কুহকিনী! বরং দেবস্বরূপকে সঠিক চিনে দেবানুচরদের কীর্তিকলাপ খতিয়ে দেখলে মনে হয়, এই দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে কেউ কেউ হয়ত কালে পরিত্রাণ লাভ করতেও পারি এবং তখনই সম্ভব প্রকৃত সত্য শিব ও সুন্দরকে আপন সত্যের মাধুরী দিয়ে আরাধনা করা। কিন্তু ধর্মের পাতা জালে ধরা পড়লে অসহায় ঈশ্বরই বহু দূরবর্তী অস্পষ্টতার মাঝে হারিয়ে যাবেন।

আপন মনের পবিত্র ঔদার্যের মধ্যে খোঁজ করলে দেখা যাবে, সত্য শিব ও সুন্দর আমার আপনার সবার মধ্যেই সহাস্যে সস্নেহে নিত্য বিরাজমান। এই মহাসৃষ্টির মাঝে প্রতি কণায় তাঁরই প্রতিবিম্ব। তাই তো কবি বলেন, হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ করো, তাঁকে পাবে। মানব-প্রেমিক বলেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, বোকার মত কোথায় তাঁর সন্ধানে ফিরছ! মহা প্রেমিক বলেন, ঈশ্বর নিয়ে বৃথা কালক্ষয় কেন? তোমার ধর্ম সাম্য, সবার সঙ্গে ভাগ করে নাও নিজের সাধ আহ্লাদকে, তৃপ্তি পাবে।

আর সেই মহাতৃপ্তিই তো অজ্ঞাতকুলশীলের মহান আসঙ্গানুভূতি। কিন্তু মজা এই, সহজ পথটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই ধার্মিকের মনে ভয় হয়, এই বুঝি তাঁর ঈশ্বর মঠ মন্দির ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। বেচারী ধার্মিক তখন তাঁর মঠ মন্দির গির্জার সিংহদুয়ারগুলিতে আরও বড় বড় তালা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। একবারও ভেবে দেখেন না, তালা ঝুলিয়ে যে বন্দীশালা তিনি রচনা করেন, তাতে তিনি নিজেই প্রধান কয়েদী, বাকি উন্মুক্ত দুনিয়ার পথে পথে ঈশ্বর তাঁর নিজের উপযুক্ত আলয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শত্রুতা হেতু দ্রোণাচার্যের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্বল আকাঙ্ক্ষা যদি রাজা দ্রুপদের বুদ্ধি বিবেচনাকে আচ্ছন্ন না করত, বহিরাগত দেববাহিনী ও পুরোহিততন্ত্রের কাছে হয়ত তাহলে দ্রুপদকে বিকিয়ে দিতে হত না পাঞ্চালের স্বাধীনতা। দুর্যোধন পক্ষে অন্যতম সেনাপতিরূপে তাঁকেও দেখা যেত কুরুক্ষেত্রে সমবেত ভারতীয় রাজন্যবর্গের পাশে বীরদর্পে সারিবদ্ধ হতে। সেদিন অধিকাংশ ভারতীয় রাজাই যা করেছিলেন, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দ্রুপদও তাই-ই করতেন ; অস্ত্র তুলে ধরতেন পুরোহিতপূজারী দেবস্তাবক পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। কেননা দ্রুপদের মধ্যেও ছিল সেই স্বাধীনচেতা মনোভাব যা তাঁকে ক্ষুব্ধ ও সপ্রশ্ন করেছিল।

কপট ধর্মব্যাখ্যাতা যুধিষ্ঠিরের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় বক্তৃতা মেনে নিতে পারেননি তিনি। মানতে পারেননি দ্রৌপদীর বহুস্বামিত্বকে বেদসম্মত ও ধর্মানুগ কার্য বলে। রাজার এহেন স্বাধীন মতবাদে বিচলিত হয়েছিলেন তাই যুধিষ্ঠির। তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুপদ-মনোশ্চাঞ্চল্যের সংবাদটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাত্ত্বিক বেদব্যাসের কাছে। যুধিষ্ঠিরের 'ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ'-জাতীয় বাণী রাজার ওপর প্রভাব বিস্তারে অসক্ষম জেনে ছুটে এসেছিলেন ব্যাসদেব। কিন্তু বৃথা, গালগল্পে দ্রুপদকে ভোলাতে তিনিও পারলেন না। অথচ গল্প বেশ সাড়ম্বরেই সুরু হয়েছিল। ব্যাস বলেছিলেন, কিছু অহঙ্কারী ইন্দ্রকে শাপভ্রষ্ট (পদচ্যুত ?) হতে হয়। (লক্ষণীয়, স্বয়ং ব্যাসদেবও 'ইন্দ্রগণ'—এই বহুবচন ব্যবহার করেন, যার অর্থ ইন্দ্র কোনো একক ব্যক্তি নন, পদবিমাত্র)। সেই শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রগণই পঞ্চপাণ্ডবরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দ্রৌপদী স্বয়ং লক্ষ্মী। (পঞ্চপাণ্ডবের কতরকম ব্যাখ্যা ? যখন যেমন প্রয়োজন, সেইমত নয় কি ?)।

দ্রুপদ কিন্তু বিশ্বাস করেন নি সেই গল্পকাহিনী। সম্ভবত পাণ্ডব-জন্মকথা তাঁরও শোনা ছিল। চোখের ওপরই তো তিনি দেখেছেন নীলকেশিনী কৃষ্ণার যজ্ঞভূমিতে আবির্ভাবের ভেল্কি। তাই যুগ যুগ ধরে যা আমরা বিশ্বাস করে এলাম, দেব-ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার হ'য়েও দ্রুপদ সে যুগেই সে বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলেন। হয়ত বেশ কিছু দেব-চতুরালী তাঁকে প্রভাবিত না করে বরং ভাবিতই করে তুলেছিল। স্বয়ং ব্যাসও তাই পারলেন না রাজা দ্রুপদকে তথাকথিত ধর্মের অহিফেন-বটিকাটি গায়ে হাত বুলিয়ে গিলিয়ে দিতে।

অবিশ্বাসী দ্রুপদকে অতঃপর বাগে আনতে দেবলোকের তাত্ত্বিক পুরুষ ব্যাসদেবকেও যুধিষ্ঠিরের মতই ব্যবহার করতে হ'ল সর্বশেষ অস্ত্রটি। চোখ রাঙিয়ে বেদব্যাস বললেন, "স্বয়ম্ভূ (এখানে শঙ্কর) এই নিমিত্তই (অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্যই) ইহার (দ্রৌপদীর) সৃষ্টি (নির্বাচন) করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয় করুন।" (আদি, কালী-প্রসন্ন/বন্ধনী আমার)।

দ্রুপদ স্পষ্টই বুঝলেন, বিতর্কে পরাজিত ব্যাস আঁখ গরম সুরু করেছেন। ব্যাখ্যা নয়, এখন ভীতি প্রদর্শন। বলতে চান, শেষ কথাও শোনালাম, এখন নিজে যা বুঝবেন করুন। ফলাফল অবশ্যই দেববিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

এর পরও আর বেদবিরোধী, লোকাচারবিরুদ্ধ বহুস্বামিত্ব নিয়ে তর্ক চলে না। লাভ নেই। বৈদিক আচারবিধি দেবদাপটে ইচ্ছামত বদলাতে সুরু করেছে। যা দেবব্রাহ্মণ-স্বার্থের সংরক্ষক, তাই ধর্ম। যা দেবানুমোদিত নয়, পাপ ও অধর্ম তারই ধর্মীয় নাম। বিদেশীর অনুশাসনে ধর্মাধর্মের নয়া ব্যাখ্যা দেশীয় মুনিবরদের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হচ্ছে। এবং যেহেতু হিমালয়শিবির-নিযুক্ত বুদ্ধিজীবী তাঁরাই, দেবশক্তির পূর্ণ মদতও তাই তাঁদের রক্ষাকবচ।

হতাশ রাজা বিমর্ষ স্বরে তখন বললেন : "যখন মহাদেব (দেবসেনাধিনায়ক) এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি।" বুঝলাম, এমন নির্দেশিত পথই যে ধর্মানুগ, দ্রুপদের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়নি। তিনি অযৌক্তিক আদেশকে অসহায়ভাবে শিরোধার্য করেছেন মাত্র।

দ্রুপদ সংশয়ী, যুধিষ্ঠিরের মত নিবেদিতপ্রাণ বংশবদ দেবচাটুকার তিনি হতে পারেননি। সম্ভবত পাঞ্চালদের জাতীয় চরিত্রও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে প্রস্তুত ছিল না। তাই কি তাঁদের যতদূর ব্যবহার করার ততদূর ব্যবহারের পর কুরুক্ষেত্রে ধ্বংস হ'য়ে যেতে দেওয়া হ'ল ? কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর আর্যাবর্তের কোনো শক্তিশালী ক্ষত্রিয় পুরুষকেই আর জীবিত রাখা হয়নি। দেবতারা হিমালয়ের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন দেশের তাবৎ বীরপুরুষদের রক্তে। ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন পরশ্রমভোগী পুরোহিতদের হাতে।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় দ্রুপদের নিষ্ক্রিয়তা এবং সেই পর্বে তাঁর উল্লেখহীনতায় সন্দেহ হয়, চতুর দেবতারা দ্রুপদী-সংশয় সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বলেই সাবধানে সভা-কার্যের গুরু দায়িত্ব থেকে রাজাকে সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। সভায় প্রধান কর্মকর্তারূপে আবির্ভাব ঘটেছিল দেবপ্রেরিত

ধৃষ্টদ্যুম্নের। চেহারায় তিনি ছিলেন অতি ভয়ঙ্করাকার এবং কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর অ-সাধারণ কর্কশ। দ্রৌপদীকে পাশে নিয়ে সেই রোবটসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্ন সভায় প্রবেশ করেছেন। সমবেত রাজন্যবর্গের পরিচয় তিনিই জ্ঞাপন করেছেন কৃষ্ণাকে। সভার ঘোষকও ছিলেন ঐ ধৃষ্টদ্যুম্নই। তিনিই সকলকে দেখিয়েছেন সেই অদ্ভুত ঘূর্ণ্যমান আকাশযন্ত্রটি যার মধ্য দিয়ে শরসন্ধান করে লক্ষ্যভেদ করতে পারলে তীরন্দাজ লাভ করবেন দেবরূপিণী নীলকেশিনী কৃষ্ণার পাণিপীড়নের অধিকার। দেবী কৃষ্ণা, দেবপ্রেরিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দেবনির্মিত আকাশযন্ত্রটিই শুধু নয়, বৈশিষ্ট্য আরও ছিল। ছিল একটি বিশেষভাবে নির্মিত ধনু। গায়ের জোরে সে ধনুতে গুণ পরানো শাল্ব, শল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রমুখ কোনো বীরপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অথচ জরাসন্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। মহাভারতীয় প্রতিবেদন বলেঃ "সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অঙ্গের আভরণসকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন।" (আদি)।

কিন্তু কেন? ধনুটির নির্মিতিও কি ছিল অনন্যসাধারণ? ছিল কি তা বিদ্যুৎবাহী? যাঁরা শক্তিশালী মল্লবীর, তাঁরা স্পর্শমাত্র দিগ্বিদিকে 'বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন' কেন? জ্যা সংযুক্তিকরণের প্রচেষ্টা পর্যন্ত নয়, স্পর্শমাত্র পতন ও 'নিস্তেজ' ভাব অন্য কোন্ কারণে সম্ভব? সমস্ত ব্যাপারটাই, তাই তো মনে হয়, চমৎকারভাবে পূর্বপরিকল্পিত। দেব-উদ্দেশ্য ছিল, রাজসভা ডেকে অর্জুনের শৌর্য প্রদর্শন করানো। আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গকে আচ্ছা করে সমঝে দেওয়া যে, অর্জুনই একমাত্র বীর যিনি ক্ষমতায় রাজচক্রবর্তীদেরও অনায়াসে পরাভূত করতে সক্ষম। কেননা আমরা তো জানি, দেবাধিনায়ক শঙ্কর আগেই কৃষ্ণাকে পাণ্ডব-মহিষীরূপে মনোনীত করেছেন। তবে আবার স্বয়ংবর-সভা কেন? কেন সকল রাজা-রাজড়াকে জড়ো করে মজা মারা? মজা ঐখানেই। মজাও বটে, আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনও বটে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর নাম-কি-ওয়াস্তে একটি নির্বাচনী সভা, আসলে তাও ছিল গূঢ় অভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ।

দুজন মাত্র সেই বিচিত্র ধনুতে জ্যা-সংযোগে সক্ষম হয়েছিলেন। দুজনেই খাঁটি দেবপুত্র। দেব ঔরসে কুন্তীগর্ভে দুই বীরেরই জন্ম। সূর্যপুত্র কৌন্তেয় কর্ণ পেরেছিলেন অবলীলায় ধনুতে গুণ পরাতে। অপর গুণার্ণব ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য, তিনি জন্মমাত্রই দেবগণ-দ্বারা পরিত্যক্ত। কুন্তীর

মহিমময়ী ইমেজ রক্ষা, দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র অর্জুনের বীরত্ব সপ্রমাণ করা, এবং পুরোহিতরাজ স্থাপনের জন্য পাণ্ডবদের শক্তিমত্তা সকলের সামনে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কর্ণকে জয়ী হয়েও সর্বত্র পরাস্ত হতে হল।

কর্ণ সেই বিশিষ্ট ধনুতে জ্যা সংযোগ করা মাত্র তাই তো শুনতে পেলাম, দ্রৌপদী মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করছেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।"

কর্ণ, দুর্যোধনগোষ্ঠী বা অন্যান্য রাজন্যগণ এই ঘোষণায় সরবে প্রতিবাদ করতে পারতেন। বলতে পারতেন, শর্ত ভঙ্গ করছেন দ্রৌপদী, কারণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোষণা ছিল অন্য রকম। তিনি বলেছিলেন, যে বীর তীরন্দাজ ঐ ধনুতে গুণযুক্ত করে আকাশযন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে পঞ্চশর নিক্ষিপ্ত করতে ও তার দ্বারা লক্ষ্যভেদে সক্ষম হবেন, তিনিই লাভ করবেন দ্রৌপদীকে। এ শর্তে কৃষ্ণার নির্বাচনবিষয়ক স্বাধীনতা ছিল না। সফল ধনুর্ধর কর্ণকে তবে তিনি কোন্ অধিকারে প্রত্যাখ্যান করেন? সূতপুত্র? তা সেই সূতপুত্র কি ক্ষত্রিয় নন? তিনি কি রাজকীয় মর্যাদায় ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী অর্জুনের থেকে রূপে গুণে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন না? যদি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে বিগলিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন এক রাজকুমারী তবে কোথায় বাধে তাঁর বীর ক্ষত্রিয়রাজা সুপুরুষ কর্ণকে বরমাল্য প্রদান করতে?

বাধা ঐ দেবতারা। বাধা সেই ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বাধা স্বয়ং দেবাধিনায়কের অমোঘ আদেশ। এই সব বাধা ছিল বলেই দুর্ভাগিনী দ্রৌপদীকে সেদিন প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল বাস্তবিক সজ্জন এক বলদৃপ্ত যুবা রাজ-পুরুষকে। কোনো রাজা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি; যুক্তিবাদী দুর্যোধনও ছিলেন নীরব। কর্ণ কৃষ্ণাবাক্য শ্রবণে 'সামর্ষ' (ক্ষুব্ধ) হাস্যে "সূর্য-সন্দর্শন-পূর্বক শরাসন পরিত্যাগ" করেছিলেন।

কিন্তু কেন? সম্ভবত স্বয়ংবর-সভায় বরণকারিণী কৃষ্ণার স্বাধীন পছন্দকে তাঁরা সেদিন জানিয়েছিলেন সুভদ্র সম্মান। আর সেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কুরুগণ সভাপর্বে। অপমানিত কর্ণও সেদিন ছেড়ে কথা কননি পঞ্চজনের অঙ্কশায়িনী দ্রৌপদীকে। সে আচরণ মহাপাপ বলে মহাভারতের পর্বে পর্বে সক্রোধে নিন্দিত ও ধিক্কৃত। অথচ স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদী কর্তৃক কর্ণের অপমান সামান্যতম মন্তব্যের দ্বারাও কর্ণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে উদার নয়। বড় নিষ্ঠুর পক্ষপাত, বড় নির্দয় লোভাতুর চক্রান্ত কর্ণের প্রতি অকারণে কঠোর।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি দেবজন দ্বারা কর্ণ পরিত্যক্ত, তবে তিনিই বা ধনুতে

গুণ যোজনায় সক্ষম হলেন কেমন করে ? সঙ্গত প্রশ্ন। বাস্তবিক, ধনুটি বিশেষ-ভাবে বিদ্যুৎবাহী করে বিজ্ঞানী দেবতারা যদি রহস্য গভীর করে থাকেন, তবে সেকথা না হয় মহর্ষি বেদব্যাস জানিয়ে রেখেছিলেন অর্জুনকে। হয়ত পার্থকে শেখানো হয়েছিল কী উপায়ে বৈদ্যুতিক প্রহার এড়িয়ে জ্যা-যুক্ত করতে হবে ধনুতে। কিন্তু দেবপরিত্যক্ত কর্ণ সেই গূঢ়তত্ত্ব কার কাছে শুনেছিলেন ?

তবে কয়েকটি পর্বের পাতা উল্টে আমাদের সেই তথ্যটির সন্ধান করতে হবে, বিশাল রণকাহিনীর যে পর্বে ইন্দ্রের অভিসন্ধি জানতে পেরে সূর্য ছুটে গেছলেন কর্ণের কাছে; আত্মজকে সাবধান করে বলেছিলেন, ছদ্মবেশী ইন্দ্র আসছে তোমার অক্ষয় বর্মটি (কবচ কুণ্ডল) ভিক্ষা চাইতে; হে দাতা, ঔদার্যবশত সেই তঞ্চককে যেন দিয়ে দিও না তোমার রক্ষা-কবচটি। এ তথ্য জানায়, ব্রহ্মা ও শঙ্করের পরিকল্পনা এবং ইন্দ্রের দাপটে সূর্য তাঁর আত্মজকে সহায়তা করতে পারেননি সরাসরি। কিন্তু যখনই সম্ভব, ছুটে গেছেন তাঁকে গোপনে সচেতন করে দিতে। অসম্ভব কি, স্বয়ংবর-সভা সম্পর্কিত দেবপরিকল্পনার কথা জানতে পেরে সূর্যই ছুটে যাননি কর্ণের কাছে ? হয়ত কর্ণকে তিনিই শিখিয়ে দেন সেই ধনুকের বিদ্যুৎ-প্রহার এড়ানোর গোপন কৌশল। আর সেজন্যই দেখি, ধনু স্পর্শমাত্র যখন সকল বীরপুরুষই ধরাশায়ী হয়েছেন, তখন কর্ণ পেরেছেন অবলীলায় জ্যা যোজনা করতে। চমকিত করেছেন সভাস্থল ও চক্রান্তকারী দেব-বাহিনীকে। সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায় দেখে দ্রৌপদীকে দিয়ে শর্তভঙ্গ করিয়ে তখন প্রত্যাখ্যান করাতে হয়েছে সূতপুত্রকে। তাছাড়া উপায় কী! ঐ একই যুক্তিতে অর্জুনকে কর্ণের হাত থেকে বাঁচানো হয়েছিল কুমারদের নকল রণপর্বে। কর্ণ স্বয়ং সেই নেপথ্য অভিসন্ধিটি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই আর বৃথা চেষ্টা করেননি। হেসেছিলেন। লাঞ্ছিত বীরপুরুষ যেমন ক্ষুব্ধ হাসি ফুটিয়ে মনে মনে প্রতিশোধের স্পৃহা গোপন করেন, সেদিন কর্ণও তাই-ই করেছিলেন। নির্ভুল তাঁর সেই আচরণ। তিনি বুঝেছিলেন, প্রতিপক্ষ সুরক্ষিত এবং প্রস্তুত। সে সভায় উত্তেজনা প্রকাশে লাভ নেই। অপেক্ষা করেছেন তিনি উপযুক্ত অবসরের। লাঞ্ছনার প্রতিশোধও তিনি নিয়েছিলেন আর সেজন্যেই নিষ্কলঙ্ক কর্ণের চরিত্রে যথেচ্ছ মসীলেপনের সুযোগ পেয়ে গেছলেন দেবস্তাবক বুদ্ধিজীবীরা।

দেব-প্রস্তুতি সম্পর্কে কর্ণের কাছে কতদূর সংবাদ ছিল, মহাভারত পাঠে আমরা অবশ্য সে খবর পাই না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যায়, একমাত্র কর্ণ ও অর্জুনই জানতেন, বিশেষভাবে নির্মিত সেই ধনুটিতে 'কি ভাবে জ্যা যোজনা

করতে হবে তড়িতাহত না হয়ে। যে সংবাদসূত্র কর্ণকে এই গুপ্ত দেব-পরিকল্পনার বিষয় জানিয়ে গেছে, মনে করতে পারি, সেই নির্ভরযোগ্য সূত্রটি আরও একটি সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে আগেভাগেই সাবধান করেছিল মহাবীর সূর্যতনয়কে। কর্ণ জানতে পেরেছিলেন, দেবশিবির কড়া প্রহরার বন্দোবস্ত রাখবেন কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর সভায়। সুতরাং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ঐ সভায় কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়ে তোলা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে না। আমার এই অনুমানের সমর্থন মেলে ভগ্নসভার কোলাহলের মধ্যে। দেখতে পাই, লড়াইয়ের সূত্রপাত হতেই কর্ণ সেদিন সাবধানে সে সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে গেছলেন। রণে ভঙ্গ দেওয়ার মানুষ তিনি নন। ব্রাহ্মণদের প্রতিও তাঁর কোনো বিশ্ববিশ্রুত শ্রদ্ধা ছিল বলে আমরা জানি না। তবু কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের ছলনাকে বিনা প্রশ্নে না বোঝার ভান করে তিনি স্বেচ্ছায় রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন। একাজ তাঁর মত বীর নিশ্চয় পরাজয়ের দুর্ভাবনায় করেননি। তিনি জানতেন, প্রস্তুত দেববাহিনীর বিপক্ষে অপ্রস্তুত ভারতীয় রাজন্যবর্গ অস্ত্র ধারণ করলে পরাজয় অনিবার্য। তাই তৈরী-করা একটি সঙ্ঘর্ষের আবহাওয়াকে কৌশলে এড়িয়ে গেছেন তিনি। গোঁয়ার্তুমি নয়, কূট রাজনীতিকের মতই উপযুক্ত সময়ের জন্য চরম যুদ্ধাবস্থাকে বিলম্বিত করেছেন। লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেন নি সখা দুর্যোধনকেও।

আমার এই অনুমিতির স্বপক্ষে এবার কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাপারের উল্লেখ করব। পাঠককে অনুরোধ করব স্বয়ম্বর-সভাস্থলটি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

মহাভারতীয় তথ্য আমাদের যেটুকু সংবাদ দেয় তাতে জানতে পারি, সেই সভায় দেবসেনাধ্যক্ষদের ভালমতই সমাবেশ ঘটেছিল। গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য মিছিল করে হাজারে হাজারে ব্রহ্মানন্দমার্গী দেবস্তাবক ব্রাহ্মণবৃন্দকেও জড়ো করা হয়েছিল। আমন্ত্রিত দর্শক হিসেবে দেববাহিনীর নভশ্চর অধিনায়করা এসেছিলেন 'বিমানারোহণ পূর্বক'। উপস্থিত ছিলেন, যম, কুবের, অশ্বিনীকুমার। এসেছিলেন রুদ্র, আদিত্য ও বসুগণ। এঁরা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। অন্য দিকে 'কৃষ্ণমতাবলম্বী' বৃষ্ণি-বংশীয় যোদ্ধারাও প্রস্তুত ছিলেন ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের বিপদাপন্ন অবস্থায় সাহায্য করার জন্য। তাঁরা যে সুদূর দ্বারাবতী থেকে এজন্যই স্বয়ম্বর সভায় ছুটে এসেছিলেন তা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। সে কথা বলার আগে লক্ষ্য করতে বলি ব্রাহ্মণ জনতাকে, যাঁরা অর্জুন ও পঞ্চ পাণ্ডবের পক্ষে দল ভারি করে চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাণ্ডব-সমর্থক বাহিনীর সংখ্যাগুরুত্ব প্রচার করেছিলেন তাঁরা সভাস্থলে। প্রশ্ন এই, এমন এককাট্টা ব্রাহ্মণবাহিনী কার তৎপরতায় পাণ্ডবদের ঘিরে সভাস্থলে

মুখর করে তোলার জন্য পাঞ্চাল রাজ্যে সমবেত হয়েছিলেন? সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন রাজা দ্রুপদের রাজসভায়? স্বয়ম্বর সভায় সাধারণ জনতার প্রবেশাধিকার কি থাকত? সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কার অঙ্গুলি হেলনে তবে ওই জনমণ্ডলীকে সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল? তা-ও কি দেবশিবিরেরই নির্দেশ, স্বাধীনতা সমর্পণকারী রাজা দ্রুপদ যে নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন? ঘটনাক্রম তো তাই বলছে। না হলে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের ঘিরে এমন হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন কেন? দুর্বাসার দশ হাজার অনুচর ছিল। ওঁরা সেই সন্ত্রাসবাদী দল নন তো? উত্তম মিছিল সংগঠক ছাড়া শত শত শিখাধারী ব্রহ্মামার্গীকে একত্রিত করলেন কে এবং কী উপায়ে? সেদিন তো সংবাদপত্র বা বেতারের প্রচলন ছিল না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্রাহ্মণরা তাহলে দলবদ্ধভাবে পাণ্ডবপঞ্চককে পুরোভাগে নিয়ে ঠিক সময়ে পাঞ্চাল রাজ্যে পৌঁছে গেলেন কার নিপুণ কারসাজিতে? এসব প্রশ্নও উপেক্ষা করার মত নয়। এসব প্রশ্ন জাগে বলেই ভাবতে হয়, ঐ স্বয়ম্বর সভার সকল ব্যাপারই বেশ সুচিন্তিত পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি। এবং বলাই বাহুল্য. ক্রমশ দেখতে পাব, এ-ও সেই নভশ্চর দেবতাদের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার পরিকল্পনায় তৈরী ঘটনা রাশি।

তার আগে দুচারটি কৃষ্ণকথা কয়ে নিই। মহাভারতের কথারম্ভে কৃষ্ণের চরিত্রটিকে আনা হয়নি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভাতেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। সুতরাং এখানে এই হঠাৎ আকস্মিকভাবে আবির্ভূত কৃষ্ণকে ঘটনাক্রমে যেমন পাচ্ছি সেভাবেই লক্ষ্য করা যাক।

সভামঞ্চে বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের মধ্যে কৃষ্ণ উপস্থিত আছেন। তাঁর পাশে গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট আছেন অগ্রজ বলভদ্র এবং 'কৃষ্ণমতাবলম্বী' বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধবৃন্দ। এ সভায় কৃষ্ণ ও বলভদ্র যাজ্ঞসেনীর পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হননি। ধনুকে ছিলা পরাতে রঙ্গভূমিতে গিয়ে দাঁড়াননি যদুনেতা শ্রীকৃষ্ণ। (তিনি রাজা ছিলেন না। ছিলেন গণতান্ত্রিক যদু রাজসভার একজন বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ দলপতি)। তবে কৃষ্ণ অত যোদ্ধবৃন্দ নিয়ে এ সভায় কিসের জন্য এসেছিলেন? এসেছিলেন তিনি সম্ভাব্য বিপৎকালে পাণ্ডবদের রক্ষা করতে। অথচ মজা এই, ইতিপূর্বে তিনি কিন্তু কোনো পাণ্ডবকেই চিনতেন না। আর সে সময় তামাম আর্যাবর্তই জানত, পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধাবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন। তাহলে? এ সভায় পাণ্ডবদের গোপন সাহায্যকারীরূপে কে তাঁকে প্রেরণ করল? অবশ্যই হিমালয়স্থ দেবশিবির! কৃষ্ণের সঙ্গে

দেববাহিনীর যোগাযোগ যে কত নিবিড় ছিল কৃষ্ণ প্রসঙ্গে তা আমরা জানতে পারব।

দেবতাদের নির্দেশেই কূট রাজনীতিতে উদাসীন অগ্রজ বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁর 'কৃষ্ণমতাবলম্বী' (যদুদের মধ্যে কৃষ্ণ বিরোধী ও কৃষ্ণমতাবলম্বী দুই সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ বাধে। যদুবংশ ধ্বংসকথায় সে সব আলোচনা আমরা করব।) সম্প্রদায় সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ম্বর-সভায়। পাণ্ডবদের না চিনলেও পাণ্ডবরা ঠিক কোন জায়গায় কীভাবে বসবেন সে কথা তিনি আগেই জেনে এসেছেন, হয়ত এই চেনার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্নের ব্যবস্থা ছিল। কেননা সভামঞ্চে বসে তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কেবলি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাণ্ডবদের সনাক্ত করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন জতুগৃহে মৃত বলে রটনা হলেও আসল ঘটনা হ'ল বিদুরের সাহায্যে কুন্তীসহ পাণ্ডবরা জীবিত আছেন এবং দ্রৌপদীও পাণ্ডব ভোগ্যারূপে দ্রুপদগৃহে পালিতা হচ্ছিলেন। পাণ্ডবরা সভায় আসবেনই এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য রাখতে হবে, দেবমনোনীত এই পঞ্চ পাণ্ডব যেন কোনোরকম বিপদে না পড়েন। এসব কারণেই দেখা গেল, লক্ষ্যভেদের খেলা শুরু হওয়ার আগেই কৃষ্ণ তাঁর দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সংবাদ অনুসারে ভিড়ের মধ্য থেকে পাণ্ডবদের বাছাই করে চিনে নিতে অসুবিধে হয় নি তাঁর। পঞ্চ পাণ্ডবকে চিহ্নিত করার পরই কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাদেরও পঞ্চ পাণ্ডবকে চিনিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডবদের চোখে চোখে রাখার জন্য কৃষ্ণের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে যদুরা কর্তব্যনিষ্ঠভাবে সেই "পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন" (মহাভারত)। দেখা গেল, ঈষৎ নুয়ে পড়ে অগ্রজ বলভদ্রকে ফিস ফিস করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ঐ দেখুন, ঐ পাঁচ ব্রাহ্মণই পঞ্চ পাণ্ডব। আমি খবর পেয়েছি জতুগৃহে তাঁরা পুড়ে মারা যাননি।

বোঝা যাচ্ছে, পাণ্ডবদের সনাক্ত করার উপায়টি শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না। তিনি বলদেবের কাছে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রত্যেককে চিনিয়ে দিয়েছেন স্বতন্ত্র-ভাবে। সভায় যে গণ্ডগোল একটা বাধবেই এ বিষয়ে দেবশিবির নিশ্চয় শঙ্কিত ছিলেন। তাই যদুনেতা কৃষ্ণ সে সভায় প্রেরিত হয়েছেন। তাই গোলমালের আগেই বুদ্ধিমান কৃষ্ণ পার্ষদ যদুগণকে পৃথাপুত্রদের আলাদা আলাদা করে চিনিয়ে দিলেন প্রয়োজনে যাতে যদুরা তাদের সাহায্য করতে পারেন।

এখানে সবিশেষ আরও উল্লেখ্য, গোড়া থেকেই মহাভারতকার অনুচ্চারিতভাবে এই ইঙ্গিত রাখতেও বিস্মৃত হ'ননি যে, যদুদের মধ্যে আদর্শগত

একটি বিভেদ পূর্বাপর বজায় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যদু নেতা হিসেবে উল্লিখিত হলেও যদুরা সকলেই তাঁর নেতৃত্ব মান্য করতেন না। কৃষ্ণ তাই তাঁদের নিয়েই ঘোরা-ফেরা করতেন যে বৃষ্ণিবংশীয়গণ ছিলেন "কৃষ্ণমতাবলম্বী"।

এই স্বয়ংবর সভায় সুতরাং এটাও সুস্পষ্ট বোঝা গেছে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ তো বটেই, বৃষ্ণিবংশীয় যদুগণও অংশত দেববিরোধী গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। অন্যেরা কৃষ্ণমতাবলম্বী, অর্থাৎ বহিরাগত দেবনেতৃত্বের সমর্থক। পাণ্ডবসহায় আর্যাবর্তবাসী রাজা তখন একটিও নেই। আছেন শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। দেবশিবির সেজন্যই রাজা দ্রুপদকে বিশেষ বিবেচনার পর নিজেদের শিবিরভুক্ত করে পাণ্ডবদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করলেন। ফলত পাণ্ডবরাও লাভ করলেন শক্তিশালী পাঞ্চালদের মিত্রপক্ষরূপে।

পাঞ্চালরা আন্তরাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুকালাবধি ছিলেন কুরুবিদ্বেষী। এ সংবাদ জানা ছিল বলেই দেবরাজনীতিকরা এই দ্বন্দ্ববিবাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। দ্রুপদকেও সংগ্রহ করেছেন তাঁবেদার রাজশক্তি হিসেবে। আর্যাবর্তে এমনি এক সহায়ক শক্তির ছত্রছায়ায় পাণ্ডবদের আশ্রিত করায় ধৃতরাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি সহজ হয়েছে। কেবলমাত্র হিমালয়ের নভশ্চর দেবতারাই নন, আর্যাবর্তের পাঞ্চাল ও কৃষ্ণমতাবলম্বী যদুরাও পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে বা ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্তমান দিল্লী অঞ্চল) সমাসীন করার জন্য চাপ দিয়েছেন। পরবর্তী লড়াই কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসেবে পাণ্ডবদের জন্য বিনাযুদ্ধে কেবলমাত্র রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে রাজক্ষমতা আদায় করে নেওয়া দেব-কূটনীতির পক্ষে সেদিন ছিল এক মস্ত সাফল্য। এই সাফল্য লাভের জন্যই দ্রুপদ রাজ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীকে (কৃষ্ণা) প্রেরণ করেছেন হিমালয় শিবিরে। এজন্যই কৃষ্ণার ওপর আদেশ, বরমাল্য অর্জুনের গলায়ই পরাতে হবে। পাঁচ ভাইকে কৃষ্ণাসূত্রে গেঁথে তাঁদের মধ্যে সর্বদা ঐক্য বজায় রাখতে হবে। সেটাই দ্রৌপদীর 'দেবকার্য সাধন'। অর্থাৎ 'ধর্ম'। তাঁর অন্য ধর্ম নেই।

পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে শত্রুরা যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, অদ্ভুত রাজ-নীতিপ্রজ্ঞ দেবশিবির তা আগেভাগেই বুঝেছিলেন। এবং সেই গণনা অযথার্থ ছিল না। পাণ্ডবদের শক্তি হ্রাস করার বিষয়ে পরবর্তী সময়ে কর্ণ দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের যে মন্ত্রণা-সভা বসেছিল, তাতে রাজনীতিদক্ষ দুর্যোধন প্রস্তাব রেখেছিলেন,…"…সুবিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণদ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুতযুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব"। বলেছিলেন, "অথবা উপায়-নিপুণ কার্যকুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র

ভঙ্গ করিয়া দিক, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখপূর্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক। অথবা উপায়-কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক। যেহেতু, ভীম তাহাদের সর্বাপেক্ষা বলবান। অর্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে।" (আদি একাধিকদ্বিশততম অ. কালী)। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, আগেই বলেছি, এ জন্যই ছিল বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন। তাই সনাতন আচারপ্রথা মান্য করা হয়নি। এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছিল দেবাধিনায়ক শঙ্করের খাস শিবির থেকে।

কর্ণ-প্রত্যাখ্যানে রাজন্যবর্গ উত্তেজিত হননি। কারণ কর্ণ লক্ষ্যভেদে সফল হলে এবং দেবরাজনীতির নেপথ্য চক্রান্ত না থাকলে দ্রুপদ-জামাতার সম্মান সেদিন তিনিই অর্জন করতেন। অন্যান্য রাজবৃন্দ কর্ণকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে দেখে তাই প্রতিবাদ করেননি। ভেবেছিলেন, দ্রৌপদী তাঁদেরই কারকে নির্বাচন করবেন এবং প্রত্যেকেরই আশা ছিল সেই নির্বাচনী বরমালাটি হয়ত তিনিই লাভ করবেন। আর বস্তুত পক্ষে সেটা কী আর এমন শক্ত কাজ ছিল? সেদিন তাঁদের অনেকেই তো ছিলেন লোকবিশ্রুত বীরপুরুষ।

কিন্তু ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। রাজারা বুঝলেন, ধনু ও আকাশযন্ত্রটি রাজন্যবর্গকে অপমান করার একটা দ্রুপদী চক্রান্ত। বললেন, সকলকে সমবেত করে দ্রুপদ তাঁর কন্যাকে ইচ্ছাকৃৎভাবে 'বিপ্রসাৎ' (ব্রাহ্মণস্থ) করেছেন। সুতরাং জোর বিতণ্ডা ও গোলমাল সুরু হয়ে গেল সেই স্বয়ংবর সভায়।

মহাভারত এই সুযোগে অর্জুন-প্রশস্তি গাওনার আয়োজন করলেও আমরা দেখলাম, কোনো বিরাট যুদ্ধ সেখানে অনুষ্ঠিত হয়নি, সব রাজারাও অংশ গ্রহণ করেননি সেই সংঘর্ষে। শুধু সমবেত ব্রাহ্মণরা খুবই লম্ফঝম্প করেছেন এবং তা বেশ উপভোগ্য ও হাস্যকর হয়েছিল।

রঙ্গস্থলে বিতণ্ডা থেকে দুটিমাত্র দ্বৈরথ রণপ্রদর্শনীর সৃষ্টি হয়। তাও হয়েছিল সম্ভবত খেলাচ্ছলেই। মল্লযুদ্ধ দেখিয়েছিলেন মামা ও ভাগ্নে, ভীম ও শল্য। ভীমসেন শল্যকে মাথার ওপর ঘুরপাক খাইয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলেছেন। তখন সমবেত হাস্যরোল উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধে তো হাস্যরোল ওঠার কথা নয়। বস্তুত শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল কর্ণ এবং ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের মধ্যে। বলা বাহুল্য, পরাজিত হয়েছিলেন অর্জুন, যদিও মহাভারত ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন,

সকলেই ভীমার্জুনের কৃতিত্বে মোহিত হয়েছিলেন। ঘটনায় প্রতিবেদন কিন্তু অর্জুন-পরাভবের তথ্যই লিপিবদ্ধ করে গেছে। যেমন :

"কর্ণ অর্জুনের অনুপম ভুজবীর্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় (কর্ণের) সৈন্যগণ অর্জুন প্রযুক্ত বাণবর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈস্বরে স্বপ্রভুর (কর্ণের) জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।" (আদি. কালী, বন্ধনী আমার)।

অর্থাৎ অর্জুনপ্রযুক্ত বাণ কর্ণের সেনাদলই রুখে দিল। হায়, তবু মহাভারত বললেন, রাধেয়সহ অন্যান্য রাজারা কৃষ্ণালাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু রাধেয় বা কর্ণের ব্যর্থতা কোথায় ?

ঐ যুদ্ধে কেউ কারকে গুরুতরভাবে আহতও করেননি। কর্ণ নিজেই যুদ্ধ নিবৃত্ত করে বলেছেন, হে ব্রাহ্মণ, তোমার উত্তম অস্ত্র শিক্ষায় পরম প্রীতি লাভ করলাম।

পাছে প্রদর্শনী যুদ্ধটি মারাত্মক রূপ নেয়, তাই বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হয়ে রাজাদের বললেন, "হে ভূপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন। তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" (ঐ)।

চতুর কৃষ্ণ প্রথমাবধি চুপচাপ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কথায় সব মিটমাট করে রাজারা বিদায় নিলেন।

ধার্মিক পাণ্ডবদের অনুকূলে মহাভারতীয় ঢক্কা বিস্তর নিনাদিত হলেও দেখা গেল, আর্যাবর্তের রাজন্যকুলে পৃথাপুত্রেরা একান্তভাবেই নিঃসঙ্গ। দানযজ্ঞলোভী ব্রাহ্মণগণ ছাড়া ওঁদের পাশে একটি সমর্থ রাজশক্তিও এসে দাঁড়াননি। দ্রুপদ যা করেছেন তার কারণ ছিল আলাদা। সেকথা আগেই বলেছি। দেব-ইচ্ছায় দ্রুপদ সবেমাত্র শ্বশুরমশাই হয়ে দেবব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষে তাঁর নাম নথিভুক্ত করলেন। কিন্তু শল্যের কি হ'ল? আত্মীয়তা সূত্রে পাণ্ডবদের তিনি মামা তবু কেন শেষ পর্যন্ত তাঁকে কখনই পাণ্ডব শিবিরের মিত্রপক্ষ হিসেবে দেখতে পেলাম না আমরা? কারণ, শল্য ছিলেন দেবশত্রু জরাসন্ধের বন্ধু। শল্য চিরকালই কুরুপক্ষে। মহাভারতকার কুরুপক্ষে শল্যের যোগদান বিষয়ে একটি গালগল্প সৃষ্টি করলেও শল্যের আচরণের যৌক্তিকতা যথার্থ বিশ্লেষণে আগ্রহী হননি।

এইভাবে পাঞ্চালের সাহায্যে শক্তিলাভ করলেন পাণ্ডবরা। রাজার কাছ থেকে পেলেন অজস্র যৌতুক। পেলেন প্রচুর ধনরাশি। একশ হাতী আর একশত রথ। সে রথের ঘোড়ার বল্গাগুলিও ছিল সোনার পাতে মোড়া।

তাছাড়া ভিক্ষুক পাণ্ডবদের দ্রুপদ একশত দাসীও দান করেছিলেন। সে যুগে যৌতুক হিসেবে সর্বত্রই দাসী দানের প্রথা ছিল। যদুনেতা শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদের শতাধিক দাস-দাসী দান করেছেন ঐ বিবাহ উপলক্ষে। উৎসবেও দানসামগ্রী হিসেবে রাজনটী ও সুন্দরী বারনারী প্রদানও ছিল মহাভারতীয় রীতি।

পাণ্ডবদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় যেমন দ্রুপদ তেমনি পাণ্ডবরাও লাভবান হলেন। কিন্তু পাণ্ডব স্তুতিগায়করা শুধুই বললেন, "পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না।" অর্থাৎ দেবতাদের মিত্রপক্ষীয় পাণ্ডবদের আত্মীয় রূপে পাওয়ায় দ্রুপদও দেবমিত্র-বাহিনীর মধ্যে বেশ একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। অথচ একথাও তো সত্যি যে, দ্রুপদকে পেয়ে আর্যাবর্তে নিঃসঙ্গ পাণ্ডবরাও সহায়-সম্পন্ন হয়েছিলেন। দেবতারা কৌশলে দ্রুপদকে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করলে আর্যাবর্তে দাঁড়াবার মত জায়গা পাণ্ডবদের ছিল না।

দেবতাদের তাঁবেদার, ব্রাহ্মণদের প্রতি নতজানু এবং পাণ্ডবদের বন্ধুরাজ্য সেদিন যদি আর কেউ থাকতেন তবে যুধিষ্ঠিরের বিবাহে তাঁরা ও নিশ্চয় উপযুক্ত যৌতুক নিয়ে উপস্থিত হতেন। কিন্তু তা হয় নি, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভের পর দু'একটি রাজ্যে পাণ্ডবরা তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অর্জুন স্বেচ্ছা-বনবাস গ্রহণ করে ভারতের কয়েক প্রান্তে বৈবাহিক সূত্রে কিছু মিত্রপক্ষের সৃষ্টি করেন।

মহাভারতে বনবাস পর্ব একাধিকবার উপস্থিত হয়েছে। আর ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ঐ সব বনবাসের উদ্দেশ্য ছিল শক্তি সংগ্রহ। যথার্থত তা আদৌ বনবাসই নয়, তাকে বলা যায়, রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস এবং পাণ্ডবদের স্বার্থেই তাঁরা সেই অজ্ঞাতবাস স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। স্তুতিকাররা অবশ্য ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছিলেন, কুরুদের অত্যাচারে বনবাসী হতে হয়েছে ধার্মিক যুধিষ্ঠির-বাহিনীকে। হ্যাঁ, 'বাহিনী'ই বলব, কেননা কখনই তাঁরা নিঃসম্বল অবস্থায় বনবাসে যাননি। গেছেন লোকলস্কর ও দলবল সঙ্গে নিয়ে। গল্পের স্রোতে মহাভারতের সেই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু মহাকাব্যে যা সাবধানে ও নিম্নকণ্ঠে উচ্চারিত, ইতিহাসের উপাদান সেই পুরা-ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে। খোঁজ নিতে হয় সেগুলির। আমরা পর্বে পর্বে তারই অনুসন্ধান করছি, দেখছি, সেই ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত কাহিনীর সুতোতেই গাঁথা আছে দেবতাদের বুদ্ধিদীপ্ত ষড়যন্ত্রের আনুপূর্বিক ইতিকথা।··· কিন্তু যা বলছিলাম···।

ওদিকে গুপ্তচর মারফৎ ধৃতরাষ্ট্রের দরবারে সংবাদ এলো, পাণ্ডবরা দ্রৌপদী লাভ করেছেন। খবর শুনে বিদুরের আর 'প্রীতির পরিসীমা রহিল না।' ছুটলেন তিনি অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদটি পৌঁছে দিতে। ধৃতরাষ্ট্র জানেন দ্রুপদরাজা কন্যার স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করেছেন এবং কর্ণসহ দুর্যোধন গেছেন সেই কন্যালক্ষ্মীকে জয় করে আনতে। পুত্রের বিজয়বার্তা শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন রাজা। বিদুরও জানতেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই উদ্বেগের কথা। তাই বিদুর এসে রাজাকে সব্যঙ্গে বললেন, "মহারাজ, কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন।" রাজার প্রতি মন্ত্রী হিসেবে এটা তাঁর ব্যঙ্গোক্তি বৈকি। পাণ্ডব শব্দের বদলে ইচ্ছাকৃতভাবে কৌরব শব্দ ব্যবহার করে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতেই চেয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র যখন সংবাদটি পুত্রের জয়লাভ হিসেবে গণনা করে মনে মনে উৎফুল্ল, তখন তাঁর সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখটিকে মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়ে বিদুর জানালেন, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। বিদুরের এই আচরণে এক দিকে যেমন কৌন্তেয়দের প্রতি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে অপর দিকে তেমনই প্রকাশিত হয়েছে রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ, কারণ, যুবরাজ দুর্যোধন এখন স্পষ্টতই পাণ্ডববিরোধী। পাণ্ডবদের উৎখাত করার জন্য তিনি চেষ্টিত। তার মানে, পাণ্ডবরা বর্তমানে কুরু-শত্রু। বিদুরের তা অজ্ঞাত নেই। তাই, পাণ্ডবদের জয়লাভে তাঁর পক্ষে হর্ষ প্রকাশের অর্থ রাজদ্রোহই বটে। বিদুর ভিন্ন অন্য কেউ হলে হয়ত তখনই তিনি হস্তিনাপুর থেকে বিতাড়িত হতেন, খুইয়ে বসতেন তাঁর মন্ত্রিত্বপদ। কিন্তু বিদুর জানতেন, ধৃতরাষ্ট্র সাবধানী ও সতর্ক। বিদুরকে তিনি বিতাড়িত করার ঝক্কি গ্রহণ করবেন না। করলে সেটা হবে অত্যন্ত বড় একটা রাজনৈতিক ভুল। বিদুরের দুঃসাহস তাই ক্রমবর্ধমান। রাজাকে তিনি সম্মানের চেয়ে অসম্মানই বেশী করেন। তিনি জানেন, তাঁর পেছনে আছেন, হিমালয় শিবিরের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান দেবতারা। তাঁর পাশে আছেন, দেবক্ষমতায় বলীয়ান এক বিরাট ব্রাহ্মণবাহিনী। আর জানতেন, ব্রহ্মার পরিকল্পনা তৈরী। আজই হোক আর কালই হোক, দেবতারা কুরুবংশ ধ্বংস করবেনই।

ধৃতরাষ্ট্রও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। বিদুরকে তিনি ভালভাবেই চেনেন। জানেন, বিদুরের মত ক্ষতিকারক পার্শ্বচর তাঁর সভায় অন্য কেউ নেই। তবু প্রকাশ্যে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেন না। অসীম ধৈর্যশীল চরিত্রের মানুষ, তাই বুঝি নাম তাঁর ধৃতরাষ্ট্র। যখন নিষ্ঠুর বিদুর গান্ধারীর প্রথমজাত সন্তানের

জন্মমুহূর্তে সেই শিশুপুত্রের নির্বাসন দাবি করছেন রাজসভায় দাঁড়িয়ে, তখনও বৃদ্ধ রাজা তাঁর মর্মবেদনা গোপন করে অদ্ভুত সংযম প্রদর্শন করেছিলেন। বিদুর-চক্রান্ত লক্ষ্য করে ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ সভা ভেঙে দিয়ে সে যাত্রায় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে রুখেছিলেন। ঠিক অনুরূপ সংযম তিনি এবারেও অবলম্বন করলেন। বিদুরের ব্যঙ্গোক্তি গায়েই মাখলেন না। প্রথম আবেগের উচ্ছ্বাস ও পরবর্তী আঘাতের চমক যুগপৎ দমন করে নিপুণ অভিনেতার মত মুখমণ্ডলে খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, সুসংবাদ। ভালই হয়েছে। খুবই ভাল হয়েছে। পাণ্ডবরা আমারই সন্তানস্বরূপ। তাদের জয়, কুরুকুলের বিজয়-বার্তাই ঘোষণা করেছে। এই জয়ে দ্রুপদের মত ক্ষমতাবান এক রাজপুরুষের সঙ্গে হস্তিনাপুরের মিত্রতা স্থাপিত হল।

শেষের কথাটির মধ্যেও ছিল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের বিপরীত মনোভাবকে মানান-সই করে নেওয়ার চেষ্টা। ধৃতরাষ্ট্র ভালভাবেই বুঝেছিলেন, পাণ্ডবরা দ্রুপদজামাতা হওয়ায় সহায়সম্পন্ন হল আর শত্রুবৃদ্ধি হল কুরু শিবিরের। কিন্তু মুখে তিনি উল্টো কথাটাই বললেন। বললেন, বিদুরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই।

পরে দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ এবং তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী কাণকের সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রের এই মনোভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাণ্ডবদের গতিবিধি জানবার জন্যই তিনি যে বিদুরকে রাজগৃহে পরিপোষণ করেন এ সত্য আমরা জানতে পেরেছি।

পাণ্ডবপক্ষপাতী বিদুর সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে কতদূর অসহায় ছিলেন, তাঁর অপর একটি বক্তব্যেও তা বোঝা যায়। বিদুর সম্পর্কে এমন স্পষ্টোক্তি সচরাচর মেলে না। ধৃতরাষ্ট্র যখন আপন মনোভাব গোপন করে পাণ্ডবদের তাঁর পরমপ্রিয় বলে ঘোষণা করলেন, নির্জনে তরুণ কর্ণ ও দুর্যোধন তখন রাজাকে ভৎর্সনা করেন। প্রত্যুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন, "তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাঁহার নিকট সর্বদা পাণ্ডবদিগের গুণকীর্তন করিয়া থাকি। বিদুর আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না।" (ঐ)। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র জানতেন বিদুর রাজবাড়ির প্রতিটি গোপন বার্তা পাণ্ডবপক্ষকে প্রেরণ করেন এবং তিনি আদৌ রাজহিতৈষী নন। তবু একবার মাত্র বিদুরকে পদচ্যুত করে পুনরায় তাঁকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া রাজা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি।

ধৃতরাষ্ট্র বিনা রক্তপাতে কুরুকুলের জয় কামনা করেছিলেন বলেই তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখেছি আমরা? সর্বদাই দেখা গেছে, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের শক্তির পরিমাপ করতে চেয়েছেন। বিদুরকে সেজন্যও তাঁর প্রয়োজন ছিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদুরকে ডেকে পাঠিয়ে মন্ত্রণা দান করতে বলতেন তিনি। উদ্দেশ্য, পাণ্ডবপক্ষের অবস্থা এবং দেবশিবিরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করা। মন্ত্রণার দ্বারা তিনি বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু কখনই অভিভূত বা প্রভাবিত হননি। ভীষ্ম ও বর্ষীয়ান নেতাদের মন্ত্রণায় ডেকে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন প্রবহমান রাজনৈতিক বাতাবর্তটি। নিজের অন্ধত্বের জন্য রাজা মানসিকভাবে খুবই সঙ্গত কারণে মাঝে মাঝে অসহায়তা বোধ করতেন। যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারতেন না তরুণ ও আপোষহীন দুই যোদ্ধা, দুর্যোধন ও কর্ণের ওপর। রাজার এই দ্বিধা অনেকাংশেই দুর্যোধনপক্ষকে দুর্বল করেছে। পারে নি তারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এবং তারই সুযোগে যুধিষ্ঠির প্রস্তুতির সময় ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফলে দেব ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবদের জয়কে সুনিশ্চিত করার পথে ধৃতরাষ্ট্রের বিলম্বিত সিদ্ধান্ত বহুলাংশে পাণ্ডবদের সাহায্যই করেছিল।

তবু শুধুমাত্র সে কারণেই মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রকে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। যুদ্ধের পরও দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থকের সংখ্যা আর্যবর্তে কম ছিল না। তাই ধৃতরাষ্ট্রের গুণগান করে সমস্ত বিদ্বেষ দুর্যোধনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের কিছু পরিমাণে হয়ত শান্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তা না হলে ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষণ হিসেবে 'প্রজ্ঞাচক্ষু'র বদলে আমরা নিশ্চয় সর্বত্রই দেখতে পেতাম দুরাত্মা ও 'পাপিষ্ঠ' শব্দ। সুর-বিরোধী হয়েও আশ্চর্যভাবে ধৃতরাষ্ট্র যে ঐ দুই মারাত্মক অভিধার আঘাত থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন, এই ঘটনার .সুতরাং আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

সময় থাকতে থাকতেই পাণ্ডবপক্ষকে ঘায়েল করার পক্ষপাতী ছিলেন কর্ণ। তিনি বলেছেন, "পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।" বাস্তবিক পক্ষে এটাই তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ধৃতরাষ্ট্র রক্তপাতের ভয়ে অগ্রসর হতে সাহস পেতেন না, বরং পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্যে সমাসীন করে বিপদকে ঘরের দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। যখন নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে নামতেই হল, দেবশিবিরের সঙ্গে পুরোপুরি হাত মিলিয়ে পাণ্ডবপক্ষ ততদিনে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়ে বসেছেন।

সুতরাং আর্যাবর্তের তামাম ভারতীয় রাজন্যবর্গ একজোট হয়েও উন্নত শক্তির অধিকারী দেবশিবিরের বিরুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়কে এড়াতে পারেননি। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে যে মহতী বিনষ্টি, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলচিত্ততা সেই লোক-ক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কে জানে, সেজন্যও ব্রাহ্মণ শ্লোক-রচয়িতারা তাঁর প্রতি নরম ছিলেন কি না।

যাই হোক, পাঞ্চালরা পাণ্ডবমিত্র হয়েছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে একটি জটিল সংকট এড়াতে চাইলেন, এবং সেটাই হল চরম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা।

অর্জুনের বনবাস ঃ পাণ্ডবদের মিত্রশক্তি লাভ

আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে, পাঞ্চালদের মিত্রপক্ষরূপে পাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র মানে মানে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দিতে বাধ্য হলেও তাঁদের জন্য নির্বাচিত করে দেন একটি বনময় প্রান্তর। আর সেই খাণ্ডবপ্রস্থভুক্ত খাণ্ডববন দগ্ধ করে স্থানটি বাসানুকূল করে তোলেন কৃষ্ণার্জুন।

আসল তথ্য কিন্তু অন্যরকম। খাণ্ডবপ্রস্থ বা পুরানো দিল্লী জায়গাটি ছিল খুবই মনোরম এবং পাণ্ডবরা সেখানে গিয়ে রীতিমত খুশি হয়েছিলেন। এসম্পর্কে মহাভারতে (কালীপ্রসন্ন) বলা হয়েছে, "ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত, পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, শ্বেতনাগ-সমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত, গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ, দ্বার সমূহ ও পরমরমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত...; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ; শতঘ্নী, লৌহচক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্রসমুদয় ও তল্পসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত ও যোধগণ দ্বারা সুরক্ষিত। ঐ নগর মধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন সমুদয় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎ-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে।" মহাভারতকার আরও জানিয়েছেন, "পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন...।" (ঐ)।

খাণ্ডববনের দহনকার্য হয়েছিল অনেক পরে। তার মধ্যবর্তী সময়ে খাণ্ডবপ্রস্থে ঘটে গেছে অনেকানেক রাজনৈতিক তৎপরতা। দেবশিবির থেকে প্রেরিত হয়েছেন দেবর্ষি নারদ। নারদের মন্ত্রণাক্রমে অর্জুন বের হয়ে পড়েছেন দেশে দেশে পাণ্ডবমিত্রপক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে।

ঘটনাটি একটু বিস্তারিত করা দরকার—

পাণ্ডবরা যখন খাণ্ডবপ্রস্থে সুস্থির হয়ে বসলেন তখন আর্যাবর্তে তাঁদের একটিমাত্র মিত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেবানুগ্রহে পেয়েছেন তাঁরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মত একটি মহাসমরে একমাত্র পাঞ্চাল ও

দেববাহিনীকে রক্ষকরূপে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, দেব রাজনীতিকরা নিশ্চয় তা ভেবে দেখেছিলেন। দেবশিবির অনুভব করেছিলেন যে, পাণ্ডবপক্ষে মিত্রশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। কারণ বহিরাগত দেবতারা সরাসরি সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অপারগ। বহিরাগত বলেই তাঁদের লোকবলের অভাব। হিমালয়বাসী দেবকুলের সংখ্যাও অপ্রতুল। দেববুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা তাই খাণ্ডবপ্রস্থে নারদকে পাঠালেন পাণ্ডবদের পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে আসার জন্য।

খাণ্ডবপ্রস্থে যখন "পঞ্চ ভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন", তখন হিমালয় থেকে হঠাৎ নেমে এলেন দেব-সংবাদবাহক দেবর্ষি নারদ। আদি পর্বে নারদের এই আবির্ভাব খুব সমারোহপূর্ণ নয়, কিন্তু তাঁর আগমনের তাৎপর্যটি ছিল রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ ভাইকে তিনি একটি গোপন মন্ত্রণা দিয়ে বিদায় নেন। ভায়েদের মধ্যে অদ্ভুত এক নিয়ম করলেন দেবর্ষি। বললেন, এক স্ত্রী দ্রৌপদীকে নিয়ে পাছে তোমাদের মধ্যে বিরোধ বাধে তাই সকলে প্রতিজ্ঞা কর, যেন তোমাদের যে কোনো একজন যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে থাকবে, তখন অপর কোনো ভাই সেখানে উপস্থিত হলে তাকে স্বেচ্ছায় বার বছর বনবাসী হতে হবে। বারটা বছর সম্ভবত তখন বেশ দীর্ঘ সময় নয়। বার বছর বনবাসকে মৃদু শাস্তি হিসাবেই গণ্য করতে হয়। সে হিসেবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-কালও অতি অল্পায়ু। তিন-বারং ছত্রিশ বছর মাত্র। সেকালে মানুষ হাজার বছরও বাঁচত। ভীষ্মপর্বে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বলেছেন: "মহারাজ।...সত্যযুগে আয়ু সংখ্যা চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে আয়ু সংখ্যা তিন সহস্র বৎসর, দ্বাপরযুগে আয়ু সংখ্যা দ্বিসহস্র বৎসর...।" মহাভারত দ্বাপর যুগের ঘটনা। তাই বলছি, সে যুগে বার বছরকাল ছিল নিতান্তই তুচ্ছ সময়।

সুন্দ-উপসুন্দের পৌরাণিক গল্পটিসহ দেবর্ষি-আগমন ঘটনাটিকেও কাহিনীর আমেজ নিয়ে দ্রুত পাঠ করে গেলে এর গূঢ়ার্থ ধরা পড়ে না। কিন্তু এই একটি ঘটনাই পরবর্তী এক মহাসমর প্রস্তুতির প্রাথমিক আয়োজনে কত যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঘটনাটিকে তলিয়ে বুঝলে খুব সহজেই আমরা কিন্তু তার তল খুঁজে পেতে পারি।

দেবর্ষি যে নিয়ম করে গেলেন তারই ফলশ্রুতিতে অর্জুন সংগ্রহ করতে পেরেছেন আরও কিছু মিত্র শক্তি। ঘটনাক্রম সৃষ্টি করতে এখানেও এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটেছে। যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে আয়ুধাগারে, ব্রাহ্মণ

ঠিক সেই সময়টিই বেছে নিয়েছেন। অর্জুনের কাছে আবেদন করা হয়েছে, ডাকাতদলের কবল থেকে ব্রাহ্মণের গো-সম্পদ উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণ আবেদনকারীকে ফেরাতে পারেন নি অর্জুন। আয়ুধাগারে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে নিয়ম ভঙ্গ করে। ফলে স্বেচ্ছায় বার বছরের বনবাস।

প্রশ্ন জাগে, অর্জুন কি একটা সংবাদ দিয়ে ঢুকতে পারতেন না? তা হলে তো গোল বাধত না কিছু। অদ্ভুত ব্যাপার, অর্জুন সেই সহজ পথে যান নি। নিজের অপরাধ কবুল করে তিনি যখন বনবাসে যেতে চাইলেন তখনও যুধিষ্ঠির যুক্তি খাড়া করে তাঁকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দেন। কিন্তু অর্জুন বনবাসে যাবেনই। বনবাসে যাওয়াটাই ছিল যেন তাঁর উদ্দেশ্য ও পরম প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে, অসতর্কভাবে অন্য কোনো ভাই-ও তো নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারতেন? না, তা-ও হয় নি। আর যদি হয়েও থাকে তবে হয়ত পারিবারিক ক্ষমার মধ্য দিয়ে সে সমস্যার ইতি হয়েছিল। কেননা অন্য কারও বনবাসে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না অন্যতর কারকে দেববাহিনীরও। সব ঘটনাই এমন নিপুণভাবে সাজানো হয়েছে, যেন প্রতি ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র অর্জুনই 'হিরো' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

এক্ষেত্রেও তা-ই হ'ল। অর্জুন গেলেন বনবাসে। অবশ্য যথার্থ অর্থে তা বনবাস নয়। আসলে মিত্রশক্তি শিকারে বে'র হয়েছিলেন পার্থ। তাঁর সঙ্গে গেছলেন ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত, শৌর্য-কথা-কথক এবং ঐতিহাসিক অথবা 'পৌরাণিক সূতগণ'। বনবাসে তাঁদেরই বা বিশেষ উপস্থিতির কারণ কি? এতো পার্শ্বচর নিয়ে কেউ কি বনবাসে যান? আসলে সবটাই তো সাজানো ঘটনা। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।

বার বছর বনবাসে ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রতিজ্ঞা করে ঘরের বাইরে পা ফেলেছিলেন বটে পৃথাপুত্র, কিন্তু কার্যত এই সময়টাও তিনি নারীসহবাস ও একাধিক বিবাহ করে দেশে দেশে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তা স্থাপন ও মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করেছেন। আশ্চর্য এই, অর্জুনের জন্য নেপথ্য শক্তি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা তৈরী রেখেছেন। গঙ্গাদ্বারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে নাগরাজ কৌরবের সুন্দরী কন্যা উলুপীর সঙ্গে। অর্জুনকে বরণ করার জন্য উলুপী ছিলেন আগে ভাগেই প্রস্তুত। জানতেন তিনি, কোন্ অছিলায় খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে অর্জুন দেশান্তরে ভ্রমণ করছেন। বলেছেন, "হে পাণ্ডব! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ ও তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি।" (আদিপর্ব)। কিন্তু কী

করে উলুপীর কানে দূরদেশের ঘটনাবলী পৌঁছে যায়? কে তাঁকে সে সংবাদ প্রদান করেন? বিনা ভূমিকায় গঙ্গাদ্বারে এসে অর্জুনকে তিনি সহবাসে আহ্বানই বা জানান কেমন করে আর সে আহ্বানে অর্জুন তো বিস্ময়বোধ করেনই-না বরং হাসিমুখে উলুপীর পাণি গ্রহণ করতে সামান্য সঙ্কোচও তাঁর মধ্যে দেখতে পাই না আমরা! ঘটনাবলী আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা নাহলে এই মিলনপর্ব এতো সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। প্রশ্ন তাই, সমস্ত ঘটনাই কি সেই হিমালয়ের দেবশিবির সংগোপনে সাজিয়ে রেখেছিলেন? নারদমুনির দৌত্যকার্যেই কি হয়েছিল পূর্বাপর ঘটনার সমাবেশ? উলুপীর পাণি গ্রহণ করায় অর্জুন দেবানুগত অনার্য নাগদের পরম মিত্ররূপে লাভ করলেন। উলুপী বললেন, তুমি সমস্ত জলচরকে জয় করিতে পারিবে। জলচর অর্থে নাগসম্প্রদায়। নাগজাতি সাধারণত জলাভূমির আশেপাশে বসবাস করত। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে "অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ" করলেন তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ। অনার্যদের সুযোগমত বিভিন্ন স্থানে উৎখাত করে তাঁদের আশ্রয় ও সম্পদ ঐ ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে বণ্টন করে ব্রাহ্মণ্য প্রতাপবৃদ্ধির 'পুণ্য' কর্মে এ সময়টা তিনি ব্যাপৃত থাকেন। এরপর গয়া হয়ে মণিপুরে গমন। মণিপুরেশ্বরকে মহাভারত 'পরম ধার্মিক' আখ্যা দিয়েছেন। ভালই হয়েছে। আমাদের বোঝার পক্ষে আর অসুবিধা নেই। বুঝতে পারি মণিপুরেশ্বরও ছিলেন এক দেবানুগত রাজা। অর্জুন তাই বহু নদ নদী জনপথ অতিক্রম করে তাঁর রাজ্যেই উপস্থিত হয়েছেন এবং অনায়াসেই রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মণিপুরকে পাণ্ডব মিত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভেই অর্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম।

কোথায় মণিপুর আর কোথায় প্রভাস। ভারতের দিগ্বিদিকে সফর শেষ করে অর্জুন অবশেষে উপস্থিত হলেন প্রভাসে। শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুতই ছিলেন। কৃষ্ণ মতাবলম্বী যদুরা মহাসমারোহে দেবনির্বাচিত পার্থকে আপ্যায়ন করলেন। কৃষ্ণবলভদ্র-ভগিনী সুভদ্রাহরণই যে ছিল এই শুভাগমনের মূল উদ্দেশ্য যদুরা অবশ্য তা জানতেন না। উদ্দেশ্যটি জানতেন মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। জানতেন তিনি, সুভদ্রা-হরণ কাজটি খুব সহজ নয়। অন্তত সেনাসামন্ত পরিবেষ্টিত দ্বারকা থেকে সুভদ্রাকে রথে তুলে পালানো অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব। তাই চতুর কৃষ্ণ রৈবতক পর্বত-সন্নিহিত অঞ্চলে অন্ধক ও যদুদের যে উৎসব হয় সুভদ্রা হরণের জন্য মনে মনে সেই স্থানটি নির্বাচিত করেছিলেন। মহাভারতীয় তথ্য

অনুধাবনের দ্বারা। এসব গোপন রহস্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সুভদ্রাহরণ সম্পর্কে কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে যে নিভৃত আলাপ হয়েছিল, সাজানো ঘটনা বুঝবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। কোন্ সহজ উপায়ে সুভদ্রালাভ সম্ভব কৃষ্ণকে একথা জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ বলেছেন, "হে অর্জুন! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছু বলা যায় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।...তুমি আমার ভগিণীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কারণ, স্বয়ংবরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে কে বলিতে পারে?" (রৈবতকে মহোৎসব, আদি)।

সুভদ্রা, সুতরাং, অর্জুনকে দেখেই মোহিত হয়ে তাঁর রথে চেপে বসেছিলেন, এমন নয়। সুভদ্রাকে বস্তুতই হরণ করা হয়েছিল। এই হরণ পর্বে যদুরা যদি অর্জুনকে বাধা দিতেন তা হলে তাঁর বীরত্ব কতদূর প্রকাশিত হয় বলা যায় না। কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। অর্জুন বিনা বাধায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেছিলেন শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায়। উত্তেজিত যদুদের শান্ত করেছিলেন কৃষ্ণই। কোনো সংঘর্ষ বাধতে দেন নি। এই পর্বে বলদেব অর্জুনের আচরণে এতোদূর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে সরোষে বলেছেন, "আমি একাকীই অদ্য এই বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব, অর্জুনের এই ব্যতিক্রম আমি কখনই সহ্য করিব না।" (ঐ)।

শুধু বলরামই নন, যদুনেতারা অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন অর্জুনের আচরণে। 'মহাবীর যাদবেরা...ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া' রণসাজে সজ্জিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বজাতিবর্গকে।

যুদ্ধ একটা বাধো বাধো অবস্থা, তখন চতুর কূটনীতিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ করলেন উত্তজিত যদু বীরদের। বললেন, অর্জুন তো যদুবংশের কোনো অমর্যাদা করেন নি, যা করেছেন তা একান্তই ক্ষত্রিয় কুলোচিত। তিনি অর্থের বিনিময়ে সুভদ্রাকে গ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ যদুগণকে অর্থলুব্ধ জ্ঞান না করে যথোচিত সম্মানই প্রদর্শন করেছেন। মেয়েদের মন কে বোঝে। স্বয়ম্বরে সুভদ্রা লাভ যে হবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। অর্জুন তাই সে পথেও যান নি। আবার পিতামাতার অনুমতি নিয়ে কন্যার পাণিগ্রহণ করাও ক্ষত্রিয় বীরের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ নয়, তাই অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে উভয়পক্ষের সম্মানই বজায় রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করে বরং তাঁকে অভ্যর্থনা করে দ্বারকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত। দেবাধিনায়ক মহাদেব ছাড়া পার্থকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারেন এমন বীর কে আছেন? পার্থ যদুদের আত্মীয় হলে সে তো যাদবগণেরই লাভ।

যাদবগণের সকলেই কৃষ্ণবাক্যে একমত হয়েছিলেন কিনা জানা নেই। সম্ভবত বিরোধীরও অভাব ছিল না। কারণ মৌসলপর্বে জানা যায় যাদবগণের ওপর শ্রীকৃষ্ণের একচ্ছত্র প্রভাব ছিল না। সুভদ্রাহরণ পর্বে অবশ্য বলরামের মধ্যস্থতায় যাদবরা কৃষ্ণবাক্যকে মান্য করেছিলেন। পার্থকে ফিরিয়ে এনে পুরো একবছর তাঁর সাদর পরিচর্যা করেছেন যাদবরা।

বনবাসছলে বহির্গত অর্জুন এভাবেই আর্যাবর্তে পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষ সংগ্রহ করেছিলেন। বনবাস-এ যাচ্ছি, এই ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক চাতুরীমাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্যকে গোপন করে কাজ গুছানো। শক্তিবৃদ্ধিই পার্থের বনগমনের উদ্দেশ্য একথা জানলে ধৃতরাষ্ট্রকুল চুপ করে বসে থাকবে না। হয়ত ব্রাহ্মণ-পাণ্ডব দেবতাদের সে আশঙ্কাও ছিল। ঘটনাটি তাই সূক্ষ্ম চাতুর্যের সঙ্গেই সাজানো হয়েছে। কৃষ্ণার্জুনের বাক্যালাপেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে আসে। প্রভাসে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ জানতে চান অর্জুনের উদ্দেশ্য। অর্জুন তাঁকে স্পষ্টত কী বলেন তার উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায় বেশ একটি দীর্ঘ বৃত্তান্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানান। শুনে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "সঙ্গত হইয়াছে।" অর্থাৎ পাণ্ডবরা ঠিকমতই তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন।

ব্রহ্মার পরিকল্পনা থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাধারণ পাঠকের কাছে সুদীর্ঘ সময় বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সেযুগের সময়ের হিসেবে তো বটেই, এ যুগের রাজনৈতিক উত্থানপতনের সময়কাল গণনা করলেও খুব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল বলা যায় না। বরং সে যুগের সময়ের হিসেবে সমরায়োজনে বিরাট কালক্ষয় হয়নি, যথাশীঘ্র আর্যাবর্তে দেববিরোধী শক্তির পতন ঘটেছিল, এ কথাই বুঝতে পারি।

সুভদ্রাহরণের পর কৃষ্ণার্জুনের সম্মিলিত শক্তি খোদ আর্যাবর্তে দেবরক্ষিত একটি শক্তশিবির রচনায় উদ্যোগী হয়েছে। তখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে খাণ্ডবপ্রস্থকে সম্প্রসারিত করার এবং তার বুকের ওপর থেকে অনার্য শক্তিকে উৎখাত করার। এই প্রয়োজনের ফলশ্রুতিতে সেখানে ঘটে গেল একটি নিষ্ঠুর অগ্নিকাণ্ড যাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল অগণিত পশুপক্ষী উদ্ভিদ ও অনার্য বাসিন্দাকে। মহাভারতে সেই অগ্নিকাণ্ডেরই নাম, খাণ্ডবদাহন।

তাঁর সফরকালে (বনবাসে) পার্থ একাধিক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেই সুন্দরীদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকেই তিনি পাটরাণী করে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন

করেন। বস্তুত সুভদ্রাই তো পাণ্ডবরাজকুলে পাটরাণী। দ্রৌপদী ওঁদের সাধন-সঙ্গিনী মাত্র। দ্রৌপদী দেবগণ-প্রেরিতা। পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁদের দেব-নির্ধারিত লক্ষ্যে অর্থাৎ আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ দখলদারি প্রতিষ্ঠার কাজে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই যেন ছিল দ্রৌপদীর ওপর একমাত্র অর্পিত কর্তব্য। দ্রৌপদী চিরদুখিনী। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বনে বনান্তরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন একই গৃহে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে। যুদ্ধ পরবর্তীকালেও তাঁর মধ্যে রাণী হওয়ার জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। মহাপ্রস্থানের পথেও একমাত্র তিনিই পাণ্ডব ভ্রাতৃপঞ্চকের সহগামিনী। পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামা পরিচালিত হত্যালীলায় দুর্ভাগিনী দ্রৌপদীর সন্তানগুলিই নির্বিচারে নিহত হয়েছে। ওদিকে অর্জুনের পাটরাণী সুভদ্রার নাতি পরীক্ষিতকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল আর্যাবর্তের দেবানুগত রাজ্যে পুরোহিতশাসিত শাসনভারের প্রতীক রাজার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য। কৃষ্ণের পক্ষে আপন তেজে মৃতকে জীবন দান যদি সত্যিই সম্ভবপর ছিল (গল্প বলে কৃষ্ণ মৃতপ্রায় পরীক্ষিতকে জীবন দান করেন) তবে দ্রৌপদীপুত্রদেরই বা তিনি বাঁচিয়ে তুললেন না কেন ? কেউ তাঁকে সে অনুরোধও তো করল না ! দ্রৌপদী নিজেও যেন নিরাসক্তা। কৃষ্ণ দ্রৌপদী-সখা, কিন্তু নিজের সন্তানদের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণের কাছে কোন প্রার্থনা জানান নি। তাই মনে হয়, রাজ্যাধিকারে দ্রৌপদী-তনয়দের যে দাবি ছিল না, একথা স্বয়ং দ্রৌপদীও জানতেন। তিনি জানতেন, অগ্নি সাক্ষ্য রেখে একমাত্র তিনি যুধিষ্ঠিরেরই সহধর্মিণী। আর দেবনিযুক্তি অনুসারে কার্যত তিনি ছিলেন পাণ্ডবশিবিরে প্রেরিতা একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ। সেকারণ, তাঁকে অপর পাণ্ডবদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতি বিশেষ প্রেমাসক্তি প্রদর্শন করতে পারেন নি। নিজস্ব একটি স্বামীপুত্র দাবি করার মানসিক আর্তিকে নীরবে নিভৃতে আপন মনের নিবিড় বেদনাগর্ভে প্রতিদিন নিহত করতে হয়েছে তাঁকে। এই চরম নির্যাতনে তাঁর মধ্যে এসেছিল একটি নির্বিকার ঔদাসীন্য। একমাত্র দীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা হতাশ পাণ্ডবদের উত্তেজিত করা ছাড়া প্রণয়কলা নিবেদনের সুযোগ তাঁর স্বল্পই ছিল। তিনি ভীমকে ব্যবহার করেছেন উদ্দেশ্যসাধক শক্তি হিসেবে। অর্জুনের যৌবনকে উদ্দীপ্ত রেখেছেন নিজেকে নিঃশেষে দান করে। যুধিষ্ঠিরের ভীরু দোলাচল চিত্ততাকে সংযত ও সুদৃঢ় করতে প্রযত্ন গ্রহণ করেছেন আর কনিষ্ঠভ্রাতাদ্বয়কে প্রায় স্নেহডোরে আবদ্ধ রেখে পাণ্ডব-সংহতিকে সবসময় সুস্থিত করতেই ব্যস্ত থেকেছেন। নিজের জন্য কিছুই যেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত থাকার কথা নয়।

দ্রৌপদী চেয়েছেন শুধু যুদ্ধ। যুদ্ধশেষে সরে গেছেন যবনিকার আড়ালে। পুনশ্চ তাঁর তৎপরতা দেখা গেছে মহাপ্রস্থানের পথে।

তাই বলছিলাম, সুভদ্রাকেই পাটরাণী করে আনলেন অর্জুন, যিনি দেবপক্ষের ক্ষমতাসীন নেতা বা রাজা ইন্দ্রের ঔরসজাত খাঁটি দেবপুত্র। সুভদ্রার আগমনে দ্রৌপদীর হৃদয়ে যেটুকু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা-ও নিতান্তই দাবিশূন্য। অর্জুনের প্রতি অনুযোগেও তাঁর দাবিহীন দুঃখই প্রকাশিত হয়েছে। আজীবন আত্মত্যাগ ও স্বর্বস্ব সমর্পণের বিনিময়ে দ্রৌপদী কিছুই চাইতে পারেন নি। দ্রৌপদী সর্বাগ্রবর্তিনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন কি তাঁর পালক পিতা রাজা দ্রুপদও পাণ্ডবদের কিছু বলেন নি। সকলেই যেন এটা মেনে নিয়েছিলেন যে দ্রৌপদীর শুধু দেওয়াই কর্তব্য, কিছু নেওয়ার জন্য তাঁর আবির্ভাব নয়। তিনি যুদ্ধবস্থায় প্রেরিত দেবশিবিরের নারী গুপ্তচরমাত্র।

দেবতার ক্ষুধা

মহাভারতে এক ক্ষুধার্ত দেবতার ভীষণ ভয়াল আবির্ভাব দেখতে পাই খাণ্ডবদাহন পর্বে। "তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণসঙ্কাশ পিঙ্গলোজ্জ্বল শ্মশ্রুজালজড়িত জটাচীর ধারী দীর্ঘকায় সেই ব্রাহ্মণ" বার বছর ঘৃত পান করেও অতৃপ্ত। তাঁর দুই চক্ষে সর্বভুক মাংসলোলুপ জিঘাংসা। একটি প্রশান্ত বনাঞ্চলের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকে সম্পূর্ণ অগ্নিসাৎ করার মানসে একদিন সেই ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ হিমালয় গিরিশীর্ষ থেকে নেমে এলেন দিল্লী-সন্নিকটস্থ যমুনা-তীরবর্তী খাণ্ডববনাঞ্চল-সন্নিহিত এক মনোরম স্থানে। ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ ছিল, পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থে অধিষ্ঠান করছেন এবং বাসুদেব কৃষ্ণও সেখানে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ-মতাবলম্বী বার্ষ্ণেয়বীরগণের সঙ্গে। শুধু সংবাদই নয়, স্বয়ং ব্রহ্মার নির্দেশ ছিল, ব্রাহ্মণ যেন কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে খাণ্ডবন দগ্ধ করার আয়োজন করেন।

খাণ্ডবদাহন পর্বেও দুই ধারা গল্প আছে। একাধার মহাভারতে তা সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেবতার ভূমিক্ষুধাকে ব্রাহ্মণের আমিষ-ভক্ষণের গালগল্পের মোড়কে ভরে ইতরজনের কাছে সমগ্র ঘটনাটিকে বিশেষ উদ্দেশ্যে দুর্বোধ্য করে তোলা হয়েছে। একটি নির্বিচার নৃশংস হত্যালীলা এক ব্রাহ্মণ দেবতার রাক্ষুসে ক্ষুধা হিসেবে বর্ণিত হওয়ায় স্বরূপত সেই দেহধারী ব্রাহ্মণ অপার্থিব মহিমায় প্রসারিত হতে হতে আমাদের সমস্ত চৈতন্য, সমস্ত বোধবুদ্ধিকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। আর তারই ফলে আমরা একটি নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে দৈবীলীলা ভেবে খাণ্ডবদাহনের অন্তর্লীন অর্থ টিকে অবহেলা করে সেই ঘটনার বহুতর কাল্পনিক অর্থ আবিষ্কারের প্রযত্ন গ্রহণ করে আসছি বহুকালাবধি তো বটেই, এমন কি আজও, যখন বেশ কিছু ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় খাণ্ডবদাহন কাণ্ডটি অনার্য-হননের শ্মশানভূমির ওপর আর্য-সাম্রাজ্যবাদের নগরীস্থাপন পর্ব বলে উল্লিখিত হচ্ছে।

কবি বুদ্ধদেব বসু এই ঘটনাটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার পরও খাণ্ডবদাহনকে এক নতুনতর দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা গৌরবান্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে ('১০ : আগুন-জলের গল্প' দ্র)। যদিও তিনি জানেন, খাণ্ডবদাহনের সুস্পষ্ট নেপথ্য প্রেরণা হল,

"নগর নির্মাণের জন্য অরণ্য ধ্বংস করা…" এবং "বৃক্ষ ও পক্ষীনাগাদির শ্মশান-ভূমির উপর" গড়ে তোলা এক নতুন রাজধানী।

সেই রাজধানীর নামকরণ করা হয়েছিল, 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' দেবভাবক যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নামকরণের মধ্যেই বহিরাগত দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নজীরও অস্পষ্ট নয়। তবু কী আশ্চর্য, আধুনিক এক বিদগ্ধ কবিও ইতিহাসকে আমল না দিয়ে কল্পগল্পের মধ্যেই অবগাহন করলেন চিরাচরিত দার্শনিক গাল্পিকতার আকর্ষণে। বুদ্ধদেববাবুর মত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত কবিও যেদেশে এই বিমুগ্ধতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, সে দেশের আপামর জনসাধারণ যে মহাভারতের কথা শ্রবণে পুণ্য ও পরমার্থ লাভ হয় ভেবে বিনা তর্কে তার সবকিছুই নীরবে মান্য করে চলবেন তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে। বরং সেই প্রথাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার কথাস্তূপ খুঁচিয়ে আমাদের মত পুণ্যলোভবর্জিত অল্পজ্ঞানী যখন নিহিত সত্যের ফসিল-সন্ধানে ব্যাপৃত হয়, বিস্মিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ সৃষ্টি হয় তখনই। এই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সুখপ্রদ হয় না। নেপথ্যে শত্রু বৃদ্ধি হয় অনেক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি তো চোখ ফেরাতে পারি না সেই নিহত সত্যের কঙ্কাল-গুলির ওপর থেকে। আমাকে খুঁজতেই হয়, উদ্ধার করতেই হয় সেই সব কথা, যেগুলি বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাহিনী।

সেই গল্পাংশে উপস্থিত হওয়ার আগে সর্বভুক অগ্নি দেবতাটি সম্পর্কে একটু তথ্য তল্লাশ করে নেওয়া দরকার। অগ্নির যথার্থ স্বরূপ না বুঝলে ব্রহ্মার পরিকল্পনায় খাণ্ডবদাহনের ইতিবৃত্ত দুর্বোধ্য থেকে যাবে, ফলত আমাদেরও দার্শনিকতার সহজ পথটি খুঁজে নিয়ে হাজার বছরের বোঝা পিঠে তুলে আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলতে হবে, বড় মুখ করে সেই চলাকেই তখন বলতে হবে, চরৈবেতি। এগিয়ে চলো। অর্থাৎ তা হবে একজাতের কসরৎ বা ব্যায়াম। এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে শুধু সর্বাঙ্গ নাড়িয়ে চলার একটি ছন্দ তৈরি করা মাত্র। —যাক, যা বলছিলাম:

পুণার ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-এর পণ্ডিত গবেষক ডঃ আর. এন. দাণ্ডেকর অগ্নি দেবতা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তটি এইভাবে অল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন: বৈদিক যুগে অগ্নির ভূমিকা ছিল কাল্পনিক। অগ্নির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কল্পনা করতেন কল্যাণপ্রার্থী গৃহস্থ। যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত নৈবেদ্য ধূমায়িত আকারে গগনগামী হলে তদবস্থায় আরাধ্য দেবতা সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, এই ছিল বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈশ্বরের

সঙ্গে অগ্নি ছিলেন অন্তরীক্ষ পথের সংযোগ-রক্ষাকারী সেতুস্বরূপ। ক্রমে অগ্নি স্বয়ং পুরোহিত পদবাচ্য হয়েছেন। বলা হয়েছে, অগ্নি দেবতার মুখগহ্বর-স্বরূপ, তিনি দেবদূত, তাঁর মাধ্যমেই দেবতারা গ্রহণ করেন নৈবেদ্য।[১]

বৈদিক আমলের অগ্নিদেবতা পৌরাণিক আমলে হিমালয়স্থ দেহধারী দেববৃন্দের পার্থিব দূতে পরিণত হয়েছেন। তিনি অতঃপর আর দেবতাও নন. একজন উচ্চপদস্থ দেবানুচর, জাতিতে আর্য ব্রাহ্মণ। তাঁর তপ্তকাঞ্চনসদৃশ উজ্জ্বল বর্ণের কথা কালীপ্রসন্ন-মহাভারত থেকে আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি গুরুতর দেবকার্য-সাধনে বেদব্যাস দুর্বাসা ও নারদের মত স্বতই ব্যস্ত থাকেন। ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে ভূভার হরণের দায়িত্বও তাঁর ওপর কিছু কিছু অর্পিত আছে। তিনি কোনও অগ্নিময় লেলিহান শিখা নন, পদব্রজে যাতায়াতকারী ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন এক পুরুষ। যোগবল ও দৈববলেও এই অগ্নি তাঁর পালনীয় কর্তব্য সমাধা করতে অপারগ। ব্রহ্মার আদেশানুসারে তাই তাঁকে সশরীরে ছুটে আসতে হয় বদ্রিনাথ অঞ্চল থেকে উত্তরপ্রদেশের দিল্লী অঞ্চলে. মহাভারতীয় যুগে যা ছিল অনার্য অধ্যুষিত সুগভীর বনাঞ্চল, নাম খাণ্ডবপ্রস্থ। নিজবলে খাণ্ডবদাহনেও তিনি অসক্ষম। ইতিপূর্বে ব্রহ্মার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে এই বন বার সাতেক দগ্ধ করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে কথিত অগ্নিদেব। তাঁর এই অসাফল্য ব্রহ্মার বিরক্তির কারণ ঘটালে দেববুদ্ধিদাতা বা মহামন্ত্রী ব্রহ্মাজী অগ্নিকে সব্যঙ্গে বলেছেন, "পূর্বে দেবনিয়োগ ক্রমে দেবশত্রু অসুরগণের আলয়ভূত যে ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহাদিগের মেদোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে; অতএব শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই গ্লানিরূপ পাপ হইতে আশু মুক্ত হইতে পারিবে।" (কালীপ্রসন্ন, আদিপর্ব)।

অর্থাৎ অগ্নির ওপর খাণ্ডববন দাহনের আদেশ ছিল। বারম্বার চেষ্টা সত্ত্বেও সে কাজ কিন্তু তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে শ্বেতকি রাজার বার বছরব্যাপী যজ্ঞে অবিরত নিরামিষ ভোজন করে ও ঘৃত পান করে অগ্নি আয়েসী ও চর্বি-সর্বস্ব অধমে পরিণত হয়ে পড়েন। নিজের অক্ষমতায় নিতান্ত লজ্জিত হয়ে বিরক্ত ব্রহ্মাজীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন তাই পরান্নভোজী সেই ব্রাহ্মণ এবং নিজের মানসিক গ্লানির কথা নিবেদন করে নতুন কর্মভার প্রার্থনা করেছেন। তখন ব্রহ্মাজী যা বলেছেন, আমাদের ভাষায় তা লিখিত হলে সংলাপটি এই রকম দাঁড়াত: পরশ্রমভোগী অতিভোজনক্লান্ত ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা

বলতেন, শ্বেতকি রাজ্যে বসে বসে ভূরিভোজন করে অক্ষম হয়ে পড়েছ, বাপু। এবার একটু গতর নাড়াও। ইতিপূর্বে দেবতারা তোমাকে খাণ্ডব-দাহনের কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অকৃতকার্য হয়েছ। যাও, খাণ্ডবপ্রস্থে দুই মানব বীর উপস্থিত আছেন। তাঁদের সাহায্যে অসমাপ্ত কাজটা সেরে এসো।

বলা বাহুল্য, মহাবীর দুজনের একজন পার্থ, অপর পুরুষ, বাসুদেব কৃষ্ণ।

প্রসঙ্গত রাজা শ্বেতকির উপাখ্যানটির দিকেও একটু তাকিয়ে নিই।

রাজা শ্বেতকির বার বছর ব্যাপী দানযজ্ঞের আড়ম্বর দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি একজন দেবানুগত দেশীয় রাজা ছিলেন। দেবভক্তির প্রমাণ স্বরূপ উন্মাদের মত সুদীর্ঘ দানযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন তিনি। প্রজাশোষিত সম্পদের সেই হরির লুঠে লুঠেরা ব্রাহ্মণগণও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। বার বছর ধরে যজ্ঞকুণ্ডে ঘি ও আগুন ছড়িয়ে যজ্ঞধূমে ব্রাহ্মণদের সর্বশরীর ঝলসে গেছে। তাঁরা আর শরীর ক্ষয় করে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে রাজি নন। তাঁরা জানেন, আর্যসম্প্রসারণবাদীরা ব্রাহ্মণদের নিশ্চিন্ত আরামের জন্য বিনাশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন লাভের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বহু ভূমি ও গোধনযুক্ত সেই ব্রাহ্মণরা সুতরাং আর খেটে খেতে রাজি নন। যজ্ঞধূমে-পীড়িত জবাকুসুমসংকাশ অক্ষিগোলক দুটি বিঘূর্ণিত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন তাই তাঁরা। বললেন, এতো যজ্ঞ করবে কে মশায়? এবার ক্ষান্তি দিন। কিন্তু রাজা শ্বেতকি নিষ্কর্মা পুরুষ। তাঁর রাজ্যে লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। ছুটলেন তিনি শঙ্কর মহাদেওর দরবারে। প্রার্থনা, শঙ্করজী তাঁর জন্য একজন উত্তম যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ যোগাড় করে দিন। রাজার এবম্বিধ সংকট শুনে শঙ্করজী কৌতুক অনুভব করলেন। পাগলা রাজার যজ্ঞ করার জন্য অতঃপর তিনি নিযুক্ত করলেন সদারুষ্ট সদাহিংস্র দুর্বাসাকে। দুর্বাসাকে প্রেরণ করার অর্থ শ্বেতকি রাজ্যে ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহ দমন করা। দুর্বাসা ব্রাহ্মণদেরও ত্রাস। আর এসব কাজ তো শঙ্করেরই করার কথা। তিনিই যে দেবতাদের সমরাধিনায়ক।

এই উপাখ্যান বলল, কেবল ঘি মাখন খেয়ে খেয়ে ব্রাহ্মণের পেটে চড়া পড়ে গেছল। মূর্খ শ্বেতকি হয়ত তাঁদের জন্য মদ্যমাংসের ব্যবস্থা রাখেন নি। এ গল্প মহাভারতে গেঁথে রাখার অপর লক্ষ্য হল, ব্রাহ্মণদের উদার হস্তে সর্বস্ব দান করার একটি আদর্শকাহিনী সাজিয়ে ধরা। এবং ইঙ্গিতে এ কথাও বলা যে, পূজ্য উপবীতধারীগণকে নির্ভেজাল নিরামিষাশী ভাবা সমুচিত নয়, তাঁদের জন্য যাবতীয় জীবের রক্তমাংসও নৈবেদ্য রূপে প্রদত্ত হওয়া দরকার,

না হলে রাজ-ইচ্ছাও বিঘ্নিত হতে পারে। এই গল্পে প্রজাশোষণের যে অবাধ আয়োজন লক্ষিত হয়, তাকে বঙ্গদেশীয় জমিদার শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কিয়দংশে তুলনা করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে অবাধ প্রজাশোষণের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে-প্রদত্ত 'জমিন্দারি'র মালিকরা। যথার্থ কোন্ দিবসে ইংরেজের প্রাপ্য রাজস্ব গুণে দিতে হবে, বিদেশী প্রভুর আইনী ভিক্টোরিয়ায় তা লিখিত থাকলেও প্রজাশোষণের কথা কিছুমাত্র আলোচিত ছিল না। এক্ষেত্রেও প্রভু-দেবতাদের প্রতিনিধি পুরোহিতগণকে সেবার কথা মহাভারতের পাতায় পাতায় লিখিত আছে, কিন্তু কোত্থেকে সেই সেবার ব্যবস্থা হবে, কার পাকা ধান কেটে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের শস্যাগার পূর্ণ করে দিতে হবে, সে বিবরণ উল্লিখিত নেই। দেব-ব্রাহ্মণ-শোষণের স্বরূপ ছিল এমনিই নির্বিচার। তা সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় আতঙ্কের সৃষ্টি করে দেশীয় অব্রাহ্মণদের নিঃস্ব ও নিঃসম্বল করেছিল। শ্বেতকি-উপাখ্যান তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

অগ্নি শ্বেতকির যজ্ঞঘৃত অনবরত পান করে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিম্বা অকস্মাৎই হয়ত তাঁর বোধোদয় ঘটল এই ভেবে যে শ্বেতকি-রাজ্যে পড়ে থেকে তিনি তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। ব্রহ্মার সভায় তাঁর আর ডাক পড়ছে না। কোনো ভারি কাজের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করছেন না দেবতারা। সুতরাং আত্মগ্লানি উপস্থিত হল ভগবান অগ্নির মনে। তিনি ব্রহ্মাজীর কাছে উপস্থিত হয়ে কাজ চাইলেন।[৫] ব্রহ্মজী অগ্নির নিজস্ব ক্ষমতায় ইতিমধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এ বিষয়ে অগ্নি ও ব্রহ্মার সংলাপ আগেই উদ্ধার করেছি। সেখানে দেখলাম, অগ্নিকে স্বাধীনভাবে খাণ্ডবদাহনে পুনরায় আর প্রেরণ করা হল না। ব্রহ্মা তাঁকে দৌত্যকার্যের ভার দিলেন। এরপর অগ্নি একাধিকবার পাণ্ডবদের কাছে দূত হিসেবেই হিমালয় থেকে প্রেরিত হয়েছেন। স্বাধীন কোনো কাজের ভার পান নি। বেদবন্দিত অগ্নিদেব পরিণত হয়েছেন দেবশিবিরের সামান্য রাজনৈতিক দূতে।

সেই দেবদূত অগ্নি খাণ্ডবপ্রস্থে যমুনাতীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন জল বিহারের পর কামিনীগণসহ কৃষ্ণার্জুন বিশ্রম্ভালাপে অবসর যাপন করছেন। অগ্নি তাঁদের কাছে খাণ্ডবদাহনের প্রস্তাবটি উপস্থিত করলে কৃষ্ণার্জুন শর্তসাপেক্ষে অগ্নির সহায়তায় রাজি হলেন। অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের সঙ্গে একটি মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হল। খাণ্ডবদাহন করে বনাঞ্চলবাসী অনার্য উৎসাদন করার বিনিময়ে কৃষ্ণার্জুন প্রদত্ত হলেন দুর্লভ কিছু দেব অস্ত্রসহ সুনির্মিত বেগবান

দেবরথ। এবং শুধু খাণ্ডবদাহনের জন্যই নয়, ঐ গাণ্ডীবধনু, ঐ দেবরথ, ঐ কৃষ্ণ-অঙ্গুলিধৃত চক্র, সে সমস্তই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছিল একই অস্ত্র পূর্বতন সময়ে অনার্যহননের কাজেও। অগ্নি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে দেন দেবশিবিরের চতুর্থ লোকপাল বরুণের আয়ুধাগার থেকে। এক সময় লোকপাল বরুণ দেবশিবিরের বিশেষ ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। প্রবল প্রতাপ ছিল তাঁর। দেবতাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন তিনিই। বর্তমানে তিনি ম্রিয়মাণ। দেবতা সূর্যের মতই তাঁকে অতিক্রম করে প্রতাপ বৃদ্ধি করে নিয়েছেন ইন্দ্র ও শঙ্কর। কিন্তু এক সময় বরুণের প্রতিপত্তি খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। যাই হোক, বরুণ যে গাণ্ডীবধনু, তূণীরদ্বয়, চক্র এবং কপিলক্ষণ রথ[৩] প্রদান করেন, আগে তা সোমরাজ কর্তৃক দানবনিধনে ব্যবহৃত হয়েছিল। গাণ্ডীবধনুটি ছিল 'ব্রহ্মনির্মিত'।[৪] ব্রহ্মার পরিকল্পনায় কুরুক্ষেত্র; তাঁরই পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, জরাসন্ধ-শিশুপালের গুপ্তহত্যা এবং তাঁরই আদেশে খাণ্ডবদাহন। ব্রহ্মার অপূর্ব এই রাজনীতির খেলা পূর্বাপর অনুধাবন করলে আমার মত আপনিও কাশীরাম দাসের সেই প্রখ্যাত শ্লোকটিকে পরিবর্তিত করে এইভাবে আবৃত্তি করতে চাইবেন :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
যে শোনে তারই হয় ধ্রুব ব্রহ্মজ্ঞান—
ব্রহ্মাজী সুমেরু শীর্ষে করি অধিষ্ঠান
কুচক্রী ব্রাহ্মণহস্তে করে যান দান
বিপুলা উত্তরাখণ্ড, আর্যাবর্ত নাম,
যা ছিল অনার্য বীরে পূর্ণ সুখধাম।

আগেই বলেছি, মহাভারতের কথায় আছে দুই ধারার গল্প। তার উপরিস্তরগত আখ্যানটি রূপকথার রূপালী আচ্ছাদনে আবৃত। অন্তর্লীন অর্থটি কিন্তু অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস। কবি বুদ্ধদেব বসু খাণ্ডবদাহন প্রসঙ্গে কী অর্থে যে বললেন, "খাণ্ডবদাহনের উপরিস্তরগত অর্থটি খুব স্পষ্ট", আমার কাছে তা পরিষ্কার মনে হল না। "নগর নির্মাণের জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হল, বৃক্ষ ও পক্ষীনাগাদির শ্মশানভূমির উপর সগর্বে উঠল নতুন রাজধানী", সে কথা কিন্তু আপাতভাবে মোটেই বোঝা যায় না। সে ইতিহাস গবেষকদের বহু তর্ক ও আলোচনার ফলশ্রুতি। তা উপরিস্তরগত অর্থ নয়, গবেষণার দ্বারা লব্ধ অন্তর্লীন ইতিবৃত্ত। কবি বরং এই অংশের 'উপরিস্তরগত অর্থে'র প্রতি অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় যা ইতিহাস, তাকেই শুক্তিকারূপে পরিহার্য করে উপরি-

স্তরগত গল্পাংশকে, যা রূপকথার মতই অসম্ভব ও কল্পনাশ্রয়ী, তাকেই মুক্তারূপে সপ্রশংস সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ফলত যা হবার তাই হয়েছে, বিদগ্ধ কবিকেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় বেশ কঠিন স্ববিরোধী বক্তব্যের দোলাচলে আন্দোলিত হয়েছে।

আমরা মহাভারতের অন্তর্লীন সেই পুরা ইতিহাসের প্রতিই সমধিক কৌতূহলাক্রান্ত। খাণ্ডবদাহন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রসঙ্গের এমনিই একটি আলোচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করি। ডঃ ইরাবতী কার্ভে প্রসঙ্গত যা লিখেছেন তার অংশত ভাবানুবাদ এই রকম : খাণ্ডবদাহনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, আর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। নির্বিচার আদিবাসী-হত্যা আর্যনীতির পরিপন্থী ছিল না। অনার্য নিধন করে তাঁদের জমি ও সম্পদ দখল করতেন তাঁরা। খাণ্ডববনের সবটা না হলেও অংশবিশেষ ছিল তক্ষকের রাজ্যভুক্ত। সে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই পলাতক তক্ষকবংশীয়ের দ্বারা পরবর্তীকালে অর্জুনপৌত্র পরীক্ষিত নিহত হন। বৈরিতা ও প্রতিহিংসাস্পৃহা এইভাবে বংশানুক্রমেও বজায় ছিল। মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সঙ্গে তাই দেখা যায় আরও একটি ইতিবৃত্ত সমান্তরালভাবে যুক্ত আছে। তা হল, পাণ্ডব-তক্ষক বৈরিতার কাহিনী। সেই কাহিনীর সূত্র ধরেই মহাভারতকথার সুরু। পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়কে তাঁর পিতৃপুরুষের যে কাহিনী শোনানো হয়, তাই মহাভারতকথা।[৫] আরও উল্লেখ্য যে, রাজা জনমেজয়ও তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন নাগবংশ ধ্বংস করে। কথিত আছে, যমুনা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল নাগশূন্য করা হয় ঐ সময়।

নাগেরা সাধারণত নদী উপকূলেই থাকতেন। বিভিন্ন নাগ দলপতির নেতৃত্বে এঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। পশ্চিম হিমালয় থেকে মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে এবং নর্মদার দক্ষিণাংশে ছিল তাঁদের বসতি। নদী ও বনাঞ্চলই ছিল তাঁদের প্রিয় বাসভূমি। অন্যপক্ষে আর্যরা উন্মুক্ত কর্ষণযোগ্য ভূমিই বেশি পছন্দ করতেন। তক্ষকের রাজ্য ছিল খাণ্ডববন। নাগরাজ ঐরাবতের রাজধানী ছিল ইরাবতী নদীর উপকূলে।[৬]

এই তো হল ইতিহাস, মহাভারতের যা অন্তর্লীন সত্য। কিন্তু সেই সহজ সত্যটিকে অদ্ভুত রাঙতায় মুড়ে পরিবেশন করা হয়েছে আমাদের কাছে। এ এক অভিনব রচনারীতি। পৃথিবীর যত পুরাকথা সবই প্রায় অনুরূপভাবে রঙিন হয়ে আছে। সকল পুঁথিবর্ণিত ঘটনাবলীই এই আশ্চর্য রঙ্‌রেখায় বিশেষ প্রযত্নে তার মূল অর্থকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রায় সমসাময়িক সেই পৌরাণিক

যুগের পুঁথি-রচনা-কৌশলের ধারা লক্ষ্য করে তাই একটা দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাধ যায়। প্রশ্ন জাগে, এই বিশেষ রচনারীতিটি কি কোনো বহির্জাগতিক আঙ্গিক, যার দ্বারা তৎকালীন পুরা ইতিবৃত্তগুলির অঙ্গসজ্জা রচিত হয়েছিল? কিন্তু সে প্রশ্ন থাক। এবার আমরা খাণ্ডবদাহনের সেই 'উপরিস্তরগত' উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করে দেখব গল্পের স্তূপ খুঁড়ে হারানো ইতিবৃত্তটির প্রস্তরীভূত কঙ্কালটিকে উপরিস্তরে উত্থিত করা যায় কি না।

রথ ও আয়ুধ লাভের পর, কৃষ্ণার্জুন বললেন, 'হে পাবক ('পাবক' বলতে কি অগ্নিসংযোগকারী বুঝব?)। আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দগ্ধ করুন।' অগ্নিকে তো দেহধারী এক স্বর্ণকান্তিময় আর্য ব্রাহ্মণরূপেই আবিষ্কার করেছি আমরা। তবে কি বুঝব, কৃষ্ণার্জুন অগ্নিকে প্রজ্বলিত হতে বলছেন, এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যা হবে, তাঁরা অগ্নিকে জঙ্গল-বদ্ধ করে তার চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করতে বললেন? হ্যাঁ, সেটাই তো প্রকৃত ব্যাখ্যা। অগ্নির মহিমাবৃদ্ধির মানসে চতুর মহাভারতকার সে কথা এমনভাবে বললেন, যেন স্বয়ং অগ্নিই জ্বলে উঠবেন। যদি এতই তাঁর প্রতাপ, তবে দাবানলে খাণ্ডববন একাই দগ্ধ করতে পারেন নি কেন? আমরা বলি, 'কাপড় ছেঁড়ে'; যদিও জানি, কাপড় নিজে নিজে ছিন্ন হতে পারে না। তবু বাক্যের মোচড়টি অমনিই হয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও, অগ্নি, আপনি জ্বলে উঠুন! একথা শুধুই কথার কথা। বলা হচ্ছে, হে পাবক, এবার বনাঞ্চল ঘিরে ফেলে আগুন ধরিয়ে দিন। বোঝা যাচ্ছে, অগ্নির নেতৃত্বে বেশ একদল অগ্নিসংযোগকারী নিঃশব্দে তৈরি আছেন। সংকেত পেলেই তাঁরা অগ্নিসংযোগ করবেন। অসংখ্য জীব ও নিশ্চিন্ত মানুষের পোড়া মাংসের গন্ধে যমুনার জলও অল্পক্ষণ পরেই দূষিত হয়ে যাবে। হায়, এমন একটি বহ্ন্যুৎসব কেমন ধর্মকর্ম হয়ে উঠেছে, আর জতুগৃহ পর্বটি কতভাবেই না নিন্দিত! পাছে খাণ্ডবদাহনও ইতিহাসের মহান কলঙ্ক রূপে দেবনিন্দার চিরস্থায়ী কারণ হয়ে থাকে, সম্ভবত সেজন্যই ঘটনাটিকে রাঙতার মোড়ক পরিয়ে রুপুলি করা হল। সামান্য এক ব্রাহ্মণকে জগদীশ্বরের সমান ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আছে এখানে। আর্য-লিখন-চাতুর্যে সাধারণ পাঠকের কাছে সেই ঢাকা-চাপা গল্পকথাটিই সত্য হয়ে রইল। আর আমরা তাই মেনে নিয়েছি নির্বিবাদে। বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে তাই নিয়ে লম্বা দার্শনিকতার বাহাদুরি করেছি। আমাদের ভগবান খোঁজার পালায় ক্লান্ত হইনি কখনো। বরং বাহবা পেয়েছি সেই কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে যাঁরা পদে পদে একটি দিকপাল ভগবান খাড়া করে সেই বায়বীয় মূর্তির

বিশালকায় কুয়াশার অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়ে বসে অনন্ত জীবন শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে নির্মম রসিকতা করে যান আর দেবদেউলের দুর্গে নিজেদের আশ্রিত করে, অগ্নিদগ্ধ করেন সমাজের নগণ্য শ্রেণীকে। এই ট্রাডিশনই চলছে। আর কী আশ্চর্য, ভক্তি বিশ্বাসের ফাঁদে সবিশেষ বাঁধা পড়েছে হৃতসর্বস্ব নির্জিতরাই!

খাণ্ডববন দগ্ধ করার ব্যাপারে ব্রাহ্মণের অকৃতকার্যতার কারণস্বরূপ মহাভারতকার আর একটি আষাঢ়ে গল্প ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ইন্দ্রের গল্প। সর্বঘটে যেমন কাঁঠালি কলা, মহাভারতে তেমনি ইন্দ্র। ব্যক্তিপূজার চূড়ান্ত হয়েছে ঐ দেবরাজকে নিয়ে। অনার্যের পরাক্রম আর্যের মুখে ও লেখনীতে স্বীকার্য নয়, তাই অনার্য দলপতি তক্ষককে কে রক্ষা করেন,—এই সমস্যাটির সহজ সমাধান করেছেন তাঁরা তক্ষকের রক্ষকরূপে স্বয়ং দেবরাজকে খাড়া করে। নিম্নস্বরে যদিও আসল ঘটনাটিও অনুল্লিখিত নেই। ব্রাহ্মণের ব্যর্থতা যে অনার্যদের সংগঠিত প্রতিরোধেই ঘটেছিল, এ সত্যকে মহাভারতে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে এইভাবে, "খাণ্ডববন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য প্রাণিগণ দাহশান্তির জন্য যত্নবান হইল। করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া সত্বরে শুণ্ড দ্বারা জলায়ন পূর্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহুশীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া মস্তক দ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল"—এতো কথা, তবু দাম্ভিক আর্যরা অনার্য বীরগণকে জন্তুজানোয়ার ছাড়া অন্য কিছু বলে উল্লেখ করলেন না। বললেন, আগুন নিভিয়েছিল হাতী ও সাপে। কি জানি, একথা বলতে তাঁরা হাতী ও সাপের অনার্য-টোটেমগুলিকে নির্দেশ করেছেন কিনা অথবা তক্ষক-সম্প্রদায় ব্যবহৃত অগ্নি-নির্বাপক হোস্ পাইপ কথকতার আবোলতাবোলে হস্তী ও সর্পে রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা। যে জাতির মধ্যে ময়দানবের মতো স্থপতি ছিলেন, প্রযুক্তি বিদ্যায় তাঁরা যে গোপালক আর্যগণের চেয়ে খাটো নন, বরং উন্নতই ছিলেন একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু চতুর আর্য ঐতিহাসিকে সে সত্য মিথ্যাস্তূপে কবরস্থ করে গেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের পরে লিখিত ও অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সভায় গীত এই বিশালাকার কথাবর্জনার দ্বারা।

এতটা দুঃসাহসের সঙ্গে এমন একটি উচ্চবাচ্য করার প্রেরণা আমি মহাভারতের অন্তর্লীন গল্পধারার মধ্যেই পেয়েছি। সুতরাং যে ভক্তজন কবি বুদ্ধদেব বসুর মতো খাণ্ডবদাহনকে "বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান" বলেই মনে করেন, করজোড়ে তাঁদের বলি, হে মহাভাগগণ, অনুগ্রহ করে মহাভারতের উপরিস্তরগত আখ্যানের দ্বারাই অভিভূত হবেন না, আর একটু তলিয়ে দেখুন।

তলিয়ে বুঝুন। ইংরেজরা ভারতীয়গণকে যে কালে অনুন্নত জাতি বলে জগৎ-সভায় প্রচার করেছিলেন, সেকালে ভারত কি উন্নততর সভ্যতার অধিকারিণী ছিল না? তবে পূর্ব-ঐতিহ্যবাহী সে সভ্যতা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর না হওয়ায় তার ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলি নতুন ভাবভাবনার ধারক ইংরেজি সভ্যতার বৈজ্ঞানিকতার কাছে পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মানেই তো এই নয় যে, ভারতবাসীরা জন্তুজানোয়ারের সামিল ছিলেন। তাঁদের প্রাচীন যুদ্ধ পদ্ধতি পর্যুদস্ত হয়েছিল বহিরাগতের উন্নত আয়ুধ ব্যবহারে ও চতুর রাজনৈতিক চক্রান্তে। অনুরূপভাবে মহাভারতের প্রেক্ষাপটে আর্য-অনার্য সঙ্ঘর্ষটিকে লক্ষ্য করলে খাণ্ডবদাহনকে আমরা কোনক্রমেই "বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান" ('মহাভারতের কথা' দ্রঃ) বলে উল্লেখ করতে পারি না।

জন্তু জলনির্বাপকদের কথার সঙ্গে সঙ্গে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' প্রথায় মহাভারতকারকে তখনই আবার বলতে হয়েছে: "অন্যান্য প্রাণিগণও নানা প্রকার উপায় দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ শান্তি করিল। বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাতবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহারা সাতবারই নির্বাণ করিল।"—অর্থাৎ সাত সাতবার অগ্নির ব্যর্থতাকে তাঁরা জানোয়ারের কারসাজি বলে প্রচার করলেন। ঢোঁক গিলে 'প্রাণিগণ' পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন, কিন্তু অনার্যদের মানুষরূপে বর্ণনা করতে তাঁদের জিভের জড়তা শিথিল হল না। ওঁদের কথায় আমাদের কি বুঝতে হবে যে, তক্ষক সম্প্রদায় বনাগ্নি নির্বাপণে অক্ষম হয়ে ঘরে বসে ছিলেন আর বন্য জন্তুরা সেই কাজ করে দিল? না, বুঝতে হবে, অনার্যদের হীন প্রাণী ছাড়া অন্যভাবে উল্লেখই করা হত না। নাগ টোটেমধারীদের মানুষ না বলে গোপালকগণ সরাসরি তাদের 'সাপ' বলেই উল্লেখ করেছেন, বরাহ টোটেমধারীদের মানুষ না বলে বরাহই বলা হয়েছে। যে ঔপনিষদিক সভ্যতা বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করেছিল, পৌরাণিক যুগের ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণচক্রের কলুষিত লেখনীতে তা মানুষের প্রতি চরম ঘৃণায় উগ্রমূর্তি হয়ে উঠেছে। দেবশত্রুদের 'মেদোমাংস' ভক্ষণে ও শোণিত পানে তাঁদের সেই পৈশাচিক উল্লাস পুরাপুঁথির সকল স্তরে তাই অভিনব দেব-মানব-জন্তুর গল্প সাজিয়ে তাকে আমাদের কাছে দুর্বোধ্য করেছে। ব্রাহ্মণদের রক্ষক ও পরিচালক হিমালয়বাসী বহিরাগতরা দেবশব্দের দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছেন, বিজয়ী ব্রাহ্মণরা নিজেদের একমাত্র মনুষ্যপদবাচ্য বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁদের শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে রাক্ষস খোক্কস ও জন্তু সরীসৃপের স্তরে বহিষ্কৃত করেছেন।

যাই হোক, ব্রহ্মার দ্বারা নিযুক্ত ব্রাহ্মণ বা অগ্নিদেব সাতবার পরাজিত হন।

তখনও পর্যন্ত ইন্দ্রের উল্লেখ নেই। ইন্দ্র এসেছিলেন পরবর্তী অভিযানে কৃষ্ণার্জুনকে সাহায্য করতে, যদিও মিথ্যাভাষণের বন্যা বইয়ে দিয়ে এখানেও গল্প ফাঁদা হয়েছে অন্যরকম। বলা হয়েছে, তক্ষক ছিলেন ইন্দ্রের বন্ধু, তাই ইন্দ্র এসেছিলেন তক্ষককে সাহায্য করতে। বেশি কথা না বলেও এই আষাঢ়ে উপন্যাসটিকে সরাসরি বাতিল করে দেওয়া যায় একটি মাত্র যুক্তি প্রয়োগে। বলতে পারি, খাণ্ডবদাহনের জন্য যখন দেবতারাই অগ্নিকে বার বার নিযুক্ত করেছেন এবং সেই অনার্য আবাসটি পুড়িয়ে ছারখার করার পরিকল্পনা যখন ব্রহ্মার সভায় গৃহীত, তখন কোনো ইন্দ্রের ক্ষমতা ছিল কি তার বিরুদ্ধাচরণ করার? কৃষ্ণার্জুনকে দেবতারাই অস্ত্রে রথে সজ্জিত করলেন, তবে আর দেবরাজ তাঁদের খাণ্ডবদাহন পর্বে বাধা দিতে দৌড়ে আসবেন কেন? ইন্দ্রের পক্ষে তক্ষককে সাহায্য করতে আসার পেছনে তাই কোন যুক্তি নেই। মহাভারতকার এক ভক্তিমুগ্ধ রাজার সভায় কিছু অপ্রতিবাদী অথবা মূর্খের কাছে যথাভিলাষে সাজানো গল্প গেয়েছেন। সেই গাওনা বিনা প্রশ্নে আমরা মেনে নিতে বাধ্য থাকব কেন? হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও কি সেই সাবালকত্ব অর্জন করব না, যা অনুসন্ধিৎসু, প্রশ্ন নিক্ষেপক এবং বিচারশীল?

না, ইন্দ্রের গল্পটিকে আমাদের নতুন করে পড়তে হবে। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মহাভারতের বানানো কথকতা।

তাহলে দেখা যাক, খাণ্ডবদাহন পর্বে তক্ষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে দেবরাজ ইন্দ্র বস্তুতই কোনো সাহায্য করেছিলেন কি না।

কালীপ্রসন্ন মহাভারতের আদিপর্বে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের শেষে 'ইন্দ্রের খাণ্ডব বহ্নি নির্বাণ প্রয়াস' শিরোনামে কিছু কথা আছে।

খাণ্ডববনে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে তার সকল নেপথ্য কারণই ব্রাহ্মণ ও সাধারণ দেবতাদের জানা থাকার কথা নয়। উচ্চ মহলের সামরিক গোপনীয়তা মহামন্ত্রী ব্রহ্মা ও তাঁর সভাসদ্ বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সেটাই নিয়ম। এক্ষেত্রেও ঘটনা হয়ত সে ভাবেই গড়াচ্ছিল। তাই অগ্নি ও ব্রহ্মার মধ্যেই খাণ্ডবদাহন পরিকল্পনা হয়েছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। সাধারণ দেবতারা এ ব্যাপারের কিছুই জানতেন না। ইন্দ্র, সূর্য, শঙ্কর প্রমুখ দেববাহিনীর প্রধানগণ এ সময় ঠিক কোথায় ছিলেন এবং তাঁদেরও এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছিল কিনা তাও বলা হয়নি। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাঁরা ব্যাপারটি জানতেন। শঙ্কর তো অবশ্যই জানতেন। দেবরাজ ইন্দ্রেরও এ খবর অজানা থাকার কথা নয়। বরুণ জানতেন, কেননা অগ্নি বরুণের কাছ থেকেই

কৃষ্ণার্জুনের জন্য অস্ত্রাদি, রথ ও সুদর্শন চক্র সংগ্রহ করেছেন। দেবপ্রধানদের অগোচরে খাণ্ডবদাহন পরিকল্পনা নিশ্চয় ব্রহ্মা একাকী গ্রহণ করেননি। আগেও যে একবার 'দেবনিয়োগক্রমে' খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল স্বয়ং ব্রহ্মা সেকথা নিজমুখে অগ্নিকে বলেছেন। সুতরাং দেবশত্রু অনার্য বাসভূমিটির দখল নিয়ে বেশ কিছুকাল দেবশিবির তৎপরতা চালিয়ে আসছিলেন। এমতাবস্থায় মহাভারতের কবি যখন একটি সম্পূর্ণ বিপরীত কাহিনী শোনাতে বসেন তখন ব্রহ্মাবাক্যে শ্রদ্ধাবান শ্রোতা বিমূঢ় বোধ করবেন বৈকি। শ্রোতাকে মূঢ় বানিয়ে মহাভারতের কবি সেই অবিশ্বাস্য গল্পটিই সাড়ম্বরে শোনাতে বসলেন। গল্পের এই গোলমেলে অধ্যায়ে এসে তাই চমক লাগল। দেখলাম, কবি বলছেন, খাণ্ডবদাহন সুরু হলে কিছু "সন্তপ্ত দেবগণ ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদয় মর্ত্যালোক দগ্ধ করিতেছেন?…"

আগেই বলেছি, ব্রহ্মার পরিকল্পনা সকল দেবতা (দেবরক্ষী বাহিনী) ও ব্রাহ্মণদের জানার কথা নয়। তাই অগ্নিকাণ্ড দেখে তাঁরা দেবরাজের কাছে অবশ্যই ছুটে যেতে পারেন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দেবানুচরদের কথা শুনেই ইন্দ্রও 'খাণ্ডববনরক্ষার্থে গমন করিলেন', ইন্দ্রের এমত আচরণ সকল সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে। ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবাধিনায়কদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় ও পরামর্শ না করেই তিনি কি সেই ভূখণ্ড রক্ষা করতে সদলে আকাশপথে ধাওয়া করতে পারেন? না, তা সম্ভব নয়। সর্পরাজ তক্ষক ইন্দ্রমিত্র হলেও ইন্দ্র পারেন না ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে। তবে তিনি যে সংবাদ পাওয়া মাত্রই খাণ্ডবারণ্যের উদ্দেশ্যে সদলে রওনা হয়ে গেছলেন এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি খাণ্ডবারণ্যের ওপর তাঁর আকাশ-রথে করে (হেলিকপ্টার?) আর্য অনার্যের যুদ্ধটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই তৎপরতা গ্রহণ করেছিলেন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। প্রমাণ একে একে সাজিয়ে দিচ্ছি:

'অর্জুনের বিরুদ্ধে দেবগণের যুদ্ধ' শিরোনামযুক্ত স্তবকে বলা হল, ইন্দ্র 'কৃষ্ণার্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন' এবং তাঁকে অশনি উদ্যত করতে দেখে অন্যান্য দেবগণও স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করলেন। কুশলী কবি এই সংবাদ জ্ঞাপন করার সময় কিন্তু উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের বশে একটি বিপরীত কথাও বলে ফেললেন। বললেন, কৃষ্ণার্জুনকে কথতে যে দেবগণ ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাশ ও বজ্র হাতে বরুণদেবও উপস্থিত ছিলেন। পাঠক, আপনি

তো জানেন, কৃষ্ণার্জুন যাতে খাণ্ডবদাহনে সমর্থ হন এজন্য তাঁদের অস্ত্র ও রথ ঐ বরুণদেবই দান করেছেন। ঐ অস্ত্রাদি কৃষ্ণার্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও ব্যবহার করেন। সুতরাং প্রশ্ন, যে বরুণ খাণ্ডবদাহনের জন্য অস্ত্র ও রথ যোগাড় করে দেন, তিনিই আবার খাণ্ডববন দাহনকার্য নিবারণের জন্য ইন্দ্রের পাশে উপস্থিত থাকেন কী করে? মহাভারতের এক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচক্ষণ দেবতারা কি পণ্ডশ্রম ও ছেলেখেলা করতেন? না, তাঁদের প্রত্যেকটি কাজেরই সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছি। ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণার্জুনের বিরোধিতা করতে এলে বরুণের পক্ষে দেবরাজের সহায়তাকারী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার হত।

কথক আরও বললেন, "দেবগণ সমভিব্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণার্জুন···নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন।" অর্থ কি এ কথার? ইন্দ্রকে সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত হতে দেখে যুদ্ধবিশারদ কৃষ্ণার্জুন মনে আরও সাহস ও ভরসা পেলেন? ও কথার তো এমন অর্থই বুঝি। মর্মার্থ যদি হয়, কৃষ্ণার্জুন এমনই যুদ্ধবিশারদ যে দেবরাজ ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত দেখেও 'নিভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন', তবে বুঝতে হবে শত শত সেই দেবতাদের মশা মারার যোগ্যতাও ছিল না, কৃষ্ণার্জুন এমন সংবাদ রাখতেন। কিন্তু তেমন কথা কেউ বললে তাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করা যায় না। কৃষ্ণ ও পার্থ তো দেবতাদের অস্ত্র নিয়েই খাণ্ডবারণ্য অবরোধ করেছেন। অস্ত্রদাতা বরুণও এসেছেন সদলে তাঁদের সাহায্য করতে। তবে তাঁরা যে সাহায্যকারী, সাধারণকে প্রথমে হয়ত তা বুঝতে দেননি। তাছাড়া অর্জুন ইন্দ্রপুত্র। তিনি ইন্দ্রের মহিমা অবগত ছিলেন। অন্যদিকে অনার্য নাগাধিপতি তক্ষকের তালুক রক্ষা করতে এসে ইন্দ্র জ্ঞাতসারে নিজপুত্র অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন এমন অশ্রদ্ধেয় বাক্যেও বিশ্বাস রাখা যায় না। আমরা জানি, ইন্দ্রই অর্জুনকে হিমালয়শিবিরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করেছেন। তিনি ভিক্ষুকের বেশে কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁর কবচকুণ্ডল চেয়ে এনেছেন পার্থকে রক্ষা করার মানসে। সুতরাং ইন্দ্রের সেই পুত্রস্নেহ অনার্য তক্ষকের তালুক রক্ষার জন্য হঠাৎ উবে গেল এমন হাস্যকর বয়ানে তাই কি বিশ্বাস রাখা যায়?

এরপর বলা হল, "দেবতাদিগকে (কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে) যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; দেবরাজও পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের (পার্থ ও কৃষ্ণের) বল, বীর্য ও অসামান্য রণনৈপুণ্য

সন্দর্শনে পরমপ্রীত হইলেন।" এ কথায় প্রকৃত ঘটনা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসে। বোঝা যায়, দেবশিবিরের গোপন মতলব সম্পর্কে যে দেবর্ষিগণ অনবহিত ছিলেন, দেববাহিনীকে খাণ্ডবদাহন নিবারণে অনিচ্ছুক দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। গূঢ় রাজনীতি ওঁরা বোঝেননি। সসৈন্যে ইন্দ্র খাণ্ডবারণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করায় তাঁরা ভেবেছিলেন, দেবরাজ তাঁর বন্ধু তক্ষককে উদ্ধার করতেই বার হলেন। ওদিকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত। দেবতারা দহনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন না। বরং কৃষ্ণার্জুনের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠলেন দেবরাজ স্বয়ং। এরপর 'খাণ্ডবযুদ্ধে দেবগণের পরাজয়' অংশে পুনশ্চ বলা হয়েছে, "সুরগণ কৃষ্ণার্জুন হস্ত হইতে খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।" এর পরেও কি দেবরাজের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে? তক্ষকের বন্ধুরূপে এসে খাণ্ডবদাহনকারী কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে যাঁর লড়াই করার কথা, তিনি তক্ষক-শত্রুদের প্রশংসা করতে লাগলেন। এ যে গল্পের গরুকে ইচ্ছেমত গাছে চড়ানো ও নামানোর খেলা।

এই কাণ্ডাকাণ্ডের মধ্যে একবার অবশ্য দেবরাজ বলেছেন, 'এইবার কৃষ্ণার্জুন নিহত হইয়াছে।' হয় ব্যঙ্গ নতুবা ঘন বনাঞ্চলে যুদ্ধরত দুই সখা অদৃশ্য হওয়ায় দেবগণের আশঙ্কার প্রকাশ এই বাক্যটি এবং সেই আশঙ্কা দেখা দেওয়া মাত্র দেবগণও খাণ্ডববনবাসীদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, কথক কিন্তু সেই বিষয়টিই গোলমেলে ভাষায় প্রকাশ করে কৃষ্ণার্জুনের মহিমা কীর্তনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই অংশের উপসংহারে আবার একই কথককে বলতে হয়েছে, দেবরাজ জিঘাংসাপরতন্ত্র হয়ে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তার আঘাতে পার্থ বা কৃষ্ণ নন, খাণ্ডবারণ্যের 'সমস্ত প্রাণী যুগপৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল'। অর্থাৎ খাণ্ডববাসী অনার্যদের সবংশে নিধন করার কৃতিত্ব একাকী কৃষ্ণার্জুনেরই নয়, সে কৃতিত্বের দাবি অনার্যদের চিরশত্রু দেবরাজ ইন্দ্রেরও আছে। কারণ তিনিও 'জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া' খাণ্ডববাসীদের ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। ভারতের আদিবাসী উচ্ছেদে এই বহিরাগত দেবতাটিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পনের দিন ধরে খাণ্ডবারণ্য অবরোধ করে মহা উৎসাহে অনার্য-নিধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জীবন্ত দগ্ধ করে এইভাবে নির্বিচার প্রাণী হত্যাকেই মহাভারতের কথকঠাকুরগণ পুণ্য কর্ম হিসাবে তুলে ধরেছেন। নাগেদের

একটি উপজাতিকে নির্বংশ করে দেবানুরাগী একটি রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করার এই চক্রান্তকে পরিপূর্ণ সফল করে তোলার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র সদলবলে খাণ্ডববনের ওপর চক্রাকারে ঘুরেছেন। তক্ষকের সঙ্গে দেবরাজের মৈত্রী থাকলেও নাগেদের প্রতি এই সময় দেবশিবির বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য। তবে কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরেই দেবরাজকে হয়ত সময় সময় রাজনৈতিক অভিনয় করে নাগ সম্প্রদায়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে দেবরাজ যদি কোনো নকল যুদ্ধও লড়ে থাকেন তবে তারও নেপথ্যে থেকে থাকবে ব্রহ্মার আর এক কুশলী রাজনীতি যার কথা আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সেই চমকদার রাজনৈতিক কৌশলটি হল, কৃষ্ণার্জুনকে অপরাজেয় বীর হিসাবে প্রচার করা। লোকমুখে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যে, সাবধান, পার্থসারথি একত্রিত হলে দেবদ্বিজ যক্ষ রক্ষ কারও নিস্তার নেই। এই প্রচারের উদ্দেশ্য পালটি শিবির দুর্যোধন পক্ষের মনোবলকে বিধ্বস্ত করা। কিন্তু প্রচার যেমনই হোক, দুর্যোধন কর্ণকে সে প্রচার বিচলিত করতে পারেনি। দেববাহিনীর চাতুরীর খবরাখবর দূতমুখে তাঁরাও রাখতেন। দুর্যোধন নির্ভয়ে বলেছেন, দেবতাদেরও তিনি ডরান না। এবং সেটাই খাঁটি কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ দুর্যোধন তা প্রমাণ করে গেছেন। বহিরাগত দেবগণের স্বার্থরক্ষক পাণ্ডববাহিনীকে সূচাগ্র মেদিনীও বিনাযুদ্ধে তাঁরা ছেড়ে দেননি।

১। *"Agni, the Vedic fire god, who stands next in importance to Indra, is essentially a domestic divinity—a divinity which brings the world of man closer to the world of gods. He is variously described as the priest, the mouth or the messenger of god, and the carrier of the oblations offered to them."—Indian Mythology/Dr. R. N. Dandekar/Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.*

২। 'বহু ঘৃত ভক্ষণে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য'/আদি/কালীপ্রসন্ন দ্র।

৩। বানরধ্বজাযুক্ত বিচিত্র শব্দকারী রথ। এই রথে আধুনিক সাইরেনতুল্য যন্ত্র স্থাপিত ছিল। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা দ্র।

৪। দেবতাদের কারিগরি বিদ্যায় নির্মিত এই ধনুটির ছিল জলন্ত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ক্ষমতা। অর্জুনের বাণে শত্রুরা দলে দলে দগ্ধ হতেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ ফেটে গিয়ে বিস্ফোরণও ঘটাতে পারত। যুদ্ধ বর্ণনায় সেকথা জানা যায়।

৫। আদিপর্ব/৬০ অ/কালীপ্রসন্ন দ্র।

৬। *Yuganta ; The End of an Epoch.—Dr. Iravati Karve.*

একে একে নিভিছে দেউটি

খাণ্ডবদাহনের পর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল যার নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের জয়যাত্রাকে নিষ্কণ্টক করা। তাই আর্যাবর্তের রাজচক্রবর্তী প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা জরাসন্ধকে বধ করা হল অতর্কিত আক্রমণে এবং প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায়। কৃষ্ণের চক্রান্তে তিনি নিহত হলেন তাঁর নির্জন যজ্ঞাগারে। ঘটনাটি রাবণপুত্র অপরাজেয় ইন্দ্রজিৎ বধের কাহিনীটি স্মরণে আনে। শ্রীকৃষ্ণের অপর চক্রান্তটি ছিল জরাসন্ধপক্ষীয় প্রখ্যাত বীর শিশুপালকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আসরে একাকী অসহায়ভাবে হত্যা করা। এই হত্যানুষ্ঠানটিও ছিল অতর্কিত, ছিল তা সকল বিধিনিয়মের বহির্ভূত। আমন্ত্রিত অতিথি ও আশ্রিতকে হত্যার রেওয়াজ ছিল না তৎকালীন ভারতবর্ষে। কিন্তু বহিরাগত দেবতারা ছিলেন ভিন্নতর সভ্যতার প্রতিনিধি। অনেক বেশি আধুনিক, তাই অনেক বেশি স্বার্থ-সন্ধিৎসু। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সেই দেবধর্ম। তাই, যা ছিল অ-ভারতীয় রীতি, তাকেই ধর্মীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরণ প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন তিনি। জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধের আসল উদ্দেশ্যও তাঁরই শ্রীমুখ নিঃসৃত ব্যাখ্যায় জানতে পারি আমরা। জানতে পারি, কৌন্তেয়গণ যাতে রাজ্যলাভে সমর্থ হন, তারই জন্য একে একে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের বীরেন্দ্রবাহিনীকে। অনার্য একলব্যের ক্ষমতাহ্রাস, কংস ও কীচকবধ, কর্ণের প্রতি নিষ্ঠুরতম অন্যায় ব্যবহার, এই সমস্তই ছিল একই চক্রান্তের ফলশ্রুতি। এখানে আমরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়িক যজ্ঞের প্রসঙ্গক্রমে ভারতের দুই দিকপাল, জরাসন্ধ ও শিশুপাল হত্যার ঘটনা দুটি লক্ষ্য করব। দেখতে পাব, এক্ষেত্রেও ব্রহ্মার পরিকল্পনা কেমন অপূর্ব সূত্রাকারে ধীরে ধীরে রূপায়িত করে তুলেছেন দেবশিবিরের প্রতিনিধিবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি বেদব্যাস এবং ব্রাহ্মণসেবক শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য এবং সবিশেষ প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর আমরা আখ্যানভাগে প্রবেশ করছি। দেখতে পাচ্ছি, দেবদূত নারদ তাঁর বীণাহস্তে ত্রস্তপদে পাণ্ডবালয়ে প্রবেশ করছেন। যুধিষ্ঠির দেবপ্রতিনিধির আগমনে আভূমি বিনত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন এবং উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছেন হিমালয়শিবির থেকে আনীত বিশেষ গোপনবার্তা শোনার জন্য।

দেবর্ষি নারদের কাছে যুধিষ্ঠির পেলেন রাজসূয় যজ্ঞ করার পরামর্শ এবং অনুমতি। কিন্তু তখনই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। দূত পাঠালেন কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্য। তথাকথিত অন্তর্যামী কৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করলে তিনি আসতে পারেন না। সে ক্ষমতা কৃষ্ণের ছিল না। থাকলে যুধিষ্ঠির তাঁকে স্মরণই করতেন। কেননা রাজচক্রবর্তী হওয়ার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ নিজে নিজে সম্রাটের আসনে বসার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বেচারা নিতান্তই নাবালক, তাই শরণ নিলেন শ্রীকৃষ্ণের। খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা হওয়ার পর তিনি কোনো জবরদস্ত মহামন্ত্রী খুঁজে নিতে পারেননি। সকল মন্ত্রণার জন্য শুধু শরণ নিয়েছেন যদুনেতা বাসুদেব কৃষ্ণের। দ্রৌপদী-লাভের পর থেকে কৃষ্ণও এগিয়ে এসেছেন সাধ্যমত সহায়তা করতে। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত। তিনি বুঝেছেন, অকস্মাৎ আবির্ভূত ঐ কৃষ্ণ ব্রহ্মাজীরই মনোনীত। পাণ্ডব রাজনীতির ধ্বজপতাকা ধারণ করার জন্যই তাঁর নির্বাচন। সুতরাং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতঃপর যুধিষ্ঠির বেশ নিশ্চিন্তেই কৃষ্ণপরামর্শকে অবলম্বন করতে সুরু করেছেন। ফলাফলের দায়িত্ব, দেবশিবিরের জবাবদিহির ঝামেলা শ্রীকৃষ্ণের, তিনি শুধু সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাজসুখ ভোগ করায় ব্যগ্র। এজন্য আত্মবিক্রয়েও নির্দ্বন্দ্ব। এজন্য সুবোধ বাধ্য অনুজগণসহ দ্রৌপদীকেও দাসতাপাশে আবদ্ধ করতে ধর্মপুত্রের মানে বা আত্মায় আঘাত লাগে না।

রাজনৈতিক উপদেষ্টারূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে পরম নিশ্চিন্ত যুধিষ্ঠির স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেছিলেন : হে কৃষ্ণ! রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজ চক্রবর্তীর আধিপত্য ও সম্মান লাভ করার সময় কি আমার এখনো উপস্থিত হয়নি? দেবর্ষি নারদ আমাকে যজ্ঞানুষ্ঠান করার উপদেশ দান করে গেছেন। (সভা/১২ অ/কালী)।

যিনি নিজেকে অপরের আশ্রিত বলে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর সাধ-আহ্লাদের বিচিত্র বহরটি দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। দুর্বলচেতা যুধিষ্ঠিরের বহু আচরণই এমনি হাস্যোদ্রেক করে। মানুষটিকে আমরা করুণা করতে পারতাম যদি না তাঁর সেই পরনির্ভরশীল মুখ থেকে বারম্বার দম্ভোক্তি উচ্চারিত হত। কিন্তু স্ববলে বলীয়ান, রাজকীয় মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত দুর্যোধনের প্রতি প্রযুক্ত যুধিষ্ঠির-বাক্যগুলির পরিমাপহীনতা লক্ষ্য করে দয়ারও অযোগ্য এই যুধিষ্ঠিরকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাইতো তাঁকে নিয়ে দেবানুগত ভারতবর্ষও ব্যঙ্গবিদ্ধ একটি প্রবাদ তৈরী করে ফেলে। পুরুষানুক্রমে ব্যঙ্গচ্ছলেই

আমরা ব্যবহার করে আসছি—"ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বিশেষণটি। বলা বাহুল্য, এই বিশেষণ শঠতার প্রতিই প্রযুক্ত হয় আর তখন মহাভারতে সরবে ঘোষিত বক্তব্যটি, 'যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবগণ ধার্মিক ছিলেন', আমরা নির্বিচার মিথ্যাভাষণ বলেই গণ্য করি।

কিন্তু থাক সে কথা। যুধিষ্ঠির কর্তৃক কৃষ্ণবন্দনার পর চতুর যদুনেতা বাসুদেব কী প্রত্যুত্তর করলেন পাঠকের কৌতূহল এখন সেই কাহিনীতে। বলছি সেকথা :

কৃষ্ণ বললেন : রাজ চক্রবর্তী তো আপনারই হওয়ার কথা। তবে এ বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক আছে। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলেন বৃহদ্রথপুত্র মগধরাজ জরাসন্ধ। পার্বত্য প্রাচীর-বেষ্টিত সুরক্ষিত রাজগৃহে (রাজগির) তাঁর রাজধানী। ভারি ক্ষমতাশালী রাজা। তিনিই বর্তমানে রাজ চক্রবর্তী। প্রতাপশালী শিশুপাল তাঁরই সেনাপতি। যবনাধিপতি ভগদত্ত তাঁর মিত্র। আপনার মাতুল শল্য তাঁর অনুগত। আমার আত্মীয় ভীষ্মক, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশাধিপতি দুই বীর তাঁর বন্ধু ছিলেন। জরাসন্ধের পরাক্রমের কাছে ত্রিভুবন অদ্যাবধি নতশির নতজানু হয়ে আছে। তাঁর ভয়ে বহু নরপতি দিগ্বিদিকে পলাতক হয়েছেন। সুতরাং অপর কারও পক্ষে রাজ চক্রবর্তীর সম্মান লাভ করা সম্ভব নয়। মহারাজ, আগে জরাসন্ধকে বধ করতে হবে, তবে আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করার পথ নিষ্কণ্টক হবে। (ঐ/১৩ অ)।

যুধিষ্ঠির বস্তুতই এক রহস্য। যে বিখ্যাত রাজা জরাসন্ধকে কেন্দ্র করে আর্যাবর্তের রাজনীতিতে ঘটে গেছে দীর্ঘদিনব্যাপী রোমহর্ষক ঘটনাবলী, দেখা যায়, যুধিষ্ঠির সেই সম্রাটোপম জরাসন্ধ সম্পর্কে সাধারণ ব্যক্তির মতই অজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণকে তিনি প্রশ্ন করেন : "হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীর্য বা পরাক্রম কি প্রকার? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশন স্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই?" (ঐ/১৬ অ)।

এই প্রশ্ন শোনার পর আর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রতাপের ওপর। এমন অজ্ঞতা বাস্তবিক বিস্ময়কর। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করতে হয় আদিপর্বের সেই ঘটনা। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁদের পাণ্ডুপুত্র বলে পরিচয় প্রদান করলে রাজপুরীর কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে যে বিতর্ক হয় তাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে বলেন,—রাজা পাণ্ডু বহুকাল দেহত্যাগ করেছেন, অতএব ঐ পুত্রপঞ্চক যে তাঁরই তার প্রমাণ কি! অর্থাৎ তাঁরা প্রকাশ্যেই

কৌন্তেয়দের সন্দেহ করে বলেন, যাঁদের পাণ্ডব বলে পরিচিত করানো হচ্ছে, তাঁরা আসলে কিন্তু পাণ্ডুপুত্রই নন। বিশেষ উদ্দেশ্যে কতিপয় অজ্ঞাতকুলশীলকে কুরুরাজ্যের দাবিদার বানানো হচ্ছে। একদল ভারততাত্ত্বিকেরও ধারণা, কৌন্তেয়রা কুরুবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তাঁদের সাজিয়ে এনে সিংহাসনের দাবিদার বানানো হয়। কৌন্তেয়দের দুর্বাক্য, ব্যবহার ও অমার্জিত আচার লক্ষ্য করে এবং যুধিষ্ঠিরের অদ্ভুত অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে ঐ ধরনের একটি তর্ক আমাদেরও বিচলিত করে। কিন্তু মহাভারতে এই তর্কের সমর্থনে একাধিক নজির অনুপস্থিত। তাই সে তর্কে প্রবেশের উপায় নেই। কেবলমাত্র একটি ক্ষীণ সন্দেহ আমাদের আলোড়িত করে যায়। মনে হয়, এমনও তো হতে পারে, পাণ্ডব নামে কথিত ঐ ভ্রাতৃপঞ্চকের কুরু সিংহাসনে প্রকৃত দাবি হয়ত ছিল না। চতুর দেবব্রাহ্মণ-চক্র গায়ের জোরে তাঁদের দাবিকে হস্তিনাপুরে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁদের দ্বারা একটি দেবসেবক পুরোহিতভোগী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন ?

কিন্তু সেই বিতর্কে আমরা কালক্ষয় করতে চাই না। বরং মহাভারতের অন্যান্য তথ্যাবলীর অনুসরণে নিহিত সত্যের সন্ধান করা যাক। তার দ্বারাই কৌন্তেয়দের চরিত্র সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করবে। দেখা যাবে, রাজকীয় মহিমা ও সমৃদ্ধি বলতে যা কিছু বোঝায়, তা বহুলাংশেই কর্ণ দুর্যোধনের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু সেই রাজকীয় মহিমা থেকে সহস্র হস্ত দূরে সরে গেছেন পাণ্ডবরা। ভীমের শৌর্য ব্যতীত তাঁদের মধ্যে আস্ফালনই সর্বস্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি অর্জুনের বীরত্বও কেবলমাত্র প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্জুন বাস্তবিক পক্ষে খুব বড় বীর ছিলেন না। দেবগণ পাণ্ডবদের নিরস্ত্র করার পর যখন অর্জুনের রথাগ্রে আর কোনো পীতবসন পুরুষ (ইন্দ্র ?) অর্জুনের হয়ে অরাতিনিধন করলেন না, তখনই তাঁর বীরত্বের মহিমা বাষ্পপূর্ণ একটি ফুটো আধারের মত ফেঁসে গেল। সাশ্রু নয়নে পার্থ তাঁর সেই অপদার্থতার কথা বেদব্যাসের কাছে বৃথাই নিবেদন করেছেন। ব্রহ্মার পরিকল্পনা সার্থক হওয়ার পর দেবগণ আর পাণ্ডবদের সহায়তায় তিলমাত্র শক্তি ব্যয় করেননি। এমন হতাশা ও পরাজয় আত্মীয় হননকারী মিরজাফরদের জীবনেই আমোঘ সত্য রূপে দেখা দেয়। পাণ্ডবরাও সেই সত্যের অন্যথা ঘটাতে পারেননি।

আবার ফিরে আসি গল্পাংশে।

কৃষ্ণকর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞের বিঘ্নগুলি বর্ণিত হলে, জরাসন্ধের পরাক্রম সবিস্তারে

উল্লিখিত হলে যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হওয়ার সদ্যজাত স্বপ্নটি সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে গেল। তখন তাঁর আশান্বিত হৃদয় কম্পিত হতে সুরু করল। নিজের ভীতি-প্রসূত মনোভাব ব্যক্ত করে আত্মশ্লাঘাপ্রিয় যুধিষ্ঠির তথাপি বললেন, যুদ্ধে লাভ কি? যুদ্ধের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ সম্ভব হয় না। কাজ নেই আর রাজ চক্রবর্তী হয়ে। বরং বিবাদ বিসম্বাদ এড়িয়ে যেটুকু রাজ্যসুখ অনায়াসে অর্জিত হয়েছে তাই নিয়েই তুষ্ট থাকা উচিত।

বললেন, "আমার মতে সমতাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। যুদ্ধাদি দ্বারা কোনোক্রমেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ ঘটে না।...হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি। যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান জ্ঞান করিব?..."(সভাপর্ব)।

তাঁর এই মতটি জরাসন্ধভয়ে সদ্য প্রসূত। তিনি রাজ চক্রবর্তী হতে চান অনুজগণের বাহুবল ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাবল আশ্রয় করে। তাই যেক্ষেত্রে কৃষ্ণ স্বয়ং জরাসন্ধের প্রতাপে পলাতক, সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে মহত্ত্বাব অবলম্বন করাই নিরাপদ বটে। হায়, যে কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর বলে মহাভারতে কীর্তিত, তিনি জরাসন্ধের দ্বারা সবংশে উৎখাত হয়েছেন এবং সেই বীরের প্রতি প্রতিহিংসা লালন করে আসছেন দীর্ঘকাল। এমন একটি জগদ্বিধাতার হাতে সৃষ্টি পালনের দায়িত্ব থাকলে তার শেষ পরিণতিতে যদুবংশের আত্মহননই শুধু সম্ভবপর হয়, কোনো মহৎ কর্ম সাধিত হয় না।

যুধিষ্ঠিরের চমৎকার পশ্চাদপসরণের পর কৃষ্ণ অন্য কথা বললেন। বললেন, ব্যাপারটা তা নয়। জরাসন্ধ বধ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাহুবলে অসম্ভব হলে ছলনার দ্বারা গুপ্তভাবে হঠাৎ আক্রমণ করেই ঐ অপরাজেয় বীরবরকে হত্যা করতে হবে। কূট রাজনীতিক কৃষ্ণ বললেন, "বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান তাহার সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত...। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের কার্য সাধন করিব।" ভীম অর্জুনও একথায় সায় দিলেন।

মহাধার্মিক যুধিষ্ঠিরের চোখে পুনরায় স্বপ্নের মৌতাত সৃষ্টি হতে সুরু করল। অতবড় মহাভারতখ্যাত ধর্মবীর এককথায় সেই নীতিবিগর্হিত হত্যাকাণ্ডে সায় দিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবানুচর ব্রাহ্মণরাও প্রচারের ঢাকে কাঠি ছোঁয়ালেন। সাধু, সাধু! এইবার নররাক্ষস জরাসন্ধের ভবলীলা সাঙ্গ হবে! প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্মরাজ্য !!!

পাঠকমনে নিশ্চয় এসময় একটি সঙ্গত প্রশ্ন উদ্রক্ত হয়েছে। তিনি ভাবছেন, জরাসন্ধ যদি দেবাধিনায়ক মহাদেবের পূজারী তবে দেবশক্তি নেপথ্যে বসে তাঁরই গুপ্তহত্যার আয়োজন করছেন কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি আগেই দিয়ে রেখেছি। আমার আগের বই-এ ব্রহ্মার পরিকল্পনা পরিচ্ছেদে তার আলোচনাও করেছি। স্মরণ করুন সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটি। আর্যাবর্তের বহু বীর পুরুষই মহাদেবের পূজা অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন সেকালে। তাঁরা তা করেছেন কেবলমাত্র শক্তিলাভের জন্য। সেই শক্তিলাভের আশায় তথাপি তাঁরা দেবশিবিরের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেননি। রাজনৈতিক মিত্রতা এক জিনিস, আর তাঁবেদার রাষ্ট্র অন্য ব্যাপার। জরাসন্ধ, শিশুপালরা ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখেও দেবতারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। রাবণও তো মহাদেব ভক্তই ছিলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে খতম করতে কসুর করেননি। হিমালয় শিবিরের নিরাপত্তা এবং তামাম আর্যাবর্তে দেব-ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তারই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান প্রশ্ন। এজন্য ন্যায় অন্যায়ের সকল যুক্তি দেববাহিনী গঙ্গা যমুনা মন্দাকিনী অলকনন্দায় বিসর্জন দিয়েছেন। দেবতারা ও তাঁদের অবতারবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণ দলপতিদেরও ন্যায় ধর্ম মেনে চলতে হবে এমন বায়না ধরলে তো সৃষ্টি রসাতলে যাবে। আইন রচনাকারী আইনের ঊর্ধ্বে না থাকলে শক্ত আইন কি তৈরী হতে পারে! শাসন কর্ম চলবে কেমন করে? তাই যা কৃষ্ণ করেন, তাই শ্রীকৃষ্টকর্ম। তা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে না। সেটাই গীতার বাণী। প্রশ্ন নয়, আদিষ্ট কর্ম আত্মসমর্পিত প্রাণ মনে করে যাও। ফলাফল বিচারে তুমি অনধিকারী।

জরাসন্ধের বস্তুত কোনো অপরাধই ছিল না। ভদ্র সুজন এবং সুপুরুষ সেই মহাবল জরাসন্ধ তাঁর প্রতিজ্ঞা ও কথার মূল্য রাখতেন। এমনকি উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের পাওনা সম্ভ্রম মিটিয়ে দিতেও তিনি কখনো গররাজি ছিলেন না। খাণ্ডবারণ্য ধ্বংস করতে দেবশিবির যে নির্বিচার নরহত্যা করেছেন, জরাসন্ধ আপন প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য হত্যালীলায় ততদূর নৃসংশতাও করেননি। তাঁর অপরাধ, তিনি আর্যাবর্তে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিলেন। আয়োজন করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত এক রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য। পরাভূত রাজন্যবর্গকে বেঁধে নিয়ে গেছেন আপন রাজ্য গিরিব্রজে। সময় মত যজ্ঞে তাঁদের বলি দেওয়া হবে। রণক্ষেত্রে না মেরে যজ্ঞভূমিতে মারবেন বলে সেইসব রাজন্যবর্গকে বন্দী করে এনেছেন তিনি। ক্ষত্রিয়ের আচরণই করেছেন। বিজিতের ওপর যথা-ইচ্ছা

ব্যবহারের অধিকার সেদিন ক্ষত্রিয় সমাজে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ছিদ্রান্বেষী সন্ধানী কৃষ্ণ এ ব্যাপারের দিলেন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাখ্যা। বললেন, জরাসন্ধ নরবলি দেওয়ার পাপে পাপী। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আবার ধর্মাধর্মের প্রশ্ন কি। এমন লোককে গুপ্তভাবে হত্যা করার মধ্যে অধর্ম নেই। অপরাজেয় ইন্দ্রজিৎকে যেমন একাকী অসহায় অবস্থায় গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল, জরাসন্ধকেও তেমনি গভীর রাত্রে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ অর্জুন ও ভীম একত্রভাবে বধ করলেন জরাসন্ধের পবিত্র যজ্ঞাগারে। যুদ্ধে রণে ছল চাতুর্য বিশ্বাসঘাতকতার রীতি ভারতের আদি রাজন্যবর্গের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল। তাঁরা বীর হলেও সরল বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধনীতি মেনে চলতেন। সম্মুখ সমরে শৌর্য প্রদর্শন ছাড়া জয়লাভের অন্য পথ তাঁদের জানা ছিল না। শৌর্যের অহঙ্কার ছিল তাঁদের।

যুদ্ধে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ হিমালয় শিবিরের নয়া নীতি। কৌশলী রণনীতির বলেই তাঁরা আর্যাবর্তে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। দুরভিসন্ধিমূলক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা কুরুক্ষেত্রের আগে সম্ভাব্য সকল জবরদস্ত প্রতিবন্ধক-গুলিকে স্বতন্ত্রভাবে একে একে তাঁরা শেষ করেছেন। জরাসন্ধের পরই মহাবল শিশুপালকে হত্যা করে ভবিষ্যতের বাধাকে আগেভাগে অপসারিত করে রেখেছেন। এই গুপ্ত ঘাতকদের সম্পর্কে জরাসন্ধের আগেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুপ্তভাবে আঘাত করার নীতি যেহেতু তাঁরা নিজেরা কখনো অবলম্বন করেননি, সেজন্য জরাসন্ধ কোনো গুপ্তঘাতের আশঙ্কাও করেননি। আগে সাবধান হলে তাঁকে নিশ্চয় অমন শোচনীয় ভাবে মৃত্যু বরণ করতে হত না।

ভীমার্জুনসহ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে জরাসন্ধের সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছেন। পুর প্রবেশের আগে তাঁরা জরাসন্ধ নগরীর পবিত্র ভেরী ও চৈত্যশৃঙ্গ ভেঙে ফেলেন। পুরোহিতরা ব্যাপারটিকে দুর্লক্ষণ বলে প্রচার করলেন। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কার কথা রটনা করে মহাবল জরাসন্ধকে উপবাস করার পরামর্শ দিলেন তাঁরা। উপবাসী রাজাকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাতে লাগলেন। একে উপবাসী তায় পরিশ্রান্ত করা হল জরাসন্ধকে। এই পরিশ্রমের পর যখন জরাসন্ধের বিশ্রাম দরকার, গভীর রাত্রে তখন ছদ্মবেশী ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন যজ্ঞ-শালায়। জরাসন্ধ ইতিপূর্বে ঐ তিন ছদ্মবেশীর দৌরাত্ম্যের সংবাদ পেয়েও একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় অর্ধরাত্রে তাদের অভিপ্রায় অনুসারেই যজ্ঞাগারে এসে দেখা করলেন। একাকী পরিশ্রান্ত ও উপবাসী জরাসন্ধকে অন্যায় মল্লযুদ্ধে

নিহত করলেন ভীমসেন। এ কাহিনী জানায়, জরাসন্ধের আপন রাজ্যেও ব্রাহ্মণ গুপ্তচরেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন জরাসন্ধ হত্যা পরিকল্পনায়। অর্থাৎ জরাসন্ধ হত্যার আগে একটি পুরোহিত চক্রান্ত পাণ্ডবদের জন্য পথ পরিষ্কার করে রেখেছিল। এ তথ্য আভাসে মেলে, দেবতাদের ডিকটেশনে লিখিত মহাভারতে তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকারই কথা।

সেকালের রাজারা বলশালী হলেও দেবশিবিরের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে বার বার হেরে গেছেন। অহঙ্কারী হওয়ায় সমান বলবান ব্যতীত অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেননি। রাজা জরাসন্ধ অর্জুন বা কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নামলে নিশ্চয় অপরাজিত থাকতে পারতেন, যেমন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বেছে নিলে তাঁকে রক্ষা করার জন্য দেবশিবিরকে আরও একটি অন্যায় যুদ্ধ ধর্মের নামে পরিচালনা করতে হত। কিন্তু জরাসন্ধ ভীমকেই সমকক্ষ বীর হিসেবে নির্বাচন করে কৃষ্ণার্জুনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। উপবাসী রাজাকে কাবু করতে তথাপি ভীমসেনেরও দীর্ঘ সময় লেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত মল্লযুদ্ধের যথার্থ নিয়ম অমান্য করেই তিনি সক্ষম হয়েছিলেন জরাসন্ধ বধে। এই হল ঘটনা। এর নেপথ্যে আরো এক উল্লেখযোগ্য রটনাও আছে যা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়:

জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলে দেবশিবিরের জয়ঢাকগুলি মহাভারতকার এইভাবে বাজিয়ে দিলেন। বললেন: "পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ (জরাসন্ধবধ পর্বে কৃষ্ণের সত্যসন্ধতার অবশ্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি) হলধরানুজ মধুসূদন ঐ ভীম পরাক্রম…বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।"

জরাসন্ধ বধের আসল উদ্দেশ্য একথায় পরিষ্কার হয়ে গেল। এ-ও সেই ব্রহ্মারই পরিকল্পনানুসারী এক কাজ। আরও বোঝা গেল, ব্রহ্মার আদেশ শ্রীকৃষ্ণের কাছেও গোপন-বার্তা মাধ্যমে পৌঁছে থাকে। তিনি ব্রহ্মলোকের আদেশ মান্যকারী এক বুদ্ধিমান কুচক্রী। ইনি গ্রহান্তর শিবিরের নূতন ভাবধারার রাজনীতি ও ধর্মানুশাসন প্রবর্তন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য দেবতাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি কংস বধ করেছেন ও দেব-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী যদুকুলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে আপন মতাবলম্বী অর্থাৎ দেবানুগত একটি সম্প্রদায়ের সংগঠন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবতারা কৃষ্ণকে এখন থেকে পাণ্ডবদের উপদেষ্টা ও অভিভাবক স্বরূপ নিয়োগ করেছেন বলেই সদাসমর্পিত অন্তর রাজ্যলোভী যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র গ্লানিবোধ না করে

আপন ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণপদে অবলুণ্ঠিত করে বলেছেন, হে কৃষ্ণ, পাণ্ডবরা এখন তোমারই আশ্রিত।

জরাসন্ধ বধের পর আর এক পরাক্রান্ত অনার্য বীরের নিধনপর্ব একই রকম গোপনতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের গোলমালের মধ্যে। নিহত হয়েছিলেন চেদিরাজ শিশুপাল, যিনি ছিলেন কংস ও জরাসন্ধের ঘনিষ্ঠ এবং একজন কট্টর কৃষ্ণবিদ্বেষী। কৃষ্ণের প্রতি প্রযুক্ত শ্লেষবাক্যে শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে গেছেন। শিশুপাল বলেছেন, রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ অর্ঘ্য গ্রহণের অযোগ্য, কারণ তিনি যে কেবল রাজা নন তাই নয়, তাঁর মধ্যে এমন কোনো মহৎ লক্ষণেরও প্রকাশ ঘটেনি যেজন্য যুধিষ্ঠির তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করে অন্যান্য নৃপবৃন্দকে ছোট করতে পারেন। কৃষ্ণের চেয়ে পদমর্যাদায় বড় অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জ্ঞানে ও বয়সেও তিনি বহুজনের চেয়ে অর্বাচীন। পরাক্রমে শিশুপাল নিজেও কারো চেয়ে খাটো নন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক নৃপতি সৌজন্য-বশতই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং বিধিপূর্বক সে যজ্ঞে দেয় করও প্রদান করেছেন। ভয়ে বা পাণ্ডবদের পরাক্রমে তাঁরা কেউ নত হয়ে আসেননি। বস্তুতপক্ষে শিশুপালকে কোনো পাণ্ডব জয় করে তাঁর কাছ থেকে কর আদায় করেননি। শিশুপাল বলেছেন, কৃষ্ণ অন্যায়যুদ্ধে 'মহাত্মা' জরাসন্ধকে নিহত করেছেন।

শিশুপালকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি তাঁকে শান্ত করতে গেলেন। সেটাই সমুচিত কাজ। এ সভায় বিশ্বাসযোগ্য প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এইখানে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও বেমানান দুটি অধ্যায় সংযোজিত করলেন কৃষ্ণোপাসকগণ। ভীষ্মের মুখে একটা লম্বা বক্তৃতা যুক্ত করা হল। আমরা অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম দুর্যোধনাদির ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামনে ভীষ্ম এমন এক মানুষ কৃষ্ণের স্তব করছেন, যিনি অন্যায় কৌশল ছাড়া সামান্য জরাসন্ধকেও বধ করতে পারেন না; যিনি জরাসন্ধ শিশুপালের ভয়ে মথুরা ছেড়ে ভারতের শেষ প্রান্তবর্তী কাথিয়াওয়াড় (দ্বারবতী) অঞ্চলে সমস্ত আত্মীয় পরিজন নিয়ে পলায়ন করেন ও দীর্ঘকাল পর্বতের ওপর দুর্গ নির্মাণ করে বিনিদ্র দিনরাত অতিবাহিত করেন। বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম, ভীষ্ম তাঁরই স্তুতি করে বলেছেন যে, এই কৃষ্ণ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই "এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্তা এবং সর্বভূতের অধীশ্বর!..."

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের মুখে ভক্ত কবি যে কল্প-গল্পটি জুড়ে দিলেন ভক্তির অতীব তাড়নায় তাতে তিনি কয়েকটি মূল প্রশ্নকে একেবারেই আমল দেননি। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ভীষ্মের বক্তৃতাকে উটকো গল্প অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত ভাবতে বাধ্য হচ্ছি।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের একটি সভায় যিনি রাজা নন এমন এক ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদানে শিশুপাল তো বটেই অন্যান্য অনেক রাজাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যুধিষ্ঠির শিশুপালকে শান্ত করতে না পেরে এবং "সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষ প্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে" উপায় বিধান করতে অনুরোধ করেন। (সভাপর্ব, কালীপ্রসন্ন)। ইতিহাসের কথা এইটুকু দিয়ে আরম্ভ। কিন্তু শিশুপালকে সম্বোধন ও কুরুপিতাকে উপায় বিধান করতে বলার মাঝে অতর্কিতে ভীষ্মের একটি লম্বা বক্তৃতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল। অবাস্তব ব্যাপার।

সামান্য এক যদুনেতাকে স্বয়ং জগদীশ্বররূপে সেই সভায় সত্যিই ভজনা করা হয়ে থাকলে ভীষ্মকে সেদিন কেউই আর স্বাভাবিক মস্তিষ্কের অধিকারী ভাবতে পারতেন না। হয় ভাবতেন, বুড়ো ভীষ্মের ভীমরতি হয়েছে, নয় বলতেন, হে যুধিষ্ঠির, হে দুর্যোধন ! তোমরা বৃদ্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর, ওনার মাথার গোলমাল হয়েছে। ভীষ্ম যদি কৃষ্ণকে দেবতা আখ্যা দিতেন, তাহলেও সেকালের মানুষ তাই নিয়ে ন্যায্যত আলোচনা করতে পারতেন। কেননা দেবতারাও স্বাভাবিক নরদেহধারী পুরুষ ছিলেন এবং তাঁদের বাস্তব অস্তিত্বের সংবাদ রাজারা রাখতেন।

কিন্তু দেবতাও নয়, মহাপুরুষও নয়, বলা হল, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর এবং তাঁর মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে আছে। আর সেই আষাঢ়ে গল্প শুনে নাকি তাবৎ বীরবৃন্দ, যাঁরা বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞও, চুপ করে রইলেন ! জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় যে মানুষ জগদীশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে উঠতে পারে না, ভীষ্ম একেবারে আঙুল তুলে তাঁকে চিহ্নিত করে দিলেন, যেন জগদীশ্বরের জন্মকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মূর্খের বচনে লাগাম পরানো না হলে এমনই বিপত্তি ঘটতে পারে। কিন্তু, কী আশ্চর্য। ভীষ্মের এই বক্তৃতার পরেও দেখা গেল শিশুপাল সেই মহান জগদীশ্বরকে ছেড়ে কথা বলছেন না। সভায় জগদীশ্বরকে নিয়ে জটলা, কিন্তু কেউই জগদীশ্বর পদে দণ্ডবৎ হচ্ছেন না ! দুর্যোধন কর্ণরাও নির্বাক। অর্থাৎ অতবড় একটা আবিষ্কারের তরঙ্গ কোথাও-ই আছাড় খেল না। এমন একটি মহিমাময়ী গল্প রচনার পরিশ্রম ব্যর্থ হল তাই সম্পূর্ণভাবে। মাঠে মারা গেল বাসুদেবের জগদীশ্বর মূর্তিটি।

ভীষ্মের মুখে কৃষ্ণস্তাবকরা বার বার কৃষ্ণস্তুতি বসিয়ে দিয়েছেন। এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মহাভারতে ভীষ্ম সর্বত্যাগী এক মহান চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধে কুরুপক্ষে অস্ত্র ধারণ করলেও কথকরা তাঁকে মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ বলেই প্রচার করেছেন। এই নিরপেক্ষতার মহানুভবতা আরোপ করা হয়েছে দ্রোণ, শল্য ও কৃপের ওপরেও। আমরা অবশ্য বিরাট পর্বেই দেখেছি, তাঁরা আদৌ নিরপেক্ষ নন। তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণভাবে দুর্যোধনহিতৈষী। যুদ্ধও করেছেন পাণ্ডবদের বিপক্ষে বেশ জোরের সঙ্গেই। কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, শল্য ছিলেন জরাসন্ধমিত্র, অর্থাৎ দেবশত্রু। তাঁর সেই উক্তি আমরা রাজসূয়িক পর্বে শুনেছি। তবু প্রচারকরা এঁদের পাণ্ডবহিতৈষীরূপে খাড়া করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি কোথাও। ফেঁসো গল্প অনেক সময় ফেঁসে গেলেও তিন বৃদ্ধকে প্রায় তাঁরা হিতৈষী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। স্বৈরতান্ত্রিক হিটলার অনুচর গোয়েবলস বলেছিলেন, একটি মিথ্যাকে বারবার উচ্চারণ করা হলে তা সত্যে পরিণত হয়। মিথ্যার পুনরুক্তি দ্বারা মহাভারতে অনেক সত্যের প্রতিষ্ঠার মত তিন বৃদ্ধকে পাণ্ডবহিতৈষী বানানোর চাতুরীটিও সফল হয়েছে। কুরু-শিবিরের ঐ তিন বৃদ্ধ সেকালের মানুষের মনে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বীর, ন্যায়নিষ্ঠ, বিদ্বান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই তিন পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন-পক্ষে স্বেচ্ছায় অস্ত্র ধারণ করেছেন, শুধু এটুকু জানতে পারলেই পাণ্ডবদের পক্ষে প্রযুক্ত ভালো ভালো কথাগুলিকে সাধারণে আর গুরুত্ব দিত না। এবং সেই সম্ভাবনার কথা বুদ্ধিমান দেবতারা খুব ভালো ভাবেই বুঝতেন। তাই ইতিবৃত্তকারদের দিয়ে যত্রতত্র এমন সব আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হল, যাতে মনে হয়, ঐ বহুজন-ভক্তিধন্য পুরুষত্রয়ী দুর্যোধন শিবিরের রক্ষক হলেও তাঁদের অন্তরাত্মা ছিল পাণ্ডবপক্ষে। তাই দেখা যায়, কূট উদ্দেশ্যটিকে সফল করার জন্য যেখানে সুযোগ সেখানেই তিন বৃদ্ধের মুখে পাণ্ডবদের প্রশংসা জুড়ে দেওয়া হয়েছে বার বার। শিশুপাল বধপর্বে ভীষ্মের মুখে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা যোজিত করে কথকরা বিরোধী মনে কৃষ্ণের 'অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন। ভীষ্মকেই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষ্য হিসেবে, কেননা পাণ্ডবশিবিরে খাঁটি মানুষের যে নিতান্তই দুর্ভিক্ষ তা পাণ্ডব-স্তাবকদের চেয়ে আর কেই বা ভালো জানতেন?

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। শিশুপালবধপর্ব তারই সামান্য কিছু পরের ঘটনা। এই সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই আর্যাবর্ত কৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলে মেনে নিল, তা-ই-বা বাস্তব ঘটনা হয় কী করে?

কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ঢের পরবর্তীকালে। তাই ভীষ্ম-বচন এখানে স্পষ্টতই প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই চেতনা ভীষ্ম মহারাজের হয়ে থাকলে তিনি কি বসে থাকতেন সেই জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণে অস্ত্র ধারণ করার জন্য? নাকি, পাণ্ডবদের গোটা পাঁচেক গ্রাম পাইয়ে দেওয়ার জন্য তথাকথিত জগদীশ্বরকে অত ছোটাছুটি, অত দৌত্যকার্য এবং সর্বশেষে যুদ্ধে অত রথ চালনার পরিশ্রম স্বীকার করতে হত? বালবিধবার মত যে অন্ধ ভক্ত আজীবন শুধু কথক-কথকতায় ভক্তি স্থাপন করবার জন্যই জন্মেছেন, বাসুদেব তাঁদের ওপর অনায়াসে জগদীশ্বরত্ব বিস্তার করুন, আমরা বলব, জগদীশ্বর বস্তুটিকে হাত বাড়ালেই অত সহজে পাওয়া যায় না, তাঁর সঙ্গে সম্মুখসমরে মোলাকাত করাটা তো নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার। যে জগদীশ্বর ষোল হাজার নারীকে হারেমে রেখে উপভোগ করেন (মহাভারতের কৃষ্ণের ষোল হাজার সেবিকা ছিল), যে জগদীশ্বর পাণ্ডবদের নারী উপঢৌকন পাঠান. যে জগদীশ্বর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপবীতধারী পরান্নপালিত ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনের কাজে ব্যাপৃত হয়ে গর্ব অনুভব করেন এবং যে জগদীশ্বর অন্যায় যুদ্ধে ভারতের আদি রাজন্য-বর্গকে উৎসাদিত করে ভারতবর্ষকে বহিরাগত দেবতাদের উপনিবেশে পরিণত করেন, তাঁকে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বলে মেনে নিতে আমরা বাধ্য নই।

অর্ঘ্যাভিহরণ পর্বাধ্যায়টি যেন শুধু কৃষ্ণস্তুতির জন্যই রচিত হয়েছিল। যজ্ঞে ছয় স্তরের অধিকারীকে অর্ঘ্য প্রদানের নিয়ম ভীষ্ম ব্যাখ্যা করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন। কৃষ্ণস্তাবকরা কৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অর্ঘ্য প্রদান করে একটি প্রচলিত নীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন। স্বভাবতই উপস্থিত রাজন্যবর্গ তাতে অপমানিত বোধ করেন। কৃষ্ণবলরাম কুরুদেরও আত্মীয়, সম্ভবত এজন্য কুরুপক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। তথাপি, কৃষ্ণের জগদীশ্বরত্বের ওপর প্রলম্ব বক্তৃতার মধ্যে দুর্যোধন কর্ণ একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না এটাও খুব সন্দেহজনক ব্যাপার। এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন সহদেব। অগ্রজগণ বর্তমানে মাদ্রীপুত্রদের মুখে গোটা মহাভারতে কখনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। কিন্তু অর্ঘ্যাভিহরণ পর্বে দেখা গেল, কৃষ্ণ-বিরোধীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করছেন সহদেব। কোনো ভদ্র সভামণ্ডলীতে এমন ইতরজনোচিত ব্যবহার অকল্পনীয়। একমাত্র ইতর কবির দ্বারাই এ ধরনের প্রক্ষিপ্ত নাটক মহাভারতের ইতিবৃত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কাব্যের মহিমাও তাতে খর্বিত হয়েছে।

লক্ষণীয় আরও একটি ব্যাপার হল, এই পর্বে নারদমুনির আত্মগত চিন্তা।

মুনিবর স্মরণ করলেন, স্বয়ং নারায়ণই কৃষ্ণরূপে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছেন ধর্ম রক্ষা করার জন্য। কৃষ্ণোপাসকরা এ-ভাবেই নারায়ণ তৈরীর খেলায় কৃষ্ণের অনুকূলে বহুজনকে সাক্ষী মেনেছেন। নানা মুনির বচনে, পাণ্ডবদের শ্রীকৃষ্ণবন্দনায়, কুরুবৃদ্ধদের প্রশংসায়, এমন কি সুযোগমত ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণের মুখ দিয়েও নারায়ণ বন্দনা গাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু এত করেও তাঁরা নারায়ণরূপী কৃষ্ণকে সামান্য ব্যাধের শরাঘাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। স্বীকার মানতে হয়েছে, পবিত্রমনা গান্ধারীর চোখের সামনে কৃষ্ণও ম্রিয়মাণ হয়ে গেছলেন। স্বজনহত্যার পাপ তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

সুতরাং এটাই বুঝতে পারি যে, অর্ঘ্যাভিহরণ পর্বাধ্যায়ে ভীষ্ম সহদেবের যে বাগযুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে তা আদৌ কোনো বাস্তব ঘটনা নয়, নিতান্ত উদ্দেশ্য-মূলক পরবর্তী সংযোজনা। এই সংযোজনাগুলির ফলেই ক্ষীণ কলেবর মহাভারতের স্ফীতিলাভ ঘটেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমতে তাই এটাই স্বীকার করা উচিত যে উদ্যোগ পর্বের বিবরণটিই যথার্থ। (কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য)। সেখানে বলা হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করায় শিশুপালের সঙ্গে একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালবধ করেন।

যুদ্ধটি যে কোনো ঘোরতর সংগ্রামের সূত্রপাত করেনি তাও বলাই বাহুল্য। সে যুদ্ধের কোনো বিস্তারিত বর্ণনাও নেই। যতটুকু জানা যায়, তাতে একথা মনে করার যথেষ্টই কারণ আছে যে কৃষ্ণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে অপ্রস্তুত শিশুপালকে সুযোগমত বধ করেন। কারণ শিশুপালবধে কৃষ্ণের অস্ত্র ধারণের কথা আছে, শিশুপালের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল বলে কিন্তু উল্লেখ নেই। এবং এটাও ঠিক, বধকার্য নিশ্চয় সভামধ্যে হয়নি, রীতিমত কোনও প্রকাশ্য স্থানেও হয়নি। প্রকাশ্য স্থানে শিশুপালকে হত্যা করা হলে অন্যান্য রাজাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত এবং সভাটিও নির্বিঘ্ন হতে পারত না। কিন্তু আমরা দেখলাম, এমন একটি ঘটনার পরেও সভাশেষে সকলে স্বাভাবিক বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সভাস্থ রাজবৃন্দ শিশুপালবধের সংবাদ তখনও পর্যন্ত জানতেই পারেননি। তাই প্রশ্ন জাগে, রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে শিশুপালকে গুপ্ত-ভাবে হত্যা করা হয়নি তো? এ কাজে কৃষ্ণ তো বিশেষ সুপটু ছিলেন। কিছুদিন আগেই তিনি গুপ্তভাবে জরাসন্ধকে বধ করার পরীক্ষায় পাস মার্কা পেয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তার আগে অতর্কিতে খাণ্ডবারণ্য অবরোধ করে

নির্বিচারে খুন করেছেন নাগেদের তক্ষক সম্প্রদায়কে। দেবানুগত একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টির জন্য এইসব কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে পরশ্রমভোগী পুরোহিত সম্প্রদায়ের মনে অসম্ভব-সম্ভবকারী ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তিনি। তারই পুরস্কারস্বরূপ ব্রাহ্মণরা তাঁকে মন্দির বানিয়ে পুজো করেছেন। উপকারী রাজাদের জন্যও সে যুগে বহু মন্দির বানানো হয়েছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, রাজারা ঈশ্বর ছিলেন।

তবে শিশুপাল বধ যে ব্রহ্মার পরিকল্পনাভুক্ত, এমন কথা স্পষ্টত উক্ত নেই। তা না থাক, ঘটনাবর্তে জানা যাচ্ছে, জরাসন্ধের প্রতাপবৃদ্ধি হিমালয়স্থ বহিরাগত নভশ্চরদের মনঃপূত ছিল না, তাছাড়া কৃষ্ণকথায় যখন জানা যাচ্ছে ব্রহ্মার ইচ্ছায় তিনি জরাসন্ধ বধে অস্ত্র ধারণ করেননি, জরাসন্ধহত্যা ব্রহ্মারই পরিকল্পনা ছিল, তখন শিশুপালকেও সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ নিশ্চিতভাবে হিমালয় শিবির থেকেই আসে। মহাভারতীয় তথ্য, শিশুপাল কেবলমাত্র নিজেই পরাক্রান্ত ছিলেন এমন নয়, তিনি জরাসন্ধের সেনাপতিত্বও করেছেন। শিশুপাল দেবতোষণের বিরোধী। তিনি দেববিরোধী একটি জোট গঠনে তৎপর ছিলেন। তাঁর ভাষণেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজসূয় যজ্ঞ শেষে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে যে প্রশ্ন করেন, এবং ব্যাসদেব যে উত্তর দেন সেই প্রশ্নোত্তর পাঠেও মনে হয়, শিশুপাল বধের নির্দেশ হিমালয় শিবির থেকেই এসেছিল। বাসুদেব ও পাণ্ডবরা কৌশলে সে নির্দেশটি কার্যে রূপায়িত করলেন গোপনে শিশুপালকে সরিয়ে দিয়ে। জরাসন্ধের পর আর্যাবর্তে দেবতা নামক নভশ্চরদের শত্রু আর একটি জোটের দলপতিকে একই ভাবে গোপনে খতম করা হল, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব সেদিন হয়ত দুর্যোধনও সঠিক বুঝতে পারেননি।

ব্রহ্মাজীর সভায় আর্যাবর্তের মানচিত্রটিতে আর একটি পতাকা বিদ্ধ করা হল : শিশুপাল নিহত। পথের আরেকটি কাঁটা পরিষ্কৃত হল।

দেখা যাক, আমাদের এই অনুমান মহাভারতীয় তথ্যের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় কি না।

পাণ্ডবরা যে প্রতি ক্ষেত্রেই এক নেপথ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত এটা বার বার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দেবানুগ্রহলোভী পুরোহিত প্রধান দুর্বাসা, বেদব্যাস প্রমুখ পাণ্ডব জন্ম থেকে পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সকল বিষয়ে সহায়তা ও পথ নির্দেশ করে এসেছেন। ঐ দুই পুরোহিতপ্রধান হিমালয়স্থ দেবলোক অর্থাৎ নভশ্চর দেবতাদের পার্বত্য ঘাঁটি থেকে প্রতিটি নির্দেশ নিয়েই

সমতলে আসতেন ও ধর্মের নামে রাজনীতির নোংরা চক্রান্ত করে যেতেন। এ সত্য বর্তমানে আমাদের অজ্ঞাত নেই। দ্রৌপদী লাভের পর পাণ্ডবদের কাছে হিমালয়ের আর এক দূত, দেবর্ষি নারদের যাতায়াত বেড়ে গেছে। দেবশিবিরের নির্দেশাবলী নিয়ে তিনিও আসা যাওয়া স্বরু করেছেন ঘন ঘন। দেবর্ষির বসবাস ছিল ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় নির্মিত ব্রহ্মাজীর সভামণ্ডলের সন্নিকটে। তিনি দেবর্ষি, স্বতরাং তাঁর স্থান দেববুদ্ধি-দাতার দরবারের কাছাকাছিই হবে। মহর্ষি বেদব্যাস থাকতেন কৈলাস পর্বতে। দেবতাদের সামরিক অধিকর্তা শঙ্করের নির্দেশই ছিল বেদব্যাসের বেশি প্রয়োজন। বিশেষ নির্দেশের জন্য তাঁকে আবার সুমেরু অঞ্চলে ব্রহ্মাজীর সভায়ও পরামর্শের জন্য উপস্থিত হতে হত এবং সেখানে থাকতেও হত। তাই বদ্রিনাথ অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়ও ছিল ব্যাসগুহা।

ঐ দুই দেবদূত যুধিষ্ঠিরের রাজস্থূয় যজ্ঞের আগে ও পরে প্রথম পাণ্ডবের কাছে দেবশিবিরের নির্দেশ ও পরামর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। নারদের উপদেশক্রমেই রাজস্থূয় যজ্ঞের পরিকল্পনা, ব্রহ্মার আদেশে জরাসন্ধ বধ। এসব ঘটনা ঘটে গেছে। রাজস্থূয় যজ্ঞের পর শিষ্য সামন্ত পরিবৃত হয়ে বেদব্যাসও উপস্থিত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তিনি যে যোগবলে আবির্ভূত হতেন না, তাঁর সশিষ্য আগমনেই তা প্রমাণিত হচ্ছে। নারদ তাঁর ঢেঁকি-সদৃশ উড়ন্ত অজানা যানে চেপে হিমালয় শিবির থেকে আসা-যাওয়া করতেন; বেদব্যাসের যানটির বর্ণনা অবশ্য পাওয়া যায় না। অথচ দিল্লী অঞ্চল থেকে কৈলাস পদব্রজে অথবা ঘোড়ার পিঠে যেতে হলে তা হত বহু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই মনে হয়, বেদব্যাসও দেবদত্ত আকাশযান ব্যবহার করতেন। তবে খুবই সাবধানে। তাঁর অবতরণ স্থলটি হয়ত কোনো গোপন প্রদেশে নির্মিত ছিল। যে সব পুরোহিত দলপতিকে লোকচক্ষে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন বলে প্রচার করা দেবতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সেই সব দলপতিরা সম্ভবত সেই গুপ্ত অবতরণ ক্ষেত্রে তাঁদের আকাশযান থেকে ওঠা-নামা করতেন। গুপ্তচরদের জন্য গুপ্ত অ্যারোড্রামের ব্যবস্থা আমারও রাখি, রাখে বড় বড় স্মাগলাররা। সেকালে নির্জন প্রদেশের অভাব ছিল না। দুর্বাসা যখন কুন্তিভোজ প্রাসাদে কুন্তীকে শিক্ষা দিতেন তখন হঠাৎ হঠাৎই তিনি কয়েকদিনের জন্য কোথাও উধাও হয়ে যেতেন। কোথায়ই বা যাবেন? ব্রহ্মার পরিকল্পনার প্রাথমিক অংশকে রূপদানের ভার পড়েছিল দুর্বাসার ওপর। কুন্তিভোজের একটি নির্জন প্রাসাদে বসে তিনি তখন নিবিষ্ট মনে সে কাজেই

ব্যস্ত ছিলেন। ব্রহ্মলোকের নির্দেশ আনার জন্য তাঁকে প্রায়ই ছুটতে হ'ত হয়ত হিমালয়ে। আমরা দেখেছি, যোগবলে এই ছোটাছুটি স্বয়ং শঙ্করেরও অসাধ্য ছিল। সুতরাং দুর্বাসাও আকাশযানই ব্যবহার করতেন। তবে গোপনে এবং লোকচক্ষের আড়ালে।

যাই হোক, কৈলাস থেকে এভাবেই ছুটে এলেন বেদব্যাস। সরেজমিনে তদন্ত করে গেলেন রাজসূয় যজ্ঞের ফলাফল। ব্যাপারটি তো হিমালয় শিবিরে যথাযথ রিপোর্ট করতে হবে। এবং বেদব্যাসের চেয়ে উত্তম রিপোর্টার সে যুগে আর কে-ই বা ছিলেন। সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য দেবতারা তাই তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। সবকিছু পরিদর্শন করার পর বেদব্যাস বললেন, ভালই ব্যবস্থা হয়েছে। খুশি হলাম। এবার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। বললেন, "আমি পূজিত হইয়াছি,···" "এক্ষণে আমি কৈলাস পর্বতে গমন করি।" (সভা, দ্যূত পর্বাধ্যায়)। পাঠক জানেন, কৈলাস এলাকায় ছিল দেবসেনাধিনায়ক শঙ্করের শিবির। শিশুপালহত্যা বিষয়ক সংবাদটি সামরিক, তাই বেদব্যাসকে সর্বাগ্রে কৈলাসেই যেতে হবে। সংবাদটি শঙ্করজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই।

ব্যাসদেব গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করতে যুধিষ্ঠির বললেন, "ভগ্‌বন্‌! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতে কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল?···"

অন্ধ ও অজ্ঞ কিন্তু রাজ্যব্যাকুল যুধিষ্ঠির যে কতদূর দেবনিভর, ব্যাসদেবের কাছে উত্থাপিত তাঁর এই বাতুল প্রশ্নটিতেও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। দেবতারা বলেছেন, হে পাণ্ডব! তোমাদের হিমালয় শিবিরের সহায়তা দিয়ে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করব। সুতরাং যুধিষ্ঠির এক ধর্মরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। একান্ত বশংবদ এবং শরণাগত দীনার্ত যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছেন, জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য লাভের সকল বিঘ্ন অপসারিত হয়েছে তো? অর্থাৎ আয়োজন সমাপ্ত হলেই পুতুল রাজা গিয়ে সিংহাসনে আরূঢ় হবেন তো? তাঁর নিজের আর কী করার আছে। কে তাঁর শত্রু, কেইবা তাঁর মিত্র, মহারাজের তদ্বিষয়েও কোনো ধ্যানধারণা নেই। মহর্ষিকে তাই প্রশ্ন করছেন, শত্রুরা সব খতম হয়ে গেছে তো? এইবার নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করব কি?

উত্তরে বেদব্যাস গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, না। এখনো তের বছর সঙ্কটকাল। অর্থাৎ সবে কলির সন্ধ্যে।

"ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! সেই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে।" বললেন, "নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব…শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন।" (সভা, দ্যূত পর্বাধ্যায়)।

স্বপ্ন নয়, বস্তুতই যা ব্রহ্মার পরিকল্পনা মহর্ষি তাই বলে গেলেন, 'স্বপ্ন' শব্দটি অলৌকিকতা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত। "ব্যাস প্রোক্ত কুরুপাণ্ডবের ভাবী ক্ষয়াশঙ্কা" এই তো প্রথম নয়, পাণ্ডুর ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াকর্মের পর ঝড়ের মত হস্তিনাপুরে এসে মাতা সত্যবতীকে সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছলেন ব্যাসদেব। ব্রহ্মার পরিকল্পনাটি জানার পর মায়ের জন্য তাঁর উদ্বেগ জাগে। তিনি সত্যবতীকে বলেছিলেন :

অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিত দারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গত যৌবনা ॥ (৬)
বহুমায়া সমাকীর্ণো নানাদোষ সমাকুলঃ।
লুপ্ত ধর্ম ক্রিয়া চারো ঘোরঃ কালঃ ভবিষ্যতি ॥ (৭)
কুরুনামনরাচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি।

(আদি, সিদ্ধান্তবাগীশ)।

দুর্যোধন তখন কিশোর। কিন্তু আগে থেকেই ব্রহ্মাজী তাঁকে ত্যাগ করে বসেছেন। আর্যাবর্তের সাম্রাজ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান পাণ্ডবদের। তাই দেব ভক্তদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কুরুকুল দুর্নীতি প্রযুক্ত হয়ে ধ্বংস হবে। সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। তিনি সাবধানে সত্যবতীকে সরিয়ে নিয়ে গেছলেন। বলেছিলেন, অচিরেই কুরুবংশ ধ্বংস হবে। সেই ধ্বংস স্বচক্ষে দেখে লাভ কি। বরং আমার সঙ্গে চলো। হয়ত সত্যবতীকে তিনি নিরাপদ হিমালয়েই স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু সে অনেক কথা। সেসব কথা সবিস্তারে আগের বই-এ আলোচনা করেছি।

বেদব্যাস দেবতাদের কোনো প্রশ্ন করেননি। ব্রহ্মাজীর বাণী সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। দেবানুগত ব্যাসদেব তাই প্রশ্ন করেননি : শিশু দুর্যোধনের অপরাধ কি প্রভু?

না। প্রশ্ন অবান্তর। উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অধিকারী সেই অদ্ভুতকর্মা দেবতাদের শক্তিমত্তার নানা পরিচয় বেদব্যাস পেয়েছেন। জন্মাবধি তিনি নিরুদ্দিষ্ট। সম্ভবত তাঁর কৈশোর যৌবন হিমালয়েই অতিবাহিত হয়েছে। তিনি দেবতাদের ক্রিয়াকলাপকে অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলেই বুঝেছেন।

তাই ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে প্রশ্ন চলে না, প্রজ্ঞাবান সাধুর মনে এমনই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ে হিমালয় থেকে তখনই তিনি ছুটে এসেছেন সত্যবতীকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করার জন্য। অতঃপর তাঁর কাজ হয়েছে দেবতাদের দ্বারা সমতলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর ঘটনাবলী নিখুঁত ঐতিহাসিকের মত লিপিবদ্ধ করে রাখা।

আমরা জানি না, বেদব্যাসের মহাভারত লিখিত ছিল কিনা। কিন্তু অলিখিত হাজার হাজার শ্লোক কি শুধু স্মরণে রাখা যায়? দেবতাদের নিশ্চয় লিখিত ভাষা ছিল। দেবতাদের সেই ভাষা সংস্কৃত। সেজন্যেই ধারণা, সংস্কৃতে শ্লোক না আওড়ালে ঈশ্বরের কানে তা পৌঁছায় না। আশ্চর্য! যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা অন্তর্যামী, তাঁর এই সীমাবদ্ধতা একমাত্র সীমিত জ্ঞান-সম্বল মানুষেই কল্পনা করে। আসলে সংস্কৃত ছিল সেই বহিরাগতদের ভাষা। ভারতীয় রাজন্যবর্গেরও লিখিত ভাষা ছিল। তা ছাড়া অমন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। বেদব্যাস ছিলেন দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্কলক এবং গ্রন্থনাকার। তিনিই সর্বোত্তম প্রতিবেদন রচনাকারী। তাই ব্রহ্মলোকের সকল বার্তাই তাঁর গোচরে থাকত। তবে সকল রাজনীতির সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য হয়ত তিনি বিচার করে উঠতে পারতেন না। ইতিহাস সঙ্কলক তো নিজে রাজনীতিক নন। সেকালের ঘটনাবলীর সূত্রধাররা ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যাতাও ছিলেন না। যেমন বলা হত তেমনি বুঝতেন, যেমন নির্দেশ, তেমনি লিখতেন ও গাইতেন।

কেন সেই সঙ্কট ঘনীভূত হতে তখনও ত্রয়োদশ বছর বাকি, সম্ভবত বেদব্যাস তা জানতেন না। তাই সে ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে আমরা পাইনি। নিশাবসানে কেন দেবসেনাধিনায়ক শঙ্করজী শূল ও পিনাক ধারণ করে দক্ষিণদিক নিরীক্ষণ করবেন তার সদুত্তরও বেদব্যাসের অজ্ঞাত। তাই তিনি পাখীপড়া বচন আউড়ে গেলেন এবং যুধিষ্ঠির পুনরায় ভয়ে আশঙ্কায় মুষড়ে পড়লেন। ভায়েদের ডেকে বললেন, না ভাই, এত ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে সম্রাট হওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। বরং আমি প্রাণত্যাগ করি। ভায়েরা ভীরু অগ্রজকে ভৎর্সনা করলেন। অগ্রজ তখন মহাব্রত ধারণ করে বললেন, ঠিক আছে আমি সাবধানে থাকব। সঙ্কট এড়িয়ে চলব। দরকার কি ঝামেলায়। (সভা, কালীপ্রসন্ন, 'ব্যাসের ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ' দ্রঃ)।

ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ব্যাখ্যা পরবর্তীকালেই হয়ে থাকে। তখন সঙ্কটের

অবসানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন কি বেদব্যাস-বক্তব্যের ব্যাখ্যা এমনিভাবে দাঁড় করানো যায় না ?—

দেবশিবিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য আরও বছর তের সময় দরকার ছিল। তেরটা বছর সে যুগে কিছুই না। সে যুগের মানুষ যে হাজার বছর বাঁচত পুরা পুঁথিগুলিতে সেকথা সর্বত্রই লেখা আছে। আছে বাইবেলে। আছে রামায়ণ মহাভারতে। বাইবেল থেকে এমন একটি হিসাব আমি তুলে দিয়েছি। এই তেরটা বছর হয়ত সমর সরঞ্জাম তৈরী, বিশেষ পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্যই প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মাজীর সভায় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব সুরুর জন্য দিনক্ষণ এ ভাবেই স্থির হয়েছে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের আগে দেবশিবির সম্মুখ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে চান। তাই উৎপাত সৃষ্টি হবে তের বছর উত্তীর্ণ হলে।

সেই সঙ্কটকালে দেবশিবিরে সবচেয়ে যিনি কর্মব্যস্ত থাকবেন তিনি নিশ্চয় শিবিরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ শঙ্কর। তিনিই পরবর্তীকালে ভারতের আদি জনগোষ্ঠীর দেবতা শিবপশুপতির সঙ্গে নিজের আইডেনটিটি মিলিয়ে মিশিয়ে মহাদেবরূপে প্রতিষ্ঠা আদায় করে নিয়েছেন দেবস্তাবকদের কাছে। সেজন্যই ব্যাসদেব বলেছেন, নিশাবসানে মহাদেবকে দক্ষিণ দিক্ অর্থাৎ সমতল আর্যাবর্ত নিরীক্ষণ করতে দেখা যাবে। মহাসমরের পর তিনিই তো দখল নেবেন বিজিত ভূখণ্ডের। প্রতিষ্ঠিত করবেন ব্রহ্মাজী মনোনীত পাণ্ডবদের সেই রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। এসব সমবাধিনায়কেরই করণীয় কাজ। তিনিই এ যুদ্ধের নায়ক।

দেবরাজ ইন্দ্র যখন অর্জুনকে স্বর্গে অর্থাৎ বদ্রিকাশ্রম অঞ্চলে পাঁচ বছর সমর শিক্ষার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন ইন্দ্র অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি মহাদেবকে তুষ্ট করো। তিনিই তোমাকে অস্ত্র দান করবেন।

মহাদেবের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে, রীতিমত এক মিলিটারি পরীক্ষা ও ইণ্টার্ভু পাস করে তবেই ইন্দ্রকীল পর্বত থেকে প্রথমে মহাকাশে ও পরে বদ্রি অঞ্চলে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন অর্জুন। (বনপর্ব॥ দা. ম. স্ব. দ্রঃ)।

রাজসূয়িক পর্বে পরাক্রান্ত শিশুপাল প্রায় বিনা যুদ্ধে এ ভাবেই নিহত হলেন। তা ছাড়া দুর্যোধনকে খুশিমত লাঞ্ছিতও করলেন কৌন্তেয়গণ। আমন্ত্রিতের প্রতি এই ব্যবহারও সেকালে নিতান্ত দুর্লভ। মহাভারত কীর্তনীয়ারা যাঁদের নৃশংস নরাধম প্রভৃতি তিক্ত বিশেষণে ভূষিত করে গেছেন, অতিথির

প্রতি সেই অনার্যদের ব্যবহার ছিল কিন্তু অত্যন্ত বিনীত ও সুভদ্র। উদাহরণ স্বরূপ জরাসন্ধপুরীতে কৃষ্ণসহ ভীমার্জুনের সঙ্গে মহারাজ জরাসন্ধের ব্যবহার স্মরণীয় বলে মনে করি। অন্যদিকে অনার্য স্থপতি ময়দানবের দ্বারা নির্মিত সভাগৃহে বিভ্রান্ত দুর্যোধনকে নিয়ে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবরা যে উপহাস ব্যঙ্গের আসর জমজমাট করে তুলেছিলেন তাকে সঠিক ভদ্রতা বলা যায় না। আমন্ত্রিত হয়ে ভ্রাতাগণসহ দুর্যোধন খুশিমনেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়িক যজ্ঞে নিজেদের ওপর ন্যস্ত কর্তব্যকর্ম করেছেন। মহাভারতে তাঁদের বিদ্বেষের কথা উল্লিখিত নেই। অথচ তারই প্রতিদানে দুর্যোধনকে উপহাস ও বিদ্রূপের দ্বারা বিদ্ধ হতে হয়েছে। যুবরাজের আত্মাভিমানে এ বিদ্রূপ স্বভাবতই আঘাত করেছে। আঘাত এমনই গুরুতর যে অপমানে দুর্যোধন আত্মঘাতী হতে চেয়েছেন। মামা শকুনিকে বলেছেন, অপমান তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ উত্তেজনা প্রদর্শন করলে, দুর্যোধনের সন্দেহ ছিল, অসহায় অবস্থায় তাঁকেও শিশুপালের মতই বধ করা হত। এসকল ব্যাখ্যা আমরা মহাভারতে উদ্ধৃত দুর্যোধনের উক্তিতেই শুনতে পাই। মহাভারত কীর্তনীয়াদের কেউ কেউ কিন্তু দুর্যোধনের সেই মনোবেদনাকে আদৌ কোনো মূল্য না দিয়ে তাকে কুরুকুমারের দুর্মতি ও হিংসা বলে ইতিহাসে উল্লেখ করে গেছেন। বলেছেন, আসলে জ্ঞাতিদের ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধনের মনে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল।

"দুর্যোধনের দুর্মতিসূচনা" অধ্যায়ে (সভাপর্ব) এমন কতকগুলি উক্তি দুর্যোধনের মুখে বসানো হয়েছে যা পাঠ করলে যে কোনো সাবধানী পাঠকই বলবেন, ঐ সংলাপ উদ্দেশ্যমূলক রচনা, দুর্যোধনের মুখে অমন কথা উচ্চারিত হতে পারে না।

আমরা ভাবতেই পারি না, দুর্যোধনের মুখে 'মহাত্মা ধনঞ্জয়' শব্দ উচ্চারিত হবে। ধনঞ্জয়ের কদর্য হিংস্র রূপ তিনি দেখেছেন কুরুকুমারদের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শনীর আসরে। দেখেছেন, বীরত্বে ম্রিয়মাণ হয়ে পার্থসহ অন্যান্য ভায়েরা কর্ণকে কীভাবে মর্মান্তিক বাক্যশরে বিদ্ধ করেছিলেন। মানবিক ঔদার্য থাকলে সেরূপ আচরণ কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। সেই ধনঞ্জয়কে খামোকা মহাত্মা বিশেষণে বিশিষ্ট করবেন কেন দুর্যোধন? ঐসব চাটুকারী খেতাব স্বার্থান্ধ তোষামুদের দ্বারা ইচ্ছেমত লিখিত হয়েছে। স্বদলীয় লোকেই সামান্য রাজনৈতিক নেতাকে মহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে 'ধর্মরাজ' বলা হয়েছে। কিন্তু যে দুর্যোধন সেই ধর্মের বিরোধী কী কারণে তিনি যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মরাজ' বলে উল্লেখ করবেন? তাছাড়া তখনও পর্যন্ত কোনো

তথাকথিত ধর্মরাজ্য তো স্থাপিতই হয়নি। এই মনগড়া বা মুনিগড়া ভাষণের শেষে দুর্যোধনের মুখ দিয়ে আরও বলানো হয়েছে, 'দৈবই প্রধান। পৌরুষ নিরর্থক।' বলা বাহুল্য, এমন চিন্তা দুর্যোধন চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন পুরুষকারেরই পূজারী। দেবতাদের বিভ্রান্তিকর সূক্ষ্ম ধর্মে তাঁর তিলতম আস্থা ছিল না। সেজন্যই তো মহাভারতে তিনি নাস্তিক চার্বাকের বন্ধু বলে কথিত। এসব কারণেই মনে হয়, এই অধ্যায়টি কোনো পাণ্ডব তোষণকারী কথকের অধ্যবসায় দ্বারা রচিত। এখানে খাঁটি সংবাদ নেই।

দুর্যোধন যখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন তখনও কিন্তু তাঁর বক্তব্যে হিংসার প্রকাশ ঘটেনি। নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরে আমরা যেমন উৎসবের বর্ণনা দিয়ে থাকি, ঠিক তেমনিভাবেই অন্ধ পিতার কাছে সেই ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার কাছে অভিমানাহত কণ্ঠে বলেছেন, অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারলে তিনি তাঁর ব্যর্থ জীবন আর রাখবেন না। পুরুষোচিত যথার্থ বচন, সন্দেহ কি? আর তাতে অন্যায়টাই বা কোথায়? মর্যাদাবান মানুষ অপমানিত হলে তো প্রাণত্যাগের সংকল্পই করেন।

পাশাপর্বঃ আর একটি চক্রান্ত

নিষ্কলুষ কর্ণ-চরিত্রটিকে মসিলিপ্ত করা হয়েছে সভাপর্বে পাশা খেলার আসরে বা দ্যূত সভায়।

মহাভারতের পর্বে পর্বে দেবচক্রান্তের অজস্র নজির আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি এবং পরেও পাব, কিন্তু দ্যূত সভার পরিকল্পনাটি শুধু অনন্যসাধারণই নয়, বাস্তবিক অকল্পনীয়। এই নাটিকাটি এমনভাবে সুঅভিনীত হয়েছে যা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। কুরুবৃদ্ধ-সমাবৃত সভায় কুরুকুলবধূ দেবকন্যা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাদৃশ্য নির্বিচার বর্বরতার একটি চিরকালীন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই দৃশ্যে এসে শিহরিত হয় মানবাত্মার সকল শুভবুদ্ধি। মহাভারতের সহস্র মিথ্যাভাষণের নিরন্তর আক্রমণে দুর্যোধন তো জন্মাবধিই আমাদের সহানুভূতি থেকে অকারণে বঞ্চিত হয়েই আছেন, সভাপর্বে আমাদের নির্মম মমত্বশূন্য করে তোলা হয় কর্ণসহ কুরুবৃদ্ধদের প্রতিও, শকুনিকে খাড়া করা হয় শঠতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি রূপে। এমন দৃশ্য জগতে আর কোথাও লিখিত হয়নি। এতো সূক্ষ্ম লিপিকুশলতা; সত্যকে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যার দ্বারা এমন সহজ ও অনায়াস উপায়ে আবৃত করার শৈল্পিক চাতুর্যও দুর্লভ।

• উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণাগ্রজ বলভদ্রের ভাষণে এই অপূর্ব দেবচতুরালী ফাঁস হয়ে না গেলে সভাপর্বের ঘটনাটিও যে সযত্নে সাজানো, তার পিছনেও যে ছিল সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চক্রান্ত, আমরা তা কেউই নজর করতাম না। কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবই আমাদের দৃষ্টি সত্যমিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন তাঁর নির্ভীক সত্যভাষণের দ্বারা। বলাই বাহুল্য, এমত রূঢ় সত্য উচ্চারণের মত মনোবল সেদিন পাণ্ডব সভায় বলদেব ছাড়া আর কারই ছিল না। বলদেবকে যতই মদ্যাসক্ত ও গঞ্জিকাসেবী খেয়ালী পুরুষ হিসেবে মহাভারত প্রতিপন্ন করে গিয়ে থাকুক না কেন, আমরা তাঁর নির্ভীক সত্যভাষণের প্রশংসা না করে পারি না। মদ্যাসক্ত বলে কথিত বলদেব বীরত্বে কিছুমাত্র খাটো পুরুষ ছিলেন না। বলা হয়েছে, ভীম ও দুর্যোধন তাঁর কাছেই গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। তিনি মহাভারতের এই দুই অসীম সাহসী ও শক্তিধর যোদ্ধার গুরু। হয়ত সেটাও একটা কারণ যে জন্য বিরাটসভায় কেউ তাঁকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ করতে সাহস পাননি। নচেৎ অকপট সত্যভাষণের পরিণামে কৃষ্ণের সামনেই হয়ত

অগ্রজ বলভদ্রের মুখ ব্রাহ্মণস্তাবকরা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতেন। কৃষ্ণমতাবলম্বী বৃষ্ণিবংশজ সাত্যকি বাক্যবাণে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করতে অবশ্য ছাড়েননি, কিন্তু দেবব্রাহ্মণরা তাঁদের বিরোধী শক্তিকে কেবলমাত্র বাক্যপ্রহারেই শাস্তি দিতেন না। সে ঔদার্যের যথেষ্ট অভাব ছিল তাঁদের। তথাপি বলদেব যে সেদিন অ-প্রহৃত ছিলেন, তার তিনটি কারণ খুবই স্পষ্ট। এক, তিনি নিজ বলে বলীয়ান ছিলেন। দুই, তিনি ছিলেন কৃষ্ণাগ্রজ এবং তিন, বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন নির্বিরোধী নিরপেক্ষ। এমনটি না হলে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের চক্রান্তটি ফাঁস করে দেওয়ার সাজা তাঁকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হত। আমরাও আর একটি গুপ্তহত্যার পাপকে ধর্মকর্ম বলে নীরবে মেনে নিতাম।

অজস্র অকৃপণ বাগ্মিতার দ্বারা মহাভারত কথক আমাদের সুনিপুণভাবে বুঝিয়ে গেছেন যে স্রেফ জোচ্চুরি করে দুর্যোধন মাতুল শকুনি পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় পরাস্ত করে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে করায়ত্ত করেন। অতঃপর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কুৎসিত অভদ্র চেষ্টা হয়। সেই লাঞ্ছনার সময় পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু অদ্ভুত নীরবতা পালন করেন এবং দীর্ঘ নাটকটি অনুষ্ঠিত হতে দেন কেবলমাত্র কতকগুলি জিঘাংসা-পরতন্ত্র শপথবাক্য উচ্চারণের আত্মপ্রসাদের মধ্যে।

মহাভারতে এইটুকু রটনাংশ। প্রকৃত ঘটনাংশ কিন্তু অন্যরকম। সেই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরা হল বিরাট রাজার সভায়। সমাগত পাণ্ডব হিতৈষীরা দুর্যোধনদের শত দোষ উল্লেখ করে কুরুবংশ নাশের জন্য পরিকল্পনা আঁটছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, কৃষ্ণ, বলদেব প্রমুখ। কুরুপক্ষের প্রতি একতরফা দোষোল্লেখ যখন পার্ষদগণ কর্তৃক সহর্ষে সমর্থিত হচ্ছে, বলদেব তখন সকলকে চমকিত করলেন সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব এক বক্তব্য উপস্থিত করে। বললেন, "ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন ; কিন্তু দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াই আপনার সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত করিয়াছেন। ইনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নহেন, সমুদয় সুহৃদগণ তদ্বিষয়ে ইঁহাকে নিষেধও করিয়াছিলেন, তথাপি ইনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্যোধনের সভামধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র অক্ষভেদী ছিল যাহাদিগকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতেন, কিন্তু দৈবের কি দুর্বিপাক ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন।...ইহাতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নাই।" (উদ্যোগ, কালীপ্রসন্ন)

সভাসদবৃন্দের সঙ্গে আমরাও চমকিত হলাম এই ব্যাখ্যায়। মহাভারতের

ধর্মাধর্ম শব্দসম্বলিত উচ্চনাদের মধ্যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, কার্যাকার্যের বিচারবোধ কৌশলী কথক আমাদের কাছ থেকে অপহরণ করেছিলেন। তাই দৃষ্টিপাত করিনি সদসতের প্রতি। একবারও মনে হয়নি সভাসদগণের নিষেধ সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কেন পাশক্রীড়ায় অমনভাবে ঝুঁকে পড়লেন। যদিবা আসক্তিবশত তিনি খেলতে নামলেন, তবে জেনেশুনে অক্ষক্রীড়া-পারদর্শী শকুনিকেই বা কেন তাঁর প্রতিপক্ষরূপে বেছে নিলেন? দুর্যোধনের শর্ত তো তেমন ছিল না। প্রতিপক্ষ হিসেবে অপর যে-কোনো ক্রীড়াবিদ্‌কে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। স্বয়ং দুর্যোধনকেও আহ্বান জানানো যেত। এবং সেক্ষেত্রে তাঁকে নিশ্চয় হেরে যেতে হত না। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় বেশ পটু ছিলেন। বিরাট রাজার সভায় তিনি পাশা খেলে বেশ কিছু সম্পত্তিও জিতেছিলেন। সুতরাং মল্লবীর দুর্যোধনকে এই ন্যায়েসী খেলায় আমন্ত্রণ জানলে দুর্যোধন নিশ্চয় প্রথম পাণ্ডবের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিতই হতেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু সে সুযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে শকুনির সঙ্গেই খেলায় বসলেন এবং কী আশ্চর্য, স্বয়ং শকুনির দ্বারা খেলায় নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি অকাতরে ঘুঁটি চেলে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব হারালেন। যদি বলা হত, এটি তাঁর মহান আত্মত্যাগ, তবে বিষয়টি বিশ্বাস্য বোধ হতে পারত। কিন্তু না, স্বেচ্ছা পরাজয় বরণ করা হল শুধু একটি মিথ্যা কারণ খাড়া করে। ঘটনাচক্রে মনে হল, কোনো নেপথ্য শক্তি যেন যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় বরণ করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলদেব বললেন, এই পরাজয়ের পেছনে ছিল দৈব দুর্বিপাক।

ব্যাপারটি দৈব দুর্বিপাকই বটে।

দেবতাদের সমতলবাসী গুপ্তচরবাহিনীর নেতৃত্ব করতেন বিদুর, একথা তথ্যপ্রমাণসহ বারবারই উল্লেখ করেছি। যুধিষ্ঠিরকে নির্বিচারে অক্ষক্রীড়ায় যোগদান করতে তিনিই বলে গেছলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তিনি দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর নির্দেশের যাথার্থ্য আমরা সঠিক না বুঝলেও যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন। জতুগৃহে গমনের প্রাক্কালে বিদুরের সাংকেতিক সাবধানবার্তা বুঝতে যেমন তাঁর অসুবিধা হয়নি, এক্ষেত্রেও দেখতে পাই, বিদুর-বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি অনায়াসেই উপলব্ধি করলেন এবং বিদুরকে বললেন, "হে বিদুর! পুত্র পক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরদরদেবনে (পাশা খেলায়) ইচ্ছা করিতেছি না। আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব।"

বোঝা গেল, পাশা খেলার অধর্ম নিয়ে সভাস্থলে প্রলম্ব বক্তৃতা করলেও

গোপনে বিদুরই ঐ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে যুধিষ্ঠিরকে আদেশ দিয়ে গেছলেন। এই খেলার পেছনে, এমন কি তাতে পরাজিত হওয়ার বিষয়েও দেবশিবিরের অনুমোদনই ছিল। দেবতারাই চেয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব পাশায় হেরে রাজ্যত্যাগ করে বনবাসী হন। সে সময় তাঁদের বনবাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনটি, বলাই বাহুল্য, সামরিক।

ঘটনাবলী অতঃপর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যাক।

পাশা খেলার আসরে শুধুমাত্র কুরু ও পাণ্ডবরাই নন, দর্শক ও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অনেক রাজন্যবর্গও।

খেলায় বসে যুধিষ্ঠির শকুনিকে বললেন, দেখবেন, খেলায় ধূর্ততা করবেন না যেন।

একথা হয়ত বিশেষ ইঙ্গিতসহ মহাভারতের শ্রোতাকেই শোনানো হল, কেননা এই সঙ্গে কথক শকুনির ধূর্ততা বিষয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ আখ্যান রচনা করে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, শকুনিচালিত পাশার ঘুঁটি ছিল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ছিল তার মধ্যে যাদু চাতুরী, এবং সেকথা জানতেন বলেই 'সদাশিব' প্রথম পাণ্ডব শকুনিকে সৎভাবে খেলতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এখন আর আমরা সেকথা সরল মনে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের প্রশ্ন, অমন ঘটাপটা করে যুধিষ্ঠিরের হারতে বসারই বা কী প্রয়োজন ছিল? যে কোনো একজনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে তিনি শঠ শকুনির সঙ্গেই বা খেলতে বসলেন কেন? যদি খেলতেই বসলেন তবে কে তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল পাশায় সর্বস্ব পণ রাখতে? তাঁরই বা এমন শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি? বিদুর ধর্মের নামাবলীটিতে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে পাশা খেলার আদেশ দিয়ে সেই পাশক্রীড়াকেই কুরুবংশের সর্বনাশের কারণ বলে সভায় সোচ্চারে উচ্চারণ করলেন কি শুধু দুর্যোধনের বিরুদ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্যে? পাপপুণ্য নিয়ে যাঁরা সবিশেষ চিন্তিত, তাঁরা কি দয়া করে স্বীকার করবেন, শঠতা ও পাপ এক্ষেত্রে বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের এবং দুর্যোধনপক্ষ নির্দোষ? মানুন চাই না মানুন, আমরা সভাপর্বের চক্রান্তটিকে আজ সবার সামনে উন্মুক্ত করব।

ঐ শুনুন, শকুনি যুধিষ্ঠিরের পরিহাস বাক্যের প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে কী বলেছেন। বস্তুত ক্রীড়ারম্ভে এ তো শুধু পরিহাস বিনিময়ই ছিল।

শকুনি হেসে বললেন, মহারাজ চাল ঠিকমত চাললে কেউই পরাজিত হন না তাছাড়া খেলায় হারজিতে তো দোষ নেই। দোষ হয় পণ রেখে খেললে।

বললেন, "পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই···" সুতরাং এটাও পরিষ্কার বোঝা গেল যে পণ রেখে জুয়া খেলতেও অনুরোধ জানানো হয়নি যুধিষ্ঠিরকে। বরং শকুনি বলেছেন, পণই পরাভবের কারণ, খেলায় তো হারজিত আছেই।

কিন্তু ধর্মধ্বজী যুধিষ্ঠিরের অবস্থা তখন 'কালা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' প্রথম পাণ্ডব বললেন, "দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত···"

যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় পাশা নিয়ে বসে পড়লেন। তখনও কিন্তু মহামতী বিদুর তাঁর আদুরে ছেলে যুধিষ্ঠিরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা না করে দুর্যোধনকেই গালি-গালাজ করছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, যদি বাঁচতে চাও, পাপাত্মা দুর্যোধনকে ত্যাগ করে অর্জুনকে রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ কর, না হলে সবংশে ধ্বংস হবে।

খেলা আরম্ভ হলে যুধিষ্ঠির বাজি ধরলেন এবং হারতে লাগলেন। বেশ ক্ষয়-ক্ষতির পর গান্ধাররাজ শকুনি খেলায় ইতি টেনে বললেন, "হে যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে, তবে বল।" অর্থাৎ ইচ্ছে করলে যুধিষ্ঠির এখানেও থামতে পারতেন। ইচ্ছে করলে পরম হিতৈষী বিদুর তাঁকে এখানেই ক্ষান্ত হওয়ার উপদেশ দিতে পারতেন। কিন্তু শঠতায় বিশেষ দক্ষ বিদুর ও পার্থগণ কেউই এখানে থামলেন না। এরপর রাজ্যসহ একে একে পরম ধার্মিক তাঁর দাস দাসী, ভ্রাতৃবর্গ এবং দেবদত্ত দ্রৌপদীকেও পণ রাখলেন। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা। কিন্তু ইনি যে পরম ধার্মিক, তাই স্ত্রীকে জুয়ায় হারলেন। এঁর বিবেচনায় ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীও এঁর সম্পত্তি। যদিও ইনি কোনো সম্পত্তিই নিজগুণে কথনো অর্জন করেননি।

যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় দ্রৌপদীকে বাজি ধরে হারলেন। সভাসদগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তাঁর সেই আচরণের প্রতিবাদে। রাজসূয়িক পর্বে অপমানিত দুর্যোধন এই উপায়ে তাঁর লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দানের সুযোগ লাভ করে কৌতুক অনুভব করলেন। আদেশ দিলেন রাজগৃহ থেকে পাঞ্চালীকে সভাগৃহে নিয়ে আসা হোক। এরপর দ্রৌপদী যখন দূতকে দু-দুবার ফিরিয়ে দিলেন তখন মৎলবী যুধিষ্ঠিরই স্বয়ং দূত প্রেরণ করলেন এবং জনান্তিকে সেই দূতকে বললেন, 'একবস্ত্রা, অধোনিবী, রজস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত হন।'

এতোবড় পাষণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে আর কে আছেন যিনি নিজের মুরদে স্ত্রীরত্ন অর্জন করতে না পেরেও কনিষ্ঠের প্রাপ্য বধূকে সূক্ষ্ম ধর্মের

ব্যাখ্যা করে আপন পরিণীতা হিসেবে গ্রহণ করার পর জুয়া খেলে সেই রমণীকে শক্রহাতে তুলে দেন তিল মাত্র বিচলিত না হয়ে ?

এতো কাণ্ডের পর, কী আশ্চর্য, রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী কিন্তু সভাপ্রবেশ করেই দৃপ্ত তেজে বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গের পৌরুষে আঘাত হেনে এবং নিজের অসহায় অবস্থা ব্যক্ত করে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপসহ অন্যান্য ভারতীয় নৃপবর্গকে দুর্যোধন বিরোধী বিষাক্ত মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করার আপ্রাণ প্রয়াস পেলেন। ভীমার্জুনসহ যুধিষ্ঠির ও বিদুর সেই নাটক লক্ষ্য করতে লাগলেন নীরবে। মহাভারতকার স্বয়ং এই মতলবটি সম্পর্কে ইঙ্গিত রেখে গেছেন। আমরা পাঠ করি, "দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিত কলেবর ভর্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের কোপানল উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন।" অর্থাৎ দ্রৌপদী তাঁর ওপর ন্যস্ত ভূমিকাই পালন করছিলেন। যুদ্ধার্থে নিযুক্ত কোনো নারী সভায়, বিপদে, শক্রব্যূহে এবং উন্মত্ত পুরুষ সান্নিধ্যেও বিহ্বল হন না। তাঁরা এমন-কি নিজের সর্বস্ব দিয়েও দায়িত্ব পালন করেন। দ্রৌপদী সাধারণ রাজনন্দিনী হলে আপন দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু ক্রন্দনই করতেন, এই লাঞ্ছনায় অদৃষ্ট এবং পঞ্চস্বামীকেই শুধু দোষারোপ করতেন। কিন্তু তা না করে উৎসর্গিতপ্রাণা রাজনৈতিক রমণীর মত বক্তৃতা করলেন এবং প্রারম্ভে 'মহাত্মা ধর্মনন্দনে'র মহিমা কীর্তন করতে বিস্মৃত হলেন না। রমণী চরিত্রের এই ব্যতিক্রম পৌরাণিক যুগেও কি খুব সুলভ আচরণ ? পরপুরুষের দ্বারা গুরুজন সমক্ষে আকর্ষিতা হয়েও নারী তাঁর বক্তৃতার বিষয় সঠিক মনে রাখেন এবং জনসমক্ষে চিৎকার করে বলতে পারেন, সে সময় তিনি ছিলেন রজস্বলা ! না, দ্রৌপদীর আচরণের সঙ্গে পুরনারীর প্রতিক্রিয়া কোথাও মিল খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা দ্রৌপদীর আবির্ভাবের নেপথ্য উদ্দেশ্য জানি বলে, তাঁকে কবির বিচিত্র সৃষ্টি বলেও মানতে পারছি না। তাঁর আনুপূর্বিক আচরণই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক, বরং এটাই বেশি করে মনে হচ্ছে। তাই তো দেখলাম এতোবড় একটা নাটক প্রত্যক্ষ করেও বিজ্ঞজনে নীরব রয়েছেন।

দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠিরের স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণের নেপথ্যে যে রাজনীতি সক্রিয় ছিল, কুরুপক্ষ তা উপলব্ধি করতে পারেননি। রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর লম্বা বক্তৃতার উত্তরে তাই দেখি, প্রাজ্ঞ সভাসদবর্গ ও আমন্ত্রিত ভারতীয় রাজন্যগণ ছিলেন স্তব্ধ নিশ্চুপ। তাঁরা সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে বিসদৃশ আচরণ লক্ষ্য করে কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। একটি তৈরী-করা সমস্যার মধ্যে

বন্দী হয়ে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে বসেছিলেন সবাই। ভীষ্মের মুখেও শোনা গেল সংশয়পূর্ণ জবাব, যার মূল কথা, যুধিষ্ঠিরের আচরণের কোনোই অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্মও। দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব তাই তাঁর জানা নেই। তিনি বললেন, "শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয় (লক্ষণীয়, শকুনি যে কপটাচারী একথা কিন্তু ভীষ্মও বলেননি) যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন; বিশেষত তিনি স্বয়ং তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।" অর্থাৎ, তাই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

পররর্তী সময়ে কৃষ্ণাগ্রজ বলভদ্রও পাশা-পরাজয়ের জন্য যুধিষ্ঠিরকেই দায়ী করলেন। তবু কি আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, শঠতা করে শকুনি দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব অপহরণ করেছিলেন? মেনে নিতে হবে ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে কতগুলি সাজানো গোছানো গল্পকথা?

যুধিষ্ঠিরের স্বরূপ তো দেখলাম। লক্ষ্য করব না কি অন্যান্য পাণ্ডবকেও?

শুনেছি, অর্জুনই ছিলেন দ্রৌপদীর প্রিয়তম। কিন্তু লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর জন্য তাঁর মধ্যেও সামান্যতম চাঞ্চল্য লক্ষিত হল না। তিনিও যে আর্য, তাই কঠোর। তাই রাজনীতিতে ধৈর্যশীল। কার্যোদ্ধারের জন্য প্রথম পাণ্ডবের মতো তিনিও পারেন অবলীলাক্রমে সকল ধর্মাধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে দেবশিবির প্রোক্ত ধর্মের জয়গান গাইতে।

• দেখলাম, অনার্য চরিত্রের সারল্য ও অকপট মানবিকতাবোধে অস্থির ভীম যখন রাগে ফুঁসছেন, যখন তিনি অপর কারোকেও দোষারোপ না করে জ্যেষ্ঠের দুষ্কার্যে অতিষ্ঠ হয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছেন: যে হাত দিয়ে পাশার ঘুঁটি ঠেলে দ্রৌপদীকে হেরেছেন ধর্মরাজ, তিনি সেই হাতটা পুড়িয়ে দেবেন!⋯ তখন অর্জুন তাঁকে নিরস্ত করে বলছেন: "হে ভীমসেন, তুমি পূর্বে কখনো ঈদৃশ দুর্বাক্য প্রয়োগ কর নাই। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম-গৌরব বিনষ্ট করিয়াছে।⋯ধর্মাচরণ কর⋯।"

কেবল কতকগুলি শুষ্ক অলীক 'ধর্ম' শব্দের চর্বিতচর্বণ। দেখে শুনে মনে হয়, হয় এই পাণ্ডবরা অতিমানব, নয় তাঁদের হৃদয় মানবিক-বোধ-শূন্য। কিন্তু এ-ও বাহ্য রূপ মাত্র। আসলে তাঁরা উদ্দেশ্যপরায়ণ। অর্জুন জানতেন, যুধিষ্ঠির অকারণে পাশার দান হেরে সর্বস্ব সমর্পণ করছেন না। নিশ্চয় তাঁর কর্মের নেপথ্যে আছে গূঢ় অভিসন্ধি। অভিসন্ধি ছাড়া সে ব্যক্তি এক পা-ও অগ্রসর হন না। একটি বচনও বৃথা ব্যয় করেন না। তাই পার্থ সেকথাই স্মরণ

করিয়ে দিলেন ভীমসেনকে। বললেন, ধর্মাচরণ করো। অর্থাৎ দেবশিবিরের আজ্ঞা পালন করো। 'ধর্ম' শব্দটি পাণ্ডবকুলের সাংকেতিক ভাষা। ধর্ম বলতে তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশ্য ও কর্মকেই বোঝেন। ভীমকে নিরস্ত করার জন্য অর্জুনের কৌশলী বাক্য তাই, "শত্রুগণ তোমার ধর্ম-গৌরব বিনষ্ট করিয়াছে।" শত্রুরা তোমাকে বিপথ-চালিত করছে। হে ভীমসেন, ধর্মাচরণ কর। পালন কর দেবতাদের ইচ্ছা।

দেবতাদের ইচ্ছা,—পাণ্ডবরা বনবাসের অছিলায় তের বছর অজ্ঞাতবাস করুন। এই সময়েব মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হবে।

প্রশ্ন হবে, যদি দ্রৌপদী দেবশিবিরেরই নারী গুপ্তচর হয়ে থাকেন, তবে তিনি সভায় অত কাণ্ড করলেন কেন? সহজ উত্তর, নিজের দুর্দশা দেখিয়ে কুরুপক্ষের বীরগণের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির প্রয়োজনে দ্রৌপদীকে ঐ অভিনয়টুকু করতে হয়েছিল। এমন অভিনয় তিনি একাধিকবার করেছেন। বিরাট রাজার সেনাপতি কিচকের দ্বারা বিরাট সভায় লাঞ্ছিত হলে তিনি যখন কেঁদে ভাসাচ্ছেন, যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, নটীর মত তুমি আর কেঁদ না, সৈরিন্ধ্রী। দ্রৌপদীকে প্রথম পাণ্ডব এই চোখেই দেখতেন। তাই তাঁর লাঞ্ছনায় বিচলিত হননি কখনো। অভিনেত্রী হিসেবে কৃষ্ণা-প্রতিভার অপর পরিচয় পাই যখন তিনি কিচকের সঙ্গে একাকিনী নির্জনে সাক্ষাৎ করেছেন ও প্রণয়কলার অভিনয়ে সেই অনার্য বীরকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করে টেনে নিয়ে এসেছেন অন্ধকার রাজ-নর্মগৃহে। তার পর নিরস্ত্র কিচককে অতর্কিত আক্রমণে বধ করেছেন ভীমসেন। এঁদের পুরো পার্টিটাই ছিল নিপুণ অভিনেতৃ-সঙ্ঘ। সভাপর্বেও সেই অভিনয়কলা প্রদর্শিত হল। যাত্রাপালানুরাগী আমরা যুগে যুগে সেই অভিনয়ের বশীভূত হয়ে আছি।

অবস্থা পর্যালোচনায় মনে হয়, ভীম ব্যতীত দ্রৌপদী অর্জুন ও প্রথম পাণ্ডব, এই তিনজনেই দেবশিবিরের নির্দেশটি জানতেন। জানতেন, তেরটি বছর বনবাসের অছিলায় গোপন প্রস্তুতির সময়। হস্তিনাপুরের গায়ে গায়ে বাস করে সে প্রস্তুতি পর্ব পরিচালনার সুযোগ ছিল না। তাই একটা কারণ তৈরী করে পাণ্ডবরা দেবশিবিরের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় গা ঢাকা দিলেন। এই ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে অর্জুনকে হিমালয়স্বর্গে নিয়ে গিয়ে পাঁচটি দীর্ঘ বছর ধরে দেবনির্মিত অস্ত্রাদি প্রয়োগের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বনাঞ্চলের ব্রাহ্মণ আশ্রমগুলিতে যুধিষ্ঠিরকে পড়ানো হয়েছিল দেবতাদের শাসন অনুশাসনের পাঠ। বড় বড় মুনি ঋষি ও কথকগণ এসে সাংকেতিক নামে (ধর্মবক

উপাখ্যান দ্রঃ), গাল-গল্পের মাধ্যমে, ইতিহাসকথন ও উপদেশবাণীর সহজ পন্থায় (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) এবং প্রত্যক্ষ নির্দেশ দানে (ব্যাস, নারদ প্রমুখের দ্বারা) রাজকার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরকে, যিনি মন্ত্রগুপ্তির মর্যাদা রক্ষায় ছিলেন সবার চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী। দীর্ঘকালীন এই কর্মশালায় বাকি তিন পাণ্ডবের শিক্ষণীয় কিছুই ছিল না। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে মাঝে মাঝে পাণ্ডবানুজ বলে ভাবতেই ভুলে যাই আমরা। ঐ দুই বৈমাত্রেয় ভাই যেন কেবল অগ্রজগণের অনুগত দাসমাত্র। আর ভীমসেন? অর্জুন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর দেহরক্ষাকারী ভীমও কোনো বিশেষ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নন। বরং বড় বেশি অনাদৃত ও বড় নির্দয়ভাবে উপহসিত সেই বীর পুরুষ। দেব-অভিসন্ধির কথা এঁদের জানানো হত না। এঁরা শুধু যুধিষ্ঠিরের নির্দেশচালিত সৈনিক ছিলেন। আসল উদ্দেশ্য জানতেন না বলেই প্রথম অবস্থায় ভীমকেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখি। পরে অর্জুনের ইঙ্গিতে তিনি নিজেকে সামলে নেন।

যাই হোক, যা বলছিলাম :

কর্ণের পরবর্তী স্পষ্টোক্তি : "…স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্তাই বিধান…, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্তার বশবর্তিনী হইয়াছেন, তখন ইনি বারস্ত্রী…; সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসনা করা আশ্চর্যের বিষয় নহে।" (সভাপর্ব)।

• আমরা লক্ষ্য করেছি, সুযোগ পেলেই পিতামহ ভীষ্ম কর্ণকে বিদ্রূপ ও ভৎর্সনা করতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সভাপর্বের নাটক যখন ক্লাইম্যাক্সে, নারীর প্রতি চূড়ান্ত অবমাননাকর উক্তি যখন বর্ষিত হচ্ছে দ্রৌপদীর ওপর, তখনও সমস্ত সভাগৃহ স্তব্ধ। বৃদ্ধ ভীষ্মের কঠিন প্রত্যুত্তর এই সময় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্বনিত হতে শুনে চমকে উঠেছি আমরা। সে কী, ভীষ্মও? তিনিও দোষারোপ করলেন যুধিষ্ঠিরকেই? দ্রৌপদীর সব চোখের জল বৃথা গেল? উপস্থিত আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গও কেউ প্রথম পাণ্ডবের আচরণকে সমর্থন জানালেন না! সহানুভূতি প্রকাশ করলেন না লাঞ্ছিতা সাশ্রুনয়না কৃষ্ণার প্রতি? আর বিদুর? ভিক্ষুবেশী সেই বিচিত্র বুদ্ধিধারী বিদুর? তাঁকেও হেঁটমুণ্ড এবং নীরব দেখলাম কেন? কণ্ঠে তাঁর দুর্যোধনের জন্য অক্ষয় বিষভাণ্ড। কিন্তু এই মুহূর্তে সে ভাণ্ডখানি ভেঙে খানখান হয়ে পড়ল না তো? ভীষ্মের বচনে, কর্ণের কটূক্তিতে তাঁকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে দেখছি। হায় বিদুর! এমত বিপদাপন্ন তিনি বুঝি আর কখনো হননি।

না, ইতিহাস মিথ্যা বলে না। মুমুক্ষু বন্দিনীর মত সে ইতিহাস মহাভারতের কথাজাল সরিয়ে প্রায়ই তার অবগুণ্ঠিত মুখখানি গবাক্ষপথে এনে হাজির করতে চায়। তার সেই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা একমাত্র ইতিহাস-প্রেমিকেরই নজর আকর্ষণ করে, বাদবাকি পথিক তার অস্তিত্ব টেরও পায় না।

ইতিহাসকে বালাপোষ ঢাকা দিয়েছেন যাঁরা ; সেই মূঢ় কথকদের কেউ এবার এগিয়ে আসেন অন্যতর রূপকথার দুর্বল সঞ্চয় নিয়ে। বলেন বস্ত্র হরণের গল্প।

দ্রৌপদীর শাড়ি

অলৌকিকতার মোহাবরণ সৃষ্টি করার জন্য খোদার ওপর খোদকার কোনও অসাবধানী কথক সভাপর্বে একটি ছোট্ট গল্প জুড়ে দিলেন। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য গল্পকথাটিই আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করে চলল আবহমানকাল। শ্রোতৃবর্গ কপালে জোড়াতালু ঠুকে বললেন, আহা, ধর্মের কী সূক্ষ্ম গতি! নাটকে যাত্রায় যুগ যুগ ধরে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্ব দেখে ধর্মের নামে জয়ধ্বনি দিলেন দর্শকগণ। তাঁদের কেউ কিন্তু একবারও খোঁজ করে দেখলেন না, বস্তুতই ব্যাপারটা কী ঘটেছিল।

মহাভারতের সেই গল্পাংশ ঘেঁটে দেখলাম, আমরা কোন্ ছার, যে কথক-ঠাকুরটি ঐ গল্প উপহার দিয়ে গেছেন, তিনি নিজেই জানতেন না, এমন ঘটনা সেদিন আদৌ ঘটেছিল কি না। চার লাইনের গল্প সাজাতে বসে তাই তাঁকে বার বার ঢোঁক গিলতে হল। আসুন, সেই বিখ্যাত এবং ক্ষুদ্রতম গল্পটির গেরো খুলে দেখি, কি ছিল সেই বক্তব্য।

গল্প এই রকম: সভামঞ্চে কুরুবৃদ্ধদের সামনে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করছেন এক রাজপুত্র। সেখানে উপস্থিত আছেন বহিরাগত নৃপবৃন্দ ছাড়াও মহাবীর পাণ্ডবপঞ্চক। তবু সেই অসম্ভব ব্যাপারটি ঘটেছে বলে কথক সোচ্চারে ঘোষণা করলেন। বললেন, কেউ যখন তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন না, অসহায় দ্রৌপদী তখন নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণস্তব সুরু করলেন। কেন তা কথকই জানেন। আমরা জানি, কৃষ্ণ তখন বহু দূর। এবং তিনি আমাদের মতই মনুষ্যমাত্র। কারণ, তখনও পর্যন্ত কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু কথক বললেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান! দ্রৌপদীর করুণ ক্রন্দন তাঁর কানে পৌঁছালে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে সখী কৃষ্ণার নগ্নদেহ আবৃত করার জন্য মায়াবস্ত্রের যোগান দিতে ছায়াবৎ ভেসে এলেন। দ্রৌপদীর স্তব শুনে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণ "প্রাণ প্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন।"

কথক ঠাকুর এখন আর আমাদের নাগালের মধ্যে নেই, না হলে তাঁকে জাপ্টে ধরে প্রশ্ন করতাম, সে কি ঠাকুর? কমলাদেবী যে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। মহাভারতের বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গেও 'শয্যাসন' ছিলেন নাকি? ঠাকুর, আপনি যে নরে ও নারায়ণে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। যদি ব্রহ্মার পরিকল্পনার কথাটি মানতে হয়, তবে বুঝতে হবে, দেবতা নারায়ণের অংশজ ছিলেন কংস ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণ।

আসলে অর্জুন যেমন ইন্দ্রপুত্র, কৃষ্ণ তেমনি নারায়ণ-পুত্র। তা সেই নারায়ণ-পুত্রকে দেবী কমলার পাশে আপনি কোন্ দুঃসাহসে 'শয্যাসন' করালেন, এবং বললেন, বাসুদেব কমলাকে পরিত্যাগ করে দ্রৌপদীর জন্ম হস্তিনাপুরের সভা রঙ্গমঞ্চের উইংসের আড়ালে এসে হাজার হাজার গজ বস্ত্র সাপ্লাই করে গেলেন? না, ঠাকুর, আপনার বক্তব্যে গোলমাল আছে।

আসলে কথক ঠাকুরের দোষ নেই। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আমলের মানুষই নন তিনি, পরবর্তী কালের কথক। চৌর্যবৃত্তি করে সভাপর্বে বস্ত্রহরণ নামক গপ্পোকথাটি জুড়ে দিয়েছেন কৃষ্ণকথাকে ঈশ্বরকথার দ্বারা অলৌকিক দীপ্তিযুক্ত করার 'মহান উদ্দেশ্যে'। আমি নিরুপায়। মহাভারতীয় তথ্যই বলছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ নন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নারায়ণেরই প্রিয়তমা। তাই তাঁকে নারায়ণ বানানো হলে এবং রুক্মিণীর বদলে লক্ষ্মীকে আমদানি করা হলে আমদানিকারকে হয় ভেজালদাতা বলব, নয় বলব, চোর। অবশ্য এই চৌর্যবৃত্তির উদ্দেশ্যটি সাধু, কেননা এখানে জনৈক ইতিহাসপুরুষকে ভগবান বানানোর জন্য গল্প তৈরী করা হয়েছে। কোনো বস্তু অপহরণ করা হয়নি, চুরি করা হয়েছে আমাদের সরল বিশ্বাসী মনগুলি। মন চুরি করাকে কোনো শাস্ত্রে চৌর্যাপরাধে দণ্ডনীয় বলা হয় না।

যাক, যা বলছিলাম। বলছি, মহাভারতে ভারতীয় রাজগণের বংশবর্ণনা আছে আদিপর্বে। যদুবংশবর্ণন কথা খুললেই দেখতে পাবেন, মহাভারতকার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ।" অংশ মানে কিন্তু দেহাংশ বা আত্মার অংশ নয়; অংশ মানে ঔরসজ। অন্তত সেটাই বুঝি, যেহেতু কৌন্তেয়দেরও বিভিন্ন দেবতার অংশ বলা হয়েছে; বলা হয়েছে, কর্ণ সূর্যের অংশ ইত্যাদি। আমরা দেখেছি ধর্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার প্রাকৃতিক যৌনমিলনের দ্বারা কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভসঞ্চারপূর্বক যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের জন্ম দান করেছিলেন। সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর যৌনমিলনের সবিস্তার বর্ণনা মহাভারতেই আছে। স্বয়ং পড়ে নেবেন। অথবা আমার আগের বইটি থেকে ব্যাখ্যাসহ সেই মহামিলন বা বনপর্বের সেই কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যানটির রহস্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে তুলবেন, এখানে তার পুনরালোচনা অপ্রয়োজন। তা এই ধরনের পার্থিব উপায়ে পুত্রোৎপাদনকেই মহাভারতকার অংশজ বলেছেন যখন, তখন অনুরূপভাবে বাসুদেবকেও দেবপুত্র বলেই ধরে নিতে হয়। তিনি স্বয়ং নারায়ণ নন। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর শয্যাসন থাকাও সম্ভব নয়।

অবশ্য তর্ক আপনিও একটা তুলতে পারেন। বলতে পারেন, অংশজ-র এই ব্যাখ্যা না হয় বোঝা গেল; বোঝা গেল, কারণ স্বয়ং মহাভারতকারও ঐ রকমই বুঝিয়ে গেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি দেবীর অংশে কোনো মানবীর জন্মকথা বলেছেন সেখানে ব্যাখ্যা কি? বস্তুত এ এক ঘাড়-চাপা যুক্তি। স্বীকার করি, ব্যাখ্যা সহজ নয়। ব্যাখ্যা নেই মহাভারতকারের এই কথায় যে, "রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন।" অথবা তাঁর অপর বাণী, "ইন্দ্রের আদেশানুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান বাসুদেবের পরিগ্রহ (পত্নী) হয়েন।" কিম্বা কথা: "সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। ব্যাখ্যা যখন নেই তখন তুলনামূলক আলোচনার শরণ নিতে হয়।

দ্রৌপদী যে ব্রাহ্মণকন্যা; হিমালয়ের দেবসেনাধিনায়ক শঙ্করের আদেশে তাঁকে যে দ্রুপদ রাজগৃহে দেবতারা প্রেরণ করেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে এ আলোচনা আগেই করেছি। যদুবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে মহাভারতকার আবার অন্য কথাও বলেছেন। বললেন, "দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন।" নিশ্চয় আবার করে বলতে হবে না যে, দ্রৌপদী আদৌ দ্রুপদকুলে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁকে যুবতী অবস্থায় যজ্ঞস্থলে প্রেরণ করা হয়েছিল আর সে ঘটনা যখন ঘটে তখন শচীদেবীর প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়নি। তাছাড়া শচীদেবী হলেন ইন্দ্রপত্নী। তিনি ঈশ্বরী নন, দেবী। আর দেবতা ও দেবীরাও ছিলেন দেহধারী নরাকার প্রাণী। জন্মমৃত্যুর অধীন। পৃথ্বীমানবের চেয়ে বেশি যা তাঁদের ছিল, তা হল উড়ন্ত আকাশযান, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা, অত্যুন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি। সেই দেববাহিনীর শাসক ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর এমন কোনও যোগবল ছিল না যার দ্বারা তিনি তাঁর অংশজা তৈরী করে থাকতে পারেন। তাছাড়া এই গল্প এই বংশবর্ণনকথাতেই অকস্মাৎ শ্রুত, অন্যত্র অন্য গল্পেরই চল। সুতরাং এটাই বুঝি যে, যা মহাভারতের কবিরা বলেন তা-ই বেদবাক্য নয়। তাতে ভেজালের মাত্রা কল্পনাতীতভাবেই বেশি। যেমন রুক্মিণী তেমনিই কুন্তী মাদ্রীকেও দেবী বানানোর দরকার হয়েছে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের দেবত্বকে আটেঘাটে বেঁধে ফেলার উদ্দেশ্যেই, তার অন্য উদ্দেশ্য নেই। আরও একটা আষাঢ়ে গপ্পো, ঐ ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণপত্নীর দেবীত্ব। হিমালয়ের বদরিকা অঞ্চলে ষোল হাজার দেবীকে দূর গ্রহলোক থেকে এনে জড়ো করা বেশ কঠিন কাজ নয় কি? যদি দেবতারা অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে থাকেন তবে পৃথ্বীলোকে আসার সময় লাখোকন্যা সঙ্গে এনেছিলেন এমন কথা ভাবতে বেশ বেগ পেতে হয়।

নিজগ্রহের অত নারী সঙ্গে থাকলে তাঁরা পৃথ্বী নারীদের সঙ্গে প্রবাসী পুরুষের মত সহবাসে প্রবৃত্ত হবেনই বা কেন? বাইবেল বললেন, দেবদূতেরা পৃথ্বী কন্যাদের সুন্দরী বিবেচনা করিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।[১] বাইবেলীয় পয়গম্বর এনখের রেখে যাওয়া বিবরণে জানতে পারলাম, দেবদূতদের অধিনায়ক দেব-মানবী মিলনে বিশেষ বিরক্ত হয়েছিলেন।[২] তাই বুঝতে হয়, ষোল হাজার কৃষ্ণ-বাঁদীরও দেবীদের অংশে জন্মগ্রহণ শুধুমাত্র গল্পকথায় নির্ভেজাল কল্পকথা মাত্র। মহাভারতকারের সব কথা 'টু দি পয়েন্ট' গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা যায় না। তা করতে হলে বোকার মত বিশ্বাসী হওয়া ভিন্ন অন্য পথ আর থাকে না।

কৃষ্ণের পক্ষে স্বয়ং নারায়ণত্ব লাভের পথে অন্যান্য বাধাও আছে। সে অনেক তর্ক ও যুক্তির পাহাড়। পরবর্তী অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, তার বেশি সুযোগ এখানে নেই। তর্কের দ্বারাই ঈশ্বরকে ধরা যেতে পারে। কেননা তিনি আমাদেরই মনপদ্ম থেকে নিত্য জায়মান। মানুষই ঈশ্বর ভাবনার স্রষ্টা। ঈশ্বর নিজে এসে মানুষকে তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন-নি। স্বয়ং ঈশ্বরোবাচ বলে আমরা আদিকাল থেকে যা কিছু জেনেশুনে আসছি, আমরাই আবিষ্কার করেছি, সেইসব ঈশ্বরবাণী মনুষ্যকণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল। তাই গীতা গ্রন্থটি অধুনা আর স্বয়ং ঈশ্বরসৃষ্ট বলে গণ্য হয় না, পণ্ডিতজন বুঝে ফেলেছেন, গ্রন্থটি মনুষ্য-লিখিত এবং মহাভারতের ইতিবৃত্তে একদল মতলবী কৃষ্ণভক্তের দ্বারা সংযোজিত। একটি বাস্তব যুদ্ধকথাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে 'গীতা' গ্রন্থটিকে সেখানে আচমকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দলবিশেষের মতলব হাসিলের জন্য আজ ইনি, কাল তিনি, ঈশ্বরের মহান আসনটি জবর-দখল করেছেন। ফলে এক ঈশ্বর বহু হয়েছেন। তাঁরও জাত-বেজাত, ভাষা পোশাক, দেশবিদেশ এবং শত্রুমিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। মহান ঈশ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেছেন।[৩]

নারায়ণকে যদি হিন্দুদের কল্পিত ঈশ্বর বলে এখানে গণ্য করি (অধুনা তিনি তাই হয়েছেন) তবে দেখব, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বানাতে বহু বচনযুক্ত একাধিক পুরাণকথা রচনা করতে হয়েছিল। আগেই বলে রাখি, যে নারায়ণের মাপে কৃষ্ণকে মাপতে যাচ্ছি, ধরে নিচ্ছি, তিনি বদরিকা অঞ্চলে বদরিকা ফলসেবী কোনো দেবতা নন; একম এব অদ্বিতীয়ম ঈশ্বরকেই বর্তমানে নারায়ণ নামে পুজো করা হয়। তার মানে তাঁর জন্ম কর্ম, বংশতালিকা, বাসস্থান, জাতি, ভাষা ও ঠিকুজীকুষ্ঠী আমাদের জানা থাকার কথা নয়। জানলে তাঁকে ঈশ্বরের

আসন থেকে নড়া ধরে টেনে নামিয়ে দেব। যে ঈশ্বরের জন্ম কর্ম ও কোষ্ঠী আমরাই তৈরী করতে পারি, তাঁকে আর ঈশ্বর বলে খাতির করতে যাব কেন?

মহাভারত ও পুরাণে কিন্তু কৃষ্ণের জন্ম কর্ম জাতি ও বাসস্থানের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত আর্য জাতি গোষ্ঠীর অন্যতম যদুদের রাজধানী ছিল মথুরায় যা প্রাচীন মানচিত্রে শূরসেন নামে প্রসিদ্ধ। যদুরা চন্দ্র বংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতির বংশধর। আবার তিনি বৃষ্ণিকুলেও জাত। রাজা উগ্রসেন ছিলেন মথুরাধিপতি। তিনি বৃষ্ণিবংশীয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদুও বটেন আবার বৃষ্ণিও বটেন। "যদু ও বৃষ্ণি একই জাতি, কিম্বা যদু নামক একটি প্রাচীনতর জাতির শাখা বৃষ্ণিবংশ।"[৪] বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিকতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ডঃ রায় চৌধুরী (এইচ. সি.) যদুবংশের ঐতিহাসিকতা, প্রসার এবং বিভিন্ন শাখায় বিভক্তির কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমরা বার বার বলেছি ও বলছি যে, মহাভারতের কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর তো ননই. তিনি দেবতা বিষ্ণু-নারায়ণও নন। কৃষ্ণ এক ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁর জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের মানুষ।[৫] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কালও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ থেকে নবম শতকের মধ্যে ধরা হয়। মধুর রসের বংশীধারী কৃষ্ণ দার্শনিক কল্পনার সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা হলেও ধনুর্ধারী মহাভারতের কৃষ্ণকে বহু পণ্ডিতই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেই গণ্য করেন।

তাহলে কি বুঝলাম?

বুঝলাম, নারায়ণ যতক্ষণ হিমালয় শিবিরের দেবগণের একজন, ততক্ষণ তিনি সামান্য এক ভিন্‌গ্রহবাসী বুদ্ধিমান নভশ্চর মাত্র। পরবর্তীকালে মহেশ্বরের মত তিনিও পরমেশ্বরপদে উন্নীত হয়েছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ হয়েছেন বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। বেদে নারায়ণের মর্যাদা-পজিশন বড় একটা ছিল না। পৌরাণিক যুগেই তাঁর ভাগবৎ প্রতিষ্ঠা। মহাভারতের কৃষ্ণ ও নারায়ণকে আমাদের পূজ্য ঈশ্বর অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালক রূপে গণ্য করতে হলে ইতিহাসকে ধর্মগ্রন্থ ভেবে সেই চতুর পুরোহিততন্ত্রের শাসন শোষণকে অবনত শিরে মান্য করতে হয়। পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হয়ে শরণ নিতে হয় একটি বিজয়ী গোষ্ঠীর কয়েকজন কর্তাব্যক্তির পাদপদ্মে, যে পদভারে ভারতবর্ষ যুগ যুগ নিষ্পিষ্ট হয়ে এসেছে।

মহাভারতের ব্রহ্মা বিষ্ণু (নারায়ণ) শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে একদল যুদ্ধবাজ ও ধান্দাবাজ বুদ্ধিমান নভশ্চর হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নির্বাসিত

করলেও কি ভক্তজন বিশেষ কিছু হারাবেন ? হারিয়ে যাবেন কি পরমেশ্বর ?" না, বরং উল্টোটাই হবে। মানুষের ঈশ্বর-ভাবনাকে গায়েব করে একদিন যে মতলববাজরা বিভিন্ন নামে ঈশ্বর সেজে বসেছিলেন, তাঁদের সনাক্তকরণের ফলে আমরা সত্যকার একম অদ্বিতীয় সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্তার স্বরূপ অনেক পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করতে পারব। ইন্দ্র ব্রহ্মা বরুণাদি দেবতাদের বিসর্জন দিয়ে যদি কেউ না ঠকে থাকি, তবে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে বিচার করলেও কোনো ভক্তজনেরই নরকবাস বিধির লিখন হয়ে দাঁড়াবে না। মহাভারতের গল্পগুলির 'অলীক কুকাব্য' ভালো করে বুঝলে বিস্মৃত অতীতকেও সঠিক চিনতে পারার সুযোগ ও আনন্দ লাভ করব আমরা। দেবগণ যে ঈশ্বর নন, তা তাঁদের 'লোকপাল' আখ্যা দিয়েই তো প্রমাণ করা হয়েছে। সেই দেবতাদের ভাঙিয়ে এক জাতের যে গুরু পুরোহিত সম্প্রদায় মানুষকে যুগ যুগ ঠকিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রবঞ্চনাকেও এড়িয়ে যেতে পারব আমরা যদি সাদা চোখে সবকিছু দেখতে চেষ্টা করি।

কথা হচ্ছিল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ গল্পটির অলীক অলৌকিকতা নিয়ে। দেখা গেল, সামান্য মনুষ্য কৃষ্ণের পক্ষে কুরুসভায় এসে দ্রৌপদীর দেহকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না।

কথক ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে হাজার গজ শাড়ির যোগানদার বানিয়েছেন। কিন্তু তাই যদি হয় তবে আবার তাঁকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ আর একটি গল্প সাজিয়ে দিতে শুনলাম কেন ? ঐ শুনুন, একই গল্পকার কৃষ্ণের আগমন বার্তা জানানর সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন, "মহাত্মা ধর্ম অন্তর্হিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন।" অর্থাৎ স্বয়ং কথকেরই মনে সংশয়। তিনি জানেন না, বস্তুত শাড়ির যোগানদারটি কে, কৃষ্ণ, না ধর্ম ? একবার কৃষ্ণ বলেই আরবার ধর্মের কথা ! কৃষ্ণকে কিন্তু কোথাও ধর্ম বলা হয়নি। ধর্ম হলেন বিদুর। আর ধর্মরাজ যখন পাহাড়ে পাহারদার, তখন যম। তাহলে একবার নারায়ণ, তারপর কৃষ্ণ, পরিশেষে মহাত্মা ধর্ম—এঁদের মধ্যে কোন্ মহাপ্রভু ম্যাজিক দেখালেন ? কোনো ব্যাখ্যা নেই। এক-ফের কাপড়ের টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গেই কথক বললেন, "সকলে সবিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখিয়া ধর্মের মহিমা উপলব্ধি করিলেন।" অর্থাৎ ব্যাখ্যা নয়, সুরুতেই যবনিকা পতন। ড্রপ সিন ফেলে দিলেন মহাভারতের স্বল্পতম মুহূর্তে অভিনীত এই ছোট নাটকের নাট্যকার। তাঁর ধারণা, তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

ধর্মকথা অনেক শুনলাম। এবার আসল কথায় আসা যাক।

যবনিকার অন্তরালে হঠাৎ আবির্ভূত ধর্ম যখন অপস্রিয়মাণ কুয়াশার মত সরে গেলেন, সভামঞ্চ তখন আর একবার পরিষ্কার হয়ে উঠল। দ্রৌপদীকে পণ রাখার জন্য, আমরা দেখলাম, সমগ্র সভামণ্ডপ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে উঠেছেন। মহাভারত বলেছেন, "সভাসদ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"

অন্যদিকে যখন দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যজ্ঞসেনি; এক্ষণে তুমি ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন।" বলিলেন, "তাঁরা নিজেরাই যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করে তোমাকে দাসীত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করুন না কেন? সকলেই তোমার দুঃখে কাতর হয়েছেন। কিন্তু তোমার নীরব প্রস্তরবৎ স্বামীদের মৌনীভাব লক্ষ্য করে কেউ-ই কিছু বলতে পারছেন না। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তা তিনিই বলুন না, কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত। খামকা আমাদের দোষারোপ করো কেন?" তখন কুরু যুবরাজের সেকথায় সেই একই সভা দুর্যোধনকে "ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

বস্তুতই তো তিনি প্রশংসার্হ। দ্রৌপদী কম গালিগালাজ করেননি কুরুপিতাদের, তবু কী ধীর স্থির রাজকীয় বচন দুর্যোধনের! বললেন তিনি, যুধিষ্ঠির যা বলবেন, তৎক্ষণাৎ এই সভা তা "প্রতিপালন করিবেন।" কিন্তু ভণ্ড ধর্মাত্মা কোনো কথাই বললেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি জবরদস্তি একটা গোলমাল পাকাতেই চাইছেন। চাইছেন, কুরুপক্ষ সেই পাতা ফাঁদে পা দিলেই চারিদিকে হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলবেন তাঁর সমর্থকগণ। সেটাই তাঁর অভিপ্রায়। দেখলাম, কয়েক মুহূর্ত আগেই যে ভীম প্রথম পাণ্ডবের ওপর রুষ্ট হয়ে তাঁর হাত পোড়াতে চেয়েছিলেন, অর্জুনের দ্বারা শাসিত হয়ে তিনিও চৈতন্য লাভ করেছেন। বুঝে ফেলেছেন, পাশায় হারাটাই অগ্রজের অভিপ্রায়, গোলমালই চান ধর্মনামক দেবতারা। তাই এবার ভীম বললেন, "পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি।" তারপরই চলল কুরুবধের প্রতিজ্ঞা;— ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। কিন্তু তত্রাচ ভীম ভীমই; তিনি অপরাপর পাণ্ডবদের মত কুটিলবুদ্ধি নন। অনার্যসুলভ মনোবিক্ষোভ তাঁর মাঝে মাঝেই দেখা যায়। তিনি এর পরও বার দুই দাদাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পণে-আবদ্ধ-পাণ্ডবদের মুক্তি দেওয়ার পর সক্ষোভে বললেন, "স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল।"

এর পর অনুদ্যুত পর্বাধ্যায়টি আরও চমকপ্রদ। পাশাপণে সর্বস্ব-খোয়ানো

যুধিষ্ঠিরকে দেখা গেল পুনরায় সেই শকুনির সঙ্গেই দ্যুতক্রীড়ায় বসতে। এই অনুদ্যূত পর্বের সিদ্ধান্তানুসারেই পাণ্ডবরা তের বছরের জন্য বনবাসে গেলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক দিক থেকে পর্বটি নিশ্চয়ই প্রথম পাশক্রীড়াসভা অপেক্ষা গুরুতর। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, বাক্যবিস্তারে অবাধ উদার মহাভারত কথকবৃন্দ অনুদ্যূতপর্বটিকে যেন ফিস ফিস করে উচ্চারণ করলেন মাত্র। যেন সব খেলা ঘটে গেল নেপথ্যে। আমরা শুধু শুনতে পেলাম, দুর্মতি দুর্যোধনের প্রতি অভিসম্পাত দিগ্‌বিদিকে নিনাদিত হচ্ছে এবং পাণ্ডবরা ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রান্ত হলে কে কোন্ কুরু বীরের প্রাণনাশ করবেন আঙুল মটকে মটকে তারই প্রতিজ্ঞা করছেন। এখানেও বলা হল, শকুনি শঠতা করে পাশায় জিতেছেন। তাই প্রশ্ন জাগে, কথকের এই সতর্ক বাক্‌সংযমের কারণ কি? প্রশ্ন জাগে, যদি শকুনি বাস্তবিকই অধার্মিক খেলোয়াড়, তবে 'পরম ধার্মিক' যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় দফা তাঁর সঙ্গে ছকে বসলেন কেন? যে মহোদয়বৃন্দ জাতি ও শ্রেণী বিচার করে সুবিধামত যুদ্ধ করেন এবং করেন না (কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের আচরণ স্মরণীয়) যাঁরা অতর্কিত আক্রমণে খাণ্ডববন দগ্ধ করেন, গোপনে অনার্য বীর একলব্যের শক্তি অপহরণ করে আনেন; জরাসন্ধ, কীচক ও শিশুপালকে নিরস্ত্র ও অসহায় অবস্থায় গোপনে বধ করতে যাঁদের ধর্মের ধ্বজা লজ্জায় অবনমিত হয় না; যে পাণ্ডবমাতা কুন্তী নিজে প্রথমা পত্নী হয়েও স্বামীর সঙ্গে সপত্নী মাদ্রীকে সহমরণে পাঠিয়ে রাজ্যসুখ ভোগবাসনায় হস্তিনাপুরে ছুটে আসেন; যিনি অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়ে এক অনার্য রমণীকে তাঁর পঞ্চপুত্রসহ জতুগৃহে জীয়ন্তে দগ্ধ করার চক্রান্ত করে নিজের ছেলেপুলে নিয়ে পালিয়ে যান এবং যাবার সময় সেই নিদ্রিতা অনার্য অতিথিগণকে জতুগৃহে বদ্ধ করে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে যান; যিনি বিপদকালে পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণের কাছে ছুটে যান আদরের দুলাল অর্জুনের প্রাণভিক্ষা করতে এবং সেখানে ব্যক্ত করেন তাঁর কুমারী অবস্থার লজ্জার কাহিনী; সেই এক স্বার্থসন্ধানী রাজনীতি-সচেতন মহিলার পুত্র যুধিষ্ঠির কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাশাখেলায় স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে বনবাসী হতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন? মুখে ধর্মবুলি, অন্তরে রাজ্য লাভের জন্য সর্বদা কু-অভিসন্ধি, এই খল-চরিত্রের ধূর্তমূর্তিই তো যুধিষ্ঠির; তা এতই যাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি তিনি যখন ধর্মের নামাবলী গায়ে সকল দুষ্টবুদ্ধি গোপন করে ন্যাকা সাজেন, তখনও কোন্ অজ্ঞানতাবশত আমরা তাঁর সেই ক্লেদাক্ত পদযুগে মুখ ঘষি পুণ্য লাভের লালায়িত অভিলাষে?

পাঠক, এ সব প্রশ্নের জবাব তো আমরা আগেই পেয়েছি। অনুদ্যূত

পর্যাধ্যায়ে দেখলাম, পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠাতারা নতুন গল্প ফাঁদলেন। উদ্দেশ্য, কুরুকুলের চরিত্র-হনন করে ভারতবাসীকে তাঁদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। উদ্দেশ্য, ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে পাণ্ডবদের সাবধানে খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং যাবার সময়ও পাণ্ডবদের সেই মতলবী পলায়নের দায়দায়িত্ব দুর্যোধনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে রাজ্যলোভী বানিয়ে অগণিত দেশবাসীর মনে তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব বপন করা। তবু, তত্রাচ এবং এতৎ সত্ত্বেও আজও দুর্যোধন-পূজারীর দল টিঁকে আছেন। প্রত্যেক মহাভারত পাঠকের মনে তবুও শত শত বর্ষ পাণ্ডববিরোধী মনোভাব গোপনে লালিত হয়ে আসছে। ব্যর্থ হয়েছে আর্যদের সেই অপপ্রচার।

অনুদ্যূত পর্বে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য গল্প হল গান্ধারীর উল্লেখ। অতবড় মহাভারতে তিনিই সবচেয়ে কম উল্লিখিত। যতটুকু তাঁকে বোঝা যায়, তাতে মনে হয়, তিনি ছিলেন পতিগতপ্রাণা এক সাধ্বী রমণী। রাজনীতির কুটিল আবর্ত থেকে দূরে সরে থাকতেন রাজমহিষী। কুন্তীর পাশে গান্ধারী এতই মহান যে মনে হয় তিনি যেন রক্ত-মাংসের লোভশোকপরায়ণা চতুর রমণীর পাশে এক ধ্যানমগ্না যোগিনী মূর্তি; যাঁর হৃদয় নিরুদ্বেগ, যিনি সংসারে সন্ন্যাসিনী। পাণ্ডব প্রচারক বহু পরিশ্রমে যখন গলদ্ঘর্ম, কিছুতেই গল্পের মধ্যে দুর্যোধনের সত্যরূপ সম্পূর্ণ গায়েব করতে পারছেন না; বারম্বার তাঁকে পাপিষ্ঠ বলেও জনমানসে পারছেন না সামান্যতম রেখাপাত করতে; ভীম দ্রোণ কৃপ বলরাম প্রমুখ তো বটেই, পাণ্ডবমাতুল শল্যসহ ভারতের অধিকাংশ এবং প্রায় সকলেই যখন দুর্যোধন পক্ষে, তখন নান্যোপায় কথক স্বয়ং গান্ধারীকে সাক্ষী মানালেন। সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের সাক্ষ্যের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্ সাক্ষ্য আছে?

গান্ধারীর মুখে সুতরাং তিনি একটি বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। সে বক্তৃতায় নতুন কোনো কথা নেই; নেই মাতৃহৃদয়ের হতাশা বা ক্ষোভ, নেই প্রিয়পুত্র দুর্যোধনের জন্য একবিন্দু আশীর্বাদী অশ্রু; সে বক্তৃতা বিদুর বচনেরই কার্বন কপি। আমাদের শোনানো হল সেই টেপকরা কথামালা। অক্ষম গল্পকার একটি বার ভেবে দেখলেন না, মাতৃকণ্ঠে আরোপিত হলেও একই গালিগালাজ ও পচাগলা ধর্মবচন বিবেচক মনকে আর স্পর্শ করছে না। তাই তো আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, মহাভারত পাঠকদের খুব কম জনেই সে বক্তৃতাটি মনে রাখেন। কিন্তু বস্তুতই যদি তা মাতা গান্ধারীর হৃদয়মথিত বেদনার বাণী হত, আমাদের স্মৃতিপথে তাহলে কি তা চিরঅক্ষয় আখরে লিখিত হয়ে যেত না? পাঠক, এই

মিথ্যাচার, মায়ের মুখের কথা হিসেবে সেই অশ্রদ্ধেয় বানানো-বচন যে গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়, আমি আর তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করতে পারি না। পারি না ভাবতে, মাতা গান্ধারীও কুচক্রী বিদুরের মতো অকম্পিত কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র পরিত্যাগের মন্ত্রণা দান করবেন একই ভাষায়। যদি তিনি বলতেন, এক পুত্র পরিহার করে, হে রাজন, তুমি রক্ষা কর আমার অপর নিরানব্বইটি সন্তানকে! রক্ষা কর, অগণিত ভারতবর্ষীয়গণকে তাহলে তবু একবার থমকে ভাবতাম, দ্বিতীয়বার পাঠ করতাম পুণ্যশীলা রমণীর সেই আবেদন। অসাবধানী কথক কিন্তু সেই স্বাভাবিক কথাটিও গান্ধারীর মুখে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেননি। তাঁর এই অক্ষমতাই প্রমাণ করে তিনি সত্য কথা যথাযথ শ্লোকবদ্ধ করে যাননি।

গান্ধারীকেন্দ্রিক গল্পটির পরেই মহাভারতীয় রীতিতে কোনো দীর্ঘ প্রস্তাবনা না করেই সুরু হল দ্বিতীয় দফা দ্যূত ক্রীড়া। শকুনি ও যুধিষ্ঠির পরস্পর বনবাস অঙ্গীকার করে খেলায় বসলেন। শর্ত হল, পরাজিত পক্ষ বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে ফের বিজয়ীপক্ষের কাছে গচ্ছিত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হবেন যদি না অজ্ঞাতবাসে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেন। খেলার আগে শকুনি দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্ত ব্যাখ্যা করে বললেন, "বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন পণ অবধারিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন।..."

ভাষার মধ্যে কেমন যেন এক ক্ষীণলক্ষ্য চাতুরীর আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে না? শকুনি বলছেন, "এক মহাধন পণ অবধারিত হইয়াছে," অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না শর্তটি কোন্ পক্ষ আরোপ করেছেন। কথায় কর্তা উহ্য। যেহেতু শকুনির কণ্ঠে প্রস্তাবটি সভামধ্যে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, সেজন্যেই কি ধরে নেব, শর্তটি কুরুপক্ষই এক তরফা ভাবে আরোপ করেছিলেন? কিন্তু তেমনভাবে বিবেচনা করার কী সত্যিই আমরা অধিকারী? দুর্যোধনের দোষ যে-কথকবৃন্দ খুঁটে খুঁটে উচ্চারণ করেন এবং সুযোগ পেলেই বানানো গল্পের আসর জমিয়ে তোলেন, তাঁরা এতো তড়িঘড়ি এতো অস্পষ্টভাবে এতোবড় বিষয়টি উত্থাপন ও সমাপন করলেন কেন? এমন কিছু প্রেস-পাবলিশারের তাগিদ তো তাঁদের ছিল না। কাহিনী যে হঠাৎ শেষ করতে হবে কৈ সভাপর্বের পরবর্তী দীর্ঘকলেবর পর্বগুলির দিকে তাকিয়ে সেকথা তো বলা যেতে পারে না। তবে অত ত্বরা কেন? তবে কি কোনো সত্য গোপনের জন্য এমন দুরন্ত ঘোটকগতি এই পর্বে ঘটে গেছে?

আসুন, তাহলে পরবর্তী ধারাবিবরণীটাও লক্ষ্য করা যাক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ। এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্মভয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

মহাশয়, আবার আর একটি মিথ্যা কিন্তু সুস্পষ্ট-ভাবেই ধরা পড়ে গেল। বলা হয়েছে, 'বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্মভয়ে' যুধিষ্ঠির খেলতে বসলেন। কিন্তু কী জন্য তাঁর লজ্জা? লজ্জার কারণ তো কিছুই ঘটেনি। যে লোকপ্রবাদের কথা বলা হয়েছে, দু ছত্র আগেই সেই লোকপ্রবাদকে আমরা এইভাবে পাঠ করেছি: মহাভারত বলছেন, সভাস্থ সভারা কুরুপক্ষকে অক্ষক্রীড়ার জন্য ধিক্কার দিলেন। তাহলে? পুরোহিত স্নেহধন্য মহাশয় যুধিষ্ঠিরের লজ্জার কারণ ঘটিল কেন? ধিক্কার তো তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়নি। তাহলে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে?

সত্য একটাই। তা হল, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল ঐ ত্রয়োদশ বর্ষের বনবাস। আর সেজন্যই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' পন্থায় ছোট্ট করে বলা হল, "কুরুবংশীয়দের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া পুনর্বার (যুধিষ্ঠির) দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

অর্থাৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কুরুবংশ ধ্বংসের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করার পরেই যুধিষ্ঠির নাছোড়বান্দা হয়ে দু'দুবার পাশা খেলায় বসেছেন ও স্বেচ্ছায় সে খেলা হেরেছেন। বনবাসের শর্তটি যে পাণ্ডবপক্ষই কারো মাধ্যমে উত্থাপিত করেননি তাও আমরা কি এখন হলপ করে বলতে পারি?

অতঃ কিম্?

অতঃপর পাণ্ডবরা কুরুপক্ষীয় বীরগণের কাকে কেমনভাবে বধ করবেন, সেই সব প্রতিজ্ঞা দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। মনে হয়, এই অংশটিও পরবর্তী সময়ে অনুদ্যূতপর্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কেননা যুদ্ধটা যখন দেবতারাই করবেন এবং সে যুদ্ধে পাণ্ডবরা থাকবেন তাঁদেরই পরিচালনাধীন তখন পাণ্ডবদের পক্ষে অমন বীরত্ব প্রকাশ করে আস্ফালন করা সম্ভবপর ছিল না! তাঁরা তো ক্রীড়নক মাত্র। বরং বোঝা যায়, যুদ্ধের ফলাফল যেমন হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে পাণ্ডবদের সম্পর্কে কিছু অলৌকিক মোহ কথকরা বিস্তার করেছিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এইসব মারাত্মক আস্ফালন যেন শুধু নেপথ্যেই ঘটে গেল, সভায় তার কোনরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মহাভারত

কথক মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। পাণ্ডব ভিন্ন আর কারও উপস্থিতি বা কণ্ঠস্বরের খবর আমরা পেলাম না। পাণ্ডব প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পাত এবং পাণ্ডব প্রস্থান পর্বের সুরু। কিন্তু অমন সব মারাত্মক প্রতিজ্ঞার পর কি চুপচাপ সভা ভঙ্গ হতে পারে? ব্যাপারটা নিছক বানানো গল্প মনে হয় না কি? দেখুন, আস্ফালন পর্বের পর ধর্মভেকধারী যুধিষ্ঠির কারো প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ না করে প্রবাসযাত্রার যাত্রীর মতো কেমন শান্তভাবে সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছেন এবং কুরু পরিবারও আসন্ন বিনাশের সংবাদ শোনার পরেও কত স্বচ্ছন্দভাবে বিদায় দিচ্ছেন তাঁদের। এটা কী আদৌ সম্ভব? যাঁরা কুরুবংশ ধ্বংস করবেন প্রতিজ্ঞা করে বিদেশ যাত্রা করছেন, কুরুগৃহে তাঁদেরই জননী কুন্তীদেবী নিশ্চিন্তে থেকে যান কী করে? দেখলাম কুন্তীদেবী তাঁর পরম বিশ্বস্ত (এবং হয়ত প্রণয়াসক্ত) ক্ষত্ত দেবর বিদুরের গৃহেই থেকে গেলেন।

সুতরাং আমরা বলতে বাধ্য, পাণ্ডব প্রতিজ্ঞা পর্বটি যুদ্ধপরবর্তীকালের রচনা এবং কথকরা সেটি চালাকি করে এইখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। বলব. গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাণ্ডবরা স্বেচ্ছায় বনগমন করেন। সেটা কুরুপক্ষের কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না। বলব, দ্রৌপদীর শাড়িও কৃষ্ণ যোগান দেননি। তিনি সামান্য ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁর স্বরূপটির এবার একটু খোঁজ নেব।

১। দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা॥ বীরেন্দ্র মিত্র দ্রঃ॥

২। প্রাক প্লাবন যুগের পৃথ্বীমানব এনখকে তাঁদের মহাকাশযানে চাপিয়ে দেবতারা মহাকাশে নিয়ে যান। স্লাভ ভাষায় রচিত পুঁথিতে নভশ্চর দেবতাদের সঙ্গে এনখের পরিচয়, বাক্যালাপ এবং তারপর মহাকাশ ভেলায় তুলে তাঁকে দেবাধিনায়কের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মহাকাশ থেকে নেমে-আসা সেই নভশ্চর দেবদূতেরা পার্থিব রমণীদের সঙ্গে সহবাসে সেকালে অগণিত শিশুর জন্মদান করে গেছেন। দু'শজন দেবদূত জন্ম দেন হাজার শিশুর। সেই প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ দেবাধিনায়ক এনখকে যা বলেছিলেন এনখ পুঁথিতে তা নথিবদ্ধ আছে। বলেছিলেন: "তুমি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে স্বর্গীয় পুরুষদের (যাঁরা সেখানে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছেন) বোলো, আপনারা অমর ছিলেন, কিন্তু মানবীর রক্তে নিজেদের অশুচি করেছেন, মরণশীল নশ্বর মানুষের মত ব্যবহার করে রক্তে ও মাংসে তাদের গর্ভে সন্তান দিয়েছেন। মানুষের রক্তে-মাংসে কামাসক্ত হয়ে মরণশীল মানুষের মত রক্ত-মাংস উৎপন্ন করেছেন।"--এনখ গ্রন্থের চমৎকার ব্যাখ্যা করে এরিক ফন দানিকেন উল্লিখিত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এ অভিযানে (অপর গ্রহলোক থেকে পৃথিবীতে আগমনের অভিযানে) নারীহীন এসে দৈহিক সুখের ব্যবস্থা তাদের (নভশ্চরদের) করতেই হয়েছিল। তাদের ভাবটা ছিল, তারা যেন সব দখলদার সৈন্য।"—প্রমাণ/এরিক ফন দানিকেন/অনু: অজিত দত্ত/ব্র্যাকেট আমার॥

৩। মার্ক্স এঙ্গেলসের সময়ে মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতি হয়নি। গ্রহান্তরের উন্নত-প্রাণীরা যে পৃথিবীতে অবতরণ করে মানুষের দেবতা সেজে বসতে পারেন, এমন অনুমিতি সেদিন বিজ্ঞানী-মনকে আলোড়িত করেনি। গবেষণাও সুরু হয়নি তাই নিয়ে। তবু পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে বর্ণিত দেব-ভূমিকা লক্ষ্য করে এঙ্গেলসেরও মনে হয়েছিল, "...The Gods thus fashioned within each people National Gods whose domain extended no further than the national territory which they were to protect; on the other side of its boundary other Gods held indisputed sway."—Engels.

৪। হিন্দুদের দেবদেবী। উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥

৫। কৃষ্ণকথা বিরাট পর্ব থেকে ঘনঘন উচ্চারিত হলেও তাঁর জন্মকথার বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পুরাণকারদের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। কৃষ্ণকথা আনুপূর্বিক বিবৃত না হওয়ায় এই আশ্চর্য ব্যতিক্রম যুধিষ্ঠিরানুরাগী বিদগ্ধ কবি বুদ্ধদেব বসুকেও সপ্রশ্ন করেছিল। তিনি লিখেছেন, "মহাভারতের সব প্রধান পুরুষের জীবনকথা জন্ম থেকে আনুপূর্বিক বিবৃত হয়েছে—শুধু কৃষ্ণ-কাহিনীতে কবি যেন ইচ্ছে করেই অনেক শূন্যস্থান রেখে দিয়েছেন। এই ভারত-ইতিহাসের বহু বঙ্কিম অগ্রসরণের মধ্যে কৃষ্ণের উত্থান কেমন করে ঘটলো, ব্যাসদেব তার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেননি।" বুদ্ধদেববাবু অবশ্য এই ব্যতিক্রমটি উল্লেখ করলেও তার বাস্তবসম্ভব কারণ অনুসন্ধান করেননি। আমাদের সেই অস্বস্তিকর কাজটি করতে হচ্ছে। কেননা কৃষ্ণ চরিত্রকে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহাভারতকারকে যত গল্প রচনা করতে হয়েছে, সেগুলির চাপে বহু সত্য শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। আমরা সাবধানে এখন সেই ফসিলগুলি উদ্ধার করব।

পরমেশ্বরকে হটিয়ে তাঁর স্বর্গরাজ্যের দখল নিয়েছিলেন বুদ্ধিমান বহিরাগত দেবতারা। তবে সেই নকল পরমেশ্বরদের এজন্য পরিশ্রম কম করতে হয়নি। দীর্ঘকালের চেষ্টায় মর্ত্যবাসীর বশ্যতা আদায় করতে হয়েছিল তাঁদের। জাল জোচ্চুরি, অন্যায় অধর্ম, অত্যাচার অবিচার এবং নির্বিচার খুন জখমের শেষে যখন তাঁরা কায়েম করলেন তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থা, কোন্ এক অজানা কারণে ঠিক তখনই তাঁদের চলে যেতে হল এই নীল গ্রহের মায়া কাটিয়ে। শুধু হিমালয়ের অপূর্ব সুন্দর পার্বত্য উপত্যকা থেকেই তাঁদের আকাশ রথগুলি সগর্জনে মহাকাশের অসীম নীলিমায় ভেসে পড়েছিল এমনও নয়; পৃথিবীর অন্যান্য পুরাণের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায়, দেবতারা হঠাৎ-ই নক্ষত্রখচিত মহাকাশ-পথে অদৃশ্য হয়ে যান। ভারত ভূখণ্ড থেকে মানব প্রতিনিধি হিসেবে তুলে নিয়ে যান তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে। তেমনি বাইবেলের তথ্য বলে, পয়গম্বর এনখকে দেবতারা তাঁদের সঙ্গে মহাকাশে নিয়ে গেলেন এবং এনখ আর কখনই প্রত্যাবর্তন করলেন না।[১] যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযাত্রাকে মহাভারতে সশরীরে স্বর্গযাত্রা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ দেবতাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য যুধিষ্ঠিরের অগস্ত্য যাত্রাটি মহাভারতের স্বর্গের ধারণা পাল্টে দিয়েছে। অর্জুনকেও দেবতারা মহাকাশ ভ্রমণ করিয়ে বদ্রিনাথে নামিয়ে নেন।[২] তখন দেবস্থান হিমালয়কেই মহর্ষিরা স্বর্গরাজ্য ভেবে ভুল করেছিলেন। বলেছিলেন, অর্জুন স্বর্গে গেছে। কিন্তু স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই পর্বতশীর্ষে অবস্থিত নয়, যুধিষ্ঠিরসহ দেবতাদের মহাপ্রস্থানের পর মহাভারতীয় ঋষিরা তা বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন, হিমালয়কে স্বর্গ বলে বর্ণনা করে দেবতারা একটি বিরাট ধোঁকা দিয়েছেন তাঁদের, কেননা নীল মহাশূন্যের কোনো এক জায়গায় অপর কোনোও সুন্দরতর স্থান নিশ্চয়ই আছে, যেখান থেকে দেবতারা এসেছিলেন ও প্রত্যাগমন করেছেন। এবং, অতঃপর জ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, স্বর্গরাজ্য হিমালয়ে নয়, অসীম অনন্ত মহাকাশের কোনো এক অজানা রহস্যলোকেই স্বর্গ। দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে সেখানেই প্রত্যাবর্তন করেছেন; আর তাঁরা ফিরে আসবেন না।[৩] বলাবাহুল্য, গ্রহান্তরেও কোনো স্বর্গের অস্তিত্ব নেই, ক্রমশ আমরা তা-ও বুঝলাম। তবুও স্বর্গলোককে, সেই কল্পিত এক পবিত্র স্থানকে চিহ্নিত করতে হলে সংস্কারবশত আজও

আমরা আকাশের দিকেই আঙুল তুলে দেখাই ; ভালোবাসি হয়ত আমাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় স্মৃতির মধ্যেই বসবাস করতে।

দেব-প্রধানরা চলে গেলেন। কোনো অজানা গ্রহলোকের অজ্ঞাত আহ্বানে তাঁদের সেই শশব্যস্ত মহাপ্রস্থান ঘটলে পৃথ্বীমানুষরা যে অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলেন তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। কারণ আদি পৃথ্বীপুরুষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তখন দেবস্তাবক পুরোহিতদের দ্বারা দেশ দেশান্তরে নিহত হয়েছেন। নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তনের দায়িত্ব বর্তালো তাই পুরোহিতবৃন্দ এবং তাঁদের শিবিরভুক্ত যুদ্ধদক্ষ দলপতিদের ওপর। তাঁরা হলেন রাজা, যদিও আসল রাজক্ষমতা পুরোহিতশ্রেষ্ঠদেরই হাতে রয়ে গেল। অর্থাৎ রাজা হলেন পয়গম্বরদের পুলিসি অধিনায়ক।

প্রধান দেবতারা এই গ্রহ ত্যাগ করলেও অপ্রধান দেবজাতীয় পুরুষরা অনেকেই থেকে গেলেন পৃথিবীতে। দেবতাদের পৃথ্বীপৃষ্ঠে অবস্থানের সময় দেবজাতীয় পুরুষ ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল দেবমানব দেহমিলনের ফলে। সুতরাং মহাকাশ যাত্রায় সেই স্ফীতকায় দেববাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মহাভারত সেই পড়ে থাকা দেবতাদের বিবরণ। বেদব্যাসের কাছ থেকে সেই বিবরণ জানতে পারেন সঞ্জয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমর-সাংবাদিক হিসেবে সঞ্জয় বিবরণটি শুনিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। আমাদেরও সংবাদসূত্র ঐ সঞ্জয়-বিবৃত প্রতিবেদনটি। এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে পার্বত্য ভারতীয়গণের সঙ্গে মিশে যাওয়া দেবতাদের চিহ্নিত করব :

সঞ্জয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বত ও তার বিচিত্র স্তরভেদের কথা। জানা যায়, মহাভারতের পূর্ববর্তী যুগ থেকেই হিমালয়ের বিভিন্ন পার্বত্য এলাকা সুন্দর বাসযোগ্য স্থানে পরিণত ছিল। ভীষ্মপর্বের জম্বুদ্বীপ ও পর্বতাদি পরিচয় অংশে ভারতের প্রাচীন মানচিত্রটি যেন অভিজ্ঞ ভৌগোলিক দ্বারা রচিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক এই অংশটি অবশ্যই পাঠ করে ভারত ভ্রমণের আস্বাদ গ্রহণ করবেন, দেখবেন, সেদিনের পার্বত্য ভারতের কত অংশ আজ আমরা হেলায় হারিয়ে বসেছি।

হিমালয়ের সমস্ত বাসযোগ্য পার্বত্য অঞ্চলগুলি বর্ণনা করে সঞ্জয় বলেছেন, হিমালয়ের স্তরে স্তরে দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও অন্যান্য মর্ত্যবাসীরা বসবাস করেন। কোন্ পর্বতে কোন্ জাতির মানুষ বসবাস করেন, তাঁদের বর্ণ ও বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন তিনি। বলেছেন, নীল ও নিষধ পর্বতের মধ্যবর্তী অতি সমৃদ্ধ সুমেরু পর্বতে (দা-ম-স্ব-ত্রঃ) ব্রহ্মা, রুদ্র (শঙ্কর) ও ইন্দ্র, নারদ এবং মহর্ষিগণ

দ্বারা সেবিত হয়ে বহু সমৃদ্ধ যাগযজ্ঞ করেন। সেই দেবস্থান সুমেরুরই (বর্তমান বদ্রিনাথ চৌখাম্বা এবং কেদারনাথ অ) পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মাল্যবান্ পর্বত। সুবর্ণবর্ণ 'দেবলোকভ্রষ্ট' ও 'ব্রহ্মবাদী' মনুষ্যগণের জন্মস্থান ঐ মাল্যবান্‌পর্বত। এই সুবর্ণবর্ণ ব্রহ্মবাদীরা "প্রাণিগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।…দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া অরুণের অগ্রে গমন করেন এবং ষটষষ্টি সহস্র বৎসর সূর্যতাপে তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।" (ভীষ্মপর্ব, জম্বুদ্বীপ পরিচয়, কালী দ্রঃ)।

'দেবলোক পরিভ্রষ্ট' 'ব্রহ্মবাদী' যে প্রাণীদের গায়ের রঙ সোনার বরণ, তাঁরা যে বিরল রোমবিশিষ্ট তা অনুমান করা যায়। দেবতারা ছিলেন নির্লোম এবং তাঁদের ছিল বিচিত্র গাত্রবর্ণ। তাঁরা মহাকাশে পরিভ্রমণ করতেন। সঞ্জয়ের বর্ণনায় আলোচ্য পার্বত্য উপজাতিরাও নক্ষত্রলোক চষে বেড়াতেন বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। মনে করা যেতে পারে, দেবলোকভ্রষ্ট এই ব্রহ্মবাদীরা দেবতাদেরই ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। ঘাঁটি দেবপ্রধানগণ পৃথ্বীলোক ত্যাগ করলে এঁরা সুমেরু অঞ্চলের পূর্বপার্শ্বস্থ পার্বত্য প্রদেশে থেকে যান। কিন্তু দেবতাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে এঁদের অধিকার যথেষ্ট না থাকায়। কালক্রমে নিজেদের দেবমহিমা হারিয়ে বসেন। তখন দেবতাদের আশীর্বাদধন্য পুরোহিতবৃন্দ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন এবং দেবতার শূন্য.আসনে দেবতার এক পৃথ্বীপুরুষকে জগদীশ্বর বলে প্রচার করেন। পুরোহিত-শাসিত আর্যাবর্তে জগদীশ্বরের ঈর্ষণীয় সেই আসনটিতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা নারায়ণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন নারায়ণ বা বিষ্ণু পূজকদের দ্বারা। অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, তার ঢের আগেই তাঁর নরদেহ জরাব্যাধের শরাঘাতে বিনষ্ট হয়েছে। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ঘটনা তা-ই হলে, মহাভারতের সকল কৃষ্ণস্তুতি, যা তাঁকে জগদীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ, তা সমস্তই মহাভারতে পরবর্তী-কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলে গণ্য করতে হয়; এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দেখা গেছে, কৃষ্ণস্তুতিগুলি স্পষ্টত প্রমাণ করে, কৃষ্ণ সম্পর্কে সমস্ত গালভরা বড় বড় কথাই প্রক্ষিপ্ত, ঘটনাবলীর সঙ্গে ঐ কৃষ্ণস্তুতিগুলির কোথাও কোনো ওতপ্রোত সম্পর্ক নেই! দুর্যোধন তাঁর দূত মারফত এজন্যই কৃষ্ণকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, একদল মতলবী কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা কীর্তন সুরু করেছেন। অর্থাৎ দুর্যোধন কোনোরকম কৃষ্ণস্তুতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে সে আলোচনা রেখেছি। এখানে কৃষ্ণ সম্পর্কে পণ্ডিতজনের মতামত উল্লেখ করে তাঁর

স্বরূপটি বুঝবার চেষ্টা করব। কেননা ঘটনাক্রমে এবার শ্রীকৃষ্ণের ঘন ঘন গোলমেলে আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। তাই তাঁকে বিশেষভাবে জানার দরকার। মনে রাখা দরকার, কৃষ্ণ পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দেবতাদের মতই তিনি সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। নির্বিচার নিষ্ঠুরতায় মহাভারতে উক্ত কোনো চরিত্রই কৃষ্ণের মত নির্মম ছিলেন না। জ্ঞাতি হত্যায় অগ্রসর হতে চাননি অর্জুন। স্বজাতিদ্রোহকে তিনি মহাপাপ বলেই বর্ণনা করেছেন এবং যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শস্ত্রত্যাগ করে বলেছেন: "হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।" রাজ্যলোভী যুধিষ্ঠিরও অনুশোচনা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণই তাঁদের ভর্ৎসনা করে তাঁদের দিয়ে অন্যায় ও বিধিবহির্ভূতভাবে একে একে মহাবীর কুরু সেনাধ্যক্ষদের খতম করিয়েছেন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে, চোখের জল ফেলেছেন পণ্ডিতরাও, একমাত্র মহাভারতের নিষ্ঠুরতম চরিত্র কৃষ্ণবাসুদেব নির্বিচার হত্যালীলাকে দার্শনিকতাপূর্ণ মনোমুগ্ধকর বাগ্মিতার দ্বারা পবিত্র কর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বলে বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যায় যুদ্ধ করা ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের অভিধানে লিখিত ছিল না। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তা নির্বিচার হবে কেন? স্বজাতিদ্রোহী যখন যুদ্ধে স্বজন হত্যা করেন, তখন সে যুদ্ধও কি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম? যদি তাই হবে, তাহলে পাণ্ডবরা বারম্বার অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছিলেন কেন? দুর্যোধনপক্ষ শ্রেয়লাভ সম্পর্কে কেন ছিলেন সুনিশ্চিত?—কেবলমাত্র যুদ্ধ করাই কারো ধর্ম হতে পারে না। কৃষ্ণেরও সেটা ধর্ম ছিল না। পুরোহিতদের জন্য যুদ্ধ করাকেই তিনি ধর্ম বলেছেন। তাই অর্জুনের বিষাদ লক্ষ্য করে কৃষ্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে সখা অর্জুনকে নিষ্ঠুর ভাষায় ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। বলেছেন, "হে অর্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্যসকল বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ।..."কৃষ্ণের কথায় তাঁর নিতান্ত পার্থিব শত্রু মনোভাবও স্পষ্টত ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন,..."ঈদৃশ সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্যসেবিত, স্বর্গপ্রতিরোধক, অকীর্তির মোহ উপস্থিত হইল?"

তথাকথিত জগদীশ্বর বিশেষ জাতির হয়ে প্রতিপক্ষ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করলেন। অনার্যের প্রতি অর্জুনের অনুকম্পায় রাগত হয়ে উঠলেন

তিনি এবং বললেন, অর্জুনের মোহ 'স্বর্গপ্রতিরোধক', যার মানে, অর্জুনের বিষাদ দেবস্বার্থবিরোধী অনার্যের প্রতি মোহাবিষ্ট। এই কি জগদীশ্বরের উপযুক্ত কথা? বাইবেলের সদাপ্রভুও বলেন তিনি শুধু আব্রাহামের যাকবের এবং তাদের বংশেরই ঈশ্বর। তিনি তাঁর পুজারীর বিরুদ্ধ-শক্তিকে খতম করবেন। হিংস্র সেই ঈশ্বর মানুষের বাহুবল বুদ্ধির আশঙ্কায় তাদের মধ্যে ভেদ এমন কি 'ভাষাভেদ' পর্যন্ত করে দেন।[৪]—এমন ক্ষুদ্রচেতা যুদ্ধবাজ এবং পার্থিব মানুষের বিশেষ পক্ষ ও গোষ্ঠীর স্বার্থসংরক্ষক কোনো পুরুষকে জগদীশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও পূজা করার প্রশ্নই ওঠে না। মহাভারতের কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাই আমাদের মনের আসনে পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা পাননি। তাঁর রূপকল্পনায় সেজন্যই হয়ত পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে বহু অলৌকিক অশ্রদ্ধেয় গাল-গল্পের পুরা কথা। কৃষ্ণকে মহিমান্বিত করার জন্য পুরোহিতরা কৃষ্ণের ভাবমূর্তি গড়েছেন তাঁর ওপর বৈদিক কৃষ্ণ ও পৌরাণিক নারায়ণের গুণাবলী আরোপ করে। তবু কালক্রমে তাঁকে 'রণছোড়জী' হতে হয়েছে। তিনি অবশেষে মানবমনের নিত্য-বৃন্দাবনে মনচোর মুরলীধারী এবং জীবাত্মার সঙ্গে স্বর্গীয় লীলারস-সম্ভোগকারী গোপীজনবল্লভ করুণা-সিন্ধুতে পরিণতি লাভ করে জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অতঃপর আমরা তাঁর ক্রমবিবর্তনের সেই চমকপ্রদ ইতিহাসটি লক্ষ্য করার চেষ্টা করব।

কৃষ্ণের ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপের কৌশলী ষড়যন্ত্রটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতরা যে সকল তথ্য আহরণ করেছেন, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মহোদয় বহু প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সেগুলি পূর্বাপর সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে। কৌতুহলী পাঠক মূল নিবন্ধ তাঁর গ্রন্থটি থেকে অবশ্যই পড়ে নেবেন। আমি ডঃ ভট্টাচার্যের বই ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব লাভের পূর্বাপর ধারাটি যথাসম্ভব সরলভাবে এখানে হাজির করার চেষ্টা করছি। অবশ্যই পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় যে অলঙ্কারপ্রিয়তা সর্বত্রই দেবস্বরূপের মধ্যে প্রতীক ও রূপক সন্ধান করে বেড়িয়েছে, আমি সেই গোলমেলে পথটির মধ্যে দিশা হারাতে চাই না।

বাসুদেব কৃষ্ণ 'যে বিষ্ণু'র অবতার, সেই দেবতা বিষ্ণু (নারায়ণ) নিজের দলবৃদ্ধির দ্বারা নিজেকে বৈদিক পরমেশ্বরের আসনে উন্নীত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। দেবতাদের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে রূপক আবিষ্কারের পণ্ডিতী ধারায় ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেও ডঃ ভট্টাচার্যকেও তাই বিষ্ণু সম্পর্কে

প্রথম বাক্যটি এইভাবেই সাজাতে হয়েছে—"পরবৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও পুরাণে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হওয়া সত্বেও ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রথম সারির দেবতারূপে গণ্য হতে পারেননি।"

পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরত্বের ব্যাপারে তাঁর উত্থান পতন নেই। এই উত্থান ও পতন আছে কেবলমাত্র দেবতাদেরই। কেননা মানুষের ঈশ্বর হওয়ার জন্য এঁদের অনেক রাজনীতি, অনেক যুদ্ধ ও হত্যা করতে হয়েছিল। তাই এক এক দেবতা এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ঈশ্বরের গদী দখল করে বসেছিলেন। এঁরা কেউ রাজা, কেউ বা বহিরাগত দলপতি। এমনি এক নারায়ণ বিষ্ণু কিছু কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ এবং হত্যা সংঘটন করেছিলেন। তাঁর দেববিরোধী গোষ্ঠীপতি বা দৈত্য বধের তালিকায় বেশ কিছু নাম পাওয়া যায়, যেমন বিষ্ণু ইন্দ্রসখা হিসেবে বৃত্র বধের সহায়ক ছিলেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে দাস জাতির পিতা বৃষশিপ্রের মায়া বিনষ্ট করেছিলেন, শম্বরাসুরের নিরানব্বই সংখ্যক দুর্গ বিনষ্ট করেছেন এবং বর্চি নামক অসুরের সৈন্য বিধ্বস্ত করেছিলেন। তিনি ত্রিপুরহন্তা, অন্ধকবধকারী। গরুড় পুরাণ অনুসারে বিষ্ণু গয়াসুর বধ করেন। বরাহরূপী বিষ্ণুর হিরণ্যাক্ষ বধ, নৃসিংহ অবতাররূপে হিরণ্যকশিপু বধ, মধুসূদন বিষ্ণুর মধুকৈটভ বধ প্রমুখ কৃতিত্বগুলি গল্পাকারে পল্লবিত হয়ে কৃষ্ণ-কৃতিত্বরূপে ক্রমশ মান্য হয়েছে, যিনি বিষ্ণু তিনিই কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন। মধুসূদন বলতে যেমন আমরা কৃষ্ণকেই বুঝি। মহাভারতে কৃষ্ণস্তুতিকালে তাঁর ওপর দেবতা বিষ্ণুর ক্রিয়াচার আরোপ করা হয়েছে কৃষ্ণের জন্ম-জন্মান্তরের কীর্তিকথা হিসেবে। এই আরোপ প্রক্ষেপের ঘটনাগুলিই সকল মহৎ গোলমালের মূল।

ঋগ্বেদীয় ঈশ্বরকল্পনা ও ঐশীশক্তি যেমন দেবতা বিষ্ণুর ওপর তেমনি তাঁর ভাবমূর্তিতে নবনির্মিত কৃষ্ণের ওপরও অলৌকিক রহস্য আরোপ করেছে। অন্যদিকে আবার বেদ-পরবর্তী দেবতাদের যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের কাহিনীগুলিও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

অলৌকিকতা আরোপের প্রবণতা আমাদের মজ্জায় এমনিই প্রবল যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের এমন কি বিবেকানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা বর্ণনার মধ্যেও ভক্তবৃন্দ সেই ধারাকে অবাধে বজায় রাখতেই ভালোবাসেন। অতি আধুনিক গুরু-সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রকাশিত গুরু-মাহাত্ম্য বা জীবনীগ্রন্থগুলিও এই প্রবাহস্রোতে গা ভাসাতে অকুণ্ঠিত। সকল গোষ্ঠীই দাবি করেন, তাঁদের গণ্য নগণ্য সকল গুরুদেবরাই বাল্যকালে এবং সাধনমার্গে উত্তরণের সময় অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শন করেছেন। মজা এই যে,

সব গুরুদেবের বাল্যলীলা প্রায় একই রকম বোকা-বোকা অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার গল্পগাছায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ গুরু যেমনই হোন্, ভক্তবৃন্দ তাঁকে সেই একই ট্র্যাডিশনের ভাবস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে পরমাহ্লাদে ভজনা করতে ভালোবাসেন। আধুনিক গুরুদের পক্ষে বৃত্রহন্তা হওয়ার সুযোগ না থাকায় তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই ননীচোরা গোপালের মত দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভগবৎ-দর্শনের পর বহু দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করেছেন বলে তাঁদের অনুকূলে প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকাগুলি মর্ত্যজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করে। তাই মানবত্রাতা ও সমাজ সংস্কারক ধর্মীয় বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকেও ঈশ্বর বানিয়ে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষার জগৎ থেকে স্পর্শাতীত স্বর্গীয় মহিমার অতলগর্ভ মহাকাশে বিসর্জন দেন। বুদ্ধ হয়ে যান প্রস্তরীভূত অথবা স্বর্ণপিণ্ডময় ঈশ্বরাবতার। তাঁর বাণী হয় এক নিয়মবদ্ধ আত্মমুক্তি-সন্ধানী জপমন্ত্র। চৈতন্যদেব নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান সংকীর্তনের মহা কলরবের সমুদ্রে। এঁদের সকল মহৎ ভাবনার কণ্ঠদেশে ঘটা করে মাল্যদান করে ধূপ ধুনার সুরভিত ধোঁয়ার আড়ালে এঁদের আরব্ধ কর্মকে ক্রমশ আচ্ছাদিত করে ফেলা হয়। সর্বাধুনিক ধর্মীয় নেতা স্বামী বিবেকানন্দের সৌভাগ্য এবং মানুষের ভাগ্য যে বিবেকানন্দের জ্যোতি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরোপম দেবজ্যোতির মণ্ডলাকার ব্যাপ্তির মাঝে অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মাণ। তাই মালাচন্দন বিভূষিত হলেও বিবেকানন্দকে এখনো পর্যন্ত ভগবানের কোঠায় নির্বাসিত করার বিশেষ প্রয়োজন কেউ অনুভব করেননি। অবশ্য তাঁর ওপরেও অবতারত্ব আরোপের চেষ্টা না হয়েছে বা না হচ্ছে এমনও নয়। তবে যতকাল তিনি মানুষের মাঝে আছেন, যতকাল তাঁকে ঘিরে অলৌকিক গালগল্পের স্তূপ নির্মাণ করে বহু বহু সংস্করণধন্য পুস্তক-পুস্তিকা রচিত না হচ্ছে, ততকালই বিবেকবাণী নীচ দরিদ্র বঞ্চিত সমাজের কথা শোনাবার সুযোগ পাবে। বিবেকানন্দকেও ভগবান বানানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা তাঁকে অলৌকিক দেবদূত বলে জপের ধন বানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব। উত্তর পুরুষের জন্য রেখে যাওয়া তাঁর কর্মনির্দেশ পালনের আর কোনো দায়-দায়িত্ব কারো থাকবে না। দুবেলা পুষ্প-চন্দন দ্বারা তাঁর সেবারতি করলেই ভক্তবৃন্দ তখন পরমার্থ লাভের মহৎ উপায়টি দেবালয়ের নির্জন প্রকোষ্ঠের মধ্যে মহা শান্তিতে উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। আমার তাই এক এক সময় ভয় হয়, বিশ্বমানবের দরদী ত্রাতা মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের সাধনা ও স্বপ্নকে কবরস্থ করার জন্য কায়েমী স্বার্থের প্রচারকরা নিশ্চয় একদিন ঐ তিন যুগ-

পুরুষকে মাল্যভূষিত করে কোনো নির্জন দেবালয়ে নিয়ে গিয়ে ছবি ও মূর্তি বানিয়ে ত্রিমূর্তি পূজার ব্যবস্থা পাকা করে দেবেন। মানুষের প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস মানুষকে ভগবান বানানোর ইতিহাসও বটে, যার প্রথম ধাপ, সাড়ম্বরে ব্যক্তি পূজার প্রচলন। আমরা ভাবতে ভালোবাসি, ভারতের মাটিতে পরমেশ্বর বার বার এবং একই সময় বহু মনুষ্যদেহ আশ্রয় করে লীলাখেলা করতে অবতীর্ণ হন। এমন ঈশ্বরপ্রীত ভূখণ্ড তত্রাচ যে পৃথিবীর বহু ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অপেক্ষা অতি করুণভাবে কেন এত পশ্চাদ্‌পদ এ প্রশ্ন অবশ্য আমাদের বিচলিত করে না। যাক, গুরুপদ অবলম্বী ভারত এজন্য গর্বিত বই বিমর্ষ নয়; সুতরাং আমা হেন ক্ষুদ্র প্রাণীর বিলাপ বাচালতা মাত্র।

বেদপরবর্তী এক রাষ্ট্রীয় নেতামাত্র হলেও বাসুদেব কৃষ্ণকেও মহিমান্বিত করা হয়েছিল বৈদিক ভাবকল্পনার দ্বারা বিমণ্ডিত করে। ঋগ্বেদের ধ্যানলব্ধ পরমপুরুষ পৌরাণিক বিষ্ণু-দেবতার মধ্যে বিবর্তিত ও মূর্তিমান হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণরা, যাঁরা বিষ্ণুসেবী বৈষ্ণব, মহাভারতের কৃষ্ণকে তাঁরাই তাঁদের গোষ্ঠীদেবতা বিষ্ণুর যাবতীয় গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত করে কৃষ্ণের ঐশীক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি দ্বিভুজ কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে অলৌকিক গল্প মিশিয়ে কৃষ্ণকেও তাঁরা চতুর্ভুজ বানিয়েছিলেন এবং মহাভারতের বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রের মুখে কৃষ্ণস্তুতির দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়ে দিয়ে ঐ চতুর্ভুজত্বকেও বিশ্বাস্য করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাই স্বয়ং বিষ্ণুর মতই কৃষ্ণও হলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। বলা হল কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রটি শিশুপালকে বধ করেছে, ভীষ্মকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু সুদর্শন চক্রটির বাস্তবতা সম্বন্ধে নিরুক্তকারদের মতামত অন্য রকম।

"মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা সর্বদেবতার তেজ নিয়ে এক চক্র অস্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে দৈত্য দানবাদি বিনাশার্থ এই চক্র মহাদেব বিষ্ণুকে দান করেন। সুদর্শনচক্রই বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র।" (পৌরাণিক অভিধান)। চক্রটি কৃষ্ণকে দান করলেন অগ্নি (যাঁকে আমরা দেবতাদের প্রধান দূত হিসেবে দেখতে পেয়েছি)। খাণ্ডববন দহন করে আর্যপ্রতাপ প্রসারের জন্যই ঐ চক্র কৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে একটি গদাও (কৌমদকী) লাভ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সুদর্শনচক্র সম্বন্ধে নিরুক্তকারদের মত বাছাই করলে বস্তুটি তার বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। বৈদিক চক্রটি সূর্যের মণ্ডলাকৃতি জ্যোতিচ্ছটাকেই নির্দেশ করে। অন্তরীক্ষ বা আকাশ পরিক্রমণকারী এই চক্র দ্বাদশ শলাকা বিশিষ্ট। তা কখনো জীর্ণ হয় না। "সূর্যের রথে সপ্তচক্রের কথাও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে। আবার

বিষ্ণুর চক্রও ৩৬০ বার পরিক্রমণ করছে (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১)। সূর্যের চক্র, যাই বলি, এ ত সূর্যমণ্ডল ছাড়া আর কিছু নয়।"[৫] সূর্য বিষ্ণু সম্পর্কিত ভাব-কল্পনাটিই সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গুলীতে চক্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। কৃষ্ণকে বিষ্ণু বানানোর জন্য মহাভারত পরবর্তী গীতায় ভগবান কৃষ্ণের মুখেই বসানো হয়েছে এই আত্মশ্লাঘা,—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ"। অর্থাৎ আদিত্যগণের মধ্যে আমিই বিষ্ণু। পৌরাণিক যুগে দাপটশালী দেহধারী দেবতা বিষ্ণুরই জয় জয়কার। তাঁর অবতারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বুদ্ধ, কল্কি পর্যন্ত গড়িয়েছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকে পুরোহিতরা যে স্বয়ং বিষ্ণু বানিয়ে তুলবেন এতে আর আশ্চর্য কি? রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার কাজটা খুবই চাতুর্যপূর্ণ হয়েছিল, কারণ সেই সময় বিষ্ণু-দেবতা ছিলেন ক্ষমতায় ভীষণ ভয়ঙ্কর। বলা হয়েছে, বিষ্ণু-দেবতাটি ছিলেন: শত্রুণাং ভীমঃ ভয়ানকঃ। তিনি সকলের ভীতি উৎপাদনকারী এবং 'কুৎসিতহিংসাদি কর্তা'। আর আমাদের কৌতুহল-বর্ধনকারী এই বিষ্ণু "দুর্গম প্রদেশগামী পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানে বসবাসকারী।" (ঐ)।

এই পর্বতবাসী ও উচ্চস্থানে গমনকারী দেবতাদের আমরা আবার অন্যভাবে সন্দেহ করতে শিখেছি দানিকেন-ভাবনার সূত্রে। পুরাণাদি থেকে জেনেছি, মহাকাশ পথে অবতরণকারী দেবতারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পার্বত্য প্রদেশেই বসবাস করতেন। বিষ্ণুও তেমনিই একজন দেবতা। তিনিও অনার্য-নিধনের গুরু, সম্প্রাদায়িক প্রভু। তিনি যে মহাকাশচারী ছিলেন, বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্রম উপাখ্যানটি এ বিষয়ে আমাদের হাতে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে দেয়। ঋগ্বেদে সেই পৌরাণিক তথ্যটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে: "মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পদক্ষেপ মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণও না।" অর্থাৎ বিষ্ণুর তিন পদের একটি পৃথ্বীলোকে, দ্বিতীয়টি অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয়টি মনুষ্যদৃষ্টির অগোচর মহাস্বর্গে অবস্থিত।[৬]

স্বর্গ বলতে মহাকাশকেই বোঝানো হয়েছে। যে স্বর্গে বা মহাকাশে দেবতারা যাতায়াত করতেন সেই স্বর্গটি মানুষের অগোচরই ছিল। বিস্মিত শ্লোককারগণ তাই বলেছেন, পাখাহীন মানুষ দূরের কথা, উড্ডীন পক্ষীরাও সেই স্বর্গের (বিষ্ণুর পক্ষে গমন সম্ভব) ঠিকানা জানত না। উড়ন্ত পক্ষীগণকে এই ব্যাখ্যায় টেনে আনার তাৎপর্যও লক্ষণীয়। ব্যাপারটা ওড়াউড়ি বিষয়টিকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছে।

বিষ্ণু দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তৃতীয় পদটি স্বর্গে স্থাপিত, একথার অর্থ কি তবে এই বুঝব যে, বিষ্ণু গ্রহান্তর-বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্থাপিত কোনো মহাকাশ স্টেশনে একাধিকবার গমনাগমন করেছিলেন? পার্থিবগণ সেই বিস্ময়কর ওড়াউড়ি লক্ষ্য করেন, আর তাই কি নিরুক্তকার বলেন,—তদ্রুগায়স্ত বিষ্ণোর্মহাগতেঃ? সেজন্যই কি তাঁদের সভক্তি উক্তি: বিষ্ণু মহাগতিসম্পন্ন, তিনি বিস্তীর্ণ স্থানে (মহাকাশে) ভ্রমণ করেন?

কোনো মহাকাশ স্টেশন থেকে এই পৃথিবীতে বারম্বার আসা যাওয়া করা আজ আর অসম্ভব কল্পনামাত্র নয়। আজকের বৈজ্ঞানিকগণ মহাকাশচারী ও মহাকাশ ভেলা এমনি ভাসমান মহাকাশ স্টেশনে বার বার পাঠিয়েছেন। মানুষ ও রসদ নিয়ে ভেলাগুলি নির্বিঘ্নে দিব্বি যাতায়াত করছে। সেযুগের মহাকাশচারী দেবতারা পৃথিবী ও ভিন্ন কোনো গ্রহের মাঝে কটি মহাকাশ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে রেখে ছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দেবতাদের যে দীর্ঘ তের বছর সময় একান্তই প্রয়োজন হয়েছিল, মহাভারতের তথ্যাবলী ঘেঁটে সে সংবাদ উদ্ধার করতে পেরেছি। সেই তেরটি বছর দেবতারা পৃথিবী ও মহাকাশ স্টেশনের মধ্যে কি বারবার যাতায়াত করে ভিন্‌গ্রহী অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করেছিলেন? বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ তৃতীয় পদের ব্যাখ্যাটি এই আলোকে বেশ খানিকটা স্পষ্টতা লাভ করে বলেই আমার মনে হয়। তবে আরও একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক অসুরহন্তা বিষ্ণুর স্বরূপ নিরূপণের জন্য!

পুরাণ বলছে, বিষ্ণু ছিলেন মহানীলস্রোতে অনন্ত শয্যায় ভাসমান। অন্তরীক্ষ বা আকাশও মহাসাগর। মহাকাশে ভাসমান 'উরুগায়' বা মহাগতিসম্পন্ন বিষ্ণুর নভশ্চর রূপটিকে বোঝাতেও অনন্তশয্যার কাহিনীটি লিখিত হয়ে থাকতে পারে। আবার আধুনিক নভশ্চর যেমন সমুদ্রবক্ষে এসেই অবতরণ করেন তাঁর প্রচণ্ড বেগবান রকেট ক্যাপসুল সমেত, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও সেইভাবে সমুদ্রবক্ষে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং তারপর ভাসমান ভেলায় কিছুকাল অবস্থান করায় পার্থিবগণের মনে অনন্ত-শয্যার কাহিনীটি জন্মলাভ করে থাকতে পারে। বায়ুপূর্ণ ভাসমান ভেলাটির বেলুনাকৃতি কিনারগুলিকে মসৃণ নাগদেহ (যদি তা বিচিত্রিত হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই) এবং সেই ভেলার প্লাষ্টিকজাতীয় ছাউনীকে শেষনাগের ফণারূপে কল্পনা করতে কিন্তু খুব বেশি উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন হয় না। পৃথ্বীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হওয়ার আগে দেবনারী সমেত বিষ্ণুকে নীল মহাসাগরে এইভাবে ভাসতে দেখে তটবাসীরা

সেদিন যদি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্মীদেবীসমেত বিষ্ণুর ঐশীশক্তিতে আস্থা স্থাপন করে থাকেন, তবে অবৈজ্ঞানিক সেই পৌরাণিক মনুষ্যগণের অবুঝ বিস্ময়কে আজকের জ্ঞান গরিমা নিয়ে আমরা একটুও অশ্রদ্ধা করতে পারি না। সমুদ্র থেকেই চালিকা শক্তি অশ্বের জন্ম (পূর্ববর্তী বক্তব্য স্মরণীয়) এ কথারও সুন্দর ব্যাখ্যা এভাবেই মিলে যায়। বুঝতে পারি, ব্রহ্মার সুবর্ণ অণ্ড ভেদ করে আবির্ভাবের রহস্যটিও (কথারম্ভ দ্রষ্টব্য)।

পুরাণের চারিদিকে বড় গোলমাল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন মহাদেবতার নানা ক্রিয়াকাণ্ড, নানা রূপমিশ্রণ। বিষ্ণুর পত্নীও সরস্বতী, ব্রহ্মারও তাই। কে যে কার নাভিপদ্ম থেকে জাত, এই নিয়ে দেবস্তাবকদের মধ্যে বিতর্ক বিতণ্ডা। কিন্তু এক একটি করে পাপড়ি সরালে মূল কুসুমটি সেই একই চেহারা প্রদর্শন করে। সব কথা শেষ কথায় পৌঁছায়,—সেই মহাকাশ ও মহাকাশ চারণা; সেই মহাকাশ স্বর্গ থেকে মহাবেগে মহা শব্দসৃষ্টিকারী ও অগ্নিপুচ্ছধারী অজানা উড়ন্ত যানে চেপে দেবতাদের পৃথিবীতে পদার্পণ, পার্বত্য উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে অতঃপর তাঁদের সৃষ্টি পালন, শাসন ও ধ্বংসের কাজ। শুধু লড়াই আর লড়াই। শুধু ভেদ আর বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতি এবং তাদের এক এক গোষ্ঠীপতির অনুগামীকে শত্রুশিবিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও স্তাবকবৃন্দকে নিজেদের প্রতিনিধিস্বরূপ শাসক-শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই তো দেবস্বরূপ, পৃথিবীর সর্বত্র এটাই তো ছিল তাঁদের লীলা খেলা। হিন্দুদের দেবাধিনায়করা পর্বতের ওপর থেকে যখনই সমতলের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, তখনই বলা হয়েছে, সেই দেবাধিনায়ক স্বয়ং অবতাররূপে ভূভার হরণের জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। 'ভূভার হরণ' বলতে কী বোঝায় তার সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছি আমার আগের বই-এ। সুতরাং একটা কাল ছিল যখন অবতার নামতেন হিমালয় থেকে সমতলে। চতুর গুরু সম্প্রদায় কিন্তু আজও সমানে অবতার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। ঘটনাক্রমটি ভালোভাবে বুঝলে এটাও বোঝা যায় যে, হিমালয় থেকে দেবতাদের প্রত্যাবর্তনের পর আর কোনো অবতার সৃষ্টির সুযোগ নেই।

যখন দেবশিবিরে বিষ্ণুর দাপট বাড়ছে তখন তাঁর ওপরেও 'ভূভার হরণে'র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। আর্যাবর্তের দেববিরোধী শক্তি জোটকে বিনষ্ট করাই ছিল সেই পবিত্র কর্তব্য। বিষ্ণু-পরিচালিত সেই কর্মটি সাধন করার জন্য কৃষ্ণের সৃষ্টি।

উত্তর ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল তখন শূরসেন। শূরসেন বলতে মথুরা অঞ্চলকেই বোঝায়। এখানে বসবাসকারী যাদবগণ ছিলেন তৎকালের একটি অন্যতম প্রধান আর্যগোষ্ঠী। ঋগ্বেদে যদু জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ছিলেন সেই যদুবংশজাত। তাঁকে আবার বৃষ্ণিবংশজও বলা হয়। হংসনারায়ণ পুরাণ ইতিহাসের নজির উল্লেখ করে লিখেছেন, "মনে হয় যদু ও বৃষ্ণি একই জাতি, কিম্বা যদু নামক একটি প্রাচীনতর জাতির শাখা বৃষ্ণিবংশ।" যদুপতি মথুরাধিপ উগ্রসেন, যিনি ছিলেন কংসের পিতা, তিনিও বৃষ্ণিবংশীয়। সেই বৃষ্ণি বংশে বসুদেবের দুই ছেলে হিসেবে কৃষ্ণ ও বলভদ্রের আবির্ভাব। নীলবরণ কৃষ্ণ প্রকৃতই নীলগাত্রবর্ণধারী ছিলেন কিনা সে তর্কে প্রয়োজন নেই। তবে বিষ্ণু দেবতা ভিন্‌গ্রহের পুরুষ হওয়ায় তাঁর গায়ের রঙ সুনীল হতেই পারে, অবতার রাম ও কৃষ্ণও তাই নীলবরণ হয়েছেন হয়ত স্তুতিকারদের লেখনীতে। না হলে বুঝতে হয়, তাঁরা বিষ্ণুর ঔরসজাত ছিলেন। মানুষের গায়ের রঙ তো নীলচে হয় না।

কৃষ্ণের এবং যাদব ও বৃষ্ণিদের ঐতিহাসিকতা বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৭] গ্রীক ঐতিহাসিকরাও শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের সংবাদ জানিয়ে গেছেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে শূরসেনের রাজধানী মথুরা নামেই উল্লিখিত হয়েছে। এই অঞ্চল থেকেই কৃষ্ণকে নেতা করে শ্রীকৃষ্ণ ভজনার সূত্রপাত হয়। কংসবিরোধী গোষ্ঠী কংসহত্যার পর কৃষ্ণনেতৃত্বকে আশ্রয় করেন। পৌরাণিক বিবরণে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কংসহত্যার আয়োজন কৃষ্ণজন্মের আগে থেকেই সম্পন্ন করে রেখে-ছিলেন দেবতা বিষ্ণু।

কংস ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপান্বিত এক উত্তর-ভারতীয় রাজা। দেববিরোধী কংস সিংহাসনে বসে শূরসেন রাজ্যে বিষ্ণুপূজা বন্ধ করেছিলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাদ সংঘাত তখন থেকেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। হিমালয়বাসী বিষ্ণু মথুরা অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য খোয়াতে রাজী হলেন না। তিনি তখন বৃষ্ণি ও যাদবদের মধ্য থেকে কংসবিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। বেছে নিলেন কংসের খুল্লতাত দেবক এবং বসুদেবকে। বসুদেব ছিলেন দেবকের জামাই। বিয়ে করেছিলেন তাঁর ছয় কন্যাকে। বিষ্ণুর আদেশে দেবকের সপ্তম কন্যা দেবকীরও পাণিগ্রহণ করলেন বসুদেব। বিষ্ণু বললেন, দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম ও অষ্টমগর্ভের সন্তান কৃষ্ণ যুক্তভাবে কংসবধ করবেন। কংস দেবচক্রান্তের খবর পেয়ে রাজ্যব্যাপী এক মারণ

যজ্ঞের আয়োজন করলেন। রাজার কাছে সংবাদ, শুধু দেবকীর গর্ভেই নয়, তাঁর রাজ্যের গোপালক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণু অনুগামী বহু দেবপুত্রের আবির্ভাব ঘটছে। অর্থাৎ দেবতারা কংসবধের জন্য একটি গুপ্তচক্র তৈরী করছেন। তাই গোপালক সন্তানদের হত্যার আদেশও জারি করলেন দুর্বিনীত রাজা কংস। দেবকী পুত্র দুটিকে কংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বসুদেব তাঁর অন্যতমা পত্নী রোহিণীকে পাঠালেন গোপালকদের দলপতি নন্দর কাছে। বিষ্ণুর পূর্বাদেশে অতঃপর একটু রদবদল ঘটল। দেবকীর নয়, রোহিণীর গর্ভেই জন্ম হল বলরামের এবং কৃষ্ণ জন্মালেন দেবকীপুত্র হয়ে। জন্মের পর কৃষ্ণকেও রেখে আসা হল নন্দালয়ে।[৮] কাহিনীর এই অংশটি বেশ জটিল। দেবকীর গর্ভে জন্ম হওয়ার বিপদ ছিল অনেক। দেবকী ছিলেন কংস কারাগারে বন্দিনী এবং জন্মমাত্র তাঁর সন্তানগুলিকে হত্যা করছিলেন ক্রুদ্ধ কংস। দেবকীগর্ভে জন্মের বিপদ গণনা করেই সম্ভবত বলরামের জন্ম রোহিণীগর্ভে হয়ে থাকবে। আর তাই যদি হয় তবে দেবকীগর্ভে কৃষ্ণজন্মের ঝুঁকি নিতে গেলেন কেন বিষ্ণু দেবতা ?

তবে কি বুঝতে হবে, দেবকী গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম, এই বৃত্তান্তে কিছু গলদ থেকে গেছে ? দেবকী গর্ভে কৃষ্ণজন্মের কাহিনী এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল, এজন্যই কি বিশেষত কৃষ্ণের জন্ম দেবকীগর্ভে বলে প্রচারিত হয়েছে ? ঘটনা কি ছিল অন্যরকম ?

বিভিন্ন তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায়, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ-অনুগামীরা মহাভারতের কৃষ্ণকে ঋগ্বেদীয় কৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে কৃষ্ণ ছিলেন 'দেবগব্‌ভা'র গর্ভজাত। পরবৈদিক খিলসূক্তে বাসুদেব কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু ভগবান এক ও অভিন্নরূপে কীর্তিত হয়েছেন। সেখানে, 'কৃষ্ণবিষ্ণোবাসুদেব হৃষীকেশ নমস্ততে' বলে কৃষ্ণস্তুতি করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে এবং বিষ্ণুকে পরমেশ্বরের সঙ্গে একীভূত করেছেন কৃষ্ণোপাসক সম্প্রদায়।

মহাভারতের কৃষ্ণের উৎপত্তি সন্ধান করতে বসে পণ্ডিতদের ফিরে তাকাতে হয়েছে তাই ঋগ্বেদীয় আমলে। ঋগ্বেদে এক দার্শনিক ঋষির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁর নাম, কৃষ্ণ। বৈদিক কৃষ্ণ অঙ্গিরস বংশজ। ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণও তাই। তিনি উপরন্তু দেবকীপুত্র। এদিকে মহাভারতেও তাঁকে দেবকীপুত্র এবং অঙ্গিরস ঋষি ঘোরের শিষ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত গীতার শ্রীকৃষ্ণও দার্শনিক। ডঃ ভট্টাচার্য লিখেছেন: "খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে

রচিত ঘটক জাতক (জাতক নং ৪৫৪) ও মহউম্মগ্‌ জাতকে উপসাগর ও কংস-ভগিনী দেবগব্‌ভার (দেবকী) পুত্র বাসুদেব ও বলদেবকে অন্ধকবেন্হু (অন্ধক ও বৃষ্ণি?) এবং তাঁর পত্নী দেবগব্‌ভার দাসী নন্দগোপার (নন্দগোপের পত্নী?) কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" এই বাক্যটিতে দেবকীর 'দেবগব্‌ভা' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। দেবগব্‌ভা বলতে বুঝি, হয় দেবতার জননী, নয়ত দেব-ঔরসে জাত সন্তানের জননী। কৃষ্ণকে যেহেতু দেবতা বানানো হয়েছে, তাই কি তাঁর গর্ভধারিণীকেও দেবগব্‌ভা অথবা দেবকী বলে উল্লেখ করা হল? কৃষ্ণকথা নানাযুগে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে। এর কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি প্রচার, সুতরাং তা বোঝা বেশ শক্ত। হংসনারায়ণ আরও উল্লেখ করেছেন: খ্রীষ্টপূর্ব (আঃ) ২য় শতকে পতঞ্জলির সময়ে যশোদা ও কংসবধ কাহিনীর প্রচলন ছিল, কিন্তু কৃষ্ণকর্তৃক দানববধের কোনোও অলৌকিক গালগল্প অথবা শ্রীকৃষ্ণের গোপীলীলার কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। এই তথ্যটিও প্রমাণ করে, কৃষ্ণ সম্পর্কে অলৌকিক কথা কাহিনী কৃষ্ণস্তাবকদের দ্বারা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণস্তুতির বিষয়াবলী এবং ঐতিহাসিক কৃষ্ণের কীর্তিমালা এক ও অভিন্ন নয়। মহাভারতের কৃষ্ণ দেবজন প্রেরিত অথবা দেবজনসৃষ্ট এক কূটনীতিক, দেবতাদের উদ্দেশ্য সাধনই ছিল তাঁর একমাত্র জীবনব্রত। সেটাই কৃষ্ণের ধর্ম। সেই ধর্মের বা অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা দিলেন আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণনেতা বিদুর ও ক্ষত্রিয় নেতা যুধিষ্ঠির।

'ধর্ম' বলতে আজ আমরা যা বুঝি 'ধর্ম' শব্দের ওপর ভাববাদী দর্শনের পালিশ পড়ে পড়ে সেই চাকচিক্যময় ভাবধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতে ধর্মের মূল অর্থ হচ্ছে, 'যে ধারণ করে।' বহিরাগতের অনুশাসনে শাসিত সমাজ রাজ্য ধারণ করেছিলেন. বিদুর ও যুধিষ্ঠির তাই তাঁরা স্বয়ং ধর্ম। আর সেই সামাজিক অনুশাসনকে যিনি তাঁর বাগ্মিতা, বুদ্ধি ও দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জনসমাজে তিনি সেই সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর। তিনিই কৃষ্ণ। দার্শনিক কৃষ্ণের গীতা দেবানুশাসিত সমাজব্যবস্থার দার্শনিক নীতিকথা। ইংরেজিতে যে Religion শব্দ, তারও উৎপত্তি Religare অর্থাৎ to bind বা 'বেঁধে রাখে' শব্দ থেকে। ধর্ম, সুতরাং, পরমার্থ লাভের উপায় নয়: ধর্ম এক বন্ধনরজ্জু যা একটি মতলববাজ ও শোষক মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর সাজিয়ে সাম্প্রদায়িক শোষণের কারাগারে অদৃশ্য জেলারের ভূমিকায় খাড়া রাখে। এজন্যই কায়েমী স্বার্থের প্রভুরা ঈশ্বরহীন সমাজকে ভয় পান। আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী দার্শনিক চার্বাক তাই ব্রাহ্মণদের শত্রু। দুর্যোধনকে বলা

হয়েছে, চার্বাকের বন্ধু অবিশ্বাসী দুরাত্মা। অথচ দুর্যোধনকে যতটুকু বোঝা গেছে তাতে দেখেছি; তিনি পরমেশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন ছদ্মবেশী মতলববাজ ঈশ্বর অর্থাৎ দেবতাদের সমাজ শোষণের বিরোধী। মানবমুক্তির মন্ত্রদাতা বুদ্ধ দেবপ্রাধান্য স্বীকার করেননি। ভারতবর্ষে সেজন্যই বৌদ্ধশাস্ত্র-গ্রন্থগুলিকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে। আজ সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌতমকেও চাতুর্বর্ণ-স্থাপনাকারী শিখা উপবীতধারী পণ্ডিতরা ভারতের তথাকথিত পুণ্যভূমি থেকে প্রায় নির্বাসিত করেছেন। শ্রীচৈতন্যের সাধনা নৃত্যপটিয়স খঞ্জনীবাদকদের মহাকলরবপূর্ণ সংকীর্তনের উন্মত্ততার মধ্যে নিহত হয়েছে। চৈতন্য ভাবসাধনার বিকৃতি ঘটেছে ভাববাদী ভাবোন্মাদনার স্রোতে। কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণা করে না বরং বিদ্রোহী বক্তব্য হাজির করে এমন দার্শনিক বক্তব্যকে ধার্মিক ও Religious-রা ভারত অথবা বহির্ভারতের কোথাও কখনো ক্ষমা করেননি। মেরে কেটে পুড়িয়ে মানবত্রাতাদের সর্বাংশে খতম করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বারবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সর্বংসহ পৃথিবীর মৃত্তিকায়।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম চতুর্থ শতকের গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের রচনাবলী নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল, কেননা তিনি ছিলেন জড়বাদী। সর্বস্ব সমর্পণকারী বৈরাগ্যের আদর্শকে মেনে নিতে না পারায় পরবর্তী এপিকিউরাসের রচনাও গোঁড়া খৃষ্টানদের দ্বারা সক্রোধে পরিত্যক্ত হয়। গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, ব্রুনের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের পোষকরা কী নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন সেকথা ইতিহাসের কলঙ্কস্বরূপ আজও উদ্ধৃত হয়ে থাকে। মোট কথা, শোষক সম্প্রদায়ের একটি সর্বার্থসাধক ভগবানের প্রয়োজন ছিল ও আছে। তিনিই ওঁদের দুর্গ রক্ষক। তাই তাঁরা ভগবানহীন সমাজে দিশেহারা হয়ে ঘোষণা করেন: If there is no God, create one। (ভগবান খুঁজে পাওয়া না গেলে একজন ভগবান খাড়া কর)। তাই কবি শেলী ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলে তাঁর কলেজের ক্ষিপ্ত অধ্যক্ষ আদেশ জারি করেন: My Shelly must find out his God within 24 hours or he will be expelled from the college!* চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একজন ভগবানকে খুঁজে বের করতে না পারলে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট সমাজে শিক্ষার অধিকার থেকে কবি শেলীকে বঞ্চিত করা হবে এমন বে-আইনী আইনও কলেজের অধ্যক্ষ বুক ফুলিয়ে জাহির করতে পারেন, কেননা তিনি জানেন, কায়েমী স্বার্থের শাসনযন্ত্র তাঁর পক্ষে এবং তিনিও সেই শাসন বা ধর্মের পক্ষে।

বুদ্ধদেবের মুক্তিধর্মকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রাহ্মণবাহিনী নিয়ে দিগ্বিদিকে ধাওয়া করেছিলেন। ছুটে গেছলেন ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য পথ ভেঙেও। পার্বত্য স্রোতস্বিনী অলকানন্দার তীরে নারায়ণ পর্বতের কোলে আজ যে বদ্রিনাথ মন্দির নিত্য যাত্রী সমাগমে 'ছোট বড় মাঝারি' পুজো-নৈবেদ্যদানে শশব্যস্ত, সেই মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সন তারিখসহ পূর্ণ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বৈদিক গ্রন্থে বদ্রিনাথজীর উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম ভারত বিজয় সুরু করেছে। সম্ভবত সেই সময় বদ্রিনাথের আদি মন্দিরটি ছিল বৌদ্ধদের উপাসনার স্থান। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে, আদিগুরু শঙ্করাচার্যজী যখন এই পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হয়েছেন (স্থানটির নাম ছিল 'অস্ত খণ্ড') তখন তিনি স্বপ্নে জানতে পারলেন মন্দির সংলগ্ন নারদ কুণ্ডে বদ্রিবিশালজীর মূর্তি নিমগ্ন আছে। আদিগুরু সেই মূর্তি নারদ কুণ্ড থেকে তুলে এনে বদ্রিনাথজী হিসেবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বৌদ্ধ উপাসনা স্থানটি হিন্দু মন্দিরে পরিণত হল এইভাবে। বদ্রিনাথের মূর্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। একটি মতানুসারে: আদিগুরুর নেতৃত্বে হিন্দুদের নব উত্থানের সময় বৌদ্ধ উপাসনাস্থলে একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদিগুরুর সশিষ্য আগমনের সংবাদ পেয়ে বৌদ্ধরা মূর্তিটি নারদ কুণ্ডে ডুবিয়ে রেখে পালিয়ে যান। ঐ মূর্তিটিই আদিগুরু বিষ্ণুমূর্তি (বদ্রিবিশাল) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন মন্দিরে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট এই মূর্তির সঙ্গে বুদ্ধ মূর্তির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। এই ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তিরই নাম বোধিসত্ত্ব মূর্তি।[১০] সাম্প্রদায়িকরা এভাবেই তাঁদের দেবতাকে যুগে যুগে রক্ষা করে আসছেন।

বাসুদেব কৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শনকারী ঈশ্বর, একথা মহাভারত খুব জোর দিয়ে বলিয়েছেন অর্জুনের মুখে। সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, অর্জুনের দেখা সেই বিশ্বরূপই যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ, এমন দুর্বল বিশ্বাসকে যুক্তি হিসেবে গ্রন্থবদ্ধ করতে ভক্ত লেখক তো বটেই, স্বয়ং যুক্তিবাদী এক আধুনিক কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব করেন নি। তিনি লিখেছেন: কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে "আমরা চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। আর সেই প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিত হলো, আমাদের সমস্ত দেহমনকে অভিভূত ও প্রব্যথিত ক'রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অকস্মাৎ। কে আছেন আমাদের মধ্যে, সেই ঈশ্বরের গান শুনতে শুনতে যিনি ঝড়ের ঝাপটে তরুশ্রেণীর মতো আন্দোলিত ও কম্পিত না হবেন; কে আছেন, যিনি নিখিল

প্রাণীকুলকে কৃষ্ণের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হ'তে দেখে—'যেমন পৃথিবীর সব নদী সমুদ্রে লীন হয়ে যায়, যেমন পতঙ্গেরা মৃত্যুর জন্যই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে,' তেমনি সবেগে ও অনিবার্যভাবে প্রবিষ্ট হ'তে দেখে অর্জুনের মতোই ব'লে না উঠবেন (গীঃ ১১: ২৮-২৯, ৪০) 'আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমি আপনাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে ও সর্বদিকে নমস্কার করি'? কে আছেন এর পরেও যাঁর অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন না হবে?" এই বিশ্বাস-ব্যাকুল কবি-উক্তিটি যে যুক্তিতর্কে নিতান্তই দীন, বুদ্ধদেব তা নিজেও উপলব্ধি করেছেন, তাই তাঁকে বলতে হয়, 'অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদনের কথা।' স্বীকার করতে হয়: মহাভারতে শুধু অর্জুনকেই নয়, কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে (উদ্যোগপর্ব) এবং আর একবার আশ্বমেধিক পর্বে মহর্ষি উতঙ্ককেও, কিন্তু, বুদ্ধদেব নিজেই বোঝেন, "বিশ্বরূপের এই বহুলীকরণ পীড়াদায়ক"। অথচ কী আশ্চর্য! পণ্ডিত আধুনিক কবি তবু তাঁর মর্মাশ্রিত সংস্কারকেও বর্জন করতে পারেন না; বলতে বাধ্য হ'ন, "কিন্তু এ-সব (অর্থাৎ বিশ্বরূপের গোলমেলে ব্যাপারগুলি এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তার তীব্র সমালোচনা—কৃষ্ণচরিত্রে) সত্ত্বেও আমাদের ধারণায় ও কল্পনায় গীতার একাদশ অধ্যায়টি অনন্য থেকে যায়।"[১১]

যুক্তির কাছে ভাববাদী ফাঁক ফাঁকি যে কত অসহায় এবং কতদূর শিশু-সারল্যে আস্থাশীল, বুদ্ধদেববাবুর আলোচনাটিও কি তারই এক আদর্শ প্রমাণ নয়? কোনো যুক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব যে প্রমাণযোগ্য নয়, এই সারকথা অতি নিপুণভাবে জেনে বুঝেও বুদ্ধদেব তাঁর পাঠক সাধারণকে এক কাব্যময় গিরিচূড়ায় টেনে তুললেন। মোহাবিষ্ট করলেন তাকে তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্য-কুহরিত শব্দ কুজ্‌ঝটিকায়, যা কিন্তু তাঁরই নিজস্ব বাগ্‌বিস্তারের পরিশেষে সম্পূর্ণ একটি দোলাচল বক্তব্য হাজির করে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হল। এর কারণ, বুদ্ধদেববাবু অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনকে 'চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ' বলে গণনা করেছেন।

ভীষ্মাদির বিশ্বরূপ দর্শন নিয়েও গল্প ফাঁদা হয়েছে উদ্যোগপর্বে। সেখানে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা কোনো কৃষ্ণস্তাবক কবির দ্বারা কল্পিত হয়েছে। সেই উচ্চকিত, ভীষণ, ভয়ানক এবং অনন্ত শ্রদ্ধা-আকর্ষণকারী ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎবর্তী কোনো প্রভাব কিন্তু ঘটনাক্রমকে আলোড়িত করেছে বলে দেখা যায়নি। অতএব তা বিশ্বাস্যও হয়ে ওঠেনি। এবং সর্বোপরি, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের

পক্ষে চক্ষুষ্মান হয়ে বিশ্বরূপ দর্শনের ঘটনা সত্য হলে মহাভারতে তার ফলশ্রুতি হত সম্পূর্ণ সর্বব্যাপক। ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণপদে সর্বস্ব সমর্পণ করতে দেখতাম আমরা, ভীষ্ম-দ্রোণের পক্ষেও কৃষ্ণের বিপক্ষে (কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষীয়, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন) অস্ত্র ধারণ সম্ভবপর হত না। সুতরাং ওঁদের এবং দেবদাস বিদুর ও পাণ্ডবগুণমুগ্ধ সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ দর্শন কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষ এবং চাক্ষুষ তো নয়ই। অর্জুনের পক্ষেও ঐ বিশ্বরূপ দেখা শুধু অবাস্তব ঘটনাই নয়, অর্জুন জীবনের পূর্বাপর ঘটনার সাক্ষ্যেও এই জাতীয় কাব্যকথা নিতান্তই বে-মানান। অর্জুন স্বয়ং পাঁচ পাঁচটি বছর হিমগিরি-স্বর্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে খানাপিনা করে দেবতাদের শিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন। মহেশ্বর বা শঙ্করের সঙ্গে তাঁর হয়েছে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ পরিচয় এবং দীর্ঘক্ষণের মল্লযুদ্ধ। এমনি এক অর্জুনও কিন্তু স্বর্গলোকে কোথাও কোনো বিশ্বরূপ দর্শনে বিমোহিত হওয়ার সুযোগ পাননি। বরং নর ও নারায়ণ পর্বতে দিব্বি পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরি করেছেন ও তাঁর শিবিরে দেবনারী উর্বশী এসেছেন সাধারণ গণিকার মতো তাঁকে যৌনসুখানন্দ দান করতে। সেই অভিজ্ঞ অর্জুনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধরথ থামিয়ে মর্ত্যবাসী (সমতলবাসী) কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করছেন এমন অসম্ভব ঘটনা ভক্তজনের সমাধিস্থ নয়নে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেও আমাদের স্বল্পবুদ্ধিকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি, এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুসৈন্য সামনে নিয়ে কৃষ্ণের পক্ষে যেমন গীতার মতো একটি দার্শনিক গ্রন্থ মুখে মুখে রচনা করা সম্ভব ছিল না, অর্জুনের পক্ষেও তেমনি অসম্ভব ব্যাপার ছিল বিশ্বরূপ দর্শন। গীতার মতই ঐ ঘটনাটিও মতলববাজ পুরোহিত ভাববাদীদের দ্বারা মহাভারতে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ঘটনাকে কোনোভাবেই 'প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ' বলা যায় না। অর্জুনের পক্ষে যা চাক্ষুষ বলে যুদ্ধ পরবর্তী কথকের দ্বারা বিবৃত হয়েছে, তা শুধুই একটি সুচিন্তিতভাবে তৈরি গল্পকথামাত্র। অর্জুন কৃষ্ণে বিমোহিত। সুতরাং তিনি ও পাণ্ডবরা সব সময় কৃষ্ণের মধ্যে অতিমানবিক গুণাগুণ বর্তমান বলে সোচ্চারে প্রচার করতেন। তাঁদের সেই প্রচারের দৈর্ঘ্য ক্রমেই এমন আকাশচুম্বী হয়ে উঠতে থাকে যা কোনো পরবর্তী কবিদার্শনিককে খোদার ওপর খোদকারী করতে প্রলুব্ধ করে এবং মনে হয়, তারই ফলশ্রুতিতে অর্জুনের একান্তে বিশ্বরূপ দর্শন ঘটেছে। অর্জুন এক যুদ্ধকামী সমরান্ধ দেবস্তাবক। তাঁর পক্ষে স্বজন হত্যার সম্মুখীন হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া যত স্বাভাবিক, কোনো এক

যদু নেতা কৃষ্ণের (যিনি নিজের স্বর্গলাভ সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত ছিলেন না) ঐশীরূপ দর্শন তত স্বাভাবিক নয় এবং ঠিক যুদ্ধের প্রাঙ্‌মুহূর্তে অর্জুনের সাময়িক-ভাবে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল এমন কথাও আমরা ভাবতে পারি না। বরং দেখি, যুদ্ধের জন্য যখন দুই শিবির চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন কোনো এক নেপথ্য কথক 'ফ্রিজ শট-এ'-ধরা নিশ্চল চিত্রের মতো দুই শিবিরের যোদ্ধগণকে দুইদিকে থামিয়ে রাখলেন আর সেই সুযোগে গেয়ে নিলেন তাঁরা পুরোহিত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সপক্ষে কতগুলি সুনির্বাচিত শ্লোকরাজি যার সংগ্রথিত নামকরণ করা হল, 'গীতা'। বুদ্ধদেববাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং তাঁর 'যুক্তিবাদকে নমস্কার' জানিয়ে লিখেছেন: "মহাভারতের পরিধির মধ্যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব।" আমরা বুদ্ধদেববাবুর যুক্তিহীন কাব্যকথার অপূর্ব রচনা কৌশলের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখে বলি, মহাভারতের তথ্যাবলী সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, ভাববাদী কবিদের 'শতযোজনব্যাপী' বাগ্‌বিস্তারের দ্বারাও ঐ অসম্ভব ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হওয়াও নিতান্তই অসম্ভব।

কৃষ্ণ যে বৃষ্ণিবংশীয় রাজন্যবর্গের ওপর মনুষ্য হিসেবেই কিছু রাজনৈতিক প্রভাব রেখে গেছলেন তার 'চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ' প্রমাণ পাওয়া গেছে। "মথুরা অঞ্চলের নৃপতিবৃন্দ তাঁদের মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করতেন। পরে যখন শকবংশীয় ক্ষত্রপ রাজারা মথুরা অধিকার করেছিলেন তখনও ক্ষত্রপ রাজুবুল এবং সোডাস (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী) এই মুদ্রারীতি অনুসরণ করেছিলেন।"—এস কে. চক্রবর্তীর Ancient Indian Numismatics গ্রন্থ থেকে এই উদ্ধৃতি তুলে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বৃষ্ণি বংশের মহত্তম পুরুষ বলেই তিনি (কৃষ্ণ) এই বংশের উপাস্য দেবতাতে পরিণত হয়েছিলেন, এরূপ অনুমানই যুক্তিগ্রাহ্য।" (হিন্দুদের দেবদেবী···)। প্রসঙ্গত আমরা আর একটু যোগ করে বলতে পারি, পৌরাণিক আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই রাজস্বার্থের পরিপোষককে দেবতা পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে, সেকালের রাজারা নিজেরাও দেবদূত হিসেবে নিজেদের প্রচার করেছেন। পুরোহিত-সেবী রাজতন্ত্র তাঁদের স্বার্থের পরিপোষক ঐতিহাসিক কৃষ্ণকেও সেভাবেই দেবতা বানিয়েছিলেন। এর মধ্যে আরও উন্নততর মহৎ তত্ত্ব সন্ধানের বোধহয় প্রয়োজন নেই।

১। "And Enoch walked with God; and he was not; for God took him."—*Bible, Gen, Ch. 5, 24.*

২। 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' / বীরেন্দ্র মিত্র।

৩। "In many ancient documents we find myths and legends and references to beings descending from the sky and people taken up to heaven."—*Astronauts of Yore—Matest Agrest.* রুশ বৈজ্ঞানিক এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের পরে বলেছেন, দেবতারা যাদের এই পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে গেছলেন (যেমন, এনখ; যেমন যুধিষ্ঠির) তাঁরা হয়ত এখনও মহাকাশ পথেই ছুটে চলেছেন কেননা বেগবান রকেটে সময়ের মন্দীভবন ঘটে। পৃথিবীতে সময় যখন হাজার হাজার বছর এগিয়ে যায়, মহাকাশে তখন তার অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ে। আগ্রেস্ট বলেছেন : "Remember that in a moving spaceship time passes much slower than on our 'Stationary' earth and the astronauts and the 'sons of man' they took with them may not be much older than they were when they departed." আরও বলেছেন,—"Another possibility is that the celestial visitors came from some very distant world and are still on their way home." এমন কি আগ্রেস্ট মনে করেন, এই সময় সংকোচনের আপেক্ষিক ব্যাপারটি লক্ষ্য করে মনে হয়, দেবতারা আবারও ফিরে আসতে পারেন। আর তাঁদের ফিরে আসার সময়ও এগিয়ে এসেছে। আগ্রেস্ট লিখেছেন,—"A rough estimate would suggest the possibility of a first visit about once every 10,000 years. Thus if we assume that our planet was visited by extraterrestrial beings five or six thousand years ago, we should expect another visit from somewhere else only several thousand years hence." যুধিষ্ঠির যদি আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে থাকেন তবে আগ্রেস্ট সূত্রানুসারে আগামী হাজার দুয়েক বছর পরে তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে। পুরা কথায় স্বর্গলোক থেকে হাজার হাজার বছর পরে মর্ত্যমানুষের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে।

৪। "সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী।…আইস,… তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা একজন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন,…এইজন্য সেই নগরের নাম বাবিল (ভেদ) থাকিল। কেননা সেইস্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন।" [আদি পুস্তক, ১১/৬—৯, বাইবেল]"

৫। "In the post Vedic literature one of the Vishnu's weapons is a rolling wheel which is represented like the Sun."...*Vedic Mythology.*

৬। হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব) গ্রন্থে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গত ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসকৃত এই ব্যাখ্যা উদ্ধার করেছেন, "He took three steps, one on earth, one in midheaven and the third in the highest heaven which was invisible to men..."

৭। হংসনারায়ণ উদ্ধৃত দু'টি মহাজনোক্তি পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি : "Vāsudeva Krishna had a historic basis and circumstances which led to his being invested with the supreme god head occurred later times."—Sir R. G. Bhanderkar.

"The pre-epical literature of the Hindus knows a human Krishna, but is silent about a deity Krishna, Buddhist and Jain traditions clearly refer to Vasudeva as a human hero. Even the Mahabharata preserves traces of the original human character of Krishna. The conclusion, therefore, is irresistable that he was a real man.' —Dr. H. C. Raychoudhuri.

৮। Indian Mythology—Veronica Ions.

৯। যুগের আলো—অনল রায় দ্রঃ।

১০। Uttarakhand : Garhwal Himalayas/by K. S. Fonia দ্রঃ।

১১। মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু।

পাণ্ডবের স্বর্গের পথে পথে

মহাভারতে বনবাসের রাজনীতিটি বড় চমৎকার। পাণ্ডবরা বনবাসে গেলেন, কিন্তু সে যাত্রার মধ্যে স্বল্পতম বিমর্ষ বেদনাও লক্ষিত হল না। বনবাস যাত্রাটি হল যেন বিদেশযাত্রার মতই সাড়ম্বর। পঞ্চভ্রাতার অনুগামী হলেন বেশ কিছু বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ। রাজ্যে ঐ বনবাসকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো বিক্ষোভ, বিদ্রোহ অথবা আন্দোলন দেখা দিল না। পাণ্ডবহিতৈষী প্রজাগণের দীর্ঘশ্বাস কৌন্তেয়দের যাত্রাপথ অনুসরণ করে রচনা করল না কোনো প্রত্যাশিত মেঘময়তা যা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও হস্তিনাপুরকে স্তব্ধ ও আচ্ছন্ন করতে পারত। তাঁদের সুদীর্ঘ বনবাস যাপনের মধ্যেও একের পর এক যে সব ঘটনা সঙ্ঘটিত হতে লাগল তাও কিছু কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। বিশেষত বেদব্যাসের তৎপরতা এই বনপর্বেই সুরু। ইতিপূর্বে কৌন্তেয়দের পার্থিব রক্ষক ছিলেন বিদুর, অতঃপর সে দায়িত্ব দেবতারা বেদব্যাসের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। বনবাসকালে পাণ্ডবদের কাছে তিনি কখনো স্বয়ং কখনো বা দ্রুতগামী দূত মারফৎ উপস্থিত হয়েছেন এবং দেবশিবিরের আদেশ নির্দেশ জানিয়েছেন। বেদব্যাস-প্রেরিত ব্রাহ্মণ দূতেরা কখনো এসেছেন পাণ্ডবদের আশ্বাসদাতা রূপে কখনো বা যুধিষ্ঠিরকে ইতিহাস ভূগোল ও রাজনীতিতে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দেবতারা পাঠিয়েছেন অভিজ্ঞ পণ্ডিতজনকে। বেদব্যাস স্বয়ং বারংবার উচ্চারিত শপথবাক্যের দ্বারা দেবতাদের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, বৎস, ধৈর্য ধারণ করো। তের বছর পরে পিতৃরাজ্য অবশ্যই প্রাপ্ত হবে :

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যমিত বিক্রম।
বর্ষাত্ত্রয়োদশাদূর্দ্ধং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥

কেবলমাত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাই নয়, বেদব্যাসের সংযোগসূত্র এসময় হস্তিনাপুরের দেবচর-বাহিনীর সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বনপর্বের সপ্তম অধ্যায়ের পাঠে সে বিবরণ অস্পষ্ট হলেও লক্ষণীয়। দেখা যায়, হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক গোপন পরামর্শের সংবাদ ফাঁস হয়ে এই সময় বেদব্যাসের গোচরে এসেছে। কিন্তু মহাভারত সংবাদসূত্রের কথাটিকে উল্লেখ না করে বলেছেন, "মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুদ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত" হতেন। মজা এই, দিব্যচক্ষু ও ধ্যানজ্ঞানের কথাগুলি যে শুধুই বাগাড়ম্বর,

উপযুক্ত স্থানে বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা তা জানতে পেরেছি। 'সঞ্জয় রহস্য' অধ্যায়ে 'দিব্যচক্ষু'র ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেছি। বুঝেছি, 'ধ্যানে অবগত হওয়া' ও 'দিব্যচক্ষু'তে দর্শনের বিষয়গুলি ব্রাহ্মণ-বুলি-মাত্র, এ বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ নেই।

কৌন্তেয়রা যখন কাম্যকবনে বিহার করছেন, হস্তিনাপুরে তখন পাণ্ডব নিধনের গোপন শলাপরামর্শে মিলিত হয়েছিলেন কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি। দেখা গেল, সংবাদটি বেদব্যাসের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেছে। মহাভারত জানালেন, "দিব্যচক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া" তৎপর বেদব্যাস হস্তিনাপুরে আগমন করে কৌরবদের সংকল্প-সাধন করা থেকে নিবৃত্ত করলেন। সংবাদ পেয়েই ত্রস্তব্যস্ত ব্যাসদেব সদলে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হয়ে রাজাকে শাসন করে গেলেন। বললেন, কুরুপক্ষ কৌন্তেয় নিধনের কোনো চক্রান্ত করলে তার ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হবে। বেদব্যাস-অনুগামী মুনিবর মৈত্রেয়ও দেবশক্তির উল্লেখ করে মারাত্মক ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য বিদুর মৈত্রেয় বেদব্যাস রাজাকে শোনালেন পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী। কত অল্পায়াসে পাণ্ডবরা একের পর এক অনার্য দলপতিদের উৎখাত করছেন শোনানো হল তার বিচিত্র বীরত্বকথা। কিন্তু তাঁদের সেই ফেনায়িত গল্পরাশি দুর্যোধনচিত্তকে তিলমাত্র আলোড়িত করতে পারল না। কেবল গল্প শুনে ভয় পাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। মৈত্রেয়র উপদেশ শুনে মুচকি হেসে তিনি ভদ্রভাবে মৌন হয়ে রইলেন। জানিয়ে দিলেন তোমাদের মতলব আমরা বুঝি। বোঝারই কথা। দেবরাজনীতি বুঝতেন বলেই অসীম সাহসী দুর্যোধনকেই ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের নেতৃত্বের আসনে বিনাতর্কে বরণ করে নেন। কুরুক্ষেত্রে ভারত বনাম বহিরাগতদের যুদ্ধে (যার নাম, ভারত যুদ্ধ) তাই দেখি, শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনই অবিসম্বাদী নেতা। আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজা তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। ঘটনা বিশ্লেষণে আজ আমরাও বুঝতে পারি, কি ছিল সেই চতুর বিধাতাদের মনে।

বর্ষ ত্রয়োদশকালের প্রস্তুতির জন্য কালহরণের প্রয়োজন ছিল দেবশিবিরের। তাই তাঁরা পাণ্ডবদের নিরাপদ দূরত্বে ব্রাহ্মণদের রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তৎপর চেষ্টা চালাচ্ছেন মধ্যবর্তী পর্যায়ে সকল সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য। ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে। বোঝা যাবে, ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষণাত্মক ধীরে চলো নীতির দুর্বার বাধা না থাকলে

কর্ণ দুর্যোধনের আক্রমণাত্মক নীতি দেবশিবিরকে বেশ বেকায়দায় ফেলতে পারত।

দেবতাদের কৌশলটি পরিষ্কার। একদিকে যখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে শান্তির বাণী বহন করে আনছেন মাননীয় দেবদূতেরা, অন্যদিকে তখনই গভীর বনাঞ্চলে দেবানুচর শক্তিচক্র লিপ্ত আছেন কুরুবংশ নাশের পরিকল্পনায়। বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখছি, কৌন্তেয়দের গোপন শিবিরে সমবেত হচ্ছেন কৃষ্ণসহ কৃষ্ণমতাবলম্বী ভোজ, অন্ধক, ও বৃষ্ণিবংশীয় নেতারা। পরামর্শ সভায় যোগ দান করতে আসছেন চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহাবীর কৈকেয় ও পাঞ্চালদেশীয় রাজনীতিকগণ। সেই সভায় ভাষণদানকালে সভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কৃষ্ণ বলেছেন, "আমরা ইহাদিগকে (দেববিরোধী শক্তিজোটকে) রণশায়ী করিয়া ইহাদিগের অনুগত লোক ও অন্যান্য নৃপবর্গকে পরাজয়পূর্বক আপনাকে (যুধিষ্ঠিরকে) রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" এর পর তাঁর কুটিল চক্রান্ত বুঝতে অসুবিধা হয় না। দেখতে পাই, বনবাসী বলে কথিত পাণ্ডবরা হস্তিনাপুর থেকে শত শত যোজন দূরে গোপন শিবির স্থাপন করে দেবতা ও তাঁদের অনুগত মিত্রপক্ষের সঙ্গে ঘন ঘন রাজনৈতিক বৈঠক করছেন। 'ধর্মরক্ষার্থে বনগমন'' ব্যাপারটি আসলে রাজ্য লাভার্থ অজ্ঞাতবাস হয়েছে। বনে তাঁরা স্বেচ্ছায় আগমন করেছেন গভীর গোপন উদ্দেশ্যটিকে ফলবতী করার জন্য। দেবমিত্র বাহিনীর মধ্যে সংহতি স্থাপনে এখন থেকে কৃষ্ণরও কর্মতৎপরতা সুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণদের ঐ ভগবানটি তাঁর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছেন। কৃষ্ণ বলেছেন, "আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না।" (বন/১২ অ/কালী)। কৃষ্ণের এই শপথোচ্চারণে বিস্মিত হই। জগদীশ্বরের এমন দুর্দশায় চমকিত হতে হয়। ইনি শপথ করেন, 'ক্ষমতানুসারে' পাণ্ডব-উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ ত্রুটি ঘটাবেন না! সীমিত ক্ষমতার এই জগদীশ্বরও যে ত্রুটিমুক্ত নন এবং কোনো ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নয়, পাণ্ডবদের রাজ্য পাইয়ে দেওয়ার জন্যই যে তাঁকে গলদঘর্ম পরিশ্রম করতে হয়, এই সত্য জানার পর আমি সেই মনুষ্যটির নিতান্ত জাগতিক লোভীরূপের স্থলে কোনোও চিত্তচমৎকারী বিশ্বরূপ দর্শনের দুঃস্বপ্ন দেখি না।

বনবাস পর্বের পর আর একটি লক্ষণীয় ঘটনা হল, পাণ্ডবরা কখনই একই জায়গায় বেশিদিন বসবাস করেন নি। তাঁদের গতিবিধি গোপন রাখার জন্য স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন বেদব্যাস। কাম্যক বন থেকে দ্বৈতবন, সেখান থেকে পাথুরে স্বর্গের পথে পথে বারটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

বনবাসকালে রাজ্যলাভ ব্যাপারে তথাকথিত নির্লোভী যুধিষ্ঠির প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়তেন। একদিন তিনি ভীমকে বলছেন, "···কর্ণের আলোকসামান্য রণনৈপুণ্য চিন্তা করিয়া এককালে আমার নিদ্রা উচ্ছিন্নপুরী হইয়া গিয়াছে।"—হওয়ারই কথা। কেননা রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ছাড়া সেই মহাধার্মিকের দ্বিতীয় আর কোনো চিন্তা ছিল না। রাজ্যাকাঙ্ক্ষাই তাঁর ধর্ম, রাতের স্বপ্ন, দিবসের পরিকল্পনা। সেটাই প্রথম পাণ্ডবের জপ তপ সাধনা, তাঁর স্বধর্ম। এমনি এক আপনি-অক্ষম রাজ্যলোভী, পৌরাণিক পুরুষের 'মহাত্মা' স্বরূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিদগ্ধ কবি বুদ্ধদেব বসু তাই যখন যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এক উদাসীন দার্শনিক নায়কের সন্ধান পান, তখন বাস্তবিক বড় বিস্ময় জাগে। মহাভারতীয় তথ্যে এই পুরুষ পুঙ্গবের চেহারাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। বরং অর্জুনচরিত্রেও যেটুকু মহানুভবতা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপর্বে লক্ষিত হয়, যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ততটুকু ঔদার্যও কোথাও খোঁজ করে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের বিখ্যাত বিষাদ,—স্বজাতিনিধনে তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা আমাদের বিস্মিত করে। অন্যদিকে আমরা ঘৃণায় শিহরিত হই যখন দেখি, রাজ্য লোভোন্মাদ যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্য কিশোর অভিমন্যুকে ব্যূহপ্রবেশে আদেশ করছেন। অর্থাৎ নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রকেও অধৈর্যবশত ঠেলে দিচ্ছেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে। আরও দেখি, অভিমন্যু যখন অবলীলায় ব্যূহ ভেদ করেছেন, তাঁকে রক্ষা করার জন্য সেই ব্যূহে প্রবেশ না করে ভীমসহ যুধিষ্ঠির তখন প্রাণভয়ে নিজেদের শিবিরে পালিয়ে এসেছেন। জয়দ্রথের প্রতিরোধ-দুর্গ ভেঙে দেওয়ার মুরোদও ছিল না যুধিষ্ঠিরের। ছিল শুধু নির্বাধ নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা। অভিমন্যুকে ব্যূহভেদ করতে পাঠানো যে মোটেই উচিত কাজ হয় নি, সামান্য অভিমন্যু-সারথিও তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি কিশোর অভিমন্যুকে নিবৃত্ত হতে বলেন। বলেন, "হে আয়ুষ্মান্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।" কিন্তু দেবতাদের প্রসাদধন্য জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ অমান্য করার উপায় ছিল না পার্থপুত্রের। সে অবধারিত মৃত্যুর দিকে নিষ্কম্প অন্তরে আত্মোৎসর্গ করতেই এগিয়ে গেছে। তখন তার "সারথি অসন্তুষ্ট-মনে" রথ চালনা করেছেন।

অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদে যুধিষ্ঠিরের বিষাদও নিতান্তই মামুলি। কিন্তু সঞ্জয়ের মুখে অভিমন্যু-হত্যার সংবাদ শুনে বিপক্ষীয় কুরুপিতা ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলেছিলেন, "হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্ত যৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে,

ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্মানুসারে রাজ্য লোলুপ বীরেরা বালকের ওপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্মকর্তারা সেই ক্ষাত্রধর্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।" অথচ যুধিষ্ঠির নিজের দোষ সংক্ষেপে স্বীকারের পরেও মনের হিংসাভাবকেই প্রকাশ করে বেদব্যাস ও কৃষ্ণার্জুনের কাছে বলেছেন, "যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিতই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।" এই মানুষটির ন্যাকাপনা সত্যিই অসহ্য।

অভিমন্যুকে বহুক্ষণ সহ্য করার পর যখন সেই তরুণ যোদ্ধা কৌরবপক্ষের শিবির তছনছ করতে সুরু করেন একমাত্র তখনই মহারথীরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিলেন। যুধিষ্ঠির কি মনে করেন, শিখণ্ডী খাড়া করেই তিনি যুদ্ধ জয় করবেন? তাঁর নিজের ক্ষমতা ছিল তৃণাদপি হীন। দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত ছিলেন বলেই তাঁকে একমাত্র ভীম ছাড়া সাহস করে কেউ কখনো কোনো বিষয়ে দোষারোপ করতে পারে নি। নচেৎ অভিমন্যু বধের সকল দায়িত্ব সেই লোভী বৃদ্ধের যিনি রাজ্যলাভের জন্য সর্বদা উন্মাদ। তত্রাচ পুত্রের জন্য বিলাপ করার সময় সুভদ্রাও পারেন নি ধর্মরাজের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করতে। দেবশিবিরের শাসন ছিল এমনিই কঠোর ও নির্মম যে তা মাতার স্নেহাশ্রুকেও বিশুষ্ক করে দিতে পারত। [দ্রোণপর্ব, কালী দ্রঃ]।

আমরা আরও বীতশ্রদ্ধ হই এই দেখে যে, শোকের আবহাওয়া তখনও পাণ্ডবশিবির থেকে অপগত হয় নি, সবে রাত্রি প্রভাত হয়েছে মাত্র, এমন সময় যুধিষ্ঠির মহাসুখে রাজকীয় আসনে সমাসীন হয়ে গন্ধদ্রব্য সহযোগে গাত্রমর্দন করিয়ে স্নান করছেন! সুখের আর শেষ নেই 'মহাত্মা' ধর্মরাজের! [যুধিষ্ঠিরের প্রসাধনক্রিয়া—দ্রোণপর্ব/কালী দ্রঃ]। এই জগদ্দুর্লভ আত্মপরায়ণতা লক্ষ্য করে বকধার্মিক ক্ষুদ্রচেতা লোকটির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধাও অবশিষ্ট থাকে না। মহাভারতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্র ও মানসিকতার এই মানুষটিকে দেবতারা যথার্থই বাছাই করেছিলেন। এমন চারিত্র্যদীনতা না থাকলে কার পক্ষে অতবড় জাতিদ্রোহিতা সম্ভব! তবুও দেবপ্রচারকরা তাঁর চরিত্রে যথেচ্ছ মহানুভবতা আরোপ করেছেন। কুচক্রীর হাতে ইতিহাস তো এইভাবেই লিখিত হয়, সেকালেও হয়েছে, একালেও হচ্ছে। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বধ করিয়ে সব দোষ শত্রুপক্ষের কাঁধে চাপিয়ে অর্জুনকে আরও বেশি ক্ষিপ্ত করেছেন। অন্যদিকে হয়ত অর্জুনের বীর পুত্রটিকেও অকালে ইহজগৎ থেকে অপসারিত করেছেন স্বার্থপর রাজ্য রাজনীতির গোপন ইচ্ছা থেকেই। তবু বলা

গেল না, ধিক ! শতধিক যুধিষ্ঠিরকে। বলা গেল না, কারণ এই চক্রান্তকারী ছিলেন দেবশিবিরের মনোনীত রাজা।

সেযুগে দেবতারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের দুর্বলচেতা লোভী ও আত্মসুখী মানুষকেই বাছাই করেছিলেন দেবানুশাসিত উপনিবেশগুলির পাহারাদার রাজা হিসেবে। ক্ষমতাশালী নৃপতিকে উৎখাত করে তাঁরা বসিয়েছিলেন ক্রীড়নক মীরজাফরদের। আর সেই শোণিতধারায় জাত রাজন্যবর্গ একদিন পুরোহিত-তান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার রক্ষক হয়ে বসেছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে। দেবতারা নিজেরাও এই গ্রহের লক্ষ লক্ষ একর ভূমির মালিক ছিলেন। কিছু কিছু পুরা দলিল থেকে সে সব তথ্য আজ আমাদের চোখের সামনে শোষণভিত্তিক এক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে।[১]

জানতে পারছি, দেবতা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষ যেমন দেবত্ব লাভ করেছিল, তেমনিই দেবগোষ্ঠীরও বহুজন স্বজনপরিত্যক্ত হয়ে মনুষ্যসমাজের মধ্যে মিশে গেছেন। একদিন এই অত্যাদ্ভুত রক্ত সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া অবাধে চলেছে, তবে তার দ্বারা পুরাকাহিনীতে প্রচুর গণ্ডগোলেরও সৃষ্টি হয়েছে।[২]

আমাদের গল্পধারা এখন বনপর্বে প্রবেশ করছে বলেই এতো কথা বলতে হল। পুনরায় একবার দেবতা ও দেবপোষ্য যুধিষ্ঠিরের স্বরূপটি নিয়ে নাড়া চাড়া করার প্রয়োজন দেখা দিল। বনপর্বের সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছি 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থে। বনপর্বেই আছে দেবতাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সকল চমকপ্রদ কাহিনী। আছে অজানা উড়ন্ত দেবযানগুলির (U. F. O) কথা। সেখানে বাইবেল ও অন্যান্য পুরাগ্রন্থ এবং দানিকেনতত্ত্বের সাহায্যে দেববিমানগুলির বিশ্লেষণও করেছি। আবিষ্কার করেছি গাঁড়োয়াল হিমালয়ের স্তরে স্তরে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর অস্তিত্ব। এখানে সেসব কথা সবিস্তারে বর্ণনার সুযোগ নেই। সূত্রানুসরণের জন্য কেবলমাত্র কিছু কিছু অংশ পুনশ্চ স্মরণ করব, নাহলে গল্পের স্বাভাবিক স্রোতধারাটি ব্যাহত হবে।

বনবাসী পাণ্ডবদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন বেদব্যাস। তাঁরই নির্দেশে বন থেকে বনান্তরে গমন করতেন কৌন্তেয়রা। এসব কাজ বেদব্যাস ব্রাহ্মণ সূত্র মারফৎ এবং স্বয়ংও করতেন। একদিন তিনি পাণ্ডবালয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে দেবশিবির প্রেরিত একটি সামরিক চুক্তির সংবাদ দিয়ে বললেন, হিমালয়ে দেবতারা প্রস্তুত আছেন পাণ্ডবদের সব রকম সামরিক সাহায্য দানের জন্য। যুধিষ্ঠির যেন যথাশীঘ্র অর্জুনকে হিমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভারতে অবশ্য

ঘটনাটি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে। বেদব্যাসের মন্ত্রণাটিকে 'রহস্যবিদ্যা' আখ্যা দিয়ে রহস্য ঘনীভূত করেছেন মুনিরা। কিন্তু সে রহস্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বেদব্যাসের সেই রহস্যবিদ্যা যুধিষ্ঠির যখন অর্জুনকে শুনিয়েছেন তখনই দেব-উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অতঃপর আমার আগের বই থেকে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেব সূত্রানুসরণের জন্য।

যুধিষ্ঠিরের গোপন রহস্যবিদ্যা গূঢ় কূটনীতি মাত্র। তিনি বেদব্যাসের রহস্যবিদ্যাটি ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে বললেন, খবর আছে দেবতারা তোমাকে দেবানুগৃহীত রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়নে উৎসুক। তুমি শীঘ্র হিমালয়ে গিয়ে তপস্যার দ্বারা তাঁদের তুষ্ট কর। কিন্তু সাবধান, তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কাক-পক্ষীতেও যেন জানতে না পারে ('কাহাকেও পথ-প্রদর্শন করিও না')। কেননা, তিনি জানতেন, হিমালয়ে শত্রুপক্ষের চররাও যাতায়াত করেন (হিমালয়ে যা ঘটেছিল পরে চরমুখে ধৃতরাষ্ট্র সে সংবাদ পেয়েছিলেন)। যুধিষ্ঠিরের কাছে যে গোপন বার্তা এসেছিল তাতে এ বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, অর্জুন দেবগণের মনোনয়ন লাভ করলে কী পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য পেতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির আরও খোলসা করে বললেন, "পূর্বে দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি একস্থানস্থ (একই জায়গায়) সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন কর, তিনিই তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিবেন।" (বন, কালী পৃঃ ৪০-৪১)।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ শিরোধার্য করে অর্জুন এক অহোরাত্রের মধ্যেই আশ্চর্য উপায়ে হিমালয়ের ইন্দ্রকীল বা মহেন্দ্র অথবা গন্ধমাদন পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রকীল পর্বতই সেই স্বর্গদ্বার যেখানে সমতলের বাসিন্দাদের রুখে দেওয়া হত। দেবতাদেব স্বর্গধাম বদ্রিনাথ অঞ্চলের দিকে দেববাহিনী সমতলবাসীকে আর অগ্রসর হতে দিতেন না। তবে অর্জুনের কথা স্বতন্ত্র। তিনি খোদ দেবতাদের আহ্বানেই সেই স্বর্গদ্বারে উপনীত হয়েছেন। আর সম্ভবত দেববিমানেই তাঁকে আনা হয়েছে ইন্দ্রকীল পর্বতে। নচেৎ একরাত্রে কেউ গিরিনদী পর্বত অতিক্রম করে বদ্রিস্বর্গের দ্বারদেশে গিয়ে উপনীত হতে পারেন না। দেবতারা যে হরদম বিমান ব্যবহার করতেন তার অজস্র দৃষ্টান্ত, এমন কি ভরদ্বাজ পুঁথিতে বর্ণিত সেইসব অজানা উড়ন্ত যানের বিবরণও আমি অগ্রবর্তী গ্রন্থে উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা করেছি। তার দ্বারা

এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অর্জুন দেববিমানেই সেই পার্বত্য উপত্যকায় নীত হন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার পূর্বে দেবসেনাধিনায়ক মহাদেব তাঁকে দর্শন দেন নি। জনৈক ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন পুরুষ নিজেকে ইন্দ্র বলে পরিচয় প্রদান করে অর্জুনকে ইন্দ্রকীল পর্বতেই মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ দেবতারা অর্জুনের ধৈর্য, সাহস, একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং বলবীর্য পরীক্ষা করার জন্যই তাঁকে ইন্দ্রকীল পর্বতে, অর্থাৎ স্বর্গের দ্বারদেশে চার মাসকাল আটক করে রেখেছেন। এ এক কঠিন সামরিক পরীক্ষা। সেই পরীক্ষান্তে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর দেববিমানে ইন্দ্রকীলে উপস্থিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ছদ্মবেশে। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক বরাহরূপী অনার্যবীরকে কে আগে হনন করবেন এই নিয়ে একটি বচসার সূত্রপাত ঘটিয়ে কিরাতের ছদ্মবেশধারী মহাদেব বা শঙ্কর অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে সামিল হয়েছেন। উদ্দেশ্য, পার্থের শক্তি পরীক্ষা নিয়ে তার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা বিচার করা। সামরিক কাজে শুধু চাটুকার নিয়োগ চলে না। আর্যাবর্তে দেবশত্রুদের প্রতিপক্ষশক্তির সৈনাপত্য করার মতো গুণে অর্জুন প্রকৃতই গুণবান কিনা দেব সমরাধিনায়ক তারই পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। পাছে দেবাধিনায়কের পরিচয় জানতে পেরে যুদ্ধ না করে পার্থ সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হন, এজন্যই সমরকুশলী মহাদেবের এতো সাবধানতা। তিনি শুধু ছদ্মবেশেই আসেন নি, অর্জুনের অলক্ষ্যে তিনি তাঁর নিঃশব্দ বিমানটি থেকে অবতরণ করে পদব্রজে পার্থের সমীপবর্তী হয়েছেন। (বন/ কালী/৪৩ দ্রঃ)। আহ্বান করেছেন অর্জুনকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে।

অর্জুন বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই দ্বৈরথ যুদ্ধে নেমেছিলেন। দু'পক্ষে যুদ্ধ জমে উঠল। কিন্তু কাবু করা গেল না কিরাতকে। কিরাতরূপী মহাদেবের উন্নত ধরনের বর্ম ভেদ করতে পারল না পৃথ্বীপুত্র অর্জুনের বাছা বাছা এবং শক্তিশালী শরসমুদয়ও। পারবে কী করে, বিজ্ঞানী দেবাধিনায়কদের উন্নতমানের কবচ বাঁধতেন যে স্বয়ং ইন্দ্র।

পরাস্ত অর্জুন তখন মনে মনে ভাবলেন, "শুনিয়াছি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে।" অর্থাৎ দেবতারা হিমালয়ে আসা যাওয়া করেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। আরও ভাবলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি? "...পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে আর কাহার ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা কিম্বা যক্ষ হয়েন, আমি অবশ্য ইহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমন সদনে প্রেরণ করিব।" (ঐ, পৃঃ ৪৪)।

কী সাংঘাতিক কথা। জানা গেল, মহাভারত যে দেবতাদের ঈশ্বরের মর্যাদা দেন, সামান্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাঁরাও প্রেরিত হতে পারেন শমন-সদনে, মৃত্যুলোকে।...

প্রশ্নটি আমাদের বস্তুত অবাক করে দেয়। যে দেবতারা সর্বশক্তিমান হিসেবে আমাদের পূজা দাবি করে এসেছেন, তাঁরা শুধু মানুষের কাছে পরাজিতই হ'ন না, তাঁরাও মরণশীল, অর্জুনের হাতে তাঁদের মৃত্যুও হতে পারে। দেবতারাও যে রক্তমাংসের জীব, অর্জুনের এই চিন্তা তারই একটি অবিসম্বাদী সাক্ষ্য।...

অস্ত্রযুদ্ধে মহাদেবকে পরাজিত করা অসম্ভব হলে অর্জুন তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং মহাদেবের দীপ্তিমান দেহ স্পর্শও করেছিলেন। এজন্য অর্জুনের আত্ম-আমোদ ও পরিতুষ্টির কথা নোট করে রাখতেও ভুল হয় নি ইতিবৃত্তকারের। এ প্রসঙ্গে কোনো দিব্যদেহ স্পর্শেরও উল্লেখ নেই। দেহধারী সাধারণ রক্তমাংসের মহাদেব এই সংঘর্ষকালে সম্পূর্ণভাবেই ধরা পড়ে গেছেন।...

অর্জুন মহাদেবের গাত্র স্পর্শ করে পুলকিত হয়েছেন। পর্বতবাসী স্বর্ণপ্রভ দেবতার নির্লোম গাত্র স্পর্শে পুলকিত হওয়ারই তো কথা। (পুরাকাহিনী বলে দেবতারা ছিলেন নির্লোম, তাঁদের ভ্রূ ও আঁখি পল্লব ছিল বিরল)। তাছাড়া অর্জুন ছিলেন দেবপ্রসাদ লোভী। তাই স্বয়ং দেবাধিনায়কের সঙ্গে তিনি মল্লযুদ্ধ করেছেন জানতে পেরে তাঁর আর আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না।

অর্জুনের সামরিক পরীক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হলে শঙ্কর তাঁকে স্বর্গলোক বা বদ্রিকাধামে আহ্বান জানিয়ে উমাদেবীসহ প্রত্যাগমন করতে লাগলেন। অনুগত ভৃত্যের মতো অনুসরণ করলেন পার্থ।

সে এক দর্শনীয় দৃশ্য বটে।

সস্ত্রীক মহাদেব বিমানে উঠে বসলে সগর্জনে বিমানটি উড়ে গেল আকাশ-মার্গে। ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে রইলেন অর্জুন। দেখতে দেখতে বিমানটি তাঁর চোখের নাগাল ছাড়িয়ে অদৃশ্য হল। আবার মহাশূন্যতায় স্তব্ধ পার্বত্য পরিবেশ লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির ডাকে ঝিমিয়ে পড়ল। একাকী পার্থ সেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে অপেক্ষায় রইলেন। আসবে স্বর্গের রথ। নিয়ে যাবে তাঁকে মহাকাশে। যুদ্ধ চিন্তায় ডুবে গেলেন যুদ্ধবাজ অর্জুন।...

মহাদেবের প্রত্যাবর্তনকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কবি লিখেছিলেন, আকাশমার্গে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি 'অর্জুনের সমক্ষেই'; অর্থাৎ এই

প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অর্জুন। অর্জুন আর্যাবর্তের এক রাজকুমার, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং অকুতোভয়। তিনি যা দেখেছিলেন তার সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাদেবকে তিনি অলৌকিক উপায়ে উবে যেতে দেখেন নি, দেখেছিলেন, "অস্তাচল গমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় (মহাদেব) দেখিতে দেখিতেই অর্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।" (বন, কালী)

কবির আয়ত্তে উপমার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবু বর্ণনাটিকে বাস্তব করার জন্যই তিনি বিমানের আলোটিকে অস্তাচলগামী সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন সেই আলোকের দীপ্তি সূর্যের মতো প্রখর তীব্র ও জ্বালাময়ী ছিল না, সেই আলোকদীপ্তি ছিল অস্তগামী সূর্যের মতো লালাভ, নিরুত্তাপ এবং দর্শক সেই দীপ্ত আলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে পেরেছিলেন। সে আলোক যদি সূর্যের সমান হত, অর্জুন চোখ তুলে মহাদেবের প্রস্থানপর্ব লক্ষ্য করতে পারতেন না। অকারণে কবি নিশ্চয় এতো পরিশ্রম করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাটি শ্রোতার মনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

ঠিক একই রকম প্রযত্ন নিয়েছিলেন তিনি অন্যান্য দেববিমান বর্ণনার ক্ষেত্রেও। মহাদেবের নক্ষত্রলোক যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রকীলের পার্বত্য উপত্যকায় এসে নামতে সুরু করলেন অন্যান্য দেবতারা। তাঁদের বিমানগুলির সঙ্গেও সূর্য-সংকাশ রহস্যময় রশ্মির কথা আছে। আকাশ থেকে সেগুলি নেমেছিল 'চতুর্দিক আলোকোদ্ভাসিত' করে।···

লোকপালদের মধ্যে প্রথম যিনি বিমান থেকে অবতরণ করলেন, মহাকবি তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছেন তিনিই বরুণদেব। তাঁর পরে এসেছিলেন অদ্ভুতদর্শন কুবের। তিনি এলেন, "আকাশমার্গ সমুদ্দ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক।" এলেন অতঃপর ধর্মরাজ যম "বিমানালোকে·· সমুদয় লোক আলোকময় করিয়া"। সবশেষে নামলেন দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে তাঁর মহেন্দ্রাণী।···

এরপর বিভিন্ন দেবতা অর্জুনকে বিভিন্ন অস্ত্র প্রদান করে তাঁকে দেবশিবিরের দ্বারা নিযুক্ত এক পার্থিব সেনাপতিরূপে অভিনন্দিত করে বললেন, কৌরবদের সঙ্গে সংগ্রামে অবশ্যই অর্জুনের জয় হবে। কেননা ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারেই দেব-ঔরসে পাণ্ডবদের সৃষ্টি। তাঁরাই আর্যাবর্তে ধর্মরাজ্য অথবা দেবানুশাসিত পুরোহিত প্রধান এক শাসনব্যবস্থার পত্তন করবেন। এজন্য দেবতারা তাঁদের দেবেন অকুণ্ঠ সামরিক সাহায্য।

এই হল মহাভারতের পাথুরে স্বর্গ। গাড়োয়াল হিমালয়ের সেই প্রস্তর-মৃত্তিকার ওপর দাঁড়িয়ে পরস্পর করমর্দন করে অর্জুন ও দেবতারা আর্যাবর্ত

থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গকে উৎখাত করার চক্রান্ত এভাবেই করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা সেই দেবচক্রান্তকেই অলৌকিক গালগল্পের মাধ্যমে ধর্মানুগ আচরণ বলে প্রচার করে গেছেন। দেবতারা তাঁদের নিজের নিজের বিমানে চেপে আপনাপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন আর দেবরাজ ইন্দ্র বলে গেলেন, ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর আকাশরথটি পাঠিয়ে দেবেন। ইন্দ্রের বিমানচালক মাতলি এসে পার্থকে নিয়ে যাবেন স্বর্গলোকে। সেখানেই তিনি লাভ করবেন উন্নত মানের সামরিক শিক্ষা। সুতরাং অর্জুন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন দেবরথের প্রত্যাগমনের জন্য।

বনপর্বে অর্জুনের এই স্বর্গগমন অধ্যায়টি দেবতাদের নভশ্চর মূর্তিটিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি যে, যোগবলে, বা কোনো ঐশী শক্তির দ্বারা দেবতারা কিছুই করতে পারতেন না। তাঁরা দূতমুখে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন এবং নিজেদেরও গমনাগমন করতে হত যান্ত্রিক বিমানে চেপেই। কোনো মন্ত্র তন্ত্র বা ঐশী শক্তির দ্বারা অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সেই লোকপালদের ছিল না। তাই অর্জুনকে প্রতীক্ষা করতে হল ইন্দ্ররথের জন্য, যেটি ইন্দ্র ও শচীদেবীকে সুমেরু অঞ্চলে নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসেছিল অর্জুনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মাতলি পরিচালিত সেই অতি অদ্ভুত ইন্দ্রের অজানা উড়ন্ত যান, যাকে ইংরেজিতে বলে U. F. O. বা unidentified flying object, 'দানিকেন তত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থে সেই রথটির যন্ত্রপাতির একটি পরীক্ষা করেছিলাম বাইবেলে উক্ত পয়গম্বর ইজেকিয়েলের দেখা ইহুদী দেবতা সদাপ্রভুর বেগবান মহাশক্তিসম্পন্ন রথটির কলকব্জার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে। দানিকেন-গ্রন্থের পাঠকরা ইজেকিয়েলদৃষ্ট সদাপ্রভুর 'প্রতাপ'টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছেন। তাঁরা জানেন, রকেট বিজ্ঞানী ব্লুমরিশ সাহেব তাঁর "তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল" (অনুঃ অজিত দত্ত) গ্রন্থে ঐ আকাশযানটি বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছেন, রথটি ছিল উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার দ্বারা নির্মিত এবং বস্তুত প্রয়োগসম্ভব একটি মহাকাশভেলা যা নাকি পাথুরে মৃত্তিকা থেকে মহাকাশে ভাসমান উড্ডীন যানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারত। হয়ত তা কোনো ভাসমান স্পেশ স্টেশনেও যাতায়াত করত।

বর্তমান আলোচনায় সেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর পুনরাবৃত্তি করব না। তবে পাথুরে স্বর্গের পথে পথে পার্থকে অনুসরণ করে কুরুক্ষেত্রে দেবশিবিরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কাহিনীটি পুনশ্চ পড়ে নিতে হবেই :

"অর্জুন দেবরাজ রথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি (ইন্দ্র বিমানের চালক) রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।" (বনপর্ব, কালী, পৃঃ ৪৭) মনে রাখবেন, সেকালে অশ্ব চালিত রথও রথ, আবার বিমান ও মহাকাশযানের মতো উড্ডীন বস্তুও রথ। মাতলির রথ প্রচণ্ড বেগে ওড়ে। আর "বায়ু বেগগতি সম্পন্ন দশসহস্র তুরঙ্গম (দশহাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন এঞ্জিন?) সেই দৃষ্টি বিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে।" কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমান অর্জুনের চোখে এ সময় সব কিছু মায়া বলেই তো মনে হবে। আমাদেরও হয়। কোনো ব্যাপারে কৃতকার্য হলে ভাবি, সকলি 'তাঁহার ইচ্ছা'। গুরু কৃপয়া কেবলম্। অর্জুনও সব কিছুকেই মায়াভ্রম করবেন আনন্দ প্রাবল্যে, এতে আর সন্দেহ কী? ভালোভাবে স্বার্থ সিদ্ধি হলে মানুষের অন্তর মাঝে মাঝে মহান হয়। এই হঠাৎ মহান হওয়াটাই তো মস্ত মায়া।

ইতিপূর্বে বিমানে চেপে দেবতারা নেমেছিলেন, কিন্তু তার গর্জন ও প্রচণ্ডতা এমন ছিল না। ইন্দ্ররথ নামছে, "বেগে জলদমালা (মেঘ) ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জন সদৃশ নির্ঘোষে দিক সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ প্রায় একই রকম বেগবান ও সগর্জন আকাশ রথের কথা আছে রামায়ণেও। রথটির মালিক ছিলেন অপার্থিব-দর্শন পরশুরাম।... পরশুরামের রথ বহু গাছপালা নষ্ট করেছিল, তার প্রচণ্ড শব্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল রাজা দশরথের সৈন্য সামন্ত। মনে রাখতে হবে, পরশুরাম মানুষটাও ছিলেন অদ্ভুতদর্শন, অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং তাঁরও নিবাস ছিল মন্দার বা মহেন্দ্র পর্বতে। পুরাকালে পর্বত এক সাংঘাতিক জায়গা। পার্বত্য উপত্যকাতেই তথাকথিত দেবগণ তাঁদের বিশেষ বিমানে ওঠা নামা করতেন। হিন্দুদেবভূমি ছিল হিমালয়, চৈনিকদের কুঙলুঙ, রেড ইণ্ডিয়দের সাস্তা পর্বত, হিব্রুদের সদাপ্রভু থাকতেন সিনয় পর্বতে, অলিম্পাস পর্বতে ছিল গ্রীসীয় দেবতাদের দুর্গ। এমন পার্বত্য উপত্যকায় যে পরশুরামের দুর্গ, নিশ্চয় তাও ছিল অ-সাধারণ।

অতঃপর কুরুনন্দন পার্থকে ইন্দ্র রথে তুলে বিমানচালক মাতলি কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে মহাকাশের উচ্চমার্গে ভ্রমণ করিয়ে আনলো। শুধু অর্জুনই নয়, যে যুগে মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পৃথিবীর অন্যান্য পুরাপিতাদের ভাগ্যেও জুটেছে। সেসব কথা সবিস্তারে এবং দৃষ্টান্ত সহযোগে পূর্ববর্তী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এখানে বদ্রিস্বর্গে অর্জুনকে নামানোর আগে নভশ্চর ইন্দ্রের বিমান চালক পার্থকে যেভাবে মহাকাশ দর্শন করিয়েছিলেন সেই অংশটি উপোরক্ত গ্রন্থ

থেকে উদ্ধার করছি। পৌরাণিক পয়গম্বর এনথ, এস্তানা এবং এক্কিডুদের মত অর্জুনও সেই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মহাকাশ দর্শন হয়েছিল নভশ্চর দেবতাদের প্রাসাদে।

মহাকাশে নিয়ে গিয়ে মাতলি কুরুনন্দনকে কী দেখালেন? মহাভারতের প্রতিবেদন: "কুরুনন্দন সেই সূর্যসংকাশ দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র (অনেকানেক) বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।" সেই নক্ষত্রলোকে "সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোকসকল কেবল স্ব-প্রভাব দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন।

অর্জুনের উক্তিতে অনভিজ্ঞের বিস্ময় যথার্থই পরিস্ফুট হয়েছে। মহাকাশের উচ্চমার্গে যে আকাশের রঙ রাতের আঁধারের মতই কালো নভশ্চর ব্যতীত সে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আর কেই-ই বা হয়েছেন। মহাকাশে আকাশের রঙ আর নীল বরণ থাকে না। তা দিবানিশিই অন্ধকার সমুদ্রে অবলুপ্ত হয়ে আছে। অর্জুন এই জাগতিক সত্য প্রত্যক্ষ করলেও তার অর্থ বোঝেননি। কিন্তু আজকের নভশ্চরগণ বারম্বার মহাকাশ ভ্রমণ করে এ দৃশ্যকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই জেনেছেন। মার্কিন নভশ্চর জন গ্লেন মহাকাশ-পরিক্রমাকালে পৃথিবীকে সেই অদ্ভুত সংবাদ জানিয়ে বলেন, মহাকাশ চন্দ্র সূর্যের আলোক-বিহীন। বহু উচ্চে রকেটারূঢ় নভশ্চর গ্লেন সে দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন, "The sky has been black through out the day—" আকাশটা সারা দিনমান শুধু আঁধারে আবৃত। অর্জুনের উক্তিও একই রকম, "তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই।" মহাশূন্য রাত্রির মতই কালো।[৩]

সেই দুর্লভ মহাকাশ ভ্রমণের পর অর্জুনকে হিমালয়ের পাথুরে স্বর্গ বর্তমান বদ্রিনাথ ধামের সমীপবর্তী নরপর্বতে নামানো হল। (পূর্ববর্তী গ্রন্থে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। দেখলাম, হিমালয়স্থ দেবশিবির পার্থের সংবর্ধনার জন্য রাজকীয় আয়োজন করে রেখেছেন। এক আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তি শিবিরে পার্থিব মিত্রশক্তির প্রতিনিধিরূপে অর্জুনের আগমন স্বভাবতই যথোচিতভাবে সংবর্ধিত হয়েছিল। বিদেশী নেতার আগমনে আজ যেমন আমরা সংবর্ধনার আয়োজন করি, ঠিক সেই ভাবেই। কিন্তু সেকথার আগে স্বর্গলোকটি প্রত্যক্ষ করা যাক পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে আরো কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে। মহাভারতের পরবর্তী পাঠ এই রকম: "মহাযশাঃ অর্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোকে (দেবলোকে) উত্তীর্ণ হইয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে

লাগিলেন।" এ বর্ণনা অবশ্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য। রাজলোক বলতে পার্থিব ভূমি যা নাকি তথাকথিত দেবতাদের দখলীভূত নয়। অর্জুন সেই ভূপৃষ্ঠ (ভূমি মাত্রেই তখন রাজার অধিকৃত) অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হলেন স্বরলোকে যা দেবতাদের অধিকৃত অঞ্চল।

আগেও আলোচনা করেছি, ধারণা গঠনের প্রয়োজনে আবারও বলব, "এই স্বরলোক যে নেহাৎই আর একটি পার্থিব অঞ্চল মহাভারতকার সে বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখেননি। বলেছেন, সে রাজ্য পবিত্র তরুরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। "তথায় সুগন্ধি কুসুমসংপৃক্ত…গন্ধবহ সর্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে" কেননা ইন্দ্রের অমরাবতীর সন্নিকটেই পরমপ্রীতিকর নন্দনবন।

হিমালয়ের পথে পথে এই দেবভূমির বিস্তার। পুরাণ পুঁথিতে ইন্দ্রপুরী বা অমরাবতীর অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে সুমেরু পর্বতে। দেবভূমি সুমেরুর বিস্তৃতি হিমালয়ের ক্রোড়দেশকে ঠিক কতদূর অধিকার করে আছে এ নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখেছি। তবে ইন্দ্রের আবাস যে বদ্রিনাথ চৌখাম্বা ও কেদারনাথের পথেই, বিভিন্ন মত একত্রিত করলে তেমনই ধারণা হয়।… হিমালয়ের স্থানীয় অধিবাসীরা বদ্রিনাথ-চৌখাম্বাকেই সুমেরু পর্বত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। চৌখাম্বা ও সুমেরু দুটি শৃঙ্গ উত্তরকাশী জেলার অন্তর্ভুক্ত।…সুমেরু পর্বত কেদারনাথের উত্তরপূর্বে এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ দিকে চিহ্নিত। কেদারনাথের পূর্বে বদ্রিনাথ ও তারই সামান্য উত্তরপূর্বে নন্দন কানন।

প্রবাদ বলে, স্বর্গযাত্রার পথে যুধিষ্ঠির কেদারনাথে বিশ্রাম করেন। স্বর্গ থেকে অর্জুনের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় পাণ্ডবরা গন্ধমাদন পর্বতেই অবস্থান করেছেন। ব্রহ্মলোকের অবস্থিতিও আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি। দেখা যাক, স্বর্গে নীত অর্জুন দেবতাদের দ্বারা কীভাবে সংবর্ধিত হলেন।

সেই ইন্দ্রলোকে যখন অর্জুন এসে নামলেন তখন আর্যাবর্তের রাজ্যচ্যুত রাজকুমারকে যথোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গীতবাদ্যধ্বনি সহযোগে আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তিশিবির গার্ড অব অনার জানালেন পাণ্ডুরাজতনয় অর্জুনকে। প্রথমেই তাঁকে নন্দন কাননের মনোহর শোভা সৌন্দর্য ঘুরিয়ে দেখানো হল। তারপর নভশ্চরেরা নিয়ে এলেন তাঁকে বিমানক্ষেত্রে। হিমালয়ের সুউচ্চ বিমানাবতরণ ক্ষেত্রে অর্জুন দেখলেন, "সহস্র সহস্র (অনেকানেক) স্বেচ্ছাচারী বিমান…। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত,

কতকগুলি দ্রুতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।" (বন, কালী)। অর্থাৎ ইন্দ্রের অমরাবতীতে বৈমানিকরাই সবচেয়ে কর্মব্যস্ত।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অর্জুন আপ্যায়িত হলেন উত্তম খাদ্যপেয় সহযোগে দেবনারীদের নৃত্যগীতানুষ্ঠানে। মহাভারত লিখলেন : "ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্বচিত্তি, স্বয়মপ্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গাপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেন, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্তকীগণ··· তাঁহাদিগের স্থূললিত নিতম্বাভিনয় কম্পমান পয়োধর ও মনোহর হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত হইল।" (বন, ৪৮)। মিত্রপক্ষীয় বীরের সংবর্ধনা আজও তো এইভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

এই সকল মহাভারতীয় তথ্যাবলী থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে যে অজস্র প্রমাণ আহৃতিযোগ্য, সেসব তথ্য এমন একটি স্বর্গরাজ্যের কথা জানায় যেখানে ধর্মকর্মের কোনো ধ্যান ধারণাই নেই, আছে শুধু একটি আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। আর সেই যুদ্ধটি ঘটিয়ে তুলতে দেবতাদের বেশ দীর্ঘ পরিকল্পনাই করতে হয়েছিল। বদ্রিস্বর্গে অর্জুনকে তাঁরা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সামরিক শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

অর্জুন যখন দেবশিবিরে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছেন পাণ্ডবরা তখন দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে জনপদ থেকে অন্যতর জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন বিদগ্ধ ঋষির দ্বারা যুধিষ্ঠির লাভ করেছেন রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, দেবতাদের সামাজিক অনুশাসন ও অর্থনীতি—এই সমস্ত কিছুরই পাঠ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

হিমালয় শিবিরে অর্জুনের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সময়কাল ছিল পাঁচ বছর। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হলে অর্জুন তথাকথিত হিমালয় স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন। পাণ্ডবরা তাই হিমালয়ের পথে চললেন অর্জুনের অন্বেষণে। তাঁদের যাত্রাপথের বর্ণনা যে ভাবে পাওয়া যায় তাতে পূর্বাপর পথটির মানচিত্র খাড়া করা মুস্কিল। তবে তাঁরা প্রথম উত্তরকুরু থেকে যাত্রা করেন ও বিভিন্ন পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করে বদ্রিস্থানে উপনীত হন। পাহাড়ী পথ চলার সময় আমরা যেমন ঘোড়া বা পার্বত্য উপজাতীয় মানুষদের পরিবহন কাজে ব্যবহার করে থাকি, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পাণ্ডবরা তেমনি অনার্য বাহক সংগ্রহ করে নেন। মহাভারত বললেন, "···রাক্ষসগণের আশুগতি প্রযুক্ত অনতিবিলম্বে অতি বিস্তীর্ণ পথ অল্প পথের ন্যায় উত্তীর্ণ হইলেন।" পাণ্ডবদের বহনকারী পার্বত্য অনার্য বাহকদের পরিচালনা করেছিলেন ভীমের অনার্যা পত্নী

নৈনিতাল কন্যা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ। উত্তর গাড়োয়ালের পথঘাট ঘটোৎকচের ভালই চেনা ছিল। নন্দনকানন হয়ে পথপ্রদর্শক ঘটোৎকচ ও ব্রাহ্মণগণসহ পাণ্ডবরা কুবেরাবাস কৈলাস পর্যন্ত উঠে যান। এই পথে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন ভীমসেন।

একদিন মনোহর পার্বত্য উপত্যকায় বসে দ্রৌপদী যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, ঈশান কোণ থেকে সেই সময় একটি ব্রহ্মকমল উড়ে এসে সন্নিকটে পড়ল। দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, 'হে বৃকোদর!···প্রচুর পরিমাণে এতজ্জাতীয় পুষ্প আহরণ কর; আমি তৎসমূহ কাম্যকবনে লইয়া যাইব।' ভীমের প্রতি এই আবদার প্রকাশের আগে তিনি বলেছিলেন, যে ফুলটি পূব দিক থেকে উড়ে এসেছে, সেটি তিনি ধর্মরাজকে উপহার দেবেন।

আগেই বলেছি, ভীমকে অনার্যপুত্র হিসেবে সন্দেহ করার বেশ কিছু কারণ মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এই ঘটনা তারই আর এক সাক্ষ্য। পাণ্ডবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী পুরুষ ভীম। পাণ্ডবরা যখন অরণ্যচারী, যখন তাঁরা হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকায় ভ্রমণকারী ভীম তখন সবার পুরোভাগে। ভীম অনার্য ঘটোৎকচের পিতা। পিতাপুত্র শ্রমে অক্লান্ত, দৈহিক বলে আদিবাসী দানবতুল্য, মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। দীর্ঘপথ অতিক্রমণের সময় পাণ্ডবরা ভীমকেও বাহক হিসেবে ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। প্রতিদানে অতিভোজনপ্রিয় ভীমের জন্য খাদ্যের এক ভাগ ও নিজেদের জন্য অপর অর্ধাংশের ব্যবস্থা করেছেন যুধিষ্ঠির। সাধারণত হীনবুদ্ধি কিন্তু অধিক পরিশ্রমীরা ভোজনসুখী হয়ে থাকেন। সূক্ষ্মবুদ্ধির কারিগরেরা অল্পাহারী হন। অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীমের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবিশেষ লক্ষণীয়। সেজন্যেই ব্যঙ্গার্থে ভীমসেন বৃকোদর হিসেবে আর্য প্রভুদের দ্বারা প্রায়শই উল্লিখিত। এমন কি নির্মম দ্রৌপদী যখন তাঁকে ব্রহ্মকমল আনয়নের জন্য অনুরোধ করছেন তখনও ভীমকে তিনি অক্লেশে 'বৃকোদর' বলেই সম্বোধন করেছেন। ভীমের প্রতি অনুরক্তির একান্ত অভাবই এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। তত্রাচ অনার্যসুলভ সারল্যবশত ভীম বহুপতির নর্মসহচরী দেবজন প্রেরিতা মোহিনী নারী দ্রৌপদীর প্রতি অবুঝ প্রণয়পাশে আবদ্ধ। যে ফুলটি পূর্বদিক থেকে বায়ুভরে উড়ে এসে দ্রৌপদীর নিকটে পতিত হয়, পাঞ্চালী সেটি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব সুদর্শন যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেবেন একথা জানিয়ে ভীমকে বললেন, হে বৃকোদর, যদি তুমি বস্তুতই আমার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে থাক, তবে যাও, এই সুন্দর অপার্থিব ফুল নিয়ে এসো আমার জন্য।

বদ্রিকাশ্রমের পূবে নন্দনকানন, উত্তর-পূর্বে মানস কৈলাস। ভীম চললেন পুষ্পাহরণে। ভীম যদি গোবিন্দ ঘাট অঞ্চল থেকে নন্দনকাননের (ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-ই কি সেই নন্দনকানন, যা একাধারে বদ্রিনাথ ও মানস-সরোবরের সন্নিকটস্থ ও মধ্যস্থ ?) দিকে গিয়ে থাকেন তবে তাঁকে উনিশ কিলোমিটার বা তারও বেশি পার্বত্যপথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সেই অজস্র সংখ্যায় পাওয়া যায় সৌগন্ধিক ব্রহ্ম কমল।

১৯৩১ সালে সরকারীভাবে এই পার্বত্য পুষ্পোদ্যানটির অস্তিত্ব ঘোষিত হলেও পার্বত্য উপজাতিরা বহু পূর্বকাল থেকেই এই উদ্যানের সংবাদ রাখতেন। কিন্তু যক্ষরক্ষিত সেই উদ্যানে প্রবেশের সাহস তাঁদের ছিল না। বৈদেশিক কামেট এক্সপিডিশন আবহমানের সংস্কার ও ভীতি ভেঙে দিলে আজ দুনিয়ার ভ্রমণকারীরা সেখানে দলে দলে ঘুরে আসছেন। কুবের-রক্ষীরা কুবেরের পুষ্পোদ্যান পাহারা দেন, মহাভারতের এই তথ্যই কি পার্বত্য জাতিগুলির কুসংস্কারের কারণ? সেকালে ঐ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশে ভীম বস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কুবের-রক্ষীদের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষ বেধে যায় ভীমের। অবশেষে সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কুবের তাঁর একক উড্ডীন যানে চেপে ভীমের সম্মুখে দর্শন দেন ও দেবানুগত পাণ্ডব হিসেবে তাঁর অনধিকার প্রবেশ ক্ষমা করেন।

গন্ধমাদন পর্বত বা ইন্দ্রকীল পর্বত থেকে গোপন পার্বত্য পথ ভেঙে দেবতাদের সংরক্ষিত অঞ্চল, নারায়ণ পর্বত বা হিমালয় স্বর্গে যাওয়া যেত, দেবরক্ষীরা সেই গোপন পথ অবরোধ করে থাকতেন। ভীমসেন এমনই একটি পথমুখে এলে বাধা পেলেন। দেখলেন, বানরবেশধারী এক পালোয়ান পথ আগলে আছেন। মহাভারত কথক বললেন, ঐ স্বর্গদ্বার রক্ষীই রামভক্ত হনুমান। মহাভারতীয় যুগে তিনি দেবমার্গ পাহারা দিচ্ছেন। সবচেয়ে কৌতুককর ব্যাপার, ব্যস্ত ভীমসেনকে দাঁড় করিয়ে হনুমান তখন রামায়ণ কাহিনী শোনাতে বসলেন এবং সুযোগমত জ্ঞান দান করতেও ভুললেন না। বুঝলাম, দক্ষিণী বীর হনুমানের পক্ষে যেমন ঠিক এই সময়ে হিমালয়ে দেবমার্গ রক্ষায় মোতায়েন থাকা সম্ভব নয়, তেমনিই ভীমের পক্ষেও যুধিষ্ঠিরোপম ধৈর্য ধারণ করে রামায়ণ কথা শোনা যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়। তাই ঘটনার পারম্পর্যে হনুমান কাহিনীটিকে প্রক্ষিপ্ত ও পরবর্তী সংযোজন বলেই ভেবে নিতে হয়।

বানরবেশী এক পালোয়ানের কথা এসে পড়ায় কোনও অতি উৎসাহী কবির ধারণা হয়ে থাকতে পারে, স্বর্গ ও দেবতার অধিষ্ঠানে বানরবেশী পালোয়ান হনুমান ভিন্ন অপর কেউ হতে পারেন না। আর যদি তিনি হনুমানই হয়ে

থাকেন তবে সীতাহরণের গল্পটি তাঁর মুখে বসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তো ভক্তিমান কবি অস্বীকার করতে পারেন না। সম্ভবত এইসব বিবেচনার পরই বানরবেশী রক্ষীর প্রসঙ্গে কবিবর হনুমানকে আমদানী করেছিলেন। তাছাড়া সাক্ষাৎকারের স্থানটিও গন্ধমাদন পর্বত। দেখা গেল, হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাতের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনায় কিন্তু ভীমসেন আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে চমকিত হলেন না বা পরে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কাছে সবিস্তারে সেই পুণ্য দর্শনের কথাও বর্ণনা করলেন না। যে মহাভারতকার কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'শতযোজন বাগ্মিতা'য় অভ্যস্ত, হনুমান প্রসঙ্গটিকে তিনি নিশ্চয় হেলা-ফেলা করতেন না। আরও কিছু বাগাড়ম্বর রচিত হত হনুমান বিষয়ক। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি।

দেবরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পালোয়ান অনার্য পলটনেরও অভাব ছিল না। রক্ষীটি ছিলেন কোনো অনার্যকুলতিলক দেবানুগত প্রহরী। ইংরেজরা দুশো বছর ভারত শাসন করেছিলেন ভারতীয় সিপাহী শান্ত্রীর সাহায্যেই। বহিরাগত দেবতারাও নিশ্চয় সংগ্রহ করেছিলেন প্রসাদলোভী কতিপয় অনার্যকে, যাঁরা দেবতাদের প্রভুজ্ঞানে সেবা করে গেছেন। প্রসঙ্গত ময় দানবের উল্লেখ করতে পারি। সেই অনার্য শিল্পী দেবব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের অনুগত ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন কৃষ্ণার্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত। এখন প্রশ্ন বানরবেশী প্রহরীকে অনার্য হিসেবেই বা দেখব কেন?

অনার্যদের মধ্যেই সেকালে (এমন কি একালের আদিবাসীদের মধ্যেও) টোটেমী জাতির অস্তিত্ব ছিল ও আছে। নরাকৃতি বানরের বংশগতির স্মরণচিহ্ন হিসেবে কোনো কোনো অনার্য উপজাতি হয়ত বানর টোটেম লাঙ্গুল ধারণ করতেন। লাঙ্গুলটি ছিল তাঁদের বংশধারার প্রতীক। এভাবে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের টোটেম ধারণ ও পূজার ব্যবস্থা আছে আদিবাসী সমাজে। বরাহ রূপ ধারণকারী দানবও এরকমই বরাহ টোটেমধারী ছিলেন। কিন্তু কথকতার পর্যায় ভেদে বিভ্রান্ত কথকের দ্বারা কালক্রমে তাঁরা হয়ত এক একটি বরাহ, বানর, মূষিক, কাঠবিড়ালীতে পরিণত হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলি, লেজবিশিষ্ট মানুষের কথা বহির্ভারতেও পাওয়া যায়। শুধু পুরাণে নয়, ইতিহাসেও। সেকথা যুদ্ধের আকৃতি অধ্যায়ে আগেই বলেছি।

সুতরাং লাঙ্গুলযুক্ত মনুষ্যাকৃতি জীবকে চতুষ্পদ জন্তুরূপে কল্পনা করার কারণ নেই। লাঙ্গুলবিশিষ্ট স্বর্গদ্বারীর সঙ্গে হনুমানের সাদৃশ্য কল্পনা করে মহাভারতের কথক রামায়ণের গল্পটি গেঁথে দিয়েছেন। সুযোগটুকু সৃষ্টি করে

নিয়ে কিছু জ্ঞানদান করা হয়েছে এবং গল্পটি অহেতুক একটি রূপকথার মায়াজাল সৃষ্টির পর একটি বিচ্ছিন্ন অনুপুঙ্খ রচনা করেই পরিতৃপ্ত হয়েছে। তাই বিষয়টির জের পরবর্তী কাহিনীর ওপর রেখাপাত করেনি। তবে এখানে ভীম সম্পর্কে একটি সংবাদ আমাদের চিন্তা আকৃষ্ট করেছে অবশ্যই।

ভীম সেই স্বর্গের দ্বাররক্ষককে রামভক্ত হনুমানজ্ঞানে তাঁর কাছে আপন পরিচয় ব্যক্ত করে বলেছেন, তিনি পিতৃসূত্রে হনুমানের ভাই। হনুমান পবনপুত্র, ভীমও তাই।

এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের পূর্ব ধারণার পক্ষে কিছু সমর্থন পেতে পারি। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের আদিবাসিন্দা বানর টোটেমধারী হনুমানের সঙ্গে ভীমের রক্ত-সম্পর্কের কথা জানার পর বলতে পারি যে, ভীম নিজেও ছিলেন দক্ষিণী অনার্য বীরের ঔরসজাত সন্তান। দেবানুগত অনার্য বীর পবনদেব হয়ত দেবকার্য সাধনে সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ দেবজন গোষ্ঠীতে উন্নত হয়েছিলেন। কুন্তী তাঁকে তাঁর দূরভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে রতিক্রীড়ায় আহ্বান জানান। কেননা দেবশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দৈহিক বলে প্রচণ্ড বলীয়ান পবনের ঔরসে একটি পুত্র কামনা করেছিলেন পাণ্ডু।

পবনদেবটির পক্ষে অনার্য হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? বহু অনার্য প্রধানই তো দেবজন গোষ্ঠীতেও ঠাঁই পেয়েছেন। হয়েছেন তাঁরা দেবরাষ্ট্রের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর বা নাইট হুড প্রাপ্ত বিশেষ সম্মানীয় প্রধান। স্বয়ং দেবাধিনায়ক শঙ্করের পরিচয়ও পরবর্তীকালে অনার্য দেবতা রুদ্রের ভাবকল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শিব (মহেঞ্জোদড়োতে শিবপশুপতির মূর্তি পাওয়া গেছে), উমা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গণপতি এবং মুরুকান বা কার্তিকেয় সকলেই মূলতঃ দ্রাবিড়ীয় দেবগোষ্ঠীভুক্ত।[৪]

এ থেকে এ কথাই পরিষ্কার বুঝি যে, দেহধারী আর্যদেবতাদের ওপর বুদ্ধিমান আর্যপ্রভুরা বিজিত অনার্য দেবতাদের কিছু কিছু ভাবমূর্তি আরোপ করে পরবর্তীকালে অনার্যভক্তিকেও সেই মহাকাশচারী দেবতাদের প্রতি আকর্ষণ করেন। দুর্ধর্ষ অনার্যদের ওপর ক্রমশ নিজেদের ধর্মীয় প্রভাব এভাবেই তাঁরা বিস্তার করেছিলেন। এই আদানপ্রদানের কালে দুই-একজন খাঁটি অনার্য বীরকেও আর্য দেবগোষ্ঠীতে স্থান করে দেওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। পবনদেবের আর্য-দেবজন গোষ্ঠীতে এইভাবেই পদোন্নতি ঘটেছিল কিনা গবেষকদের কাছে আমি সে প্রশ্নটি তুলে ধরতে চাই। ইতিহাস অনুসন্ধানের

ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের চিন্তার ওপর নতুন আলোকপাত করতে পারে। মনে রাখতে হবে, দৈহিক বলবিক্রমে অনার্য বীরবৃন্দের কাছে আর্য বুদ্ধিজীবীরা নিতান্তই নগণ্য ছিলেন। তাই দানব রাক্ষস প্রমুখ অনার্য দলপতিদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে ভীমই ছিলেন পাণ্ডবদের একমাত্র বল-ভরসা। ভীমের রণপদ্ধতিও ছিল অনার্যসুলভ। বহিরাগত দেবতাদের সহায়তায় আর্যরা ভারতের আদি বাসিন্দাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন কূট বুদ্ধি বলে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বুদ্ধির বৈজ্ঞানিকীকরণ ছিল অত্যাবশ্যক। জীবন এক খরস্রোতা মহানদী। তা এক ঠাঁই থেমে থাকলে ক্ষয় অনিবার্য। জীবনের এই অমোঘ নিয়মকে প্রমাণ করার জন্যই ভূপৃষ্ঠ থেকে আদি পিতাদের ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা এক নয়া বুদ্ধিমান আগন্তুকদের অনুপ্রবেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। সরল ধর্মাচরণের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে উৎখাত হয়েছেন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যশালী অনার্য দলপতিরা। তাঁদের স্থান দখল করেছেন এমন এক নরগোষ্ঠী, নয়া সভ্যতার অগ্রদূত বহিরাগতদের পাদপদ্মে আপন আত্মাকে পর্যন্ত সমর্পণ করে বুদ্ধিমান নভোচারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হতে যাঁদের দ্বিধা সঙ্কোচ ও আপত্তি ছিল না। ক্ষমতাচ্যুত ও ক্ষমতাহীনরা এভাবেই একদিন দখল নিয়েছিলেন ক্ষমতাবান এক স্থিতিশীল সভ্যতার, মানসিক বাড়বৃদ্ধির অভাবে যে সভ্যতার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছিল।

মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার ধ্বংসের মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে যে একটি চমকপ্রদ কারণ ঐতিহাসিকদের অবাক করে তা হল, বন্যাপ্লাবিত একই ভূমির ওপর নগরপত্তনের পণ্ডশ্রম। যে ভূমিখণ্ড একই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারম্বার বিধ্বস্ত হয়েছে, অদ্ভুত মানসিক স্থাণুত্বের জন্য সেই ভূমিখণ্ড থেকে অন্যত্র নগরীর স্থানান্তরিকরণ করা হয়নি। অথচ সভ্যতা বিকশিত হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখায়। বাস্তবিক, এই স্থাণুত্বের কোনো ব্যাখ্যা নেই। অন্যদিকে বহিরাগতদের প্রদত্ত শিক্ষার মূল মন্ত্র ছিল চরৈবেতি। এগিয়ে চলো। সম্প্রসারিত হও। প্রয়োজন অনুসারে প্রসারিত হও।

কুবের-সরসী থেকে পুষ্পচয়নের সময় কুবেরের রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে ভীমের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সম্ভবত কোনো দূরভাষ যন্ত্রের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং কুবের তা জানতে পারেন। দূরভাষ যন্ত্র ভিন্ন কুবেরের কাছে তখনই সেই সংঘর্ষের সংবাদ পৌঁছানোর অপর উপায় ছিল না। আমরা দেখেছি, যোগ বলে সেই বুদ্ধিমান দেবতারাও কিছু জানতে পারতেন না, স্বয়ং মহাদেব বা শঙ্করকেও দূত মারফৎ খবরা খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রদেরও একই

অবস্থা। যম তো ছেলেমানুষ। উপনিষদের পাতা থেকে যতদূর জানা যায়, যম ছিলেন এই গ্রহেরই মানুষ, পদমর্যাদায় তিনি দেবজন গোষ্ঠীভুক্ত হন। সুতরাং তিনি এমন কি বুদ্ধিমান দেবতাদের মত ক্ষমতাসম্পন্নও ছিলেম না। তিনি দেবতাদের পুলিস বাহিনীর বড়কর্তা মাত্র। বিজ্ঞানী দেবতাদের দেওয়া উয়্যারলেস যন্ত্র তাই তাঁর পক্ষে তাৎক্ষণিক সংবাদ সংগ্রহের একমাত্র উপায় ছিল। (দা. ম. স্ব. দ্রঃ)।

সেকালে দেবতারা যে এই যন্ত্রের বহুল ব্যবহার করতেন তার আভাস পাওয়া যায় বাইবেলে। সদাপ্রভুর সঙ্গে মোজেসের কথাবার্তা হত একটি বার্তা প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে। দেবতা সদাপ্রভুর আদেশে নির্মিত সেই ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি সম্পর্কে দানিকেন লিখেছেন, "ঈশ্বর মোজেসকে বললেন, 'অনুগ্রহ সিংহাসন' থেকে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু কেউ যেন 'আর্কে'র খুব কাছে না আসে। আরো বললেন, 'আর্কে' যেতে হলে কেমন পোশাক, কী ধরনের পাদুকা ব্যবহার করতে হবে।…" দানিকেনের ব্যাখ্যা, "নিশ্চয়ই 'আর্ক'টা তড়িতপ্রবাহিত ছিল। মোজেস যে নির্দেশ রেখে গেছেন সেই অনুযায়ী 'আর্ক'টি পুনর্নির্মাণ করলে কয়েক শ ভোল্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। কনডেনসার তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়েছিল সোনার পাত, একটিতে পরা-বিদ্যুৎ আর একটিতে অপরা-বিদ্যুৎ প্রবাহিত ছিল। উপরন্তু, অনুগ্রহ সিংহাসনের দুপাশের দুটি পরীর মূর্তি যদি চুম্বকের কাজ করে থাকে তাহলে মোজেস এবং আকাশযানের মধ্যে বার্তা প্রেরণের পক্ষে লাউড স্পীকারটি নিখুঁত হয়েছিল। 'আর্ক' নির্মাণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বাইবেলে দেওয়া আছে।… আর্কের চারপাশে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা যেতো এবং যখনই কোনো সাহায্যের কিম্বা উপদেশের প্রয়োজন হত, তখনই মোজেস বার্তা প্রেরকটি ব্যবহার করতেন। মোজেস তাঁর ঈশ্বরের বাণী শুনেছেন কিন্তু কখনো তাঁকে চোখে দেখেননি

বাইবেলে পুরা ঘটনার যতদূর সম্ভব আনুপূর্বিক প্রতিবেদন প্রতিবেদকের বুদ্ধিবিচারানুসারে লিপিবদ্ধ আছে যা মহাভারতে নেই। তাই মহাভারত 'দৈববাণী'র কথা বলেন, কিন্তু সে দৈববাণী যে লাউড স্পীকারের মাধ্যমেই অলক্ষ্য থেকে প্রচারিত হয়, এই সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটির কথা একেবারেই গোপন রেখে অলৌকিকতার সৃষ্টি করেন। মনে হয়, মহাভারতকার হয়ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাখ্যা না করে মানুষের মনে এক বিচিত্র ধোঁকার সৃষ্টি করতে যত্ন নিয়েছিলেন, নচেৎ মোজেসের মত যথার্থ

প্রতিবেদন রচনায় অনুৎসাহী বা অক্ষম ছিলেন। মহাভারতের পর্বে পর্বে আমরা বহু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সাক্ষাৎ লাভ করেছি যা মহাভারতকার বিশ্লেষণ করেননি, ইঙ্গিতেও সেই বিজ্ঞানের পরিচয় রেখে যাননি। এর কারণ কি সেই মন্ত্রগুপ্তি? সাধারণের কাছ থেকে প্রকৃত জ্ঞান গোপন রাখার প্রয়াস? মাঝে মধ্যে আমরা কিন্তু কবির অসাবধানতাবশত আসল খবর পেয়ে গেছি। যেমন জানতে পেরেছি, ইন্দ্র যন্ত্র-সহযোগে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন; জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবদের উদ্ধার কার্যে বিদুর পাঠিয়েছিলেন যন্ত্রচালিত বাতসহা নৌযান যার অর্থ একটি আধুনিক মোটরবোট বিশেষ; দুর্বাসা দেবতাদের আহ্বানের জন্য কুন্তীকে দিয়েছিলেন একটি দূরভাষ যন্ত্র। মহাভারতের বিভিন্ন দৈব্যাস্ত্রেরও আজ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে। মহাভারতের মুহুর্মুহু আকাশবাণীকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

ভীমসহ দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ যখন বৈশ্রবণ আবাসের দিকে যাবেন বলে পরস্পর কথাবার্তা বলছেন, তখন তাঁরা আকাশবাণী শুনলেন। দেবশিবিরের আদেশ হল, "হে রাজেন্দ্র! সেই দুর্গম দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন কর।"—কী অদ্ভুত সংরক্ষণ ব্যবস্থা! পাণ্ডবদের অলক্ষে দেবগুপ্তচররা সর্বদা তাঁদের সঙ্গ নিয়ে ঘুরছে এবং গতিবিধি দেবশিবিরের কর্তাব্যক্তিদের দূরভাষ মারফৎ জানিয়ে দিচ্ছে। দেবতাদের সংরক্ষিত অঞ্চলে পাছে দলবলসহ পাণ্ডবরা উপস্থিত হন, তাই সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পিকার মারফৎ তাঁদের সতর্কও করে দেওয়া হচ্ছে। বস্তুতই দেবপ্রহরীরা ছিলেন অতন্দ্র, তাঁদের প্রহরার ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত সামরিক ব্যবস্থা।

শুধু অথর্ববেদেই নয়, স্বর্গদ্বাররক্ষীদের কথা সুস্পষ্টভাবে মহাভারতেও কথিত আছে। দেবশিবিরের সামরিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত হলে অলকাপুরী থেকে অর্জুন প্রত্যাগমন করবেন। পাণ্ডবরা তাঁকে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে বসবাস করছিলেন। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ তখন দেবমার্গের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছিলেন পাণ্ডবদের।

ঋষভ পর্বত আর কৈলাস পর্বতের মধ্যস্থিত ওষধি পর্বতের নাম গন্ধমাদন। এই পর্বতে নানাজাতীয় ওষধি বা উদ্ভিদের প্রাচুর্য। গন্ধমাদন কাননের অপূর্ব শোভা দর্শন করে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "এই গন্ধমাদন সানুতে কোনো বৃক্ষই কণ্টকিত বা অপুষ্পিত নাই, সমুদয় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ।" তিনি দেখেছেন, ঐ পর্বতে "দেবগণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে।" আবার কেবলমাত্র

ওষধিই নয়, সেই মনোহর পার্বত্য উপত্যকা বিভিন্ন ধাতব ঐশ্বর্যেও সমৃদ্ধ যুধিষ্ঠির বলছেন, "রজতাদি নানা ধাতু এই মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে।" এই শোভা-সৌন্দর্যশালিনী পার্বত্য উপত্যকা যেন দেবতা ও গন্ধর্বগণের শৈলাবাস। সেখানে প্রথম পাণ্ডব মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছেন, "গন্ধর্বগণ স্ব স্ব প্রণয়িনী ও কিঙ্করগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতেছেন।" কিন্তু দেবগণের ক্রীড়াভূমি বলেই এ জায়গা সমতলবাসী মানুষের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ স্থান। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ এ বিষয়ে পাণ্ডবদের সাবধান করে বলেছেন, এই পর্বতের উপরিভাগে প্রতি পর্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে। উহা এইস্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় যাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ, সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেববৃন্দের বিহারস্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐ স্থানে গমন করিলে অত্রত্য প্রাণিগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়না করে।··· যদি কোনো মনুষ্য চপলতাপ্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাহাকে তাড়না করে।"

অর্থাৎ দেখামাত্র বিদ্ধ করো। 'শুট অ্যাট সাইট'—দেবভূমিকে নিরাপদ রাখার জন্য সন্দিগ্ধ বহিরাগতগণ এমনই কড়া ও নির্মম আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন পার্বত্য আদিবাসী রাক্ষস সেবকগণের প্রতি। বস্তুত তাঁদের আশঙ্কার যথেষ্টই কারণ ছিল। তাঁরা বহিরাগত। এই পৃথিবীর সুখসম্পদে তাঁরা ভাগ বসিয়েছেন। উন্নত অস্ত্রবলে পদানত করেছেন পৃথ্বীমাতার পুত্রদের। এবং নিরন্তর চক্রান্ত করে চলেছেন সমতলবাসীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য। সুতরাং তাঁদের শিবিরের নিরাপত্তা কঠোরভাবেই রক্ষা করতে হত। মাঝে মধ্যেই সমতলবাসীরা আক্রমণ করতেন। সুযোগ বুঝে ক্ষতি করতেন বহিরাগত দেবতাদের এবং তাঁদের অনুগামী এই পৃথিবীরই বাছা বাছা দেবানুগতদের যাঁরা মহর্ষি ও দেবর্ষিরূপে সর্বদা ভিন্‌গ্রহবাসীদের সেবায় ও পৃথ্বীপুরুষদের স্বাধীনতা হরণে নিযুক্ত থাকতেন। যখন-তখন সংঘর্ষ তাই বেধেই থাকত।

শুধু বনপর্বেই নয়, হিমালয়ের পাথুরে স্বর্গে অর্জুন ও পাণ্ডবদের একাধিকবার গমনাগমন করতে হয়েছে। জয়দ্রথ বধের প্রাক্কালে কৃষ্ণসহ অর্জুন বিমানযোগে হিমালয়ে গিয়ে শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিকে অবশ্য কোনো এক বুদ্ধিমান কবি স্বপ্নদর্শন আখ্যা দিয়ে রহস্যাবৃত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যথেষ্ট কৃতকার্য হতে যে পারেন নি। যথাস্থানে তার ব্যাখ্যা করা যাবে। আর আমরা সকলেই জানি, যুধিষ্ঠির হিমাচলের স্বর্গারোহিণী

-পর্বতাঞ্চল থেকেই দেববিমানে করে অজানা কল্পিত এক স্বর্গলোকের দিকে যাত্রা করেন।

শুধু স্বর্গ নয়, হিমালয়েই ছিল যমরাজের সেই যন্ত্রণাদায়ক কারাগার, যাকে ভীত পৃথ্বীবাসীরা নরক হিসেবে আখ্যাত করেছেন। যমরাজের সেই নরকের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে।

১। তিব্বতীয় রাজ-কুলজী গিয়েলরাপে বলা হয়েছে: "আদিতে পৌরাণিক রাজা ছিল সাতাশ জন। তাদের সাতজন ছিল স্বর্গবাসী, স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল তারা।" [প্রমাণ/দানিকেন/অনু,—অজিত দত্ত]

টাইগ্রিস ইফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গ্রীসীয় নাম মেসোপটেমিয়া, বর্তমান ইরাক। দূর অতীতে ঐ অঞ্চল উত্তরে ছিল আক্কাদ আর দক্ষিণে সুমের নামে পরিচিত। সুমেরের ধনসম্পত্তি ও জমিজমার মালিক ছিলেন এক একজন নগরদেবতা। দেবপূজক পুরোহিতরাই দেবতার প্রতিনিধিরূপে ভোগ দখল করতেন বিপুল সম্পত্তি। অনুন্নত সাধারণের জন্য তাঁরা পরকালের সুখের আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দিতেন না। সে যুগের নথিপত্রে পাওয়া যায় দেবপ্রতিনিধি পুরোহিতরা প্রজাসাধারণের ওপর খুশিমত শোষণ ও অত্যাচার চালাতে পারতেন। মিশরেও ছিল অনুরূপ অবস্থা। সাধারণের শ্রম ও রক্তমাংস দিয়ে তৈরী হয়েছিল শুধু দেবতার মন্দির, পুরোহিত ও ভূস্বামীদের বিলাসাগার এবং মৃতের সঙ্গে মাটিচাপা ধনসম্পদ ও জীবন্ত মানুষের স্তূপ, পিরামিড। ইংল্যাণ্ডের এক তৃতীয়াংশ জমি ভোগ করতেন পাদ্রীরা।

—(পৃথিবীর ইতিহাস/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)।

ভারতে পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। লিখেছেন: "গঙ্গাতটের জীবনযাত্রা তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকিলেও সাধারণ সম্প্রদায়ের তাহাতে বড় লাভ ছিল না। রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য সেই সময় পার্থিব শাসক ক্ষত্রিয় এবং দৈবিক শাসক ব্রাহ্মণ—এই দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়া পড়িত।" (মানব সমাজ)।

দেবতার কাছ থেকেই দেবমনোনীত শাসক ক্ষমতা লাভ করতেন। পুরাযুগে সর্বত্রই তাই রাজাই দেবসন্তান। চীন, জাপান, মিশরের শাসকবর্গের উৎপত্তি সূর্য দেবতার বংশে। ভারতেও সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন। কিন্তু যেখানে নভশ্চর দেবতাদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়নি, পৃথিবীতে প্রায় একই যুগে উদ্ভূত সভ্যতার ধারা থেকে সেখানের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই কি দেখা যায়?—

"ঈশ্বরের ধারও ধারে না অথচ সামাজিক নীতিবিধান মানিয়া চলে, এমন সমাজ আদিম অনুন্নত মানুষ জাতির মধ্যে ছিল।···টাসমানীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতে গিয়া দেখা গেল যে ঐ ভাষায় ঈশ্বর, পরমার্থ শক্তি, স্বর্গ ইত্যাদি ভাববোধক একটি শব্দও নাই।" (মার্ক্সীয় দর্শন/সরোজ আচার্য)। বস্তুত 'ঈশ্বর' শব্দটির সঙ্গে 'দেবতা' ও পরমা শক্তিকে যুক্ত করার কৃতিত্বও ভাববাদী দার্শনিকদের। আদিতে ভগবান ও ঈশ্বর শব্দের ভিন্ন অর্থই ছিল।

"নিঘণ্টু মতে তার (ঈশ্বর শব্দের) চারটি প্রতিশব্দ আছে; রাষ্ট্রী, অর্থ, নিযুত্ব এবং ইন। কিন্তু কোনটিরই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নেই। বিস্তার বা বৃদ্ধি-কর্মপরায়ণ অর্থে এগুলি ব্যবহৃত।···

ধন, অন্ন প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেরই বিস্তার বা বৃদ্ধি।" (ঋগ্বেদের সমাজ ও চিন্তা/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)। ভগবান শব্দটিও ধন বৃদ্ধি অর্থেই প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, "ঋগ্বেদে 'ভগ' মানে পার্থিব সম্পদ (ধন) বা তার অংশ (ভাগ); ভগবান মানে ধনবান বা অংশবান।" (ঐ)।

দেবতারা শুধু রাজাই বানাননি। ওঁরা এক বিশিষ্ট সমাজবিন্যাস সৃষ্টি করে পুরোহিতের দ্বারা পৃথ্বীমানবকে কায়েমীভাবে শোষণ করার ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছিলেন। তাই দেবতার সঙ্গে, দেবপুত্র রাজবংশের সঙ্গে এক নয়া শ্রেণীব্যবস্থাও একই কালে সৃষ্টি হয়েছিল। কোথাও তা পাকা ব্যবস্থা হয়েছে। কোথাও তা রূপগ্রহণ সুরু করেছিল। ভারতের অবস্থা সম্পর্কে রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন: "ধর্মশাস্ত্রকারেরা দেশের রাজা ও প্রজার কর্তব্য সম্পর্কে বহুপ্রকার বাগ্‌বিস্তার করিয়াছেন। মোটের উপর শাসক ও রাজার জন্য এখানেও প্রজার কায়িক শ্রম এবং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছে—কিন্তু প্রজার অধিকারের তালিকায় পরজন্ম বা পরলোকের স্বর্গস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নির্দেশ দেওয়া হয় নাই।" (মানবসমাজ/রাহুল সাংকৃত্যায়ন)।

এইসব কূট উদ্দেশ্যেই বেদে যা ছিল না, পরবর্তী সময়ে তা-ও তাঁরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পুরুষসূক্তে সমাজদেহকে একদেহী পুরুষ (ব্রহ্মা) কল্পনা করে বলা হয়েছে, সেই পুরুষের মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, বাহুদেশ রাজন্যবর্গ জঙ্ঘা বৈশ্য এবং পদযুগল শূদ্র। এইভাবেই জনশাসিত ভূভাগে বর্ণ বিভেদের সৃষ্টি। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 'গীতা'ও এমনি এক অনুশাসনের প্রবর্তনার জন্যই সৃষ্ট। সেখানেও সাধারণকে সর্বস্ব বিনাতর্কে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে কায়েমী স্বার্থের পাদপদ্মে। আর কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান খাড়া করে তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, গুণকর্মানুসারে আমিই এই বর্ণভেদ করিলাম। পুরুষসূক্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পাকা করা হয়েছে ভগবৎ-বাণীরূপে কথিত গীতাগ্রন্থে।

ভারতের ইতিহাসে এই বিষয়টির প্রভাব আরও স্পষ্ট করে বুঝবার জন্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবলম্বনে রচিত গোপাল হালদারের 'সংকৃতির রূপান্তর' গ্রন্থটি পাঠক পড়ে নিতে পারেন। তিনি লিখেছেন, "পুরোহিত' শ্রেণী শুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণরূপে সমাজদেহের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত বলিয়াই ইহাতে (পুরুষসূক্তে) দাবি করিতেছেন। অর্থাৎ যোদ্ধ সমাজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যুদ্ধবিজয়ের পরে আর বেদাভিজ্ঞ যাজকশ্রেণী মানিয়া লয় নাই।"

তাই মহাভারতে আমরা দেখলাম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হলেও প্রকৃত শাসক হয়ে বসেছিলেন ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণনেতা বিদুর। এবং এই ব্যবস্থাটি কায়েম করার জন্য হিমালয়স্থ দেবশিবির আর্যাবর্তকে দেশীয় রাজন্যবর্গের রক্তে বিধৌত করেছেন। তাই সে যুগে প্রজার উন্নতি চোখে পড়ে না। দেখতে পাই, তৈরী হয়েছে শুধু বিশাল মন্দির ও পুরোহিতদের বিলাস-আশ্রম। পরবর্তী ঐতিহাসিককাল এই প্রথারই জের টেনে বিক্ষোভে বিদ্রোহে উত্তাল হয়েছে। গোপালবাবু লিখেছেন, বৌদ্ধ ও জৈনমত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জাতিভেদকে আক্রমণ করে। মৌযযুগে শূদ্র মহাপদ্ম নন্দ সম্রাট হলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও শূদ্র (বৃষল ক্ষত্রিয় নয়)। এই সময় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। সেখানে ব্রাহ্মণ্যপদের ঔদ্ধত্য ও শূদ্রবিদ্বেষী উগ্রতা নেই।...অশোকের শিলালিপিতে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনগুলি প্রতিহত হল। তারপর ফের ফিরে আসে মনুসংহিতার যুগ। আবার হিটলারি দাপট, ব্লাড থিওরি থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর শাসক শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট অধিকারের দাবি। শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘৃণা, অবজ্ঞা। মনুসংহিতাই First code of Law of Fascism। "বেদের পরিবর্তে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া (বৌদ্ধজাতকের তুলনায় দেখি, ইহাতে

সাধারণ জীবনযাত্রা নাই), বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইল।" (ঐ)।

রাজাদের হাতে সেই পুরাযুগে পুরোহিতরা তুলে দিয়েছিলেন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি। আজও বহু আইন সেই আদি অনুশাসনগুলিকে মান্য করে বলবৎ আছে। ইংরেজ পাদ্রী ও সাহিত্যিক চার্লস কিংস্লী লিখে গেছেন: "We have used the Bible as if it were a special constable's hand book—an opium dose for keeping beasts of burden patient while they were being over-loaded—a mere book to keep the poor in order."

প্লেটোর আদর্শ সমাজেও বর্ণ ভাগ ছিল। বেদের পুরুষসূক্তের মত তিনিও দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন বর্গের তুলনা করেছেন: তাঁর সমাজে বর্গ তিনটি। প্রত্যেক বর্গকে তিনিও নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, তিনি নিশ্চয় ভগবান কৃষ্ণের আদেশানুসারে এই বর্গীয় রাশি স্থির করেননি। তবে একই সমাজবিন্যাসের চিন্তার উৎপত্তিসূত্র কোথায়? তাও কি তবে বহিরাগত বুদ্ধিমান প্রাণীদের আনীত ভিনগ্রহী অনুশাসন?

পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আরিস্টটলও শ্রেণীস্বার্থের কথা অস্বীকার করতে পারেননি—বলেছেন: "Our forefathers in the most remote ages have handed down to their posterity a tradition in the form of a myth, that these bodies (heavenly) are gods and the devine encloses the whole of nature. The rest of the tradition has been added later in the mythical form with a view to the persuation of the multitude and to its legal and utilitarian expediency"...

২। মানুষ অঙ্গিরস ও ভৃগুরা এবং মরুৎগণ দেবপ্রিয় হয়ে দেবজনগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমাররা হয়েছিলেন দেবতা। [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]। মহাভারতীয় পুরুষ রাজা নহুষকে দেবতারা স্বর্গরাজ্য হিমালয়ে দেবরক্ষক ইন্দ্রের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'পৃথিবী মাহাত্ম্য' বর্ণনার সময় সঞ্জয় জানিয়েছেন, দেবজনগোষ্ঠী-পরিত্যক্ত দেবতারা হিমালয়ের কোন্ বিশেষ অঞ্চলে চিরকালের মত থেকে গেলেন। বাইবেলীয় পয়গম্বরের কাছে নভশ্চর দেবতা তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যে দেবতারা মানবীদের সঙ্গে সহবাসে তাঁদের রক্ত দূষিত করেছেন তাঁরা ক্ষমারও অযোগ্য।

৩। 'মহাকাশে অর্জুন/দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা/বীরেন্দ্র মিত্র ॥

৪। "Myths and legends of gods and heroes current among the Austrics and Dravidians, long out-dating the period of Aryan advent in India appeared to have survived the Aryan impact and to have been rendered into the Aryan language in late and garbled, or improved versions accomodating themselves to the Aryan-God and Hero-worlds."—[Dr. S. K. Chatterjee/Race Movements and Pre-historic Culture/Vedic Age]।

৫। দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ/দানিকেন/অনু: অজিত দত্ত ॥

বিভিন্ন পুরাণে দেবতা

পাথুরে স্বর্গের পথে পথে শুধু যে কৌন্তেয়রাই দেবতার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এমন নয়, পৌরাণিক আমলের যুদ্ধবাজ দেবতারা তাঁদের পার্থিব প্রজাগণকে দর্শন দিয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রস্তরময় উপত্যকায় দাঁড়িয়েই। সুমেরবাসী উরুকরাজ গিলগামেশের কাহিনী বলে, দেবতার সন্ধানে রাজা গিলগামেশকেও যেতে হয়েছিল পাহাড়ে। রাজার সঙ্গী ছিলেন বন্ধু এঙ্কিডু। এঙ্কিডু এক আজব-দর্শন পুরুষ। আধা মানব আধা জন্তু। দুই বন্ধুর অভিযানকে সুমেরীয় দেবতারাও রুখে দিয়েছিলেন বিশেষ এক পার্বত্য সীমানার বাইরে। দেবতার প্রাসাদ ছিল পর্বতের ওপর। কুয়ুঞ্জিক পর্বতে আবিষ্কৃত হয় গিলগামেশের কাহিনী। আক্কাদীয় হরফে পাওয়া যায় বারটি মৃৎফলক। কাহিনী উৎকীর্ণ আছে সেইসব মৃত্তিকা-ফলকে। সে কাহিনী থেকে জানা যায়, অদ্ভুতকর্মা দেবতা দূর থেকে তাঁর সমতলবাসী দর্শনপ্রার্থীকে কড়া যান্ত্রিক কণ্ঠে আদেশ দিয়েছিলেন: আর অগ্রসর হোও না, ফিরে যাও! এই আদেশ পাণ্ডবরা শুনেছেন; শোনানো হয়েছিল মোজেসের সহগামী হিব্রুদেরও। অর্থাৎ যে কাহিনী মহাভারতে লিখিত আছে, তাই বলছে বাইবেল, তা-ই শোনা যাচ্ছে গিলগামেশ কাব্য ও অন্যান্য পুরা পুঁথিতে। দেবতার যান্ত্রিক কণ্ঠ যখন বাতাসে ভেসে এসেছে, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষ তখন সেই যান্ত্রিক কণ্ঠকে রহস্যময় অলৌকিক দৈববাণী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। আগেই বলেছি, মোজেসের সঙ্গে সদাপ্রভুর কথা হত একটি তড়িৎবাহী যান্ত্রিক প্রাচীরের মাধ্যমে। বাইবেলের পাতা থেকে দানিকেন সেই অত্যদ্ভুত রহস্যটি আবিষ্কার করেছেন। রহস্যভেদ করেছেন তিনি পৌরাণিক গাথা কাব্যে বর্ণিত দৈববাণীর।

ভীমসেন যেমন স্বর্গদ্বাররক্ষী বানরাকৃতি মানুষের দ্বারা বাধা পেয়েছেন, উরুকরাজ গিলগামেশও তেমনি পর্বতে দেবতার সাক্ষাৎ-সন্ধিৎসু হলে দুই দানবাকার রক্ষী (রোবট?) তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সব বাধা অতিক্রম করে দেবতা উৎনাপিশতিমের দেখা যখন পেলেন, গিলগামেশ তখন নির্বাক বিস্ময়াহত। দেখলেন, কী আশ্চর্য! দেবতাকে যে মানুষের মতই দেখতে?[১] দেখলেন, "মানবস্রষ্টার অবয়ব তাঁর নিজ অবয়বের তুলনায় বড়ও নয়, ভারিও নয়, দুজনে যেন পিতাপুত্র।" অর্জুনও তাঁর সম-অবয়ব-বিশিষ্ট দেবসেনাধিনায়ক

শঙ্করের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছেন। মহাদেবের গাত্র স্পর্শ করে পুলকিত হয়েছেন।

অথর্ব বেদ বলেন, ইন্দ্রের গায়ের রঙ ছিল হরিতাভ। তাঁর শ্মশ্রু ও কেশরাজিও ছিল হরিতবর্ণ।[২] তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সেকালেই তিনি একটি অদ্ভুত উড়ন্তযান ব্যবহার করতেন যা পার্থকে মহাকাশ ভ্রমণ করিয়ে আনে। সেই অতি বেগবান রহস্যময় অজানা উড়ন্তযানটি, পাথুরে মাটিতেও অবতরণক্ষম ছিল। ইন্দ্রযানের সঙ্গে ইজোকিয়েলদৃষ্ট সদাপ্রভুর প্রতাপ বা আকাশযানটি ও অপর বাইবেলীয় পয়গম্বর এনক যে উড়ন্ত দেবযানে ভ্রমণ করেন সেই রথটির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় ঐ তিনটি যানের কলকব্জা, আকৃতি, গর্জন ও ক্রিয়াকর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল সমচারিত্রিক। অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দৃষ্ট দেবযানগুলি ছিল একই রকম। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগেই।[৩] দেবযানগুলি যেহেতু ছিল উড্ডীন এবং তা দূর মহাকাশেও মাঝে মধ্যেই পাড়ি জমাত, তাই দেবতাদের উন্নত বিজ্ঞানী ও ভিন্‌গ্রহবাসী বলেই ভাবতে হয়। পার্থিব মানুষের সঙ্গে বর্ণে ও অবয়বে তাঁদের সাদৃশ্য যেমন ছিল, বৈসাদৃশ্যও কিছু কম ছিল না। পুরাপুঁথিগুলি বলে তাঁরা এই পৃথিবীতে তাঁদের ভাষা ও বংশধারা রেখে গেছেন। জানি না সেজন্যই এত ভাষা, এত বিচিত্রদর্শন মানুষ আজ আমাদের প্রতিবেশী কিনা। বাইবেল বলেন, "সমস্ত, পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল।" (আদি পুস্তক/১১,১)। দেবতাই মানুষের মধ্যে ভাষাগত ভেদ সৃষ্টি করলেন। পর্বতীয়াদের মধ্যে সুমেরুর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জাতির চেহারার সঙ্গে গাড়োয়াল হিমালয়ের পার্বত্য অধিবাসীদের চেহারার মিল কম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিবেদক সঞ্জয়ের মুখে আমরা শুনেছি স্বর্গপরিভ্রষ্ট দেবতারা থেকে গেছলেন সুমেরু উপত্যকার পূব পারে। অবশ্য এইসব পৌরাণিক তথ্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়ীভূত নয়। তবে নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। আর তাই তার ইঙ্গিত ও উল্লেখ রাখলাম।

সব দেবতা সুপুরুষ ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন ভয়ঙ্কারাকার। কারো বা আকৃতি ছিল নর-বানর অর্থাৎ নর ও অর্ধনরের আকার বিশিষ্ট। তবে যে পৌরাণিক দেবতার ঘাড়ের ওপর জন্তুর মাথা বসানো (মিশরীয় দেবতা লক্ষণীয়), পণ্ডিতরা অনুমান করেন, তাঁদের সেই বিশিষ্ট আকৃতির কারণ বিশেষ বিশেষ জাতির টোটেম প্রীতি।[৪] যাই হোক, সিদ্ধিদাতা ছাড়া হিন্দুদের দেবতারা মানবাকৃতি ও সুশ্রী। বেদে দেবরাজ ইন্দ্রের সুদর্শন রূপই বর্ণিত আছে। ইন্দ্র ছিলেন সুগঠিত, প্রিয়দর্শন, শোভননাসা, দীর্ঘচক্ষু, সুপুরুষ।

উন্নতনাসা মহাদেব মূর্তিটির পরিচয় মহাভারতে আছে। তিনি সুগঠিত পেশী-বিশিষ্ট এক বিশালাক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিলেন। আমাদের আরাধ্য দেবতা মহাদেবের মূর্তিতে আবার আর্য অনার্য চেহারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর্যদের মতই তিনি দীর্ঘদেহী, কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘনাসা। মহাভারতের দেব সেনাধ্যক্ষ, তাই যান্ত্রিক বিমানে হিমাচল ভ্রমণকারী ও পার্বত্য উপত্যকাবাসী। আবার তাঁকেই অন্য গল্পে শ্মশানচারী গঞ্জিকাসেবী ব্যাঘ্রচর্মাবৃত বৃষারূঢ় অদ্ভুত উদাসীন ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। এ রূপ যুদ্ধবাজ দেবতার রূপ নয়। এ রূপের মধ্যে অনেকাংশে অনার্য শিবপশুপতির আদল ধরা পড়েছে। অনার্য দেবতা রুদ্র ও সিন্ধু সভ্যতার শিবপশুপতি মহাভারতের মহাকাশচারী দেবতা শঙ্করের সঙ্গে মিলেমিশে পরিণত হয়েছেন আমাদের আরাধ্য মহাদেবে।

আমাদের মহাদেব নীলকণ্ঠ। জানা যায়, পুরাকালে পার্বত্য উপজাতি রুদ্ররা তাঁদের গ্রীবাদেশ নীল ও লোহিত বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করতেন। তাঁদের মাথায় থাকত জটাজুটের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এজন্য তাঁদের বলা হ'ত কপর্দী।[৫] রুদ্রদের ঐ নীল গ্রীবাই কি তবে কালক্রমে মহাভারতের দেব-সেনাধিনায়কের গলদেশকে নীলকণ্ঠ করেছে? গরল পানে গ্রীবাবর্ণ নীল হওয়ার গল্পটি কি কোনো আর্য ব্যাখ্যাতার সাহিত্য কর্ম? আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, দ্রাবিড়ীয় শিবই বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে একাকারে মিশে গেছেন।[৬] আমাদের আরাধ্য মহাদেবের মাথায় পিঙ্গল জটাজুটের সঙ্গে প্রাচীন রুদ্র সম্প্রদায়ের ঝাঁকড়া চুলের সাদৃশ্যও মনে প্রশ্ন জাগায়। দেবতাদের বিবর্তন বহুকাল ধরে বহু বিচিত্র পথে ঘটে গেছে, আজ তার সঠিক হদিশ করা শক্ত বৈকি।

তবু, বিভিন্ন প্রমাণাদি সত্ত্বেও সাবধানী তাত্ত্বিকরা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত যে পৌরাণিক দেবতারা মানুষের মতই দেহধারী পুরুষ ছিলেন। ধর্ম কর্ম পরের কথা, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নির্বিচার হত্যালীলার দ্বারা এই নীল গ্রহে তাঁদের উপনিবেশ পত্তন করা। এজন্য পৃথিবীর সকল পুরা কথাতেই অস্ত্রধারী, যুদ্ধবাজ, ভীতি ও সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী অদ্ভুতদর্শন সব দেবতার কীর্তিকাহিনী পাওয়া যায়। উড্ডীন অজানা উড়ন্ত যানে চেপে এই দেবতারা জমি ও আপন আপন প্রজাবর্গের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সর্বত্রই বিশেষ তৎপর। বাইবেলে সদাপ্রভু মোজেস-বাহিনীকে তাঁর বাহিনী ও প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] আমাদের ব্রহ্মাও প্রজাপতি, তাঁকে মহাভারতে যে রূপে পাই, সে রূপ কিন্তু নিখিলবিশ্বের মহান স্রষ্টারূপ নয়। দেব-ঔরসে অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রজনন ক্রিয়ার দ্বারা দেবতার

ঔরসে মানবী গর্ভে দেবপুত্র সৃষ্টির তিনি নির্দেশদাতা। দেবতাদের ঔরসে মানবী গর্ভে দেবপুত্রের জন্মকথা অন্যান্য পুরাগ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাই যে দেবতাদের দেহ ছিল, ছিল জন্ম মৃত্যু ও ক্ষুৎপিপাসা তাঁদের ঐতিহাসিক বাস্তব অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না।

পৃথিবীর সব পুরাণই বিভিন্ন জাতির নিজস্ব দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ডের কথা সযত্নে লিপিবদ্ধ করে গেছে। প্রায় সকল স্থানেই আছে অজানা উড়ন্ত-যানের আরোহী দেহধারী দেবতাদের কথা। যানগুলি যে ধাতব পদার্থে তৈরী সচক্র এবং সপক্ষ যান, এ কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। আছে সেই দেবরথের অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণকারী ক্ষমতার কথা। দানিকেন গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ এখানে বাছাই করে তুলে দেওয়া যেতে পারে।[৮] সেই বিবরণ পাঠেব ফলে আমাদের দেবমূর্তিগুলি আরও বাস্তব আরও ঐতিহাসিক বলে মনে হবে হয়ত।

আফ্রিকার পুরাকাহিনীগুলি পাঠ করলে স্বর্গকে জনপূর্ণ স্থান বলেই মনে হয়, কেননা সেই স্বর্গ থেকে একাধিক দেবদূতকে সেকালের মানুষ আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছিল। সেইসব দেবদূত যেমন যুদ্ধ ও হানাহানির দ্বারা এই মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন. তেমনি তাদের বহুতর জ্ঞানে সমৃদ্ধও করেছিলেন। মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা তাঁরাই দিয়েছেন। তিরিশটি জাতির (আফ্রিকাবাসী) পুরাণে বর্ণিত সেই দেবতাদের কথা একটি একটি করে তুলে দিয়েছেন দানিকেন সাহেব।[৯]

এইসব বিবরণে একটি বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। অধিকাংশ কাহিনীই বলছে, দেবতা আকাশ থেকে নেমে আসেন, দড়ি, মাকড়সার জালের সুতো অথবা শেকল ধরে। আধুনিক বিজ্ঞানের চশমা পরে আমরা এখন ভাবতে পারি, সুতো, দড়ি ও শেকল বলতে আফ্রিকার পৌরাণিকগণ প্যারাস্যুটের দড়ির কথাই হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন। তার মানে উড্ডীন দেবযান থেকে সেদিনের অন্ধকার মহাদেশে দেবতারা নেমেছিলেন দফায় দফায় ছত্রী সৈন্যের মত। আকাশ থেকে দেহধারী উন্নত ভিন্‌গ্রহী প্রাণীদের অবতরণ করতে দেখে বিস্মিত বিহ্বল ও ভক্তিমুগ্ধ মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঐ দেবতাদের কাছে তাদের প্রথম বশ্যতা স্বীকার ক'রছিল। বাইবেলের বয়ান, ইব্রাহিম মোজেস প্রমুখরাও মহাশূন্য থেকে আগত দেবতার দর্শনে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে জানিয়েছিলেন তাঁদের ভীতিবিহ্বল প্রণতি। দেবতার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। রামায়ণ মহাভারতে দেববিমানের কথা এতো স্বাভাবিকভাবে বর্ণিত আছে যাতে মনে হয়, এইসব

আমলে ভারতে বিমান দর্শন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বিস্ময় বোধের মাত্রাও ছিল কম।[১০] আফ্রিকাবাসী জুলুদের উপজাতিগুলির সকলেই দাবি করেন, তাঁদের আদি পুরুষগণ স্বর্গ থেকেই নেমে আসেন। 'জুলু' শব্দের অর্থও স্বর্গ। তাদের বসতি-অঞ্চলের আরেক নাম, 'স্বর্গীয় মানবদের দেশ'। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের বিবরণী আরও চমকপ্রদ। তাঁরা বলেন, দেবতারা এসেছিলেন বিভিন্ন রঙ্ ও রূপের দেহ নিয়ে। কেউ ছিলেন লোহিত বর্ণ, কেউ বা নীল। কারো গাত্রবর্ণ সাদা তো অন্যের ছিল কালো। আমাদের ইন্দ্রের বর্ণ ছিল সবুজ। বিষ্ণু নীলাভ। ওদিকে বাইবেলীয় আব্রাহামের রেখে যাওয়া বিবরণ থেকে জানা যায়, আব্রাহামের চাক্ষুষ-করা দেবতার রঙ ছিল নীলকান্ত মণিবৎ।[১১] মাসাইরা আরও বলেন, দেবতাদের কাজকর্ম ছিল মানুষের বোধের অতীত। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়েই রাখতেন। কঙ্গোর পেণ্ডেরা বলেন, তাঁদের দেবতা মাউয়িসিই তাঁদের শিখিয়েছিলেন ভুট্টা চাষ করতে, বৃক্ষ রোপণ করতে। শুধু কি তাই? দেবযানে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের সময় মাউয়িসি কয়েকজন মানুষকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান এবং ফেরৎ বিমানে তাদের হাত দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন আগুন।

"আফ্রিকার ডোগন কাহিনীর মত (জাপ) নিহোঙ্গীতেও আছে, আটজন লোক নেবে এলো স্বর্গ থেকে। নাববার আর ওঠবার সময় তারাও প্রচণ্ড শব্দ করেছে, উড়িয়েছে অনেক ধোঁয়া।[৮]—"

মিশরীয় ফারাও, ভারতীয় সূর্য-চন্দ্র বংশীয় রাজাদের মত জাপানের প্রথম সম্রাটও ছিলেন স্বর্গীয় দেবপুরুষের বংশধর। তাঁরই নাম থেকে জাপ সম্রাটের উপাধি 'তেন্নো' শব্দটি প্রচলিত ছিল। সে শব্দের অর্থ, দেবরাজ। দেবতারা যে কালে দেবপুত্রকে জাপানের প্রথম সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন (৬০০ খৃঃ পূঃ), তখন থেকেই জাপানের বিখ্যাত 'ডোগু' পুতুলের চল। পুতুলটির দেহাবরণ আধুনিক নভশ্চরদের মতই। মহাকাশচারী মূর্তিতে আবির্ভূত দেবতাদের সেযুগের মানুষ পৃথিবীর বহুস্থানেই দেখেছিলেন নিশ্চয়, না হলে তাঁদের মত পোষাক-পরিহিত পৌরাণিক দেবতার মূর্তি তাঁরা সেই যুগে গড়লেন কেমন করে? তখন তো পাখী ছাড়া শূন্যচারী জীব মানুষের সামনে আর কেউ বর্তমান ছিল না? অত ওড়ার কথা, গর্জনকারী, ধূম্রসৃষ্টিকারী পুষ্পকরথগুলির কথা কি শুধু কল্পনায় সৃষ্ট? পৃথিবীর পুরাণগুলি যদি শুধু কাল্পনিক গল্পকথাই লিখে থাকে তবে পুরাণ-লেখকদের সেই অদ্ভুত সৃজনী ক্ষমতা সেদিন কোন্ গুণে অর্জিত হয়েছিল কে তার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন?

অবতরণ ক্ষেত্রটি তৈরী করেছিলেন। দানিকেন অপর একটি পার্বত্য অবতরণ ক্ষেত্রের কথা জানিয়েছেন। বিচিত্র নক্‌সা অনুসারে সেই অবতরণ ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। সাঁইত্রিশ মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া সেই চবুতরটি পাল্‌পা উপত্যকায় বর্তমান। আণ্ডীজ পর্বতমালার এই অত্যদ্ভুত স্থানটির বিচিত্র নক্‌সাসহ চিত্রও দানিকেন তাঁর গ্রন্থে যুক্ত করেছেন।[১২] তাঁর সংগৃহীত চিত্রাবলীর মধ্যে আছে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ বহু ক্ষোদিত শিল্পকীর্তি যেগুলিকে মহাকাশচারণার প্রামাণিক চিত্র বলেই মনে হয়। একটি মন্দির-প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে কোনোও অজ্ঞাত আদিম শিল্পী অঙ্কিত এক রকেট-চালকের চিত্র। পৌরাণিক রকেট-চালকের পোষাক আশ্চর্যভাবে আধুনিক এবং তিনি যে যন্ত্রাগারে উপবিষ্ট সেই প্রকোষ্ঠটিকে সার্থক ব্যাখ্যার দ্বারা দানিকেন রকেটের ককপিট বলেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। চিত্রটি 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' গ্রন্থের প্রচ্ছদে মুদ্রিত করে দানিকেন-গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীদত্ত প্রাচীন দেবতার স্বরূপটি সুস্পষ্ট করেছেন। দেবতারা যে মহাকাশচারী ভিন্‌গ্রহী বিজ্ঞানী ছিলেন পুরাগ্রন্থগুলি একবাক্যে সেকথাই জানায়।

আমাদের বৈদিক ঋষিরাও সম্ভবত আকাশচারী দেবতাদের প্রসঙ্গেই 'দ্যৌষ্পিতৃ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'দ্যু' বা 'দৌঃ' আকাশেরই নাম। বেদে আকাশ ও পৃথিবীর স্তুতি আছে। একত্রে তারা দ্যাবাপৃথিবী রূপে বা পিতা ও মাতা রূপে পূজিত। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা। তাই বলা হয়েছে, "তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।" আকাশ থেকে দেবতারা নেমে এলেন। পৃথ্বীকন্যাদের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে তাঁরা এক দেবমানব বংশধারার সৃষ্টি করলেন। পুরা পুঁথির বিভিন্ন সাক্ষ্যে সেকথাই জানা যায়। তাই দ্যাবাপৃথিবীকে এভাবেও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। ঐ দ্যৌষ্পিতৃ শব্দই গ্রীকদের Zeus Pater, রোমানদের Jupiter। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই বিষয়টির রহস্য জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছিল।[১৩] অবশ্য তাঁর আমলে মানুষ অবলীলায় আকাশ ও মহাকাশ চষে বেড়াতে শেখেনি, তাই দেবতাদের দেহধারী উজ্জ্বল পুরুষ ছাড়া আরও কিছু ভাবার সুযোগ তাঁর ছিল না। মানুষ কল্পনায় যে কল্পগল্প সৃষ্টি করে তারও জন্ম তার অভিজ্ঞতা থেকেই। কল্পনার তুলি দিয়ে একেবারে মৌলিক কল্পগল্প সে বানাতে পারে না। প্রবন্ধের তর্ক দূরে থাক, পুরাণের গল্পগাছাও তাই সম্পূর্ণভাবে কল্পনাশ্রয়ী হতে পারে না। মহাকাশচারীকে চোখে না দেখলে আকাশপথে দেবতাদের আগমন, তাঁদের দ্বারা এই গোলকে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন, মানবীর সঙ্গে যৌনমিলন ও পৃথ্বীমানুষের উন্নতিতে সহায়তা

দানের ইতিহাস কেবলমাত্র কল্পনার দ্বারা প্রাচীন পিতারা পৃথিবীর সর্বত্রই একই ধরণের কল্পগল্প সৃষ্টি করতে পারতেন না। বঙ্কিমবাবু লক্ষ্য করেছেন, "সকল আদিম ধর্মে আকাশ জনক।" বহু ধর্মে আকাশের নামেই দেবতারও নামকরণ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিদের মত গ্রীকরাও বলেন, আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী।

আদম-ইভ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর আদিপিতারা যে মহাকাশচারীদের আলোকিত উড়ন্ত-যানে লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁরাই কি তবে দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্বের স্রষ্টা? এই তত্ত্বকে ধ্যানলব্ধ বললে অবশ্য আমরা অনেক পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারি। কিন্তু যদি কেউ পাণ্ডিত্য প্রকাশের এই সহজ পথটি গ্রহণ না করেন, তবে কি তাঁকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করতে হবে? একমাত্র কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকরাই নতুন অনুসন্ধানকে অপরাধ-হিসেবে গণ্য করে লাফালাফি দাপাদাপি সুরু করেন। তাই যাঁরা এই অনুসন্ধান কাজের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র রোষ, গালিগালাজ ও সমস্ত তর্কের উর্ধ্বে কেবলমাত্র বুদ্ধিহীন উন্মত্ততা প্রকাশ করেন, আসলে তাঁরাই কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণা করেন।

উঃ আমেরিকা, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ঋষিরা আকাশকে জনক ও পৃথিবীকে মাতা রূপে উল্লেখ করেছেন। চৈনিক দার্শনিকরা ঐ দুই শক্তির মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেছিলেন। ভারতের পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্বও তাই। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম সুস্পষ্টভাবে একথাও বোঝাতে চেয়েছেন যেঃ "ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিকদিগের নিকট হইতে একথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোনো কারণ পাওয়া যায় না।" (ঐ)। অর্থাৎ বুঝতে হয়, কোনো বিশেষ বাস্তব ঘটনাই সর্বত্র আকাশ মাটির সম্বন্ধটি লক্ষ্য করেছিল। সেই বাস্তব ঘটনাটি হ'ল, সেকালের মানুষ আকাশ থেকে একদল ভিনগ্রহী পুরুষকে এই গোলকে নেমে আসতে দেখেন এবং সেই অদ্ভুত মহাকাশচারী দেবতারা পৃথ্বীকন্যাদের গর্ভে ঔরসজ সন্তানের জন্ম দান করেন।

আকাশ থেকে নেমে-আসা দেবতাদের কথা তিব্বতী রাজ-কুলজী গিয়েলরাপেও আছে। গিয়েলরাপ বলেন, "আদিতে পৌরাণিক রাজা ছিল সাতাশজন। তাদের সাতজন ছিল স্বর্গবাসী, স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল তারা। তাদের বলা হত, আলোকের দেবতা। পৃথিবীতে তাদের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, যেখান থেকে তারা এসেছিল, সেখানেই ফিরে গিয়েছিল।"[৮]

পৃথিবীর আদি পিতারা যে দেবতা বলতে একদল মহাকাশচারীকেই

বুঝেছিলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ দানিকেন কয়েকটি অদ্ভুত প্রাচীন পুতুল, পার্বণ-উৎসবে ব্যবহৃত পোষাক ও বহু প্রস্তর-চিত্রের ছবি সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থগুলিতে সংযুক্ত করেছেন। কৌতূহলী পাঠক শুধু ছবিগুলি দেখলেও দেবতা যে গ্রহান্তরের মানুষ—এ সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন নিশ্চয়ই। প্রসঙ্গত বলি, আমি দানিকেনতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁর সংগৃহীত চিত্রাবলী দেখেই। আমার বর্তমান গবেষণার প্রতি ঝোঁক চাপে তার পরেই। না হলে আমার তো ছিল অন্য কাজ। সংবাদপত্রের জন্য নিয়মিত সাংবাদিক রচনা তৈরী করা, কিছু গল্প ও উপন্যাস লেখা। কিন্তু সব কাজ পড়ে রইল। পৌরাণিক দেবতাদের রেখে যাওয়া বিবরণ ও তথ্যাদির প্রতি ঝুঁকে পড়লাম অধীর আগ্রহে। মনে হ'ল, বস্তুতই অনেক অনাবৃত সত্য, যা নিহিত আছে অতীতের অন্ধকার গুহায়, আমাদের দায়িত্ব সে সত্য আবিষ্কারে যথাসাধ্য নিজের নিজের কর্তব্য করা। ডঃ আগ্রেস্টও এই আবেদনই জানিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত অনুসন্ধিৎসুদের আহ্বান করেছেন। বলেছেন, সকলে মিলে খোঁজ করলে আমরা আমাদেব অন্ধকার অতীতের অনেক কিছুই হয়ত জানতে পারব। সে জানার বিশেষ মূল্য আছে। অতীতের অন্ধকার যত বেশি স্বচ্ছ হবে, ভবিষ্যতের পথে আমাদের পদক্ষেপও তত বেশি নিশ্চিত হবে। তাই, একাজ শুধু দানিকেনেব নয়, সকল পরিষ্কৃত মনেব অনুসন্ধিৎসুরই কাজ এটা। যে যার সাধ্যমত এ পথে কিছুদূর অগ্রসর হতে পারলেও বহু কুসংস্কারের কুহেলিকা ভেদ করতে পারব আমরা, যা আমাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে।'

মানুষের ওড়ার কথা, দেব-বিমানের কথা, প্রচুরই আছে রামায়ণ মহাভারতে। আগেই বলেছি, বাইবেল ও গিলগামেশ কাহিনীতে বর্ণিত দেবরথগুলির সঙ্গে ইন্দ্ররথের তুলনামূলক আলোচনায় যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি, রামায়ণে বর্ণিত পরশুরামের শক্তিশালী আকাশযানটির মধ্যেও সেইসব লক্ষণই পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।[৩]

দেবশিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য শঙ্কর ও ইন্দ্রের আমন্ত্রণে অর্জুন বদ্রিনাথে ছিলেন পাঁচ বছর। তাঁর স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হলে পাণ্ডবরা গন্ধমাদন পর্বতে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক যেন বিদেশ প্রত্যাগতের জন্য আত্মীয়-পরিজনের অপেক্ষা। এই সময় দেবশিবিরের বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণরা এসে দেখা করে গেছেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। স্বর্গের দ্বারদেশে চলছিল দারুণ রাজনৈতিক তৎপরতা। এমনি এক সময়ে একদিন হঠাৎ-ই "ভূধর কম্পিত ও মহীরুহসকল আন্দোলিত হইতে লাগিল।" কী ঘটছে দেখার জন্য পাণ্ডবরা ও সন্নিকটস্থ

পর্বতীয়াগণ ছুটে এলেন। এসে দেখলেন সেই পৌরাণিক 'গরুড়' অবতরণকালে তার পক্ষতাড়নায় দারুণ বাতাবর্তের সৃষ্টি করেছে। অবতরণ ক্ষেত্রটিসহ পর্বতগাত্র প্রকম্পিত হচ্ছে। এই গরুড়কে মহাভারতকার 'পক্ষী প্রধান' বলে উল্লেখ করেছেন। গরুড় সম্পর্কে পৌরাণিক রূপকথাও আছে একাধিক। কিন্তু যে গরুড়ের ডানা এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের ডানার মত প্রবল বাতাবর্ত সৃষ্টি করে এবং যে পক্ষীটির অবতরণে ভূধর কম্পিত হয় তাকে তো বদ্রির পথে পথে দৃশ্যমান বড় আকারের একটি চিল বলে কখনই কল্পনা করা যায় না। বদ্রির পথে বহু-প্রণামধন্য গরুড় পাখী দেখেছি। চিল ও ঈগলপাখীর মাঝামাঝি তার চেহারা। ফুর ফুর করে উড়ে বেড়ায়। ডানার ঝাপটে গাছ কেন, গাছের পাতাও কাঁপে না, পর্বতগাত্রের কম্পন তো দূরের কথা। কিন্তু পাখীর আকৃতি-বিশিষ্ট একটি ছোট মাপের উড়োজাহাজ পাহাড়ী উপত্যকায় নামলে তার পাখার তাড়নায় গাছ পাতা কাঁপতে পারে; শব্দের অভিঘাতে পর্বতগাত্রের শিথিল শিলারাশি গড়িয়ে পড়তে পারে। যে পৌরাণিক গরুড় বিমানপথে বিষ্ণুকে বহন করতো তাকে একটি বিমানপোতই ভাবতে হয়; বিষ্ণু-বিমানের চেহারাটি ছিল স্বর্ণাভ, সম্মুখভাগ সাদা ও পাখাদুটি রক্তবর্ণ। বলা হয়েছে গরুড় অর্ধপক্ষী অর্ধমানব। বিষ্ণুরথের চালক বা পাইলটের নামই কি ছিল গরুড় এবং চালকের নামেই পক্ষীসদৃশ যানটিও গরুড় নামেই বিখ্যাতি লাভ করে? গরুড়াবতরণের সঙ্গে গর্জনের কথা বলা না হলেও তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। গর্জন ব্যতীত ভূধর কম্পনের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়ার পক্ষেও যে কোনো তথ্য নেই। নেই কোনো সঙ্ঘর্ষের সংবাদ।

অন্যান্য দেববিমান অবতরণের প্রসঙ্গেও গর্জনের কথা আছে। হয়ত গরুড় সম্বন্ধে বা ঐ নামধারী অপর কোনোও ব্যক্তি সম্পর্কে মাতা বিনতার মুক্তিকল্পে অমৃত আনয়নের পৌরাণিক গল্পটি মহাভারতকারের জানা থাকায় গরুড় নামক বিমানটিকেও তাঁরা সেই কাহিনীর নায়কের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেছিলেন। তাই তাঁদের মনে হয়েছে, পাখীর পক্ষে ডানা ঝাপটানোই স্বাভাবিক, গর্জন করা সম্ভব নয়। আসলে ঘটনার সাক্ষাৎ বিবরণই যে মহাভারতের কথক গাওনা করে গেছেন এমন তো নয়; কথক পরম্পরায় তা শ্রুত হয়ে কয়েক পুরুষ পরে যখন জনমেজয়কে সেই ইতিহাস শোনানো হচ্ছে তখন কথক হয়ত দুর্বোধ্য ঘটনার নিজবুদ্ধিমত ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তাই উড়ন্তযান গরুড়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে গরুড়-সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যানটি।

গরুড়াবতরণের পরে পরেই ঐ বনপর্বে পাণ্ডবদের সামনে অন্যান্য

দেববিমান অবতরণের কথাও আছে। সেগুলিকে বিমান হিসেবেই কবি হাজির করেছেন।

যে অনার্য রাক্ষসদের একটি শাখা স্বজাতির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দেব-শিবিরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারাই দেবশিবির স্বর্গলোকের প্রহরায় নিযুক্ত হয়। এই ভয়ঙ্কারাকার প্রহরীরাই দেবতাদের পুলিশ কমিশনার যমরাজের অধীনে স্বর্গের পথে পথে পাহারা দিত। এদের নেতা ছিলেন দেবতাদের নর্মভূমি ও পুষ্পোগ্যান-রক্ষক রাক্ষসপতি কুবের। কুবের দেবতাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন (বদ্রিবিশালের পবিত্র সিংহাসনের নিম্ন ধাপে কুবেরের একটি ধাতব মুণ্ড রক্ষিত আছে)। দ্রৌপদীর অভিলাষ পূরণের জন্য ভীমসেন সেই কুবের-রক্ষিত দেব-নর্মভূমিতে প্রবেশ করেন। রক্ষী রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর সজ্ঘর্ষ হয়। দু-একটিকে তিনি ঘায়েলও করেন। মহাভারত-কথক এই সুযোগে দ্বিতীয় পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতা জাহির করার জন্য মস্ত এক ভয়াবহ যুদ্ধের রূপকথা তৈরী করে রাজা জনমেজয়কে শুনিয়ে রাজ-প্রীতি লাভের চেষ্টা করলেও আমরা বুঝতে পারি, কুবেরোগ্যানে বৃকোদরকে কুবের-রক্ষীরা আর আক্রমণ করেনি। কারণ ইতিপূর্বে পুষ্পচয়নের সময় তারা ভীমকে অবরোধ করলে স্বয়ং কুবের এসে তাঁকে মুক্ত করেন। দ্বিতীয়বার ভীমের উপদ্রব সুরু হলে রক্ষীরা কুবেরের কাছে গিয়ে সে বৃত্তান্ত জানান এবং কুবেরকে স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। মহাভারতকার এইখানে আবার বিভ্রান্তিকর সংবাদ সৃষ্টি করলেন। বললেন, দূতমুখে সংবাদ পেয়ে কুবের দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুষ্পক-রথে আরোহণ করলেন পাণ্ডব সন্নিধানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দেখলাম, রথ থেকে নেমেই তিনি সহাস্যমুখে পাণ্ডবদের অভিনন্দিত করেছেন, দুটো কড়া কথা পর্যন্ত শোনাননি। আবার বোঝা গেল, মহাভারত-রচয়িতা পাণ্ডবদের বীরত্ব জাহির করার জন্য এবং অপর সকলকেই বলবীর্যে খাটো দেখানোর জন্য মিথ্যা বাগাড়ম্বর রচনা করতে কখনই ইতস্তত করেন না। মিথ্যা যুদ্ধের গল্প সাজিয়ে সহস্র সহস্র দেব-দৈত্য-দানবকে পাণ্ডবরা অক্লেশে বধ করলেন আর ভীম পদভারে হিমালয় কাঁপতে লাগল—এমন আজগুবি কথা লিখে তিনি বরং ইতিহাসকে রূপকথা বানাতেই ব্যস্ত। কিন্তু এইসব রূপকথাগুলি এমনই মোটা ধরণের কাজ যে দুটি শ্লোক পাঠের পরেই মহাভারত-কথকের গাঁজাখোরী মহাভারতের সত্য ঘটনার আলোকে ধ্যাবড়াভাবে ধরা পড়ে যায়। ভাগ্যিস রূপকথার পাশাপাশি সত্য ঘটনাগুলিও সমান্তরাল সাজানো ছিল, তাই মহাভারতকে অক্লেশে কাব্য বা রূপকথা বলে সরিয়ে রাখার

উপায় নেই। বাজে কথার আবর্জনা সরালেই আসল ইতিহাস ফুটে বের হয়ে আসে।

যাই হোক, এখানে আমাদের প্রধান লক্ষণীয় হ'ল কুবেরের পুষ্পক রথটি। কবি বললেন, কুবের পাণ্ডবগণের কাছে যাবেন এই আদেশ পেয়ে কুবেরানুচরেরা "…হেমমাল্যধারী অশ্বগণযুক্ত, অভ্রপুঞ্জসদৃশ, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ যোজনা করিল। সর্বগুণসম্পন্ন, নানা রত্ন বিভূষিত, মনোমারুতগামী অশ্ব রথে যোজিত হইয়া বিজয়াবহ হ্রেষারব করিতে লাগিল।" তারপর যক্ষগণও কুবেরের সঙ্গে রথারোহণ করে "গগনমার্গে মহাবেগে…গমন করিতে লাগিল।" (বন, কালীপ্রসন্ন)।

অশ্ব যে চালিকাশক্তি, ইতিপূর্বে সে আলোচনা করেছি। এখানে হেমমাল্যধারী অশ্বগণযুক্ত উড়ন্ত রথ বলতে কী বুঝব? হেম অর্থে ঔজ্জ্বল্য বুঝি। উজ্জ্বল মালিকা কি তবে উড়োজাহাজটির ককপিটে সাজানো সাংকেতিক আলোকমালা? একটি বিমান বা জেটের কত রকম আলোই তো আছে। জেট একজষ্টও আলোকপুচ্ছ বিকিরণ করে। ছুটন্ত বিমানের জানালা দিয়ে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়, নিচে থেকে তাও আলোকমালার মতই দেখায়। আর অভ্রপুঞ্জসদৃশ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ কি উড়োজাহাজের ধাতব দেহকাণ্ডটির ('বডি') কথাই বলতে চাইছে? না হলে অশ্ববাহিত রথের গগনমার্গে মহাবেগে গমনের কল্পনাই করা যায় না। সে অশ্বের কণ্ঠে দোদুল্যমান কোনো স্বর্ণমালিকা থাকাও অসম্ভব। মহাবেগে উড়ে যাওয়ার সময় অশ্বের মালিকা স্বস্থানে যথাযথ থাকবে এই কথা কুবেরও (যিনি মানুষের অবয়ব বিশিষ্ট, মানুষের সঙ্গেই বাক্যালাপ করতে চলেছেন এবং মানুষের মতই সকল আচরণ করে থাকেন) নিশ্চয় চিন্তা করতেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় টানা রথে অশ্বের গলায় স্বর্ণমালিকা ঝুলিয়ে দিয়ে মহাবেগে এক পর্বত থেকে আরেক পার্বত্য উপত্যকায় আসা সম্ভব ছিল না।

পরে আরও বলা হয়েছে, "অনন্তর ধনেশ্বর প্রমুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধমাদনশৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন।" এখানেও উড়ন্ত রথকে পক্ষিকুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গরুড়কে বলা হয়েছে, পক্ষি-প্রধান। এপর্যন্ত নির্মিত সমস্ত উড়োজাহাজের চেহারাই পক্ষী ও পতঙ্গ-সদৃশ। সেই কালে, যখন বহিরাগত দেবতারাই একমাত্র উড়োজাহাজ ব্যবহার করতেন তখন সেই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ মানুষ উড়ন্তযানগুলির বর্ণনা আর কী ভাবে করবেন? নিজেদের জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা টেনে

অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনা দেওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। আজকের পৃথিবী মহাকাশ-বিজ্ঞানে উন্নত; তবু 'ফ্লাইং সসার' বস্তুটি বুঝতে না পেরে সেই অজানা উড়ন্তযান(অ. উ. ব বা U. F. O)-গুলিকে আমরা আমাদের অধিকৃত কোনো একটি বস্তুর সাহায্যেই সাধারণের বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করে বলছি, উড়ন্ত চাকী। এছাড়া অন্য ব্যাখ্যা জানা নেই। সেদিনও উড়োজাহাজের বর্ণনায় পাখী এবং তার অজ্ঞেয় বেগশক্তির উল্লেখকালে 'মনোমারুতগতি' অশ্বের তুলনা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

উড়োজাহাজের সঙ্গে পাখীর তুলনা পৃথিবীর অন্যান্য পুরাগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আক্কাদীয় হরফে লেখা সুমেরীয় পুঁথি গিলগামেশ কাব্যের কথা বলেছি। উরুকপতি গিলগামেশের বন্ধু এঙ্কিডুকে দেবতারা তাঁদের আকাশযানে চাপিয়ে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। মৃত্তিকা পুঁথির সপ্তম ফলকে সেই আকাশ-ভ্রমণের চাক্ষুষ বিবরণ উৎকীর্ণ আছে। এঙ্কিডুকে একটি ঈগলসদৃশ উড়োজাহাজে চাপিয়ে ভ্রমণ করানো হয়। এঙ্কিডু বসেছিলেন উড়ন্ত যানটির ধাতব নখরে (পিত্তল নখরে)। প্রতি চার ঘণ্টা ওড়ার পর শূন্যমার্গ থেকে এঙ্কিডুর চোখের সামনে পৃথিবীর চেহারা যেভাবে বদলে গেছে আজকের নভশ্চরের চোখেও সে দৃশ্য একইভাবে পাল্টে যায়। শূন্যমার্গ থেকে পৃথিবীর গৃহীত ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিলে যায় এঙ্কিডুর রেখে যাওয়া পৌরাণিক বিবরণগুলি। প্রথম উড্ডয়নের পর চার ঘণ্টা উপরের দিকে উড়ে যাওয়ার সময় এঙ্কিডুর চোখে মাটিকে মনে হল পর্বত আর সমুদ্র হ্রদ। পরের চার ঘণ্টা আরও উঁচুতে উঠে এঙ্কিডু দেখলেন, মাটির চেহারা উদ্যানের মত ও সমুদ্রের রূপ উদ্যান-পরিখার সমান দেখাচ্ছে। তৃতীয় স্তরে উঠে সে রূপও পাল্টে গেল। তাঁর মনে হ'ল, মাটি যেন একবাটি জাউ আর সমুদ্র জলকুণ্ড। এই বিবরণটি সম্পর্কে দানিকেন লিখেছেন, "বর্ণনা থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে কোনো মানুষ নিশ্চয়ই একদিন বহু ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছিল। বর্ণনাটি এতো নিখুঁত ও যথাযথ যে একে কোন মতেই কল্পনাশ্রয়ী বলা চলে না। পৃথিবীর আকার কেমন তা যদি জানা না থাকে তো কে বলবে দূর আকাশ থেকে মাটিকে দেখায় খানিকটা জাউ-এর (Porridge) মত ফ.টা ফাটা আর সমুদ্রকে চৌবাচ্চার মত?"

বাবিলনীয় উপাখ্যানে কীশের রাজা এতানাও ঈগলে চেপে আকাশ ভ্রমণ করেছেন। এতানাকে মহাশূন্য পথে এতদূর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যার ফলে উড়ন্ত এতানার চোখের সামনে থেকে পৃথিবীটাই হারিয়ে গেল। তখন

এতানা ভয়ার্ত কণ্ঠে ঈগলকে বললেন, আমাকে আমার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, চাই না আমি স্বর্গে যেতে। ঈগল থেকে এতানাও পৃথিবীর আশ্চর্য রূপ পরিবর্তন দেখেছিলেন। সে বর্ণনাও বিস্ময়কর ভাবে সঠিক।[৩]

এইসব পুরাগ্রন্থের বিবরণগুলি আমাদের বলে, ঈগল ও গরুড় কোনো পক্ষী নয়, তারা মহাশূন্য পরিভ্রমণকারী আকাশযান। পুরাযুগের মানুষ সেই ধাতব যানগুলির সঙ্গে পক্ষীর সাদৃশ্য উল্লেখ করে যানগুলির চেহারা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কুবের পাণ্ডবদের আশ্বস্ত করে হিমালয়স্থ দেবলোকের একটি সংবাদ দিলেন। বললেন, "অর্জুন দেবলোকে কুশলে আছেন।···তিনি অমরাবতীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছেন।·· অস্ত্রশিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।"

চমৎকার স্বর্গলোক, সন্দেহ নেই। সৃষ্টির কল্যাণ কামনায় সেখানে দেবতা ও ঋষিগণ ধ্যানস্থ নন। ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দেবলোক অস্ত্র সাধনায় তৎপর। কেননা সামরিক প্রস্তুতির জন্য তাঁদের তেরটি পূর্ণ বৎসরের প্রয়োজন। অর্জুনের অস্ত্র শিক্ষার কাল পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। এ এক পার্থিব স্বর্গ, যার অবস্থান হিমালয়ে।

অধৈর্য পাণ্ডবদের শান্ত করে কুবের তাঁর আকাশযানে উঠে বসলেন। যেন একটি হালকা বিমান বা হেলিকপ্টারে গুছিয়ে বসলেন দেবলোকের ব্যস্ত অফিসার। "তখন অশ্বের হ্রেষারব (ইঞ্জিন চালু করবার শব্দ?) ও যক্ষরাক্ষসের কোলাহল (ঐ একই শব্দকে রাক্ষসের কোলাহল বলে মনে হয়েছে) শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের তুরঙ্গমগণ যেন বায়ুপথে সঞ্চরণ ও ঘনজাল (ধূম্র ও ধূলি জাল?) আকর্ষণ করিয়াই দ্রুতবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল।" (বনপর্ব/ব্রাকেট আমার)।

এরপর পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্য, যাঁকে দেবশিবিরই পাণ্ডবদের বিধান-দাতারূপে নিযুক্ত করেছেন (আজ্ঞা লাভ মহর্ষি বেদব্যাস মারফৎ), তিনি হিমালয়ের দেবস্থানগুলি পাণ্ডবদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা পার্থিব গাড়োয়াল হিমালয়েরই বর্ণনা। অতঃপর তিনি দিন রাত্রি মাস ঋতুর বিবর্তন কথা শুনিয়েছেন পাণ্ডবদের এবং সেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণকারী রূপে সামান্য দেবতাদের খাড়া করে দেহধারী দেবতাদের ওপর অলৌকিক শক্তি আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য প্রকৃতিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলে ধৌম্যের নিজস্ব জ্ঞান সীমিতই ছিল। মহাবিজ্ঞানী

দেবতারা চতুরালি করে ঐ পুরোহিতদের যেমন শিখিয়েছেন, তাঁরাও সর্বান্তকরণে তা বিশ্বাস করে অন্যকে সেইভাবে শিক্ষা দান করেছেন। এভাবেই দেবতারা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের সুযোগে আদিপিতাদের ঈশ্বর সেজে বসেছিলেন। তাঁদের বাণী মানুষের শিশুসুলভ অজ্ঞতার দরুণ ঈশ্বরের বাণী বলে মান্য হয়েছে। গ্রহান্তরের মানুষ হয়েছেন পৃথ্বীমানবের ও জীবজগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অংশবান ভগবান। অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন আমরা আজ কোনো নতুন গ্রহে গিয়ে সেখানের মানুষের ভগবান হয়ে বসতে পারি। আমাদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ দেখে, আকাশ ফুঁড়ে আমাদের রকেটাবতরণ দেখে তারাও আমাদের স্বর্গীয় দেবতা বলে পূজা প্রণাম নিবেদন করবে। সকল বিজ্ঞানকে নিজের সিন্দুকে বদ্ধ রেখে তার প্রয়োগ প্রদর্শন করলে অবিজ্ঞানীর কাছে তা অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হবে। সেজন্যই তো মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন।

সাধারণ দেববিমানগুলির থেকে ইন্দ্ররথের কিন্তু যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সাধারণ দেববিমানের সঙ্গে সম্ভবত পাণ্ডবদের পরিচয় ছিল শৈশবকাল থেকেই। কেননা তারা জন্মাবধি হিমালয়ের কোলেই বড় হয়েছে। পাণ্ডু পাণ্ডুকেশ্বর পর্যন্ত অর্থাৎ মহাভারত-বর্ণিত অলকার দোরগোড়া পর্যন্ত গেছেন। সুতরাং গাড়োয়ালের পার্বত্য রাজ্যে গমনাগমনকারী দেববিমান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একাধিকবার। কিন্তু যেদিন প্রথম ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলি-চালিত আকাশরথটিকে অর্জুন দেখলেন, সেদিন তাঁর আর বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। সেই আকাশরথে চেপে তিনি মহাশূন্যে নীত হয়েছেন। এতানা বা এক্সিডুর মত মহাকাশ থেকে পৃথিবী অবলোকনের ধারাবিবরণী পার্থ অবশ্য রেখে যাননি। কিন্তু মহাকাশে উঠে তিনি দেখেছিলেন, সেই মহাকাশে "সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই।" মহাকাশের এই সত্যরূপ জানা তাঁর পক্ষে বা মহাভারতকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। একমাত্র মহাকাশচারীই জানেন, মহাশূন্য ঘনকৃষ্ণ রাত্রির মত কালো। মার্কিন নভশ্চর জন গ্লেনও মহাকাশ পরিক্রমার সময় জগতবাসীকে মহাকাশের রূপ বর্ণনা করে বলেন, মহাকাশে দিনের আকাশও কৃষ্ণবর্ণ।[১৪] অর্জুনের বিবরণ যে-কালে রূপকথা ভেবেছি, আমাদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শৈশবকালও আমরা আজ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। মানুষ মহাকাশযুগে প্রবেশ করে বুঝেছে, অজ্ঞতাবশতই পুরাগ্রন্থের বিবরণকে আমরা রূপকথা ভেবেছি, ভেবেছি কাল্পনিক। আসলে পুরাকথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই অজ্ঞাত ভূমণ্ডল, যে জ্ঞানরাজির অধিকার আমরা ক্রমশ অর্জন করে বুঝছি। যা বুঝতে পারিনি তাকে রূপকথা বলে এতকাল শুধু নিজেদের অজ্ঞতা নিয়ে

মিথ্যে অহঙ্কারই করেছি। অর্জুনের বিবরণই খাঁটি সত্য এবং সঠিক বাস্তব। আমাদের কূপমণ্ডুকতা জ্ঞানের সেই বিস্তৃত পরিধিকে অতঃপর আবিষ্কার করে আজ পুরাকথাকে সত্যকথা বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং এটাও অবশ্যই অনুমেয় যে সাধারণ বিমান ও মাতলির রথে তফাৎ ছিল প্রচুর। মাতলি-চালিত ইন্দ্ররথ শুধু আকাশেই নয়, সক্ষম ছিল মহাকাশ ভ্রমণেও।

পাণ্ডবদের সামনে থেকে কুবেরের পুষ্পক রথ অদৃশ্য হতে সেখানে এসে নামল, মাতলির মহাকাশ-ভেলা। অর্জুন একদিন অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, শত শত রাজসূয় যজ্ঞেও এমন অত্যুত্তম রথ দৃষ্ট হয় না। পাণ্ডবরাও সেই অদ্ভুত উড়ন্ত যানটি দর্শন করে বিমুগ্ধ হলেন। সে রথ তাঁদের সামনে নামল এইভাবে: "...মহতী উল্কার ন্যায় ধূমসম্পর্কশূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসদৃশ স্বীয় দীপ্যমান মূর্তিতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধমাদন পর্বতে আগমন করিলেন।..." স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ রথ অশ্বচালিত সামান্য রথ নয়, হালকা ধরনের বিমানও নয়। এই অজানা উড়ন্ত যানটির সঙ্গে উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নির সম্পর্ক আছে। সে অগ্নি আবার ধূমসম্পর্কশূন্য। মাতলির রথের মধ্যে অর্জুন দেখেছিলেন অত্যাশ্চর্য শক্তির সমন্বয়। ঠিক অমনিই অদ্ভুত উড়ন্ত যান পৃথিবীপৃষ্ঠে আরও দুজন আদিপিতা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একজন বাইবেলীয় পয়গম্বর ইজেকিয়েল, অপরজন আদি পিতা এনক, যিনি ছিলেন মহাপ্লাবনযুগীয় নোয়ার পূর্বপুরুষ এবং আদমের ষষ্ঠ উত্তর পুরুষ। ইজেকিয়েলের দেখা মাহাকাশযানটির বিবরণ পরীক্ষা করে রকেট-যন্ত্রবিৎ ব্লুমরিশ রায় দিয়েছেন, হ্যাঁ, ওল্ড টেস্টামেণ্টে বর্ণিত সেই প্রাচীন মহাকাশযানটি বস্তুতই প্রয়োগসম্ভব ছিল এবং তা পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী একটি মূল রকেটের সঙ্গে একযোগে ক্রিয়াশীলও ছিল। মাতলির রথটির সঙ্গে ইজেকিয়েল ও এনক-দৃষ্ট মহাকাশযান দুটির তুলনামূলক বিচারে তিনটি উড়ন্তযানই শক্তিশালী মহাকাশভেলা রূপে ধরা পড়ে।[৬] অর্জুন এই রথে চেপে প্রথম মহাকাশে ও পরে বদরিকা অঞ্চলে অস্ত্রশিক্ষা করতে যান। তিনি অপরাপর পাণ্ডবদের মধ্যে প্রত্যাবর্তনও করলেন সেই অদ্ভুত যানে চেপেই।

দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রবাসে অর্থাৎ বদরি অঞ্চলে সমরশিক্ষা করে অর্জুন প্রত্যাবর্তন করেছেন। দৃশ্যটি গাল্পিকের মত এঁকে রাখলেন মহাকবি। আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম, বিদেশ-প্রত্যাগত প্রিয়জনকে ঘিরে দ্রৌপদীসহ চার পাণ্ডব অর্জুনের কাছে অলকাপুরীর গল্প শুনতে বসেছেন। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পার্থকে দীর্ঘ সময় তাঁরা বিব্রত করেন নি। ফেরার

পর সে রাতে পার্থের পরিচর্যা করেছেন সবাই। তাঁর সুনিদ্রার আয়োজন করা হয়েছে। নকুল ও সহদেবের সঙ্গে শয়ন করেছেন তিনি। নিখুঁত বাস্তব। বর্ণনার ত্রুটি নেই কোথাও। তাই এই মুহূর্তে আমাদের মনে একটি ছোট্ট প্রশ্ন জাগে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ফিরলেন পার্থ। এই একটা রাতও কি তিনি দ্রৌপদীর সঙ্গে একান্তে একটি অখণ্ড রাত্রি যাপনের সুযোগ পেলেন না? দ্রৌপদীকে জয় করলেন পার্থ, বিবাহ করলেন যুধিষ্ঠির, বলা হল, দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর সেবিকা। কিন্তু কৈ? দ্রৌপদী তো স্বামী বলতে যুধিষ্ঠিরকেই শুধু উল্লেখ করেন, পার্থ তাঁর সখা। প্রকৃত স্বামীর অধিকার প্রথম পাণ্ডবই ভোগ করে যাচ্ছেন যদিও দ্রৌপদীর প্রেম পার্থেরই অনুকূলে। এ সময় দ্রৌপদীর সঙ্গে পার্থের কিছু প্রণয়-সম্ভাষণ শোনার জন্যও আমরা আগ্রহী হই। কিন্তু আমাদের সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য মহাভারতকারের কিছুমাত্র অবসর নেই। তিনি ইতিহাস রচয়িতা। কাব্য করার সময় কোথায় তাঁর? তাঁকে রচনা করতে হবে একটি বিশাল ভূখণ্ডের রাজনৈতিক উত্থানপতন ও জীবনচর্যার ইতিকথা। মৃদূচ্চারিত প্রণয়কথা বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সুখ দুঃখ আলোচনার স্থান তো ইতিহাস নয়। তাই যাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, কাব্য হিসেবে রামায়ণ শ্রেষ্ঠ, তাঁরা একটি শতসহস্রী শ্লোকযুক্ত ইতিহাসকথার মধ্যে কাব্য সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এজন্য ক্ষোভই তাঁদের ন্যায্য পাওনা। এজন্য মহাভারতকারকে দোষারোপ করার অর্থ, মহাভারতের সঠিক চরিত্রটিকে যথার্থ মূল্য না-দেওয়া। কাব্য করার অবসর মহাভারতে বস্তুতই কম। এখানে ঘটনার পর ঘটনার ধারা তীব্রস্রোতা পার্বত্য নদীর মত এক মহান জনজীবনের কীর্তিকথা শোনাতে শোনাতে বহুবিসর্পিল রেখায় ব্যস্তসমস্ত ছুটে চলেছে। বহুতর হিমবাহপথে নির্গলিতা অসংখ্য নির্ঝরিণীর সমাহারে (গাড়োয়াল হিমালয়ে গঙ্গার শাখা ধারাগুলির আছে বহু বিচিত্র নাম) যেমন গৈরিক গঙ্গানদী হৃষীকেশ হরিদ্বার বিধৌত করে ভারতীয় জনজীবনে একাকারে প্রবেশ করেছে, বহু অনুপুঙ্খ ও উপকথার অজস্র ধারায় স্ফীতাকৃতি মহাভারত তেমনি ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসকে সযত্নে ও অকল্পনীয় লিপিকুশলতায় বিধৃত করে লক্ষ শ্লোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এই তার অনিবার্য পরিণতি। কালে কালে পল্লবিত হওয়ায় অমার্জনীয় অতিকথন দোষ মহাভারত তাই সর্বসংহ হাস্যমুখে সাষ্টাঙ্গে অবলেপন করেছে। ধর্মগ্রন্থ নয়, মহাকাব্যও নয়, মহাভারতকে এক মহাজীবনের ইতিবৃত্তরূপেই পাঠ করতে হবে।

সেই ইতিবৃত্ত জানাল, বহিরাগত শিবিরের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে এবং

তাঁদের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে সাক্ষর করে পার্থ বৈদেশিক শক্তির বিমানে চড়ে ফিরে এলেন দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে গন্ধমাদন বা ইন্দ্রকীল পর্বতে। পরদিন দেববাহিনীর শাসনকর্তা ইন্দ্র স্বয়ং এলেন পৃথ্বীবাসী মিত্র-পক্ষীয়গণের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে। আবার সেই মাতলির রথ। নামল তা প্রচণ্ড কলরব অর্থাৎ গর্জন করতে করতে মেঘমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। সে শব্দের বর্ণনায় কবি এই রকম তুলনা আহরণ করলেন: "অন্তরীক্ষে মৃগ, ব্যাল ও পক্ষিগণের কোলাহলের ন্যায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমিনিস্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুত্থিত হইল।" কৌন্তেয়গণ দেখলেন, "কাঞ্চনের ন্যায় পরিষ্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান অশ্বযোজিত রথে" অপ্সরাগণে পরিবৃত হয়ে পুরন্দর উড়ে আসছেন।

ঠিক এমনি এক উড়ন্ত যানে চেপে কোবর নদীতটে সদাপ্রভুর অদ্ভুত ভীতিপ্রদ অবতরণ লক্ষ্য করেছিলেন বাইবেলীয় পয়গম্বর ইজেকিয়েল। সেই উড়ন্ত যানটিকেও তাঁর মনে হয়েছিল মেঘময় এক জাজ্বল্যমান অগ্নিপিণ্ড। আদিপিতা সেই রথটি চাক্ষুষ করে তার বিবরণকে বাস্তবসম্মত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। বর্ণনা রেখে গেছেন এই রকম: "উত্তর দিক (আকাশ) হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ (জেট নিঃসৃত ধোঁয়া?) ও জাজ্বল্যমান অগ্নি আসিল...।" শুধু অগ্নি বললে পাছে সেই বাস্তব রথটির সত্য স্বরূপ চিনতে শ্রোতার অসুবিধা হয়, ইজেকিয়েল তাই আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন, "সেই অগ্নি তেজোময় এবং সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত।" জেট বিমান অবতরণের অনুরূপ বর্ণনা রামায়ণেও আছে। রাজা দশরথের সামনে যখন পরশুরামের বিমান অবতরণ করল তখনও, কবি বর্ণনা করেছেন, "প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল;" জেটের সচীৎকার আগমনকে চিত্রায়িত করে কবি বলেছেন তখন, "চারিদিক হইতে পক্ষীসকল ঘোরতর" শব্দ সৃষ্টি করেছিল। বিমান-গর্জনকে তাঁরা বিভিন্ন কলরবের সঙ্গেই তুলনীয় করেছেন। আর সর্বত্রই জেটনিঃসৃত জ্বলন্ত ধূমপুচ্ছের বর্ণনা রেখে গেছেন। বলা বাহুল্য, আজকের মহাকাশযুগে এই আকাশরথগুলিকে সঠিক বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

ইন্দ্র তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করলে ধনঞ্জয় "ভৃত্যবৎ" করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বোঝা গেল, বহিরাগত সেই উন্নত শক্তিজোটের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন রাজ্যলোভী পাণ্ডবরা। পরিণত হয়েছেন তাঁরা বিদেশীর দাসে। ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় আশ্বস্ত করে বললেন, "হে রাজন্!

আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইবেন; তাহাতে সন্দেহ নাই।" কী চমৎকার ধর্মধাম ঐ হিমালয়, কী অদ্ভুত স্বর্গ! এখানে দেবাদিদেবরা সর্বদা তৎপর আর্যাবর্তের সীমিত ভূখণ্ডে পাণ্ডব প্রতিনিধিদের মারফৎ বৈদেশিক প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। তাঁদের ভিন্নতর কোনো আত্মিক আধ্যাত্মিক চিন্তা নেই। আর সেই বহু প্রচারিত ধর্মধ্বজ যুধিষ্ঠির? ইনি রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় বিদেশীর ধ্বজা আপন স্কন্ধে ধারণ করে 'ধর্ম ধর্ম' বলে তোতাবুলি আওড়াচ্ছেন আর দেবস্তাবক পুরোহিতবৃন্দের পদলেহন করছেন। এজন্যই স্বাধীনচেতা কর্ণ তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, বেদ পাঠরত ব্রাহ্মণ। এজন্যই বিদেশীর কাছে বিক্রীত-দেহমন পাণ্ডবরা দর্পভরে দেববিরোধী সকল ভারতীয়কেই অনার্য বলে উপেক্ষা করতেন।

১। 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?'—দানিকেন/অনুঃ অজিত দত্ত।

২। 'সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো
হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপ
হরিতা মিমিক্ষিরে॥ (অথর্ববেদ/১৩)।

অর্থাৎ ইন্দ্র সম্পর্কিত সবকিছুই হরিতাভ। তাঁর বজ্র, গাত্রবর্ণ, আভরণাদি সবই ছিল হরিতবর্ণ।

৩। এই লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ।

৪। ঐ/দেবশিবিরে অর্জুন দ্রঃ।

৫। স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা/রাজ্যেশ্বর মিত্র।

৬। Race Movements and Pre-historic Culture—*Dr. S. K. Chatterjee—Vedic Age.*

৭। বাইবেল/যাত্রা পুস্তক দ্রঃ।

৮। প্রমাণ/এরিক ফন দানিকেন/অনুঃ অজিত দত্ত।

৯। ঐ/অতিকথা চাক্ষুষ বিবরণ/পৃঃ ৮৮-৯০। ১ম সং দ্রঃ।

১০। এই লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা'/

১১। প্রমাণ/পৃ. ১৮৬/১ম সং দ্রঃ।

১২। দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ/দানিকেন/অনুঃ অজিত দত্ত।

১৩। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্রঃ।

ব্রহ্মার রাজ্যে অজ্ঞাতবাস

দেবশিবিরের প্রহরায় পাণ্ডবদের বার বছর বনবাসকাল শেষ হয়ে গেল। এরপর এক বছর অজ্ঞাতবাস পর্ব। বড কঠিন পরীক্ষা। পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে পুনরায় বনবাসী হতে হবে। সেটাই শর্ত। সেই শর্ত মেনে নিয়ে যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় পাশা-পরাজয় বরণ করেছেন। পরাজয় বরণেও দেবতাদেরই নির্দেশ ছিল। সুতরাং অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থাও তাঁরাই করলেন। অজ্ঞাতবাসের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির দর্শন পেলেন এক অদ্ভুতদর্শন দেবদূতের। সে দেবদূতের খেতাবও ধর্ম। ধর্মখেতাবধারী সেই যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন প্রলম্ব সাংকেতিক উপদেশ। উপদেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন করলে বোঝা যায়, সেগুলি ছিল দেবরাষ্ট্রের কিছু প্রচলিত অনুশাসন। পাণ্ডবরা দেবতাদের পার্থিব উপনিবেশের ভাবী শাসনকর্তা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তাই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সঙ্গে দেবানুশাসনগুলির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যক্ষরূপী ধর্ম প্রথম পাণ্ডবকে সেসব শিক্ষাই দিলেন। তারপর পাণ্ডবদের বললেন : হে কুরুশ্রেষ্ঠগণ! আমার অনুগ্রহে তোমরা বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাসকাল কাটাবে। অর্থাৎ অজ্ঞাতবাসকাল কাটাবার জন্য, হে পাণ্ডবগণ, তোমরা অতঃপর বিরাট রাজ্যে গমন কর। দেব-ভাষায় যক্ষের উপদেশটি ছিল এই রকম :

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎ প্রসাদাৎ কুরূদ্বহাঃ।
বিরাট নগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ॥ (সিদ্ধান্তবাগীশ)

যক্ষের উপদেশ শুনে ভারতের প্রাচীন মানচিত্রটির ওপর নজর ফেলতে হল। আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন অমনি সতর্ক জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে। আর্যাবর্তে এতো এতো রাজ্য থাকতে দেবশিবির পাণ্ডবদের জন্য বিরাট রাজ্যটিই বা বাছাই করলেন কেন? সে রাজ্যের বৈশিষ্ট্যটা আসলে কী? এ-ও কি সেই ব্রহ্মার পরিকল্পনা?

অবশ্যই। ব্রহ্মার পরিকল্পনা ছাড়া মহাভারতে তো কোনো কাণ্ডই ঘটে নি। পাণ্ডবদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ব্রহ্মাজীর হিমালয় শিবির থেকে। এখন দেবতারা ওঁদের পাঠাচ্ছেন একেবারে ব্রহ্মার নিজের রাজ্যে। ব্রহ্মার প্রতাপ তখন ঐ একটিমাত্র রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র বিরাট রাজ্যেই হত সাড়ম্বরে ব্রহ্মা পূজা। প্রাচীন মানচিত্রে বিরাট রাজ্যের বিস্তার ছিল রাজস্থানের জয়পুর

আলোয়ার ভরতপুর অঞ্চল জুড়ে। রাজ্যবাসীদের নাম ছিল মৎস্য। মৎস্যেরা ছিলেন দেববুদ্ধিদাতা ব্রহ্মাজীর অনুগামী। অর্থাৎ রাজা বিরাট ছিলেন দেবানুশাসনসেবী দানযজ্ঞশালী দেবানুগত দেশীয় রাজন্য। দেবতারা ঠিক করলেন বিরাট রাজ্যই হবে অজ্ঞাতবাসের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। স্বয়ং রাজার পৃষ্ঠপোষণা ও রক্ষণাবেক্ষণে পাণ্ডবদের রাখতে পারলে হস্তিনাপুরের গুপ্তচরেরা তাদের সন্ধান পাবে না। সুতরাং বনবাসে অসহায়ভাবে ভ্রমণ করতে করতে পাণ্ডবরা অকস্মাৎ বিরাট রাজ্যে গিয়ে রাজ-সমাদর পান নি, দেবশিবিরই আগে থেকে তাঁদের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে রেখেছিলেন। এই যুক্তির সপক্ষে পরে আরও কিছু প্রমাণ আমি মহাভারত থেকেই উদ্ধার করছি।

যক্ষের উপদেশ শোনার পর পার্থকে যুধিষ্ঠির বলেছেন :

এবমেতন্মহাবাহো ! যথা স ভগবান প্রভুঃ।
অব্রবীৎ সর্ব্বভূতেশস্তথা ন তদন্যথা ॥

বিরাট ১।১৪ (সিদ্ধান্তবাগীশ)

অর্থাৎ, প্রভু যেমন নির্দেশ দিয়ে গেলেন, তেমনিই হবে। তার অন্যথা হতে পারে না। চলো ভাইসব, অতঃপর আমরা বিরাট রাজ্যেই গমন করি।

বিষয়টি যে শুধু কল্পগল্প নয়, গূঢ় রাজনীতি, তা আরও পরিষ্কার হয় ভীষ্মের একটি উক্তিতে।

অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবরা কোথায় অবস্থান করতে পারেন, এই নিয়ে কুরুসভায় যখন রাজনৈতিক মন্ত্রণা চলছে, তখন ভীষ্ম বলেছেন : যুধিষ্ঠিরের মত লোক যে দেশে থাকবেন, সে দেশে "বহুতর বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি ও প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত প্রচুর যজ্ঞ হইবে।" অর্থাৎ বুঝতে হবে সে রাজ্যটি দেবানুগত এবং সেখানে পুরোহিত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। কেননা সেখানে পুরোহিতদের জন্য 'ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণা'রও ব্যবস্থা থাকবে। আর সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা ধর্মের (অর্থাৎ দেব-শিবিরের) সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকবেন : "ধর্মাশ্চ তত্র দৃশ্যন্তে সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ"। একথায় এটাও সুস্পষ্ট যে সে রাজ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, ভীষ্ম সে কথাও বোঝাতে চেয়েছিলেন।

ভীষ্ম যে রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার কথা বলেছেন, আমরা আমাদের আলোচনায় বলেছি, সেই ব্যবস্থা বহিরাগতদের নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থা ছিল। জন-শাসিত এই গ্রহে তাঁরাই প্রবর্তন করেছিলেন, সেই শ্রেণীশোষিত সামাজিক আইন প্রথা। আগেও বলেছি, নভশ্চর দেবতারা একই কালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণীভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করেন। এই ব্যবস্থা

এক দিকে যেমন পরশ্রমভোগী কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করে, অপর দিকে তেমনি সমাজে একটি শৃঙ্খলাবোধেরও জন্ম দেয়। পাপপুণ্যের বোধ, কর্তব্য অকর্তব্যের বিধান রচনা করে একটি আইনের রাজত্ব তাঁরা গড়ে দেন। অতঃপর মানুষের রাজারাও মনোনীত হতে থাকেন বহিরাগত প্রভু দেবতাদের দ্বারা। এই দেবতাদের সম্প্রচারিত দর্শনও শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিন্যাস রচনা করে যায়।[১] প্রাচীন পুরাণে শ্রেণী-শোষণের বিধানকে ঈশ্বরের অভিশাপ ও নির্দেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল যখন বলেন, In the sweat of thy face shalt thou eat bread (মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরা তোমাদের আহার্য সংগ্রহ করবে), তখন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের মূল কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেখি, বিশেষ শ্রেণীর জন্যই দেবতারা এই ব্যবস্থার বিধান দিয়ে গেছলেন। দেবতাদের স্তাবক পুরোহিতবৃন্দের জন্য স্বেদার্জিত আহার্যের বিধান ছিল না। অপরের স্বেদ-সিক্ত কর্ষিত ভূমির ফসলের সিংহভাগ দেবভোগে ও পুরোহিত সেবায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন সুমের ও মিশরবাসীদের রাষ্ট্র-সামাজিক ব্যবস্থায় একই কালে এই শ্রেণী ও শোষণভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবর্তনা ইতিহাসেও লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্য বলে : "লাগাসের সমস্ত জমিজমা প্রায় ২০টি ছোটখাটো দেবতার মধ্যে ভাগ করা ছিল···দেবতার প্রতিনিধি·· পুরোহিতরা দেবতার সমস্ত সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করত। নানারকম অত্যাচার শোষণ তারা চালাতো। সে যুগের লিখিত নথিপত্রের মধ্যে আছে যে তারা যা খুশি তাই করতে পারতো।"[২]

ভারতের তিরুপতি, জগন্নাথদেব, তারকেশ্বর প্রমুখ দেবদেউলের সেবাইতরা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিলেন। প্রাচীন যুগের অর্থনীতির নিয়ামকই ছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়। রাজারা ছিলেন তাঁদের রক্ষক। সাধারণের জীবনে সমৃদ্ধি বলতে কিছুই ছিল না। না ছিল শিক্ষা, না ছিল সম্পদ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীর সিন্দুকে তালাবদ্ধ। সাধারণের জন্য তাঁরা ভীতি-উৎপাদক কিছু গল্পকথা প্রচার করেছিলেন, যেগুলি আজও আমাদের সকল কুসংস্কারের মূল।

"পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর এরিস্টটলও ধর্মমত ও ভাববাদের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তির পিছনে অজ্ঞতা ও শ্রেণীস্বার্থের চেয়ে মহত্তর কোন হেতু আবিষ্কার করতে পারেন নি।"[৩]

এরিস্টটল লিখেছেন :

"Our forefathers in the remote ages have handed down to their

posterity a tradition in the form of a myth, that these bodies (heavenly) are gods and that the divine encloses the whole of nature. The rest of the tradition has been added later in the mythical form with a view to the persuasion of the multitude and to its legal and utilitarian expediency."

পুরাপিতাদের তৈরী অভিনব সুচতুর এক শোষণ-ব্যবস্থা ধর্মাধর্মের গল্প সাজিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সেই মুগ্ধ চোখে মহাভারতের পাঠ গ্রহণ করলে পাণ্ডবদের বিবাট রাজ্যে উপনীত হওয়ার ঘটনাটি দৈবী আশীর্বাদ বলেই মনে হয়। কিন্তু নির্মোহ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার সুস্পষ্ট রাজনীতিটি। ভীষ্মের রাজনৈতিক জ্ঞান যথার্থই ছিল। তিনি যেমনটি অনুমান করেন, বিরাট রাজার রাজ্যটি ছিল ঠিক তেমনটিই।

মৎস্যরাজ বিরাট এমন কি রাজা দ্রুপদের মতও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। অত্যন্ত দুর্বল, তাই সর্বাংশে দেবনির্ভর ছিলেন নামেমাত্র রাজা বিরাট। বিরাটের সেনাপতি কীচকই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মৎস্যরাজ্যের শাসক। কীচকের অধীনে ছিল অপরাজেয় এক দুর্ধর্ষ বাহিনী যাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস ছিল না মৎস্যরাজের। মৎস্যরাজ দেবানুগত ও ব্রহ্মাপূজক হলেও কীচকের জন্যই দেবতারা সেই দেবরাজ্যে পূর্ণ প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছিলেন না। চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব্রহ্মা তাই পাণ্ডবদের বিরাট রাজ্যে প্রেরণ করে একই ঢিলে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা করলেন। এক, অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবদের সুরক্ষিত করা এবং দুই, কৌশলে কীচকবধপর্ব সম্পন্ন করে বিরাটরাজাকে দেবতাদের খাস অধিকারে আনা।

বিরাট রাজ্যে পাণ্ডবদের আগমনের অব্যবহিত পরে তাই দেখা গেল, রাজা বিরাট মহাসমারোহে অজ্ঞাতকুলশীল পাঁচ ভাই, ও তদীয় নর্মসহচরী দ্রৌপদীকে আপন রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করলেন। অজ্ঞাত-পরিচয় আগন্তুকদের কোনো রাজা তাঁর রাজ্যের মুখ্য পদগুলিতে বসান না। আগেই গোপন সিদ্ধান্ত না থাকলে এমনটি ঘটে না। আমরা জানি, দেবশিবিরে এই সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছল যে, পাণ্ডবরা বিরাট রাজ্যেই যাবেন। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, মৎস্যরাজের কাছেও আগেভাগেই দেবশিবিরের নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল। নির্দেশ ছিল, যে পঞ্চপুরুষ একটি নারীসহ তাঁর রাজ্যে এসে 'যুধিষ্ঠির' নামের সঙ্কেতবাক্য উচ্চারণ করবেন, রাজা তাঁদেরই সাদরে গ্রহণ করে তাঁর রাজ্যের মুখ্য পদগুলিতে নিযুক্ত করবেন।

এবং দেবানুগত মৎস্যরাজ সে নির্দেশ যথাযথই পালন করেছিলেন। কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরকে বিরাট শুধু তাঁর রাজাসনের পাশে একটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন নি, রাজ্যমধ্যে একটি অদ্ভুত অকল্পনীয় ঘোষণাও প্রচার করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন: "সমাগত দেশবাসী লোকেরা শ্রবণ করুন, এই দেশে আমি যেমন প্রভু, কঙ্কও (যুধিষ্ঠির) সেইরূপ প্রভু হইলেন!"

কী অসম্ভব ঘোষণা! রাজা স্বয়ং অপরিচিত বিদেশীকে আগমনমাত্র দ্বিতীয় রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করছেন! শুধু কি তাই! তিনি সুস্পষ্টভাবে আরও বললেন, ব্রাহ্মণ বা অন্য কেউ, যিনিই কঙ্কের অসম্মান করবেন, তিনিই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হবেন। রাজস্থানের শাসক নিশ্চয় মূর্খ ছিলেন না। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতিরও কোনো প্রমাণ গোটা মহাভারতে নেই। সুতরাং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তিনি খেয়ালের বশে করেন নি। ভেবেচিন্তেই করেছেন। তাঁর মত দুর্বল রাজা দুঃসাহসীর ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়েছেন অথচ ব্রাহ্মণরা উপবীত উচ্চে তুলে তাঁকে ভস্ম করতে আসেন নি! কঙ্ক ও তাঁর সহগামীদের পেয়ে রাজা নিজেকে এতই শক্তিমান বিবেচনা করেছেন যে, শ্যালক কীচকের ভয় থেকেও মুক্ত হয়ে তিনি রাজসভায় বসে ঐ অদ্ভুত আদেশ প্রচার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এতোগুলি ঘটনা এমনি ঘটেনি। কঙ্ক সভায় এসে নিজেকে যুধিষ্ঠিরের পার্ষদ রূপে পরিচয় প্রদান করামাত্র রাজা দেবশিবিরের সংকেত বুঝেছেন। বুঝেছেন, 'যুধিষ্ঠির' সংকেতবাক্য উচ্চারণকারী ঐ পুরুষপঞ্চক দেবশিবির-প্রেরিত, সুতরাং তিনি দেবশিবিরের নির্দেশ অনুসারে অকুতোভয়েই কাজ করেছেন। এই ঘটনা আরও জানায়, মৎস্যরাজ্যের ব্রাহ্মণ নেতাদের কাছেও একই সংবাদ ছিল। তাঁরাও জানতেন, পঞ্চভ্রাতা দেবশিবিরের অনুগ্রহভাজন। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাই আন্দোলন দেখা দেয় নি।

সম্ভবত পাণ্ডবদের নিরাপত্তার জন্যই তাঁদের সঠিক পরিচয় দেবতারা ফাঁস করেন নি। তাঁরা জানতেন, হস্তিনাপুরের চরবাহিনী আর্যাবর্তের সর্বত্র পাণ্ডবদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই দেবমনোনীতদের চিহ্নিত করার জন্য 'যুধিষ্ঠির' নামটিকে সংকেতবাক্য করা হয়েছে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা প্রত্যেকেই রাজসভায় এই সংকেতবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

রাজা বিরাটের নিরাপত্তারও প্রয়োজন ছিল। ছিল সমগ্র রাজ্যের সকল মুখ্য বিষয়গুলির ওপর দেবনিয়ন্ত্রণ জোরদার করার। সেজন্যই বিরাট তাঁর রাজ্যের সবকটি চাবিকাঠি কঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর হাতে তুলে দিলেন। কঙ্ক বা যুধিষ্ঠির হাল ধরলেন মৎস্যরাজ্য শাসনের। ভীম গ্রহণ করলেন রাজ

পাকশালাটির ওপর নজরদারির কাজ। পশুশালার প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন সহদেব। নকুল নিলেন সকল রাজযান ও সারথিদের তত্ত্বাবধায়কের পদ। ওদিকে অন্তঃপুরে রাজমহিষীদের ওপর নজরদারির উদ্দেশ্যেই দ্রৌপদীকে নিযুক্ত করা হল রাজেন্দ্রাণীর নিত্যসহচরী রূপে। আর সেই রাজান্তঃপুরের শক্তিশালী গোপন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে সমাসীন করা হল বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে। অর্থাৎ আটেঘাটে রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকটি বেঁধে ফেলা হল পঞ্চপাণ্ডবকে দিয়ে। কীচক ছিলেন মহিষী সুদেষ্ণার ভাই এবং তিনিই কার্যত বিরাটের ওপর প্রভুত্ব করতেন। কীচক নিজমুখেই বলেছেন, বিরাট নামেমাত্র রাজা, প্রকৃত শাসক তিনিই। সম্ভবত এজন্যই সৈরিন্ধ্রীবেশিনী নারী দেবানুচর দ্রৌপদী ও যুদ্ধনিপুণ বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে রাজান্তঃপুর পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন দেবতারা। তাঁরা হয়ত কোনো বিদ্রোহ অথবা গুপ্ত অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করেছিলেন। পাকশালা থেকে রাজ্যের শাসনভার, সর্বত্রই তাই পাণ্ডব প্রহরাকে সুদৃঢ় করা হয়েছিল। পুতুলরাজা বিরাট সবই মেনে নিয়েছেন, কীচক বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

এরপর দেবতাদের পরিকল্পনানুসারেই বাকি ঘটনাবর্ত মৎস্যরাজ্যে একটি ছোটখাটো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিল। প্রথমেই কীচক হত্যার পরিকল্পনাটি জরাসন্ধ হত্যার মডেলে সাজিয়ে তোলা হল। কীচককে প্রলুব্ধ করলেন সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদী। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বালাই ছিল না তাঁর। আপন সম্ভ্রমবোধ বিসর্জন দিয়ে ইতিপূর্বেও তিনি দেব-উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দেবতাদের প্রয়োজনেই আর্যাবর্তের আর এক বীরপুরুষ কীচকের মৃত্যু অবধারিত হয়েছে। কীচকের জীবনকালে মৎস্যরাজ্যের ওপর ব্রহ্মার শাসন অবাধ ও নিষ্কণ্টক হতে পারছিল না। সুতরাং দ্রৌপদীকে সে কাজের ভার গ্রহণ করতে হল। গভীর রাত্রে তিনি চললেন কীচকের প্রাসাদে মোহিনী রূপসজ্জা করে। কীচকবধের পক্ষে একটি আপাত যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য দ্রৌপদী অবশ্য আগেভাগেই রটনা করে রেখেছিলেন,—কীচক তাঁর প্রতি লুব্ধ এবং তাঁকে উত্যক্ত করছেন। কিন্তু ঘটনা বলল, দুষ্ট কীচকের থেকে শতহস্ত দূরে না থেকে কীচকের ভদ্রতার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই দ্রৌপদী স্বয়ং মধ্যরাত্রে কীচক-প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর কীচকের কাছে প্রণয় নিবেদন করে সেই মল্লবীরকে যথেচ্ছ সুরাপানে প্রমত্ত করান। প্রলোভিত পুরুষটিকে অতঃপর রাজপ্রাসাদের এক ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে নিয়ে আসেন সৈরিন্ধ্রী। নির্জন সেই অন্ধকার কক্ষে আগে থেকে তৈরী হয়ে শিকারীর মত ওৎ পেতে ছিলেন

ভীমসেন। মদমত্ত কীচকের দুর্বল অবস্থায় তিনি সেই রাজস্থানী বীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নিঃশব্দে নির্জনে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেন। গুপ্তঘাতকের দ্বারা এইভাবেই জরাসন্ধ ও কীচক নিহত হলেন। এরপর কীচকের অনুগত বাহিনীকে কায়দা করতে বেগ পেতে হয় নি পাণ্ডবদের। কোনো যুদ্ধ নয়। কারোকে প্রস্তুতির সুযোগ দান করা নয়। অতর্কিত আক্রমণে খতম করার দেবরাজনীতি এ ভাবেই একের পর আর একটি শক্তিশালী বীরকে দুর্বল মুহূর্তে নির্বিচারে হত্যা করেছে।

ওদিকে কীচক বধের সংবাদটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণের ধারণা হল, কীচক নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। হস্তিনাপুরে এ সংবাদ নিয়ে গেলেন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা। কীচকের বাহুবল আশ্রয় করে বিরাট রাজা দেববিরোধী ত্রিগর্তরাজের ওপর হামলা করেছিলেন ইতিপূর্বে। কীচক-হত্যার সংবাদে তাই সুশর্মা খুশি। ছুটে গেলেন তিনি দুর্যোধনের কাছে। দেববিরোধী রাষ্ট্রজোটের নেতা দুর্যোধন। দুর্যোধনের নেতৃত্ব মানতেন তাই সুশর্মা।

ওদিকে আপন শিবিরভুক্ত রাজা সুশর্মার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব ছিল দুর্যোধনেরও। সুতরাং বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের হুকুম দিলেন তিনি। কিন্তু এই অভিযানের পেছনে আরও যে একটি উদ্দেশ্য ছিল, মহাভারতকার তা উপযুক্ত উল্লেখের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন নি। কয়েকটি ঘটনা পারম্পর্যে আমরা সেই উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে নিতে পারি।

আগেই বলেছি, পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকাল কোন্ রাজ্যে অতিবাহিত করতে পারতেন এ সম্পর্কে ভীষ্ম একটি মোটামুটি ধারণা পোষণ করতেন। আর্যাবর্তে তখন সম্পূর্ণ দেবানুগত রাজ্য ছিল ঐ রাজস্থান বা মৎস্য। কীচক বধের সংবাদেও নিশ্চয় কৌরবরা সন্দেহ করে থাকবেন যে, কীচক ভীমকর্তৃক নিহত হয়েছেন। ভীমের যুদ্ধপদ্ধতি তাঁদের অবিদিত ছিল না। কীচকবাহিনী সেই যুদ্ধপদ্ধতির দ্বারাই পরাস্ত হয়েছেন, চরমুখে দুর্যোধনের পক্ষে সে সংবাদ পাওয়াও খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া মৎস্যরাজ্যে যে একটি নারীসহ পঞ্চজন বিদেশী পুরুষের পদার্পণ ঘটেছে, কীচক হত্যার পর সেটাও চাউর হয়ে যাওয়ারই কথা। এবং সে সংবাদ ফাঁস হয়ে গেলে কুরুদের পক্ষে পাণ্ডবদের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা তৈরী করা ছিল খুবই সহজ। সম্ভবত সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই দুর্যোধন মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করতে যান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে। আর্যাবর্তে তখন হস্তিনাপুরের শক্তিই তুঙ্গে। সে তুলনায় কীচকহীন মৎস্যরাজ্যের ক্ষমতা বলতে

গেলে নগণ্য। একা ত্রিগর্তরাজই বিরাটকে পরাজিত করতে সক্ষম ছিলেন এবং দেখা যায়, বিরাট পরাজিতও হয়েছেন তাঁর কাছে। ভীম এসে বিরাটকে রক্ষা না করলে ত্রিগর্তের হাতেই মৎস্যেরা সেদিন পরাজিত হতেন। সুতরাং বিরাট রাজ্যে যুদ্ধাভিযান করার জন্য দুর্যোধনের পক্ষে বিপুল রণসজ্জার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেল সর্বশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্যোধন যুদ্ধযাত্রা করেছেন। সুশর্মাও যোগ দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। তত্রাচ কুরুবৃদ্ধদের উপদেশ ছিল যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই দুর্যোধন যে এক জবরদস্ত মহাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছেন সেটা যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রসূত সিদ্ধান্ত হয় নি। তাঁদের ঐ আশঙ্কারও কোনো ব্যাখ্যা মহাভারতকার দেন নি।

আমরা বুঝতে পারি না, এমন আশঙ্কা কেন দেখা দেবে। একা কর্ণই দিগ্বিজয়ে বার হয়ে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন, সেই কর্ণের সঙ্গে তিন শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সহ স্বয়ং দুর্যোধন দুঃশাসনও ছিলেন। তবু ঐ আশঙ্কা কেন? কারণ একটিই মাত্র হতে পারে। কুরুবৃদ্ধেরা নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন, পাণ্ডবরা বিরাট নগরেই আছেন। তাঁরাই রাজার বাহুবল। সুতরাং এটাও বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয় নি যে, যেখানে পাণ্ডব সেখানে দেবতাদের পূর্ণ শক্তিও মোতায়েন আছে। সেজন্যই বিরাট রাজ্যের সঙ্ঘর্ষটিকে তাঁরা ছোট করে দেখতে চান নি। বিপুল প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

মহাভারতকার কিন্তু এ বিষয়ে খোলাখুলি কিছুই স্বীকার করলেন না। কেবলমাত্র পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সাফল্য বিষয়ে যখন পরবর্তীকালে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে, তখন খুবই মৃদুচ্চারিত ভাষায় শুনতে পেলাম, কৌরবরা দাবি করেছেন, অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই পাণ্ডবদের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল, সুতরাং শর্ত অনুযায়ী তাঁরা স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। শর্ত লঙ্ঘন করার জন্য তাঁদের পুনরায় বনবাস যাত্রা করতে হবে। এই তর্ক খণ্ডন করানোর জন্য মহাভারতকার আবারও ভীষ্মকে সাক্ষী মেনেছেন এবং তাঁর মুখে একটি গণনা উপস্থিত করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পাণ্ডবরা যথাযথভাবেই শর্ত পালন করেন। আমরা অবশ্য জানি যে, কোনো শর্ত পালনের ধার ধারতেন না বহিরাগত দেবতারা। তাঁদের আদর্শ ছিল রণে ও অভীষ্ট সিদ্ধিতে কোন পন্থাই অগ্রাহ্য নয়।

মনে হয়, পাণ্ডবদের গতিবিধি যে কৌরবদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, এই

সত্যটি গোপন করার জন্যই মহাভারতকার দুর্যোধনের সেই বিপুল রণসজ্জার কারণ ব্যাখ্যা করেন নি।

১। From its beginning philosophy has been a participant in the class struggle. It has been partisan to a progressive or a declining class and thus has sought to advance science or to advance superstition...Philosophy characterised class society, from the fifth and sixth centuries B. C. in ancient China, India and Greece to the present day—*Howard Selsam.*

২। পৃথিবীর ইতিহাস/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৩। যুগের আলো—মার্ক্সবাদের গোড়ার কথা/অনল রায়।

৪। সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র পুষ্করে (রাজপুতানা) একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে, আর কোথাও নেই। কথিত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং পুষ্কর হ্রদে স্নান করে যজ্ঞ করেন। তাই এই হ্রদও আদি তীর্থ। হ্রদের চারদিকে রাজা মহারাজাদের অট্টালিকা আছে।

অর্জুনরথে রোবট?

ত্রয়োদশ বর্ষের ব্যবধানে দেবতারা কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী বা আমদানী করতে পারেন কর্ণ-দুর্যোধনের সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। বিরাট বাহিনী নিয়ে মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করেও তাই তাঁদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হল। পরাজয় যখন সুনিশ্চিত, কুরুবৃদ্ধেরা তখন সেই পরাজয়ের সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলেন দুর্যোধনের ওপর। বললেন, পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধাভিযানে আসা ঠিক হয় নি। কুরুবৃদ্ধদের বিরক্তির বহর দেখে মনে হয়, তাঁরা বিরাট-রাজ্যে দেবশক্তির প্রতিরোধের কথা চিন্তা করেছিলেন। অর্থাৎ বুঝেছিলেন, বিরাটের রক্ষক তখন পাণ্ডবরা ও দেবশক্তি। কিন্তু মহাভারতকার তখনি আবার ভীষ্মের মুখে এমন একটি গণনা উদ্ধৃত করলেন, যা বলে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল অতীত হয়েছে। এই গণনা বস্তুত নির্ভুল কিনা গবেষকরা সেকথা জানাবেন। আমার ধারণা, সে গণনায় গলদ আছে। বাস্তবিক পক্ষে অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পাকেচক্রে পাণ্ডবদের আত্ম-প্রকাশ করতে হয়। এবং সে কারণেই শর্ত লঙ্ঘনের জন্য দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হন। শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনা না ঘটলে, দুর্যোধনের বক্তব্য—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী, চতুর্দিকে ঘোরতর প্রতিবাদের সম্মুখীন হত। প্রতিবাদ করতেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্যও। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারি, প্রতিবাদ দূরের কথা, যুদ্ধে কুরুবৃদ্ধদের পূর্ণ সম্মতিই ছিল। দুর্যোধনের বক্তব্যে তা পরবর্তী সময়ে পরিষ্কার বোঝা গেছে।

কিন্তু সেকথা পরে। আগে বলি অর্জুনোপাখ্যান।

ইতিপূর্বে হিমালয়-স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের ব্যবহার শিখে এসেছেন ইন্দ্র-ঔরসজাত পৃথাপুত্র অর্জুন। সেসব অস্ত্র ছিল অগ্নিবর্ষী ক্ষেপণাস্ত্র। ইতিপূর্বে অর্জুনকে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। কিন্তু বিরাট পর্বে আমরা দেখলাম, শুধুই ক্ষেপণাস্ত্র নয়, অত্যাধুনিক সম্মোহনাস্ত্র পর্যন্ত তিনি অক্লেশে ব্যবহার করলেন। ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভবত কুরুপক্ষের কিছু রথী মহারথীরও ছিল। সম্মোহনাস্ত্র নিবারণ করার মত অস্ত্রবল কিন্তু তাঁদের ছিল না। বিরাট-নগরে সসৈন্যে পরাজয়ের মূল কারণ সেটাই। শুধু বুঝতে অসুবিধা হয়, সম্মোহনাস্ত্রের দ্বারা কুরু সেনাপতিদের যখন বিরাট-নগরের মিনি

কুরুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলেন অর্জুন, তখন সেই অবসরেই তিনি কুরুবীরদের খতম করে ফেললেন না কেন?

কিন্তু যা নেই মহাভারতে তাই নিয়ে কথা বাড়িয়েও লাভ নেই। আমরা মূল ঘটনায় প্রবেশ করব।

কুরুসেনা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করলে সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদীর পরামর্শে রাজপুত্র উত্তর পার্থকে সারথি করে যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু বিশাল কুরুসৈন্যের সম্মুখীন হয়ে তরুণ রাজপুত্রের আর সাহস হল না যুদ্ধ করার। তিনি রথ ছেড়ে পলায়নের উদ্যোগ করতে অর্জুন তাকে নিজের পরিচয় প্রদান করে উত্তরকে সারথির দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। বললেন, ভয় নেই। লড়ব আমি। তুমি শুধু আমার রথ চালনা কর।

উত্তরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অতঃপর তিনি রথটিকে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন সেই বিখ্যাত শমীবৃক্ষের তলায়। বিরাট-নগরে প্রবেশের সময় শমীবৃক্ষের শাখায় পাণ্ডবরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখেন।

গাছের ওপর থেকে নামানো হল সেই অস্ত্রশস্ত্র। তারপরই ঘটতে লাগল একের পর এক অদ্ভুত কাণ্ড। সুরু হল রূপকথা।

কিন্তু আমরা বলেছি, মহাভারতের কোনো কথাই রূপকথা নয়। যা রূপকথা আমরা তার বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যোদ্‌ঘাটন করব। অতএব রূপকথার রূপোলি মোড়ক এইবার আমাদের খুলতে হবে। দেখা যাক, রূপকথার আবরণে ঘটনা কীভাবে গা ঢাকা দিয়ে আছে :

উত্তরকে রথের কাছে পাহারায় রেখে শমীবৃক্ষের আর এক পাশে গিয়ে অর্জুন একাকী কী যেন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড উত্তরের বোধগম্য হল না। উত্তরের মনে হল, বৃহন্নলা ধ্যানে বসেছেন (অর্থাৎ হয়ত অর্জুনকে সে বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুনলো, যার ফলে তার ধারণা হল, অর্জুন ধ্যানে বসেছেন, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন)।

মহাভারতে এ ঘটনার প্রতিবেদনটি এই রকম; অর্জুন "অস্ত্রসমূদয় ধ্যান করিতে লাগিলেন।" বোঝা গেল, শমীবৃক্ষ থেকে নামানো তীর ধনুকের বোঝা পাশেই পড়ে রইল; বেশ কিছু সময় নিয়ে অর্জুন অন্যান্য অস্ত্রের জন্য ধ্যান করছেন। তাঁর সেই ধ্যানের ফলাফলও অদ্ভুত। ধ্যানের ফলে অদ্ভুতদর্শন কিছু অস্ত্র শস্ত্র "প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল, 'হে মহাভাগ! এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত। এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?"

বিশ্লেষণের জন্য আমাদের দুটি শব্দ বেছে নিতে হবে, (১) ধ্যান, (২) কিঙ্করগণ।

'ধ্যান' বলতে মহাভারতের ঘটনাবলী অদ্ভুত যোগাযোগের কথাই বোঝাতে চেয়েছে। যেমন বলা হয়েছিল, ধ্যানের দ্বারা কুন্তী ও মাদ্রী দেবতাদের আহ্বান করে দেবপুত্র লাভ করেছিলেন। ঘটনা-বিশ্লেষণে আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে কুন্তী ও মাদ্রী দূরভাষ যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন হিমালয়ে তাঁদের বার্তা প্রেরণ করার জন্য। ঠিক তেমনি অর্জুনও কোনো যন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যন্ত্রমাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেছেন। যেহেতু সেই দূরাভাষ যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরের কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং পরবর্তী মহাভারত-কথকরাও এই ঘটনার অর্থোদ্ধার করতে পারেন নি, সেজন্য তাঁদের মনে হয়েছে, বার্তাপ্রেরক অর্জুন ধ্যান ও মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন মায়াবিদ্যার দ্বারা। বার্তা প্রেরণের অব্যবহিতকাল পরেই যে 'অস্ত্র সকল' উপস্থিত হয়েছে সেগুলি পার্থের প্রতি সৌজন্যপ্রকাশ করে মানবভৃত্যের মত তাঁকে 'প্রণিপাত' করেছে এবং বলেছে, "আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ" উপস্থিত, আজ্ঞা করুন কী করতে হবে।

কিঙ্কর শব্দের অর্থ, ভৃত্য বা অনুচর। অস্ত্র কথা বলে না, প্রণাম করে ভৃত্য বলে নিজেদের পরিচয়ও জ্ঞাপন করে না। সুতরাং উপস্থিত অস্ত্রগুলিকে অসাধারণ কোন বস্তু বলেই বুঝতে হয়। তাহলে তারা কী? যদি তারা মানব-যোদ্ধা বা দেবসেনা হত, উত্তরের চোখে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি মায়াধ্যান বলে প্রতিভাত হত না। অস্ত্রগুলির মানবোচিত গুণ সত্ত্বেও তাই তাদের মানব বা দেবসেনার শ্রেণীতে ফেলা যায় না। সেগুলি অন্যতর কোনো বস্তু যাদের সঙ্গে কখনো পরিচয় ছিল না উত্তরের।

অস্ত্রগুলি আদেশ প্রার্থনা করলে পার্থ বললেন, "হে অস্ত্রগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য সম্পাদন কর!" মানুষ বা দেবতা হলে অর্জুন তাদের 'অস্ত্রগণ' বলে সম্বোধন করতেন না। অতএব ঐ যোদ্ধাদের অস্ত্রাকার যোদ্ধারূপেই গণ্য করতে হয়। বিজ্ঞানের মায়াবিদ্যা আজ এমন অস্ত্রাকার যোদ্ধাও তৈরী করতে পারে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রোবট বা যন্ত্রমানবের দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের অভিপ্রেত কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

দীর্ঘ তের বছরের প্রস্তুতিকালের মধ্যে দেবতারা তেমনি কিছু ধাতব মানব বা রোবটের সৃষ্টি করেছিলেন, মহাভারতীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আজ কি আমরা তেমন কোনো অনুমান করতে পারি না?

অর্জুন যে বস্তুতই একটি দূরভাষ যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তার আরও প্রমাণ

মহাভারতেই আছে। তথাকথিত ধ্যানের দ্বারা দেবশিবিরে তিনি যে সংবাদ প্রেরণ করলেন, তার ফলে শুধু যন্ত্রমানব বা তথাকথিত 'অস্ত্রগণই' 'প্রাদুর্ভূত' হলেন এমন নয়, তাঁর সামনে আকাশ থেকে আরও কিছু অদ্ভুত বস্তু অবতরণ করল।

মহাভারত বললেন, "অনন্তর অর্জুন বিশ্বকর্ম বিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া···পাবক-প্রসাদ-লব্ধ কাঞ্চন ধ্বজ আরাধনা করিতে লাগিলেন।"

আবার দৈবী মায়ার কথা। সেই মায়ার যাদুকর ছিলেন বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা নির্মিত মায়া অবলম্বন করেই বার্তা প্রেরণ করলেন পার্থ। আমরা জানি, বিশ্বকর্মা ছিলেন দেবতাদের কারিগর। দেবতারা বিজ্ঞানী। তাঁদের কারিগরও তৈরী করতেন বৈজ্ঞানিক বস্তু। অর্জুন তেমনই এক প্রযুক্তিবিদ্যায় নির্মিত বস্তুর মাধ্যমে তাঁর বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। আজ এটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, এমন ধরনের মায়া উয়্যারলেস যন্ত্রই সৃষ্টি করতে পারে।

এরপর "ভগবান পাবক তাঁহার (পার্থের) সঙ্কল্প অবগত হইয়া তদীয় রথপতাকায় ভূত সকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পতাকা সত্বর আকাশ···হইতে তদীয় রথে নিপাতিত হইল।"

ঘটনাটি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল এবার। পাবক মানে অগ্নিদেব। অগ্নিদেবের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তিনি বর্তমানে ব্রহ্মার আদেশে দেবশিবিরের সঙ্গে পাণ্ডবদের সংযোগরক্ষাকারী সামরিক দূতের কার্যে ব্যাপৃত আছেন। পার্থের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে অগ্নি দেবতাদের আকাশযানে অর্জুনের কাছে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেছেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কেবলমাত্র বেতার সঙ্কেতই নয়, লেসার রশ্মির সাহায্যেও দূরস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। এজন্য প্রয়োজন একটি ছোট্ট লেসার পিস্তল।

ফ্রড্রিশ লোরেঞ্জের 'রহস্যময় রশ্মিলোক' (অনু: শৈলেন দত্ত) গ্রন্থে বলা হয়েছে: "লেসারের সাহায্যে কথাবার্তা বলা যায়। লেসার পিস্তল থেকে একটা আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসে, সম্ভবত লাল উজানি ক্ষেত্রে যা আপনার ভাষণ মাইক্রোফোনের সাহায্যে মডিউলেটেড হয়। সংগ্রাহক যন্ত্র দ্বারা লেসার রশ্মি শ্রবণযোগ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই রশ্মি অন্ধকার, কুয়াসা, বর্ষা, সব কিছু ভেদ করতে পারে। এই বিশেষ গুণের সাহায্যে লেসার রশ্মি উড়োজাহাজকে অন্ধভাবে অবতরণে সাহায্য করে।"

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যতটুকু বুঝলাম তা সংক্ষেপে এই:

দেবতাদের সহায়তায় অর্জুন যে অস্ত্রমানবদের আজ্ঞাকারী ভৃত্য হিসেবে লাভ করেন, তারাই বিরাট নগরের যুদ্ধে অর্জুনরথের আগে আগে কুরুসৈন্য ধ্বংস করে অর্জুনের আক্রমণের পথ পরিষ্কার করে দেয়। অর্থাৎ অর্জুন সেই বিশাল কুরুবাহিনীর সঙ্গে একা লড়াই করে কোনো অলৌকিক কীর্তি স্থাপন করেন নি। তাছাড়া অর্জুন যেসব অস্ত্র প্রয়োগ করেন তারও মারণশক্তি ছিল প্রচণ্ড কেননা সেগুলি ছিল অগ্নীবর্ষী বৈজ্ঞানিক অস্ত্র। অর্জুনরথের ভূতসকল ছিল মহাশব্দ সৃষ্টিকারী ভীতিউৎপাদক যন্ত্র।

মহাভারত বললেন, যুদ্ধকালে পার্থ পাবকপ্রেরিত ভূতগুলিকে যেমন আদেশ করেছেন সেই অদ্ভুত বস্তুগুলি যথাযথ তা পালন করেছে।

ততঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ স দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
বিস্ফার্য্য চ ধনুশ্রেষ্ঠং ধ্বজে ভূতান্যচোদয়ৎ॥

(বিরাট/৪৮/২১, সিদ্ধান্তবাগীশ)

অর্থাৎ অর্জুন শত্রুগণের লোমহর্ষক শঙ্খধ্বনি করে গাণ্ডীবধনুতে টঙ্কার তুলে পাবকপ্রেরিত রথধ্বজে অবস্থিত ভূতগণকে গর্জন করার আদেশ দিলে তাদের সম্মিলিত গর্জনে পৃথিবী কেঁপে উঠল। আর সেই গর্জনে কুরুসেনা কবলিত বিরাট রাজের গো-বাহিনী লাঙ্গুল তুলে বিরাট নগরের দিকে সভয়ে পালাতে সুরু করল।

গর্জনকারী ভূতগণও তাহলে 'অস্ত্রগণে'র মতো বিশেষ বৈজ্ঞানিক বস্তু যাদের সঠিক বুঝতে না পেরে মহাভারতকার নানাভাবে বস্তুগুলিকে বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এদের কখনো অমানুষ প্রাণী, কখনো ভূত, কখনো বা বানর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কথক পরিশ্রম করেছেন বস্তুগুলির আকৃতি ও কর্মকে বোঝাতে। মানুষের মত কর্মকারী (আদেশ শুনে তারা গর্জন করে) অথচ যারা যথার্থ মানুষ নয়; প্রায় মানুষের মতই দেখতে, তবু যারা যথা অর্থে মানুষ নয়,—অমানুষ, ভূত ও প্রাণীগণ বলে তাদেরই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কবি। বানর বলতেও অর্ধমানবের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। বিকল্পে 'নর' যে সেই 'বানর'। আজকের বৈজ্ঞানিক অনুমিতির ওপর নির্ভর করে তবে কি বুঝব, দেবতাদের বিজ্ঞানী দূত অর্জুন রথের সহযোদ্ধা হিসেবে এই ঘোর শব্দসৃষ্টিকারী অদ্ভুত যন্ত্রমানবগুলিকে প্রেরণ করেছিলেন, যারা মানুষ নয়, তবু মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট এবং যাদের কর্মকুশলতাও জীবন্ত প্রাণীগণেরই সমতুল্য? প্রাণহীন, তবু যখন যেমনভাবে ইচ্ছে পার্থ তাদের সেভাবেই চালনা করতে পেরেছেন, তাই প্রতিবেদক জানিয়েছেন, সেগুলি 'ভূত'। মৃত প্রাণী সপ্রাণ জন্তুর মত আচরণ করলে

আমরা তাদের 'ভূত' বলি। ভূতের সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক আছে। এই যন্ত্র-মানবগুলি উৎকট 'সাইরেন' বাজিয়ে রণক্ষেত্রে অর্জুনকে হাজির করলে সেই শব্দে সচকিত হয়েছে গো অশ্ব ও হস্তীর দল, কিছু কিছু নির্বোধ পদাতিও প্রাণভয়ে পলায়ন করেছে। বৈজ্ঞানিক কুশলতায় সৃষ্ট শব্দকে তারা অপার্থিব ভূতরব বলে ধারণা করেছে। কেবলমাত্র শব্দসৃজনের দ্বারা অর্জুনের প্রাথমিক জয় করায়ত্ত হয়েছে। দেখা গেছে, এই প্রাথমিক জয়ে অর্জুন মৃদু মৃদু হাস্য করেছেন এবং ভূতগণকে আরও বেশি শব্দ সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি রোবটগুলিকে সেইভাবে প্রোগ্রামিং করিয়েছেন।

রণক্ষেত্রে অর্জুনরথ প্রবেশের আগেই কুরুসেনাদের প্রতি গোলাগুলি দাগা সুরু করে দিয়েছিল 'অস্ত্রগণ' নামক রোবটগুলি।

বলা হয়েছে, "গাণ্ডীবে জ্যা রোপণপূর্ব্বক (অর্জুন) টঙ্কার প্রদান করিলেন। যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গাণ্ডীবে প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবৃষ্ট হইল, পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল, প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, দিক সকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছান্ন হইয়া উঠিল, চতুর্দিকে ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ড-সকল উদ্‌ভ্রান্ত ও পাদপরাজি বিচলিত হইয়া উঠিল।"

কেবলমাত্র একটি ধনুকে জ্যা রোপণ করায় নিশ্চয় এত কাণ্ড ঘটে নি। বর্ণনায় আগ্নেয় অস্ত্রের মুহূর্মুহু ব্যবহারের কথাই বরং স্পষ্ট। যে ভীষণ শব্দের কথা কবি বলেছেন তা গোলা বর্ষণেরই শব্দ। পরেই বলা হয়েছে, 'চতুর্দিকে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল'।

উত্তর রাজার ছেলে। যুদ্ধ বিগ্রহ সে দেখেছে, যুদ্ধে গেছেও। কিন্তু "এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিলীনভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে অর্জুন অভয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন।"

..."ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীব টঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূতসকল প্রেরণ করিলেন। শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবশব্দ ও ধ্বজসন্নিবিষ্ট ধাবমান উর্দ্ধপুচ্ছ অমানুষ ভূতসকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল।"

আগ্নেয় যুদ্ধের আরও বর্ণনা :—

"তাঁহাদিগের (কুরুসেনার) বোধ হইল যেন, প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজা-সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ তৎকালে অর্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় নাই।"

"...অর্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন।"

এবং সে যুদ্ধে অর্জুন যে একা লড়াই করেননি তারই সাক্ষ্য খুঁজে পাই মহাভারতের পাতায় এইভাবে: "অনন্তর দুর্যোধনসেনা মহাবল-পরাক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্রপ্রভা নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিস্বন ধ্বজস্থিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের (রোবট?) ভৈরব রব (অস্ত্রক্ষেপ?) শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল।"

কবি বারবার গর্জন, অলৌকিক শব্দ এবং আগ্নেয় বাণের কথা বলায় সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় যে যুদ্ধপর্বটি সামান্য তীরধনুকের লড়াইমাত্র ছিল না। অর্জুন যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেছেন সেগুলি সম্ভবত শমীবৃক্ষ থেকে নামানো অস্ত্রাদি নয়, রোবটগুলির সঙ্গে দেবতারা তা প্রেরণ করেছিলেন। আরও সন্দেহ হয়, হয়ত বা গাণ্ডীব বস্তুটি আদৌ কোনো ধনুই ছিল না। ধনুকের টঙ্কার শৈল পতনের শব্দ সৃষ্টি করে না। আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্র কোনও দূরক্ষেপ্তা যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হলে তা ফেটে যাওয়ার সময়ই শুধু মহাভারত বর্ণিত শব্দজাল সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্যই গাণ্ডীবকে সাধারণ ধনু ভাবা যায় না। মহাভারতের সকল যোদ্ধা গাণ্ডীবের অদ্ভুত নির্মিতি নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন। সাধারণ ধনুক শ্রেণীর হলে মহাভারত জুড়ে গাণ্ডীব প্রশস্তি শোনা যেত না। তবে কি গাণ্ডীব ছিল অগ্নিগোলা বৃষ্টিকারী কোনো দূরক্ষেপ্তা যন্ত্র? অর্জুন-নিক্ষিপ্ত বানে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং সেই অগ্নিময় লৌহাস্ত্র হস্তী রথ ও পদাতিগণকে দগ্ধ করেছে। গাণ্ডীবের ধ্বনি মেঘবৎ গর্জনকারী! তার শব্দে জন্তু ও নিম্ন-শ্রেণীর যোদ্ধারা ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়াও অর্জুনের ছিল ঐন্দ্র, পাশুপত, সম্মোহনী প্রভৃতি অস্ত্র। যে অস্ত্রের প্রয়োগে কুরুযোদ্ধাগণ সম্মোহিতের মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের গাত্রাবরণী উত্তরার পুতুলের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন উত্তর, সে অস্ত্র সেকালে যত অদ্ভুতই বিবেচিত হোক একালে কিন্তু অতি সাধারণ অস্ত্র। আধুনিক বন্দুকের নল থেকে যেমন টিয়ার গ্যাস সেল ফাটানো যায় তেমনিই গুলি ছুঁড়ে সাময়িকভাবে মূর্ছিতও করা যায় লক্ষ্য বস্তুকে। অরণ্যচারী হিংস্র জন্তুদের সম্মোহিত করে পশুরক্ষকরা তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন আজকাল। সেকালেও এমন অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। অথর্ব বেদে এক ধরনের গ্যাস রজ্জুর কথা আছে। এই গ্যাসতার পুড়তে সুরু করলে তার বিষাক্ত গন্ধে শত্রুরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। সুতরাং অর্জুন অলৌকিক কাজ কিছুই করেন নি, ঈশ্বরের বরপুত্রও তিনি ছিলেন না। বিজ্ঞানে অনগ্রসর পৃথিবীর বুকে আগন্তুক বহিরাগত নভশ্চররা আপন স্বার্থে এই গোলকের কিছু মানুষের হাতে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র,

তুলে দিয়েছেন। সেই অস্ত্র ব্যবহারের খুবই সীমিত ও প্রাথমিক জ্ঞান তাঁরা পৃথ্বীপুত্রদের দিতেন। পাছে তারা শক্তিশালী হয়ে পড়ে। অর্জুনকেও শিখিয়েছিলেন তাঁরা অস্ত্র প্রয়োগের নৈপুণ্য। তার বেশি কিছু নয়।

বলা হয়েছে, অর্জুন একাকী কুরু সৈন্যদের ঠেকালেন। একথা হয় মিথ্যাপ্রচার, নয় বোঝার ভুল। বিরাট পর্বে আমরা দেখলাম, পার্থের রথচূড়ায় অদ্ভুত রোবটগুলি প্রোগ্রামিং অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ শত্রুর মোকাবিলা করছে তারাও। আরও দেখলাম, পার্থপ্রেরিত সঙ্কেতের প্রত্যুত্তরে শুধু সেই রোবটগুলিকে প্রেরণ করেই দেবতারা নিশ্চিন্ত হন নি, তাঁরা বিমানযোগে সদলে যুদ্ধ প্রাঙ্গণের মাথায় টহল দিয়েছেন; সংবাদ নেই অবশ্য, এ যুদ্ধে আকাশপথ থেকে তাঁরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা। মহাভারতীয় তথ্যে শুধু এটুকুই পাওয়া যাচ্ছে যে, তাঁদের বিমানের আলোকে যুদ্ধক্ষেত্রটি আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং গন্ধর্ব চিত্রসেন উড্ডীন অবস্থায় অর্জুন-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সাফল্য দর্শনে খুশি হয়ে ইন্দ্রকে অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন "মানুষেরা (না দেখিয়া) ইহা বিশ্বাস করিবে না। কারণ মানুষের মধ্যে এরূপ অস্ত্রক্ষেপ নৈপুণ্য নাই। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ দারুণ মহাস্ত্রের সম্মেলন আশ্চর্যই বটে।" (বিরাট, ৫৯/৩৯/সিদ্ধান্তবাগীশ)। সম্ভবত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে গন্ধর্বরাই ছিলেন বৈজ্ঞানিক নির্মাতা। বিজ্ঞানবিশারদ বলেই এঁদের বলা হয়েছে 'কেতপূ'। কুরু-অর্জুন সংঘর্ষে দেব-অস্ত্রের প্রয়োগ-সাফল্যে এজন্যই চিত্রসেনকে উৎফুল্ল হতে দেখা যায়। বিশ্বকর্মা ছিলেন বিজ্ঞানী প্রধান।

অস্ত্রাদির শব্দ বর্ণনা করে কবি বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দাহ্যমান বাঁশ ফাটার মত এবং আকাশে বজ্র নির্ঘোষের মত ভয়ঙ্কর শব্দে চতুর্দিক উচ্চকিত হয়েছিল। বোঝা যায়, সে যুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার হয়েছে। বাইবেলে আছে, সদাপ্রভু গন্ধকযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। অথর্ববেদে ধূমাক্ষী নামে এক ধরনের অস্ত্রের কথা আছে। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র লিখেছেন, "এটি সম্ভবতঃ একটি গোলক ছিল যেটি শত্রুদের মধ্যে পতিত হয়ে ফেটে যেত এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শত্রুদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করত। এর প্রচণ্ড আওয়াজে শত্রুরা ভীত হয়ে পলায়ন করত।"

দেবতাদের অস্ত্র নিয়ে, মাথার ওপর দেববিমানের ছত্রছায়া ধারণ করে এবং রথে অমানুষ, বানরবৎ অদ্ভুত শব্দকারী প্রাণীগণের (রোবট ?) সাহচর্য লাভ করে অর্জুন যুদ্ধ জয় করেছেন সে যুদ্ধে কুরুসেনা যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকায়। দুর্যোধন পক্ষেও বেশ কিছু আগ্নেয় অস্ত্র ছিল, কিন্তু সম্ভবত বিরাট রাজ্য

আক্রমণের সময় আরও শক্তিশালী অস্ত্র হয় তাঁরা সঙ্গে আনেন নি, নতুবা ছোটখাটো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে ভেবে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। তাই হার হয়েছিল তাঁদের। তাছাড়া স্বয়ং অর্জুন যে অজ্ঞাতবাসকালে যুদ্ধ করতে আসতে পারেন কুরুগণ সে সম্ভাবনাও আগেভাগে গণনা করেন নি। অর্জুনাগমন ঘটলে তাঁদের মধ্যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তাতে মনে হয়েছে অজ্ঞাতবাস উত্তীর্ণ হওয়ার সময় সম্পর্কে অনেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। পরবর্তী বিচারে দুর্যোধন পক্ষ অভিযোগ তুলেছিলেন যে পাশাখেলার শর্ত ভঙ্গ করে অজ্ঞাতবাসকাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। পাণ্ডবপক্ষ অবশ্য সে অভিযোগ অস্বীকার করেন। যাই হোক, কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয় ছিল। তখনকার দিনে শুধু সন তারিখ ধরেই তো সময়ের বিচার হত না, পঞ্জিকামতে তিথি নক্ষত্র দণ্ড পলেরও হিসেব ছিল। আমরা জানি না, সূক্ষ্ম বিচারে পাণ্ডবরা প্রকৃতই শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন কিনা। বিরাটের গোধন হরণ যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস সময় নিয়ে কুরুদের মধ্যে একটি আলোচনা হয়। দুর্যোধন যখন বললেন, "পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিল। এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্য বাস স্বীকার করতে হইবে..." তখন "ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা···তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করতে লাগিলেন।" এই সত্য জ্ঞাপনের পর কথক ফের ভীষ্মের মুখে পাণ্ডবদের সত্যরক্ষার কথা বসিয়েছেন। কোনটা বিশ্বাস করব? আমরা শুধু ভালোভাবেই জানি যে আপন স্বার্থে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবগণ খুব সহজেই শর্ত লঙ্ঘন করতেন, করতেন অন্যায় যুদ্ধ ও নীতিহীন আচরণ।

ওদিকে দেশ কাল পাত্র গণনা না করেই রণং দেহি রব তুলে বিরাট নগরে এসে ভ্রান্ত রাজনীতির খেসারত দিতে হয়েছে দুর্যোধনকে। পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই যে দুর্যোধন-কর্ণ যুদ্ধার্থে বেরিয়ে পড়েছিলেন এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে কর্ণের প্রতি কৃপাচার্যের উক্তিতে। কৃপ বলেছেন, "দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ। হীনকালং তদেবেহ ফলবন্ন ভবত্যুত ॥" (বিরাট, ৪৪/৩, সিদ্ধান্তবাগীশ)। অর্থাৎ অনুকূল দেশকালে যুদ্ধ করলে তবেই জয় লাভ হয়, অস্থানে অসময়ে যুদ্ধে ফল হয় না।

বিরাট পর্বে কুরুপক্ষের পরাজয় উপরোক্ত অবিমৃষ্যকারিতারই ফলাফল। এ ছাড়াও অপর একটি প্রধান কারণ হল এই যে, দুর্যোধন পক্ষে কর্ণসহ সকল কুরুযোদ্ধারাই ছিলেন অহঙ্কারী। কুরুশিবিরে প্রকৃত কোনো সেনাধ্যক্ষের

শাসন ছিল না বললেই হয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধ চলাকালে মহারথীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ বাধিয়ে বসতেন যার ফলে কুরুশিবিরের সংহতি নষ্ট হত। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ধারা হত বিপর্যস্ত। এই ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের মৃত্যু পর্যন্ত চলেছে। এমন কি শল্য কর্ণের বিতণ্ডা বস্তুতপক্ষে কর্ণের যুদ্ধ পরিচালনাকে বহুলাংশে বিভ্রান্ত করেছে। আর এইসব অবস্থায় দুর্যোধনকে বড় অসহায়, চিন্তিত, বিব্রত ও ক্ষিপ্ত হতে দেখেছি আমরা। দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য, তিনি রাজা হয়েও তাঁর সেনাপতিদের ওপর উপযুক্ত প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ পান নি। কর্ণ বন্ধু এবং অন্যান্যেরা গুরুজন। এই গুরুভার বহন করে রাজকার্য বিশেষত যুদ্ধকার্য পরিচালনা বিড়ম্বনা বৈকি।

অন্যদিকে (নেপথ্যে দেবনেতৃত্বে পরিচালিত) পাণ্ডব শিবিরের সর্বমান্য বুদ্ধিদাতা ছিলেন অংশত যদুনেতা বাসুদেব কৃষ্ণ এবং মুকুটহীন অথচ মাননীয় মহারাজ ছিলেন আর এক কূটনীতিজ্ঞ, যুধিষ্ঠির। তাই তাঁদের শিবিরটি ছিল কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী, প্রকৃত অর্থে মিলিটারাইজড।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়পরাজয়ের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, দুই শিবিরের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে বিরাটপর্বেই বুদ্ধিমান নভশ্চর দেবতারা নিশ্চয় তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা গেল, দেবশিবির যুদ্ধের সিদ্ধান্তই পাকা করে ফেললেন। অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে বিরাট নগরে সেনা সমাবেশ সুরু হয়ে গেল! রাজা দ্রুপদ ও কৃষ্ণ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অর্জুনপুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন! এবং বিবাহের পর দিনই তাঁরা যুদ্ধের জন্য মন্ত্রণা সভায় বসলেন! এর পর সন্ধির যে কোনো প্রস্তাবই অবান্তর ও অবাস্তব। তবু সাধারণের চক্ষু ধুইয়ে দেওয়ার জন্য পাণ্ডবপক্ষ সাধুতার ছদ্মবেশ ধারণ করতে কসুর করেন নি। সেটা যে কত বড় ছলনা ছিল, পরবর্তী অধ্যায়ের 'উদ্যোগ পর্ব' নামকরণই তার প্রমাণ।

অভিমন্যুর বিবাহ হয়ে গেল বিরাটরাজ কন্যা উত্তরার সঙ্গে। এ বিবাহেও আর্যাবর্তের সকল রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত হন নি। পাণ্ডবরা আর্যাবর্তে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীচক্র মাত্র। বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। তাই বেছে বেছে কতিপয় দেবানুগত রাজাই আমন্ত্রিত হয়ে বিরাট নগরে আগমন করলেন। কিন্তু সেই রাজন্যবর্গের সঙ্গে অক্ষৌহিণী সেনাদলেরও আগমন ঘটায় বিবাহ পর্বটি উপলক্ষ ও সেই জায়গায় যুদ্ধপর্বটিই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। কোনো রাজা নিশ্চয় তাঁর সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়ে সামাজিক আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন না বিশ্বস্ত বন্ধু রাষ্ট্রে। অভিমন্যুর বিবাহে কিন্তু তা-ই হল।

যুধিষ্ঠিরের প্রিয়পাত্র কাশীরাজ ও শৈব এলেন এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে। দ্রুপদের সঙ্গেও সেনাবাহিনী। এলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। কৃষ্ণের সঙ্গে এলেন সাত্যকি। এলো হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে আনলেন প্রচুর উপঢৌকন। আর এলেন শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নর সঙ্গে অক্ষৌহিণী সেনাদল। অর্থাৎ মোটামুটি সেনাসমাবেশ ও বিবাহপর্ব একই সঙ্গে সেরে ফেললেন পাণ্ডবরা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতবৃন্দ এসে প্রচুর ধনরত্নসহ সহস্র গোধন গ্রহণ করলেন হৃষ্ট মনে। রাজ্যের প্রজাশোষিত সম্পদে এঁদেরই তো সিংহভাগ। এঁরাই ছিলেন হিমালয়ের বহিরাগত বুদ্ধিমানদের ভক্তিমুগ্ধ স্তাবক ও প্রচারক।

কোনক্রমে অর্জুনপুত্র ও বিরাটকন্যার চার হাত এক করে দিয়েই পরদিন প্রভাতে বিরাটের সভাগৃহে যুদ্ধের মন্ত্রণা সুরু হল। একের পর এক মহারথী বক্তৃতা করলেন যুদ্ধের সমর্থনে। একমাত্র নিরপেক্ষ বলরামের কণ্ঠস্বরই বেসুরো শোনালো।

বলরাম বললেন: কুরুপাণ্ডবে একটা মিটমাট হয়ে যাওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গল, সন্দেহ নেই। বললেন: পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে রাজ্য হারিয়েছেন। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে শান্তি-প্রস্তাব পাঠানোয় আপত্তির কারণ বলরাম কোথাও দেখতে পান নি। তিনি বললেন, শকুনি দুর্যোধনকে মিথ্যা গালাগালি না দিয়ে কুরুরাজ্যে এমন দূত প্রেরণ করা হোক যিনি অবনত-ভাবে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

বলরামের সেই নিরপেক্ষ বক্তৃতায় কৃষ্ণ-মতাবলম্বী সত্যাকি গরম হয়ে

উঠলেন। বলরামকে চাষা এবং মধুপায়ী বলে গালাগাল করতেও তাঁর বাধল না। প্রকারন্তরে কৃষ্ণাগ্রজকে কৃষ্ণের সামনেই সঙ্কীর্ণ মনের ক্ষুদ্রচেতা কাপুরুষ বলে অবাধে নিন্দাবাদ করলেন। বললেন, কথং হি ধর্মরাজস্য দোষং স্বল্পমপি ব্রুবন্। লভতে পরিষন্মধ্যে ব্যাহর্তুমকুতোভয়ঃ ॥ (উদ্‌যোগ, ৩/৫, সিদ্ধান্তবাগীশ)। অর্থাৎ সত্যকি বিস্মিত একথা ভেবে যে, সভামধ্যে ধর্মরাজের অল্পদোষের কথাও অকুতোভয়ে বলরাম কী করে উচ্চারণ করলেন!

এই প্রথম একটি সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনতে পেলাম পাণ্ডবপক্ষীয়গণের মুখে। জানতে পারলাম, দেবশিবির মনোনীত যুধিষ্ঠিরের স্বল্প দোষও কারো পক্ষে উচ্চারণ করা সেদিন দেবানুগত সমাজে ভয়াবহ অপরাধ বলেই গণ্য হত। পাণ্ডবরা যখন প্রথম বিরাট রাজ্যে এলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের প্রিয় পার্ষদরূপে কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির তাঁর পরিচয় প্রদান করলে রাজা বিরাটও তৎক্ষণাৎ তাঁর সভাসদ্‌গণকে বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, যেই হোন না কেন, তিনি যদি কঙ্কের অসম্মান করেন, তবে অবশ্যই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সাত্যকি ও বিরাটের আচরণে, সুতরাং, এটাই বুঝি যে, বহিরাগত দেবতাদের অভিসন্ধি-মূলক ধার্মিক প্রচারের অন্তরালে ছিল স্বৈরতন্ত্রের চোখ রাঙানি। তারই প্রতিবাদে আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গ স্বাধীনতার স্বার্থে দুর্যোধনের পতাকাতলে সমবেত হতে বাধ্য হয়েছেন। ধর্মীয় নামাবলীর নেপথ্যে রক্তলোলুপ এই স্বৈরতন্ত্র ভারতের মাটিতে ছিল নয়া আমদানি। আমদানিকারক ছিলেন দেববাহিনী। কেননা বৈদিক আর্যরা সম্প্রসারণবাদী হলেও সমভোগী জনশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই লালিত হয়েছিলেন। বৈদিক মন্ত্রাদিতে সকলের জন্য সমান ভাগের প্রার্থনা আছে। বর্ণাশ্রমও বেদে কোনোরকম কঠোর অনুশাসনে পরিণত হয় নি। জাতিভেদ ও বর্ণভেদের কঠোরতা পৌরাণিক যুগের ঘটনা (অর্থাৎ যখন থেকে দেহধারী দেবতারা কল্পিত পরমেশ্বরের পবিত্র আসন বে-দখল করতে সুরু করেন)। এ প্রসঙ্গে আগেই কিছু আলোচনা পাদটীকায় উদ্ধার করে দেখিয়েছি। বেদের দশম মণ্ডলে পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রচনা পুরুষসূক্তেরও আলোচনা করেছি। এখানে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে উদ্ধার করলাম:

প্রাচীন সাম্যবাদী জীবনধারা থেকে উত্তরাখণ্ডের সমাজবিন্যাস ক্রমশ শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হলে, হারিয়ে-যাওয়া সমানাধিকারের জন্য প্রক্ষিপ্ত এবং অর্বাচীন বৈদিক শ্লোকের মধ্যে করুণ হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। হারানো অতীতকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা শুনতে পাই:

"তোমরা একত্র মিলিত হও! এক কণ্ঠে ঘোষণা কর! একত্র মন বিনিময় কর! যেরূপ অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র বসিয়া তাঁহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন।"

মনে হয়, দেবতাদের আবির্ভাবকালে জনশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই বহিরাগত আগন্তুকরাও সাম্যবাদী সমাজকেই মেনে নিয়েছিলেন। কেননা তখনও দেবতাদের অনুশাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।

আর একটি শ্লোকের প্রার্থনা: "মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, মন সমান হউক, বিচার একরূপ হউক!"

এই অবস্থা বিপর্যয় কেমন করে সাধিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তর্কের নিষ্পত্তি করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "মনে রাখা দরকার—জনসাধারণের সভা-সমিতিকে—তথা রাজনৈতিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে অবদলিত করে রাজশক্তির এই যে চূড়ান্ত বিকাশ মহাভারতে প্রকট হয়েছে, এর সূত্রপাত মহাভারতের যুগেই নয়। ঋগ্বেদেই দেখা যায়, যুদ্ধ-নায়ক ইন্দ্রের বাধাবন্ধহীন স্বৈরাচারী শক্তির স্তুতিতে বৈদিক কবিরা ক্রমশই মুখর হয়ে উঠেছেন। কেননা আধুনিক বিদ্বানেরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছেন, ইন্দ্রের এ-গৌরব ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ের পরিচায়ক নয়; প্রকৃত প্রাচীন পর্যায়ে মহত্তম বৈদিক দেবতা বলতে বরুণ; এবং এই বরুণ সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতীক, সখ্যের প্রতীক, এবং কালক্রমে ঋগ্বেদে এই বরুণের গৌরবকেই ধূলিসাৎ করে ইন্দ্রের গৌরব প্রবল হয়ে উঠেছে।······বৈদিক কবিদের কল্পনায় দেবতা-জগতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে এক গভীর সমাজ বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার মূল কথা হল, প্রাচীন যৌথ-জীবনের ধ্বংসস্তূপের উপর ক্ষাত্রশক্তি-শাসিত ও ব্রাহ্মণ্যশক্তি সমর্থিত সুস্পষ্ট শ্রেণী সমাজের আবির্ভাব।" (ঋগ্বেদের সমাজ ও চিন্তা/বিশ্বকোষ/৫ম খণ্ড)।

মহাভারতে দেখলাম, ক্ষিপ্ত সাত্যকি বলরামের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে বলছেন, ধর্মরাজের দোষ প্রদর্শনের দুঃসাহস বলরামের হয় কী করে। দেখলাম, এর পরই বলরাম নির্বাক হয়ে গেলেন। রইলেন নিরপেক্ষ।

বলদেবকে স্তব্ধ করে বাকি সভাসদবর্গ কুরুনাশের পরিকল্পনা সুরু করলেন। রাজা দ্রুপদ হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণের পক্ষে মত প্রকাশ করে দূতকে বলে দিলেন, কুরুসভায় গিয়ে পাণ্ডবদের অশেষ প্রকার গুণকীর্তন করে কুরুপক্ষীয় বীরগণের মনে ভেদ সৃষ্টি করে আসতে হবে। তাঁদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হলে দুর্যোধনকে সেই ভেদাভেদ সামলাতেই বেশ কিছু দিনক্ষয় করতে হবে এবং

সেই অবসরে পাণ্ডবরা সৈন্য সংগ্রহ এবং সামরিক দ্রব্য সঞ্চয় করতে পারবেন। দূতের প্রতি তীক্ষ্ণধী বিরাটের উপদেশাবলী বাস্তবিক স্মরণীয় :

অমাত্যেষু চ ভিন্নেষু যোধেষু বিমুখেষু চ।
পুনরেকত্র করণং তেষাং কর্ম্ম ভবিষ্যতি ॥১০॥
এতস্মিন্নন্তরে পার্থাঃ সুখমেকাগ্রবুদ্ধয়ঃ।
সেনাকর্ম্ম করিষ্যন্তি দ্রব্যাণাঞ্চৈব সঞ্চয়ম ॥১১॥

[ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ সিদ্ধান্তবাগীশ]

দূত গেলেন শান্তি প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে, উদ্দেশ্য কুরুশিবিরে ভেদ ও সংশয় সৃষ্টি করা। এদিকে পাণ্ডবগণের শ্বশুর দ্রুপদরাজা অন্যান্য রাজ্যেও দূত প্রেরণ করলেন। আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষরূপে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীপতি ও রাজাদের কাছে।

ওদিকে কুরু শিবিরেও যুদ্ধোদ্‌যোগ সুরু হয়ে গেছে। তাঁরাও দূত পাঠাচ্ছেন মিত্ররাষ্ট্রগুলির কাছে। পাণ্ডবদের কাছে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কেই দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। রাজা দ্রুপদের মত দূতকে অবশ্য তিনি আধুনিক মতে রাজনৈতিক তালিম দিতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, হে সঞ্জয়, তুমি বিরাট সভায় সকলকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করে কুরুবংশের হিতার্থে কথা বোলো। অর্থাৎ সঞ্জয়ের বক্তব্যকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেন নি রাজা। দূতকে আপন বিবেচনামত তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতেই বলেছেন।

• শৈশবে সঞ্জয় অর্জুনের প্রিয়সখা ছিলেন। সুতরাং দূত হিসেবে সঞ্জয় যা বলেছিলেন তাকে আমরা নিশ্চয় একদেশদর্শী বক্তব্য বলে সরিয়ে রাখতে পারি না। মানতে হয়, তাঁর বক্তব্যে কিছু সত্য অবশ্যই নিহিত ছিল, উচ্চকণ্ঠে যার প্রতিবাদ যুধিষ্ঠির বা কৃষ্ণ কেউই করতে পারেন নি।

অর্জুনসখা সেই সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে কী বললেন? বিরাট রাজসভায় দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভীক কণ্ঠে অনায়াসেই বলতে পারলেন : "দেখুন, জ্ঞাতিবধ করায় আপনাদের যে পাপ হইবে, তাহা শুভ্রবস্ত্রে কজ্জলবিন্দুর ন্যায় প্রকাশ পাইবে।" ...বললেন : "যে যুদ্ধে সর্ব্বনাশ, পাপ ও স্বাভাবিক সর্ব্বপ্রকার নরকের সম্ভাবনা করা যায় এবং যে যুদ্ধে জয় ও পরাজয় সমান; কোন্ বুদ্ধিমান লোক সেই যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিয়া থাকেন?...সকল কৌরবকে বিনাশ করিয়া যে জীবিত থাকিবেন, আপনাদের সে জীবন জ্ঞাতিবধবশতঃ নিশ্চয়ই মৃত্যুর কারণ হইবে।"...বললেন, "নীচবংশজাত নীচ লোকদের ন্যায় পাণ্ডবেরা কি করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থশূন্য জ্ঞাতিবধরূপ কার্য্য করিতে পারেন?" (সিদ্ধান্তবাগীশ থেকে)।

এখানে নিষ্ফল যুদ্ধ ও জ্ঞাতিবধের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। সঞ্জয় মনে করেন, এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, পাপযুদ্ধ। পরিণামে বিলাপ ছাড়া এ যুদ্ধে দ্বিতীয় পুরস্কার নেই।

সম্পূর্ণ নতুন কথা। একেবারে মহাভারত-বিরোধী বক্তব্য। বক্তব্যটি কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। মহাভারত পাঠের পর আমরাও মনে করি, যুদ্ধটা পাণ্ডবদের বিলাপেরই কারণ হয়েছিল। জ্ঞাতিবধ করে তাঁরা যে রাজ্যলাভের বাসনা চরিতার্থ করবেন বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল হয়নি। শাসনক্ষমতা চলে গেছল দেবপুরোহিতদের হাতে। সুতরাং সঞ্জয়ের অনুমান অভ্রান্ত, যুদ্ধের পরিণাম পাণ্ডবদের ক্ষেত্রেও রমণীয় হয় নি। সঞ্জয় বলেছেন, হে যুধিষ্ঠির, জ্ঞাতিবধ করে পাপ ও অধর্ম করবেন না। এমন দুঃসাহসী উক্তি দেবশিবিরের বাছা বাছা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি আর কেউ উচ্চারণ করেন নি। সঞ্জয়ের বক্তব্যে বিষ ছিল না, ছিল না পক্ষপাতিত্ব। সঞ্জয় রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মত শুভাশুভ বিচার করেছেন, তাছাড়া তিনি অবধ্য দূত। তাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যরা তাঁদের স্বাভাবিক উত্তেজনা দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরকে এবং সে কৈফিয়ৎ হয়ত যথেষ্ট নয় এমন আশঙ্কা করে মাঝপথে তাঁর তর্ক থামিয়ে তিনি সাক্ষী মেনেছেন পাণ্ডবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও বাগ্মী বাসুদেব কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন, ধর্মরাজ্য বলতে বস্তুত কি বোঝায় এবং সেই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করছেন যে সমুদয় ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের উৎসন্ন করা কেন সবিশেষ জরুরী। আমি সেই অপূর্ব ব্যাখ্যা এখানে তুলে দিচ্ছি। এই ধর্মরাজ্যের চরিত্রটি বুঝতে পারলেই মহাভারত ও মহাভারতের গুরুভার অতিকথনের স্বরূপ পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ব্রাহ্মণ শুধু অধ্যয়ন, যজন, দানগ্রহণ এবং তীর্থভ্রমণ করবেন। বৈশ্য বাণিজ্য দ্বারা উপার্জন করবে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবা করবে। শূদ্র অধ্যয়ন করবে না, যজ্ঞ করাও (অর্থাৎ সভা ও সমিতি করা) তার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। সর্বদা আলস্যবিহীন হয়ে সেবা দ্বারা উপার্জন করবে। অর্থাৎ উদয়াস্ত পরিশ্রমের দ্বারা উচ্চবর্ণের সেবা করাই তার কর্তব্য। এ সবই স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ।—অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণ স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশকেই ধর্ম বলে জানেন ! শ্রেণীভেদ দুষ্ট সমাজে পরশ্রমভোগী ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও গুরুসেবাকেই ধর্মরাজ্যের নীতি বলে মানেন। আর যাঁরাই তা না মানেন, তাঁরা দস্যু। ভারি চমৎকার এই ভগবান ! তিনিও স্মৃতিশাস্ত্র আওড়ান !

দস্যু বধ করেই মানুষ পুণ্য লাভ করে। এ-ও ভগবৎ-বাণী!

"সঞ্জয়! অধর্মজ্ঞ কৌরবেরা ধর্মের মর্ম বুঝিতে না পারায় এই গুরুতর দস্যুত্ব দোষ আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তাহা ভাল হয় নাই।"

(উ/২৯/৩১)—সিদ্ধান্তবাগীশ।

যে ধর্মের অর্থ গুহার অন্ধকারে নিহিত আছে বলে যুধিষ্ঠির কখনই সুস্পষ্টভাবে তার ব্যাখ্যা করেন নি, কেবলই এড়িয়ে গেছেন সে প্রশ্ন ছলছুতোয়, কৃষ্ণবাক্যে তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বুঝলাম, পাণ্ডবরা শ্রেণীভেদদুষ্ট একটি সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে ধর্মরাজ্য স্থাপনা বলে বুঝেছিলেন। কিন্তু এই নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁদের মনেও দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল অথবা সেই নয়া ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতি সুনিবিড় না হওয়ায় সে ব্যবস্থার সমর্থনে যুধিষ্ঠির সব সময় উপযুক্ত কথা সাজাতে পারতেন না। কেবলমাত্র 'রাজ্যলোভে' (এ স্বীকৃতি তাঁর নিজস্ব) পাণ্ডবরা ধর্ম ধর্ম বলে চিৎকার করেছেন; ধর্ম বস্তুত কী এটা বুঝতে প্রথম পাণ্ডবের গোটা জীবন ব্যয়িত হয়ে গেছে। তাই তাঁকে দেবশিবিরের সকল পদস্থ অনুচরের পায়ের তলায় ভক্তিমুগ্ধ হয়ে ধর্মবিষয়ক জ্ঞান নিতে সর্বদা সাগ্রহী দেখেছি। বড় আশায় মন বেঁধেছিলেন তিনি। দেবতারা তাঁকে 'ধর্মরাজ' খেতাবে ভূষিত করেছেন। স্বপ্ন দেখতেন, দেশীয় রাজন্যবর্গের শ্মশানভূমিতে সোনা ফলিয়ে রাজচক্রবর্তী হয়ে বসবেন একদিন। তাই প্রাণান্ত পরিশ্রম ছিল দেবতাদের নয়া আমদানি সেই ধর্মতত্ত্ব বোঝার জন্য। কবি বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরের এই একনিষ্ঠতাকেই দার্শনিক কৌতূহল বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সভয়ে আমি কিন্তু বলি, যুধিষ্ঠিরের এবম্বিধ কার্যটি নিতান্তই নির্বোধ রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্যতর কোনো মহৎ ব্যাপার ছিল না। এবং বস্তুত সেই ধর্মতত্ত্ব তিনি কখনই সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। তাই সেধর্ম ব্যাখ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে কৃষ্ণের বাগ্মিতার কাছে।

যুদ্ধ নিশ্চিত জেনে দুর্যোধন প্রথম পাণ্ডবের কাছে নিজস্ব এক দূত প্রেরণ করেছিলেন। দূতের নাম, উলূক। উলূকের মারফত দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে যে কথা বলে পাঠালেন, তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সেটাই ছিল সুগোপন সত্য কথা।

পাণ্ডব শিবিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে উলূক দুর্যোধনের সেই তাৎপর্যপূর্ণ বাণীটি এইভাবে পরিবেশন করলেন। বললেন: "হে পাণ্ডব!...মার্জার যেরূপ মূষিকদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল (ধার্মিক বন্ধু সেজে বিড়ালের মূষিক ভক্ষণের গল্পটির এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছে, বিড়াল

তপস্বী), সেইরূপ আপনিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। আপনার কথা একরূপ, কিন্তু কার্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি কেবল লোকদিগকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন ;...আপনি লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত আছেন, অতএব নিজ বাহুবলে পৃথিবী লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করুন।"

উলুককে দুর্যোধন বলেছিলেন, "হে উলুক ! তুমি পাণ্ডবগণসমক্ষে বাসুদেবকে (কৃষ্ণকে) কহিবে, '...ভয় প্রদর্শনাদি দ্বারা আপনার সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ঈশ্বরই মানুষকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন।' মনে হয়, কৃষ্ণকে ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার যে ব্রাহ্মণ্য চক্রান্ত সুরু হয়েছিল, দুর্যোধন সেই চক্রান্তের প্রতি ইঙ্গিত করেই উলুক মারফত এই কথাগুলি কৃষ্ণকে বলে পাঠিয়েছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন, "ইন্দ্রজাল, মায়া বা অতি ভীষণ কুহক —এই সকল যুদ্ধে গৃহীতাস্ত্র বীরপুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না।"—দেবতাদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ সাধারণ্যে মায়াময় বিভ্রম সৃষ্টি করলেও দুর্যোধনকে তা নতি স্বীকার করাতে পারে নি। ঠিক একই অবস্থা দেখা গেছে মিশ্রীয় ফ্যারাওয়ের ক্ষেত্রেও। আকাশযানে ভ্রমণকারী সদাপ্রভু বারবার মোজেসের মারফত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মায়াজাল বিস্তার করেও ফ্যারাওকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করাতে পারেন নি। (যাত্রা পুস্তক বাইবেল দ্রঃ)। অবশ্য অত্যাচারী ফ্যারাও এবং দুর্যোধনের মধ্যে আশমান জমিন ফারাকও আছে। সেটাও স্মরণ রাখা দরকার।

কৃষ্ণকেন্দ্রিক প্রচার যে হঠাৎ-ই সুরু হয়েছিল, তাও দুর্যোধনের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে বলে পাঠালেন : "হঠাৎ তোমার যশোরাশি লোকমধ্যে বিস্তীর্ণ হওয়াতে আজি জানিলাম, অনেক পুংচিহ্নধারী নপুংসক আছে। তুমি মহারাজ কংসের ভৃত্য ; তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার সমকক্ষ ভূপালগণের কদাচ উচিত হয় না।"—এরপরও কি মানতেই হবে যে কুরুসভায় কৃষ্ণ কোনো বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন ? বহিরাগত ভিনগ্রহী দেবতাদের স্তাবকতা করে ভারতের স্বাধীনতা যারা ক্ষমতালোভে দেবসেবী পুরোহিতদের হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছিল, কৃষ্ণসহ সেই পুরুষত্বহীন সমাজের প্রতি ক্ষোভে বিদ্বেষে রুষ্ট দুর্যোধন এর চেয়ে মধুর বিশেষণ আর খুঁজে পাননি যার দ্বারা তাদের তিনি বিভূষিত করতে পারতেন।

মহাভারতের যতটুকু ইতিহাস ততটুকুর মধ্যে দুই পক্ষের বক্তব্যই সযত্নে রক্ষিত আছে, তবে ঐ 'পুংচিহ্নধারী' দেবপ্রসাদলোভীদের অবিরত হস্তামর্শনের

ফলে দুর্যোধনপক্ষের বক্তব্যগুলি হিমালয়-প্রমাণ মিথ্যার মাটিতে চাপা পড়ে গেছে। পুংচিহ্নধারীদের গুরুপুরোহিত মানার ফলে আমরাও যুগ যুগ ধরে সেই মিথ্যাচারী সাম্প্রদায়িকদের মায়ায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মৃত্তিকাস্তূপে স্বর্গের মহিমা সন্ধান করে ফিরেছি নির্বোধ ক্ষ্যাপার মত। তাই আমাদের ঠুলিপরা চোখের সামনে "আবহমানের ভাঁড়" বারম্বার "এসেছে গাধার পিঠে চড়ে" এবং ভুলিয়ে গেছে দুর্বোধ্য কিছু ('ং') অনুস্বর-কণ্টকিত মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা।

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই, সযত্ন পাঠক অতঃপর কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের প্রত্যুত্তরগুলি লক্ষ্য করলেই দেখবেন, তাঁরা সদুত্তর দিতে না পেরে অভ্যাসমত দুরাত্মা, পাপাত্মা শব্দগুলির পৌনঃপুনিকতার দ্বারা নিজেদের অসহায় উত্তেজনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। একবার নয়, বার তিনেক একই যুক্তি পেশ করে যুধিষ্ঠির স্বমুখে নিজের গুণকীর্তন করে বলেছেন, তিনি এত মহৎ ধার্মিক যে একটি পিপীলিকাকেও বধ করতে কেঁদে ভাসান। তবে হ্যাঁ, যখন যুদ্ধটা হবেই তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকেও পাণ্ডবরা নৃশংসভাবেই হত্যা করবে দুর্যোধন যেন সেকথা মনে রাখে। আর কৃষ্ণ বললেন, আমি যুদ্ধ করব না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন রথের বল্‌গা ধারণ করব। তবে হ্যাঁ, যদি একবার যুদ্ধ করতাম, তবে দুর্যোধন টের পেত। সময়কালে ক্রোধভরে পার্থিবগণকে দগ্ধ করব।

জগদীশ্বর যুধিষ্ঠিরের আদেশ-পালক ভৃত্য মাত্র।

এ সবই মহাভারতের কথা। আমি শুধু উদ্ধৃতিকার মাত্র।

কিন্তু এ কথা কেন? কৃষ্ণ নিজে কি অপার্থিব? নাকি পৃথিবীর বহির্লোক থেকে আসা দেবতাদের দাসানুদাস হওয়ায় পার্থিবগণের সঙ্গে তিনি আর কোন একাত্মতা ও আত্মীয়তা অনুভব করেন না? কৃষ্ণের দাহনক্ষমতার কথা কোথাও পাওয়া যায় না। তবে অর্জুনের মত তিনিও দেবতাদের দাহিকাশক্তি-সম্পন্ন অস্ত্র প্রয়োগ করে পার্থিবদের পুড়িয়ে মারতে অনুৎসাহী ছিলেন না। সে পরিচয় আমরা পেয়েছি খাণ্ডবদাহন পর্বে। তারপর পুনশ্চ দেখলাম, তিনি স্ববংশ যদুকুল ধ্বংস করেছেন যদুরা কতিপয় ব্রাহ্মণ নেতাকে অপমান করেছিলেন এই অপরাধে। কিন্তু তাঁর নিজের পরাক্রম যে নিতান্তই সামান্য ছিল, ব্যাধশরে প্রাণ ত্যাগ করে সে প্রমাণ তিনিই রেখে গেছেন। ভগবানের এহেন মৃত্যুতে আমরা অবশ্য মর্মাহত না হয়ে পারি না।

আমাদের মোহজ্ঞান বস্তুতই রমণী চোখের কজ্জলরেখার মত। আমরা যুগান্তের মিথ্যা ও মায়ার ফাঁদে পড়ে আছি। প্রেমে পড়ে গেছি।

কবি জীবনানন্দের মত তাই বলতে ইচ্ছে করে :

"নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।"

(উন্মেষ, সাতটি তারার তিমির)।

মহাভারতের পথে পথে যুগযুগান্ত আমরা যে জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজ করে বেড়ালাম, সেই সন্ধান-প্রচেষ্টা বারবারই ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? কেন শুধু আবহমানের চর্বিত উচ্ছিষ্টটাই নতুন মার্জিত পাত্রে বারবার পায়সান্ন বলে গ্রহণ করলাম?

এ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করলে জবাব পাই : আমরা বস্তুত সন্ধানী হতে পারিনি। বিচারের আগেই দুরাত্মা পাপাত্মা ও ধর্মাত্মা সম্বন্ধে একটি প্রাপ্ত জ্ঞানকেই শিরে ধারণ করে দায়িত্বহীন বসে আছি। তাই ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্যের কতকগুলো বাসি চিন্তা অবিরতকাল আমাদের মগজে মাছির মত ফন্‌ফন্ করছে। আমরা মুক্ত হতে পারছি না; আবহমানের ভাঁড় আবার ঠিক সময় আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। গুরু পুরোহিত কবলিত হয়ে পড়ছি।

যুধিষ্ঠির কি জীবনে একটিই মাত্র মিথ্যে কথা বলেছিলেন? সেই অশ্বত্থামা হত ইতি গজ? না, এ পর্যন্ত আলোচনায় তাঁর মিথ্যাচারের ইতিহাসই আমরা উদ্ধার করেছি। একটিমাত্র মিথ্যা উচ্চারণ করেছিলেন এই মহাভারতীয় বিভীষণ, এ কথা ব্রাহ্মণদের প্রচারমাত্র। এই স্বীকৃতির দ্বারা যুধিষ্ঠিরের আজীবন মিথ্যাচারকে তাঁরা আবৃত করতে চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক বুদ্ধিদীপ্ত চাতুরীর এহেন নজীর শুধু অপ্রতুলই নয়, একান্ত দুর্লভ।

তাঁকে কেন্দ্র করেই মিথ্যার মহাভারত লক্ষশ্লোকে স্ফীতকায়া হয়েছে।

তাঁর কীর্তিকলাপ বড় সূক্ষ্ম, প্রতিটি কাজের তাৎপর্য বড় দুর্লক্ষ্য।

ঐ যে যুদ্ধের ঠিক প্রাঙ্‌মুহূর্তে কারকে কিছু না বলে নিজের রথ থেকে নেমে পৃথাপুত্র প্রথম পাণ্ডব কুরু শিবিরে প্রবেশ করলেন, দেখুন, তার উদ্দেশ্য কী চমৎকার সূক্ষ্ম। তিনি কুরুপক্ষের তিন প্রধান বীর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ এবং আর্যাবর্তের আর এক মহাবীর শল্যের সঙ্গে গিয়ে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন।

যুধিষ্ঠির যখন অস্ত্র ত্যাগ করে কুরু সৈন্য শিবিরের দিকে নীরবে পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন তখন তাঁর কপটাভিপ্রায় একমাত্র কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেউই বুঝতে পারেন নি। কার্য সিদ্ধির আগে সেকথা প্রথম পাণ্ডব অপর চার ভাইকে বুঝতে

দেনওনি। কপটাচারে অন্যান্য ভায়েরা তাঁর কাছে শিশু। অর্জুন তো কিছুক্ষণ আগেই অস্ত্র ত্যাগ করে বসেছিলেন। জ্ঞাতিহত্যার পাপ তিনি তাঁর অঙ্গে মাখতে নারাজ। তখন কপটশিরোমণি কৃষ্ণকে লম্বা বক্তৃতা করতে হয়েছিল পার্থের মনে পাপভয়শূন্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলার জন্য। (পণ্ডিতজনের মতে 'ভগবদ্‌গীতা পর্বাধ্যায়টি মহাভারতে স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত। তাই বর্তমান আলোচনায় এই অংশটি সরিয়ে রাখলাম। ভবিষ্যতে অন্যতর গ্রন্থে তার ব্যাপক আলোচনার ইচ্ছে রইল)।

কুরুশিবিরে তখন আর্যাবর্তের বীর রাজন্যবর্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ হেন অবস্থায় একবার অর্জুনকে এবং তারপর যুধিষ্ঠিরকে অস্ত্র ত্যাগ করতে দেখে ভারি বিস্মিত হয়েছেন তাঁরাও। অর্জুনের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব তাঁদের কল্পনায় ধরা পড়েনি। যুধিষ্ঠিরের কূটরাজনীতি সরলমনা রাজন্যবর্গ বুঝতে অক্ষম। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন: "এই ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির" নিশ্চয় শঙ্কিত হয়ে ভীষ্মের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে চলেছেন। মহাভারতের মহাত্মা যুধিষ্ঠির সম্পর্কে আর্যাবর্তের অধিকাংশ রাজন্যবর্গের মনোভাব কী ছিল, তাঁর প্রতি প্রযুক্ত উদ্ধৃত দুটি বিশেষণেই তা সুস্পষ্ট। এমন বিশেষণ আর্যাবর্তের তাবৎ রাজন্যবর্গের মুখে শুনলে স্বতঃই মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন এই কপট ধর্মাত্মাকে মোটেও সুনজরে দেখত না। সকলেই ছিলেন দুর্যোধনেরই গুণমুগ্ধ। তাই তো প্রশ্ন জাগে, ভারতের সকল রাজা ও দলপতিরাই দুরাত্মা, আর একা যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ, এই ব্যাপারটার মধ্যেই সবচেয়ে বড় ফাঁকি নিহিত ছিল।

ভীষ্ম দ্রোণ শল্য ও কৃপাচার্যের কাছে গিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁদের প্রণাম করে তাঁর প্রতি তাঁদের মন আকৃষ্ট করার বৃথা চেষ্টা করলেন। সকলেই তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠির যাতে তাঁদের দুর্যোধনপক্ষ ত্যাগ করার অনুরোধ না করেন এজন্য আগেভাগেই বললেন, "···তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব না; অতএব বল, ইহা ব্যতীত আমার নিকট তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?" যুধিষ্ঠির তখন অত্যন্ত নির্দয় ও নির্লজ্জের মত বললেন, "আপনার বধোপায় বলুন?"

প্রতিপক্ষের বীর সেনাপতিদের কাছে গিয়ে কেউ যে এমন বায়না উত্থাপন করতে পারেন তা চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু মহাভারতে অনেক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারই ঘটে। এর কারণ মহাভারত কথকগণ সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নের ধার ধারতেন না। একটি সত্যকে গোপন করার জন্য অনেকগুলি গোলমেলে ঘটনা ও উক্তি নির্দ্বিধায় সাজিয়ে ধরতে পারতেন। তাই দেখলাম, প্রত্যেকের (শল্য

ব্যতীত) বধোপায় জানতেই যেন যুধিষ্ঠির কুরুশিবিরে প্রবেশ করেছেন। দ্রোণ ছাড়া কেউই তাঁদের সংগ্রাম-বিমুখ কোনো অবস্থার কথা জানাননি। ভীষ্ম বললেন, আমার মৃত্যুকাল এখনো উপস্থিত হয়নি। কৃপ বললেন, আমি অবধ্য। দ্রোণ বললেন, একমাত্র অস্ত্র ত্যাগ করলে তবেই আমাকে পরাভূত করা সম্ভব এবং সত্যবাদীর মুখে অপ্রিয় বাক্য শুনলে তবেই আমি অস্ত্র ত্যাগ করব।

ব্যাপারটা এবার তাহলে বিশ্লেষণ করা যাক।

প্রথমত প্রতিপক্ষের কাছে যুদ্ধার্থী তাঁর দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন না, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। ভীষ্ম ও কৃপও তাই করেছেন। দ্রোণ হয়ত কৌতুকচ্ছলে রসিকতা করেছিলেন যা সময়কালে তাঁর মৃত্যুস্বরূপ প্রতিফল প্রসব করে থাকবে। কিন্তু একটা কথা তবুও পরিষ্কার হয় না। তা হল, ঐ চার বৃদ্ধ বীরই কুরুপক্ষে অস্ত্র ধারণের জন্য একই ভাষায় একই যুক্তি খাড়া করবেন কেন? তাঁরা প্রত্যেকে তখন ভিন্ন ভিন্ন রথে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন, একজনের কথা শুনে তারই পুনরুচ্চারণ করার মত অবস্থাও, সুতরাং, সেখানে ছিল না; কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে শুনলাম, বৃদ্ধ বীরগণ নিজেদের অসহায়তা জানিয়ে প্রত্যেকেই যুধিষ্ঠিরকে একই কথা বলছেন: "হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, কৌরবগণ আমাকে অর্থপ্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়াই সংগ্রাম করিতে হইবে, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না।"

একথা যখন পিতামহ ভীষ্ম বলেন তখন সকলেই আমরা চমকিত ও চমৎকৃত হই। ভাবি, এও কী সম্ভব? যে ভীষ্ম সত্যের জন্য আজীবন অকৃতদার এবং বিচিত্রবীর্যের বংশরক্ষা করাই যাঁর জীবনসাধনা, সামান্য অর্থদাস হিসেবে তিনিই আবার কাপুরুষতা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতবড় একটা মিথ্যা কথা আমাদের মেনে নিতে হবে শুধু এই কারণে যে, তার দ্বারা পাণ্ডবদের ভাবমূর্তি রক্ষা করায় পুরোহিততন্ত্রের সুবিধে? আমরা বুঝব, অর্থদাস না হলে ভীষ্ম, সত্যবাদী, সত্যরক্ষক ভীষ্ম অবশ্যই কৃষ্ণোক্ত ধর্মযুদ্ধে যোগদান করতেন? বস্তুত ভীষ্ম যে দুর্যোধন পক্ষেই অস্ত্র ধারণ করলেন, মহাভারতে এটা তো কম বড় ঘটনা নয়। সর্বত্যাগী সত্যপরায়ণ পুরুষ তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে ধরলেন ধনুর্বাণ। আমাদের মনে তাই বিচলিত প্রশ্ন জাগতেই পারে। তবে কি ধর্মযুদ্ধ ব্যাপারটার মধ্যেই ছিল ফাঁকি? হ্যাঁ, এ প্রশ্ন কারো না কারো মনে যে

জাগবেই, চতুর ব্রাহ্মণরা তা তৎকালেই টের পেয়েছিলেন। নিশ্চয় এ প্রশ্ন সে সময়ই জেগে থাকবে, তাই মহাভারতের মত একটি মহা-কালাধারে ভীষ্মের মুখ দিয়ে একটি জবাব তাঁরা লিখে রাখলেন, যার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। আসলে দল ভাঙিয়ে ভীষ্মকে নিজের শিবিরে নিয়ে যেতে এসেছিলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু সৌজন্যমূলক আশীর্বাদটুকু ছাড়া সত্যপরায়ণ পিতামহের কাছ থেকে অন্য সাহায্য তিনি লাভ করেননি। অথচ সে কথা বলা হলে যুধিষ্ঠিরদের ধর্মধ্বজাটি ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তাই একটা সাজানো গল্প বলতেই হল।

অর্থ ও দাসত্বের কথা অবশ্য বলতে পারেন দ্রোণ ও কৃপাচার্য। কিন্তু আমরা এমন একটি যুগের কাহিনী পাঠ করছি যেযুগে মাননীয়রা অর্থবদ্ধ দাস হিসেবে গণনীয় ছিলেন না। দ্রোণ ও কৃপ কুরুরাজ্যে রাজকর্মচারী হলেও প্রকৃত অর্থে তাঁরা দুর্যোধনগোষ্ঠীর প্রণম্য গুরুজন-মধ্যেই উচ্চাসন লাভ করেছেন। অনায়াসে তাঁদেরও ভীষ্মের মতই অপর দুই কুরুবৃদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। মহাভারত-কারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্যোধনকে দ্রোণ কৃপ ও শল্যরক্ষিত রাজকুমার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই বলতে দ্বিধা নেই, কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যও নিশ্চয় নিজেদের অর্থদাস হিসেবে গণনা করতেন না, করলেও তাঁদের মত স্বগুণ-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ধর্মকর্মের ওপরে ভরণপোষণকে মূল্য দিতেন না। এবং তাঁদের অভাবটাই বা কি? সেদিন এঁদের প্রতিষ্ঠা এমনই আকাশচুম্বী যে তাঁরা যেখানে যেতেন সেখানেই সাদরে সমাদৃত হতেন। সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা, এই তিন বৃদ্ধ একই ভাষায় একই কথা কী করে বলবেন?

শল্য নিজেই শক্তিমান এক প্রথম শ্রেণীর রাজা। তিনিই বা কোন্ দুঃখে হঠাৎ সসৈন্যে দুর্যোধনের দাসত্ব করতে আসবেন? তিনিও বললেন, তিনি দুর্যোধনের অর্থভোগী দাস! এ কী ছেলে-ঘুমপাড়ানি গল্প নয়?

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, গল্পটি বানানো। বানানো বলেই চার সম্মানিত ব্যক্তির মুখে একই বয়ান লক্ষ্য করা যায়; সে যুগের কবিরা হয় জনগণকে নির্বোধ ভাবতেন, নতুবা মিথ্যাভাষণের ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এতবার ধর্ম ধর্ম করা হয়েছে যে ধর্মশঙ্কিত সাধারণও ধর্ম-ধূম্রের জ্বালাময়ী অন্ধকারে শুধুই হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়েছেন, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের আর সময় পাননি, বা সে ইচ্ছেও কারো ছিল না।

আসল ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়ল যুধিষ্ঠির যখন ঐ বৃদ্ধ চতুষ্টয়কে দলে টানতে অক্ষম হয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরু সেনানীবর্গকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে

বলতে সুরু করলেন: "যিনি আমার হিতসাধন করিতে বাসনা করেন, আগমন করুন; আমি তাঁহাকে বরণ করিব।" স্পষ্ট হয়ে উঠল যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য। বোঝা গেল, যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি গেছলেন দুর্যোধনের দল ভাঙাতে। এবং ভাঙিয়েও ছিলেন একজনকে। তিনি দুর্যোধন ভ্রাতা যুযুৎসু। দাসী সৌবলীপুত্র যুযুৎসু এই দলত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজের প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন জীবিত।

যুধিষ্ঠিরকে দলছুট সংগ্রহে তৎপর দেখে কৃষ্ণেরও এই সময় একটি অসমাপ্ত কর্তব্য কর্মের কথা মনে পড়ে গেল। হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কর্ণকে তিনি দুর্যোধন শিবির থেকে ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন, এখন অন্যভাবে সেই চেষ্টাটা আরও একবার করে দেখলেন। কর্ণের কানে কানে বললেন, "শ্রুত হইলাম, তুমি ভীষ্মদ্বেষী, সংগ্রামস্থলে ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে তুমি যুদ্ধ করিবে না। অতএব যে পর্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হয়েন, সেই পর্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কর। ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্যোধনের পক্ষ হইবে।" (ভীষ্মপর্ব, কালীপ্রসন্ন)।

ভগবান ধরা পড়ে গেলেন অতি নিকৃষ্ট মানুষ রূপে। কৃষ্ণ স্বীকার করলেন, তিনি পক্ষপাতহীন নন (মহাভারতের এই প্রচারও সুতরাং মিথ্যা)। তিনি পাণ্ডবপক্ষীয়। কৃষ্ণের প্রস্তাবটিও যুধিষ্ঠির উত্থাপিত প্রস্তাবের মতই হীন। শুধু দলত্যাগে উৎসাহ প্রদানই নয়, অত্যন্ত বোকার মত বিপক্ষীয় যোদ্ধাকে আহ্বান করা হল এই বলে যে, অন্তত ভীষ্মকে খতম করে তুমি তোমার দলে ফিরে যেও! কী আশ্চর্য! জীবন-মরণ পণ ধরা লড়ায়ে কি কেউ নিজপক্ষকে হীনবল করে? পাণ্ডবপক্ষীয়গণের ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব অবস্থাব জ্ঞানবুদ্ধিও বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। তার কারণ হয়ত এই যে, পাণ্ডবরা জানতেন, যুদ্ধটা একটা খেলাই হচ্ছে। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য ঢনঢন, মাথার ওপর ইন্দ্রসহ দেবতারা এসে চক্রাকারে ঘুরছেন। লড়াইটা তাঁরাই করবেন, ফলভোগ করবেন পাণ্ডবরা শুধু দেবব্রাহ্মণদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। তাই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কেও এঁদের চেতনা শিশুর মত। যুদ্ধ করেছেন দেবতারা তাঁদের দীর্ঘ তের বছরে তৈরী বিশেষ শক্তিশালী আগ্নেয় অস্ত্রাদি নিয়ে। ভীষ্মবধপর্বাধ্যায়ের সুরুতেই তাই দেখলাম, মহাভারত জানাচ্ছেন: "দেব, গন্ধর্ব, পিতৃলোক, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সুররাজকে (ইন্দ্রকে) অগ্রে লইয়া সেই সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন।" (ঐ)।

দেবতাদের সন্ধিপ্রস্তাব

সঞ্জয়কে নিয়েও কথকগণ টানাপোড়েন কম করেন নি, যে সঞ্জয় বিরাট-সভায় গিয়ে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের সঙ্গে অকুতোভয়ে বাক্যালাপ করলেন ; অনায়াসে বললেন, পাণ্ডবদের পক্ষে জয় ও পরাজয় উভয়ই সমান, কেননা যুদ্ধের প্রাঙ্গণে নিঃশেষে জ্ঞাতিহত্যা (যার অর্থ সম্ভবত, স্বজনহনন বা স্বজাতি উৎসাদন) করে স্বজাতিহীন সংসারে তাঁরা কোন রাজ্যসুখ লাভ করবেন। অবাক হয়ে দেখলাম, হস্তিনাপুরে ফিরে সেই সঞ্জয়ের দৃপ্ত মূর্তি বেবাক পাল্টে গেছে। তিনি প্রতি বাক্যে পাণ্ডবদের অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের কথা স্মরণ করে এবং বহুবার উচ্চারিত কুরুপক্ষের একইরূপ দোষকীর্তন করে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। তাঁর প্রলম্ব বক্তৃতা, মহাভারতের ধর্মকথার ভাঙা রেকর্ডটি ফিরে বাজানোর মতই অর্থহীন বোধ হ'ল। মনে হ'ল, বিদুরের বক্তৃতার কার্বন-কপি মহাভারতকার অতঃপর সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে শোনাচ্ছেন। তরুণ সঞ্জয় অবিশ্বাস্য বয়স্কের মত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকেও অবাধে পাপমতি বলে বর্ণনা করছেন রাজসমীপে। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্যতার হার এক্ষেত্রেও শতকরা শূন্য বলেই ধারণা হতে বাধা।

মনে হয়, সঞ্জয়ের নিজস্ব বক্তব্য লিখিত হয়েছে উদ্যোগপর্বের উনপঞ্চাশতম অধ্যায়ে (কালীপ্রসন্ন, সাক্ষরতা দ্রঃ)। সেখানে তিনি শত্রুশিবির থেকে প্রত্যাগত দূতের পক্ষে যা স্বাভাবিক, শুধু নিরপেক্ষ প্রতিবেদকের মত সেটুকুই রাজসমীপে নিবেদন করেছেন। পাণ্ডবশিবিরে সমবেত মহারথীদের তালিকাটি শুনিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এই তালিকাসূত্রে আমরা যে একটি বিশেষ সংবাদ পেলাম, তা হ'ল, বাসুদেব কৃষ্ণও "অক্ষৌহিণী-পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

জানা গেল, দ্রুপদ, বিরাট, কৃষ্ণ. সাত্যকি, যুযুধান প্রমুখ পাণ্ডবদের রক্ষকবৃন্দ ছাড়া আর যাঁরা পাণ্ডবদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা নিতান্তই নগণ্য এবং পাণ্ডব-পদানত বলেই পাণ্ডবপক্ষে যোগদানে বাধ্য হয়েছেন। ভারতের অপর রাজন্যরা শোভাযাত্রা করে চলে গেছেন কুরুপক্ষে।

পাণ্ডবরা জরাসন্ধকে বধ করে তাঁর পুত্র সহদেবকে বংশবদ রাজা হিসেবে মগধের সিংহাসনে বসান ; তাই দক্ষিণ বিহার তাঁদের পক্ষে যোগ দিল।

চেদিপতি শিশুপালকে হত্যা করে ধৃষ্টকেতুকে সিংহাসনারূঢ় করায় ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবপক্ষে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেজন্যই চেদি বা মধ্যদেশ পাণ্ডবমিত্র। পাণ্ডবদের শক্তি মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সেনা।

এই দুই শিবিরের ক্ষমতার পরিমাপ করে সুতরাং দুর্যোধন পিতাকে যথার্থতই আশ্বস্ত করেছিলেন। তাঁর মুখে একেবারে আনকোরা নতুন কথা শোনা গেল উদ্যোগপর্বের চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ে (কালী, সাক্ষরতা, ৩য় খণ্ড)। দুর্যোধন বলেছেন, তিনি যখন শুনলেন পাণ্ডবরা যুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ধৃতরাষ্ট্রকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রস্তুত, তখন ভয়ে ও শংকায় কুরুবৃদ্ধদের কাছে গিয়ে তিনি জ্ঞাতিক্ষয়কারী যুদ্ধ নিবারণ করে সন্ধি করা মনস্থ করেন। কিন্তু কুরুবৃদ্ধগণই দুর্যোধনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন।

দুর্যোধন তাঁর পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন: "হে তাত! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপও আমাকে এবম্বিধ চিন্তাকাতর অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন! অরাতিগণের অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া কদাচ ভীত হইবেন না। আমরা সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে তাহারা কোনক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইবে না।"

কিমাশ্চর্যম্! এ কী কথা শুনি আজ!···

না, অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মহাভারতীয় রটনা যা-ই হোক, ঘটনা এই যে, বহিরাগতের শক্তিপুষ্ট হয়ে যে পাণ্ডবরা আর্যাবর্তে প্রভুত্বের অভিলাষী হয়েছিলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সহ ভারতের সকল স্বাধীন রাজন্যকুলই পাণ্ডবদের সেই দেশদ্রোহিতা রুখবার জন্য দলে দলে কুরুশিবিরে যোগদান করেন দুর্যোধনের নেতৃত্বে। তাই দুর্যোধন যথার্থই বলেছেন, "···আমি যে সকল ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছি, তাঁহারা আমার নিমিত্ত অগ্নি ও সমুদ্রে প্রবেশ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন।"

হ্যাঁ, সকলেই পুরোহিতসেবী স্বৈরতন্ত্রের চক্রান্ত মোকাবিলা করার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রে। এজন্যই বিস্মিত হই না, যখন দেখি, পাণ্ডবশিবিরে নিদ্রিত বলে কথিত পাণ্ডববীরদের অশ্বত্থামা হত্যা করতে গেলে কৃতবর্মার সঙ্গে কৃপাচার্য শিবিরের দ্বারদেশে প্রহরা দিয়েছেন; আশ্চর্য হই না, যখন শুনি, যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণের চক্রব্যূহে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে আক্রমণ ও বধ করেন সমবেতভাবে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা; কিম্বা যখন শুনি, ভীষ্ম প্রবল বিক্রমে সংগ্রাম করেছেন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। পাণ্ডবদের প্রতি কণামাত্র স্নেহ ও পক্ষপাত থাকলে এসব কাজ কি সম্ভব হ'ত?

এইবার মহাভারতের ভগবান কৃষ্ণের দিকে একবার তাকানো যাক।

যদুকুলে দেবানুগত গোষ্ঠীর এই বুদ্ধিমান নেতাটি যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি ছটফট করেছেন। মুখে শান্তির বাণী, কর্মে রণং দেহি ; ইনি এক দুমুখো ছুরি।

সঞ্জয় পাণ্ডবশিবিরে আসেন নিরস্ত্র, একাকী। কিন্তু কৃষ্ণ? বড় সাবধানী পুরুষ তিনি। স্বয়ং ভগবান বলে মহাভারতে বারম্বার উচ্চারিত সেই গোষ্ঠীনেতা সাহস করলেন না একাকী গমনে। দূত হিসেবে হস্তিনাপুর যাত্রার জন্য বিরাট রণসজ্জা করতে আদেশ দিলেন। সাত্যকিকে বললেন, "ভদ্র! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য আয়ুধসকল সংস্থাপন করো। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি নিতান্ত দুষ্টাত্মা, বলবান ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।"

হায় কৃষ্ণ! আত্মশ্লাঘায় ইনি ও এঁর রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে অতুলনীয়। কুরু-ভয়ে ভীত ভগবান-নামক কৃষ্ণ রণসজ্জা করাচ্ছেন। আবার মুখে বলছেন, শত্রু নিতান্ত দুর্বল বটে, তবে তাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির উপযুক্ত দূতই বেছেছিলেন। শঠতায় প্রাজ্ঞ না হলে কি দূতকার্যে অভিজ্ঞ হওয়া যায়? এই ভদ্রলোক যে বেশ দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে যাত্রা করছেন তার আরও প্রমাণ, যাত্রার আগে ইনি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন এবং সব রকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পরমেশ্বরের কাছে জপতপাদি নিবেদন করলেন। (সন্ধির জন্য কৃষ্ণের হস্তিনাগমনোদ্যোগ/কালী, সাক্ষরতা, ১ম সং, পৃঃ ৮৪, উদ্যোগপর্ব দ্রঃ)।

পাঠক, তবুও বিশ্বাস করতে হবে কথকদেব রূপকথা? বিশ্বাস করতে হবে এ হেন এক কপটাচারী দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ? ইনি বহুরূপী, তাঁর সেই বহুরূপই হয়ত বিশ্বরূপ। তবে বিশ্বরূপ দর্শন বলে মাঝে মধ্যে যে দুচারটি শ্লোক পূর্বাপর কথা-পারম্পর্য না মেনে হঠাৎ হঠাৎ মহাভারতের শ্লোকমালায় গ্রন্থিত হয়েছে, তা যে সেই ফেঁসো গপ্পো রচয়িতাদেরই কারসাজি, মহাভারত খুঁটিয়ে পড়লে সে বাতুলতা খুব সহজেই ধরা পড়ে যায়। বিভিন্ন দেবতাকে পরমেশ্বর বানানোর জন্য উত্তরবৈদিক আমল থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত গোষ্ঠীগুরুদের দ্বারা পুরাণ ও পাল্টা পুরাণ তৈরী হয়েছিল। কখনো বরুণ, কভু বা ইন্দ্র, কখনো ব্রহ্মা, কভু রুদ্র শিব বিষ্ণু ক্ষমতাবান ঈশ্বরের আসন থেকে একে অপরকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। পরমেশ্বর হওয়ার বাসনা নভশ্চর প্রভুদের প্রত্যেকের মনেই লালসা সৃষ্টি করেছিল, তারই ফলশ্রুতি ঐ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কৃষ্ণভক্তরা শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্মণ্য স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ধনুর্ধারী কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বানানোর জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত সৃষ্টি করে ফেললেন।

আসুন, যদুপতির ক্ষমতাটা এবার মহাভারতের তথ্যাবলীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যাক।

ব্রাহ্মণ-সেবক সেই কৃষ্ণ, যিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিখাধারী ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজে পরম পরিতোষপূর্বক বৃত ছিলেন, হস্তিনাপুর গমনের কালে তিনি দেখলেন, পথের দুধারে "ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষি" তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। ভগবান কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তি বড় প্রখর। দেবানুচর ঋষিদের দেখেই রথ থামিয়ে তিনি তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করতে পথে নামলেন। প্রশ্ন করলেন, "হে মহর্ষিগণ! সমুদয় লোকের কুশল তো? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণদিগের শাসনে অবস্থান করিতেছে?..."

ব্রাহ্মণ-শাসন অটুট রাখার জন্য কথকরা বড় ব্যস্ত। তাঁদের সেই ব্যস্ততায় ও প্রচারের পাল্লা থেকে, দেখা যাচ্ছে, তাঁদের ভগবানেরও রেহাই নেই। এ ভগবানের মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডিম্বাকারে বিঘূর্ণিত হলে কি হবে, ইনি রাজ্যের খবরাখবর তাঁর পরমাশক্তির প্রভাবে অবগত নন। খবর নিতে হয় অন্যের কাছে। ধ্যানে জানতে পারেন নি বলে সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি তাঁর। সেজন্য ভগবান স্বমুখে ধর্মরাজের কাছে কত অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। তিনি তখন সমৃদ্ধিশালী এক দৈত্যপুরী ধ্বংস কাজে বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। মহাভারতের ভগবানের পক্ষে একই সঙ্গে একাধিক কাজ করা সম্ভব নয়। তা হোক, তবু মুনিরা বলেন, তিনিই বিশ্বাত্মা সৃষ্টি স্থিতি লয় পালনকারী। ইচ্ছে করলে বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে তিনি নাকি মার্বেলের মত এই ভূমণ্ডলকে বিঘূর্ণিত করতে পারেন!

বর্তমানে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মণপায়ে মস্তকাবনত করে করজোড়ে বললেন, হে মহাত্মাগণ, আদেশ করুন, আপনাদের কোন্ কাজ করতে হবে?

মহাত্মারা বললেন, না, না, কিছু করতে হবে না। আমরা আপনার ধর্মার্থযুক্ত বক্তৃতা শোনার জন্য সদলে হস্তিনাপুর যাচ্ছি।

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন?" এই সূত্রে বুঝি, এঁরাও হিমালয় স্বর্গ থেকে আসছেন। যে সংবাদসূত্র মারফৎ দেবশিবির পাণ্ডবদের খবরাখবর রাখেন, এঁরাও সুতরাং সেই সংবাদসূত্রে খবর পেয়ে এবং দেবশিবিরের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই যে এসেছেন, তা বুঝতে পারি।

তারপর দেখি, দূত হিসেবে কৃষ্ণ গেলেন পাণ্ডবদের হয়ে বক্তব্য রাখতে। কিন্তু কৃষ্ণের বক্তৃতার পরই একের পর এক দেবানুচর মুনিরাও দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে, তাঁদের বাহুবলের ফিরিস্তি হাজির করে ধৃতরাষ্ট্রের

অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার চেষ্টা করলেন। বোঝা গেল, কৌরবসভায় দেবতারা একাধিক দূত প্রেরণ করেছেন। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার সিদ্ধান্ত : কুরুক্ষেত্রের লড়াইটা আসলে দেবাসুর যুদ্ধ। পাণ্ডবরা দেবশিবিরের মর্ত্যবাসী প্রতিনিধি। দেব-দূতরা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনি পাণ্ডবরক্ষিত হয়ে রাজ্যে ধর্মানুশাসন প্রবর্তন করে নির্ভয়ে রাজত্ব করুন, সন্ধি ও বন্ধুত্ব করুন হিমালয়বাসী দেবতাদের সঙ্গে।

দেবরাজনীতি অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। কৌরবসভায় দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দেবতারাও বিরাট কোনো বিধ্বংসী যুদ্ধ চান নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতদেহের ওপর যে সিংহাসন পাতা হয়, তার শাসনাধিকার লাভ করে কে আর খুশি হতে পারেন। তা ছাড়া ভিন্‌গ্রহী হলেও, বহিরাগত হলেও স্বৈরতন্ত্রী দেবতাদের বিবেকবুদ্ধি যথেষ্টই পরিশীলিত ছিল। এক উন্নততর সভ্যতার সংস্কার তাঁদের রক্তপ্রবাহে সঞ্চরমাণ। সার্বিক ধ্বংস এড়ানোর জন্য তাই তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছে; প্রযত্ন নিতে হয়েছে বহুতর। এই গ্রহের মানুষ পশ্চিমী দুনিয়াও পূর্বী পৃথ্বীবাসীর ওপর সিদ্ধান্তমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করে নি। অনেক বৈঠক অনেক বিচিন্তার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে। হিমালয়বাসী গ্রহান্তরের প্রভুরাও সেদিন একটি সর্বধ্বংসী যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মনেও। কিন্তু কৃষ্ণ? মহাভারতের নিষ্ঠুরতম ব্যক্তিত্ব তিনি। একমাত্র তিনিই দ্বিধাগ্রস্তকে আপন বাগ্মিতার দ্বারা বশীভূত করে ধ্বংসকে অনিবার্য করেছেন; সর্বত্র অন্যায় যুদ্ধে শত্রুকে খতম করে শ্রেণী ও শোষণভিত্তিক এক সমাজের পত্তন করেছেন। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে স্ফীতকায় শোষক গুরু-পুরোহিতরা তাই তাঁকে সম্মানিত করেছেন পরমেশ্বর রূপে। কৃষ্ণের জীবনে অনুতাপও কোথাও স্পষ্টরূপে ধরা দেয় নি।

মহাভারতে কৃষ্ণকে যতবড় বাগ্মী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, বর্তমান দেবদূত পর্বে আমরা কিন্তু তার পক্ষে ততবড় সাক্ষ্য প্রমাণ পাই না। কেবলমাত্র কৃষ্ণের বক্তৃতার ওপর পূর্ণ আস্থা থাকলে দেবশিবির তাঁর সঙ্গে আরও কোয়ার্টার ডজন দেবানুচরকে কুরুসভায় পাঠাতেন না। কৃষ্ণের বক্তৃতা শেষ হতেই পরশুরাম, কণ্বমুনি এবং নারদ পর পর বক্তৃতা করেন। সকলেরই একটিমাত্র উদ্দেশ্য, ধৃতরাষ্ট্রের মনোবল নষ্ট করা এবং দেবশিবিরের প্রতি তাঁকে নতজানু করিয়ে পাণ্ডবদের প্রাধান্য তাঁর দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। দেবশিবিরের

একমাত্র শর্ত, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রথম পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন এবং যুধিষ্ঠিরকেই যুবরাজ হিসেবে মেনে নিন। পরিবর্তে তিনি পাবেন দেবশিবিরকে মিত্রপক্ষ রূপে। যদি তিনি দেবানুশাসন মেনে জাতিভেদপ্রথাসহ পুরোহিত ও ব্রাহ্মণসেবী ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন, তাহলে না হয় পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম ছেড়ে দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পুত্রাদিসহ রাজত্বও করতে পারেন। তবে সে রাজ্যে দেবশক্তিকে সেলাম কুর্নিশ প্রণাম পূজা জানাতে হবে। অর্থাৎ দ্রুপদ বিরাটের মত ক্ষাত্রতেজকে ব্রহ্মতেজের পায়ে মাথা মুড়িয়ে নিঃশর্ত বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। একমাত্র তা হলেই পাণ্ডবদের সঙ্গে কুরুদের সহাবস্থানও দেবশিবির অনুমোদন করতে রাজি।

কিন্তু স্বাধীনচেতা ভারতীয় রাজন্যবর্গের নেতা দুর্যোধন এই হীন প্রস্তাবে সম্মত নন। সম্মত নন অপরাপর সভাসদবৃন্দও। তাই মহাভারতের প্রতিবেদন : কৃষ্ণের বক্তৃতা শেষ হলে "···স্পষ্টাভিধানে কেহই কিছু কহিতে পারিলেন না।" (কালী, উ, ১ম সং, পৃঃ ৯৬)।

পরশুরাম কৃষ্ণার্জুনের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে গল্প বললেন।

কণ্বমুনি ও নারদ হিমালয়ের বিজ্ঞানী পুরুষদের পরমেশ্বর বানানোর জন্য সভায় লম্বা লম্বা রূপকথার বিস্তার করলেন। এ কাহিনীগুলি, স্পষ্টই বোঝা যায়, রাজসভায় সবিস্তার বর্ণনার যোগা নয়। শিশুসভায় ঠাকুর্দা ঠাকুমার ঝুলি আদরণীয় বটে, কিন্তু, বুড়োবুড়ী পার্লামেন্টে গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের ঘুমপাড়ানি রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনিয়ে এসেছেন এবং তা-ও দেশে জরুরী এক যুদ্ধাবস্থার প্রাক্কালে, এমন কথা কেউ লিখলে, তাঁকে আমরা কি মেনে নিতে পারব ? বুঝতে হবে. তিনি কোনো গুপী গাইন বাঘা বাইনের রসিক স্রষ্টা, তবে তাঁর বিষয়টি ইতিহাস নয় ; রূপকথা।

ইন্দ্র-মাহাত্ম্যের গল্পগুলি কোনো সভাসদ্ কান পেতে শুনেছিলেন কিনা জানি না। দেখলাম, কণ্বমুনি যখন ভয় দেখিয়ে বললেন, "হে দুর্য্যোধন ! আপনি কিরূপে বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অশ্বিনী তনয়দ্বয়কে সংগ্রামে পরাভব করিবেন ? অতএব আপনি সমর-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক বাসুদেবের দ্বারা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া কুল রক্ষা করুন। এই সেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যদর্শী মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদ এবং এই সেই চক্রগদাপাণি ভগবান নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন।"

তখন কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মৃদু হাস্যে দুর্যোধন বললেন, "হে তপোধন ! পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ

কার্যই করিতেছি ; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। আপনি কেন বৃথা প্রলাপ করেন ?" (ঐ পৃঃ ১০৩)।

আমরা তখন চমৎকৃত হই। অসমসাহসী এক বীরপুরুষকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, যিনি হিমালয় শিবিরের অপরাজেয় শক্তির কথা শুনেও বিচলিত হন না। দেহধারী কতকগুলি বহিরাগতকে যিনি 'দেবতা জাতি' বলেই জানেন এবং যে মূর্খেরা তাঁদের পরমেশ্বর বলে মান্য ও প্রচার করে, তাদের তিনি সভামধ্যে 'প্রলাপবক্তা' পাগল বলতেও দ্বিধা করেন না। বুঝি, দুর্যোধন অধার্মিক ও নাস্তিক নন। পরমেশ্বরে তাঁর অগাধ আস্থা। ভেজাল ভগবানদের রুখতে তিনি অবশ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কণ্বমুনির বাক্যে এটা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধটা হিমালয়ের দেবতারাই করবেন, পাণ্ডবরা শিখণ্ডীমাত্র। বিদুর কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "অল্পবুদ্ধি, অবিচক্ষণ দুর্যোধন কতকগুলি মানবসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ স্থির করিয়াছে।" (উ/ একনবতিতম অ)। অর্থাৎ বিদুরও 'মানবসৈন্যের' প্রতিপক্ষে দেবশক্তির কথাই বলেছেন। কৃষ্ণের পরবর্তী বক্তৃতাতেও সে সংবাদই পাওয়া যায়।

অর্জুন যুদ্ধ করতেন দেবপ্রেরিত কিঙ্করগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। পলকের মধ্যে শত্রুরা কী ভাবে অগ্নিময় বাণে ঝলসিত ও দগ্ধ হতেন, পার্থ স্বয়ং তার কারণ বহুক্ষেত্রে উপলব্ধি করতেই অক্ষম হয়েছেন। এ ঘটনা ঘটেছে নিবাতকবচ বধপর্বে, বিরাট-রাজ্যে কুরুপার্থ সংঘষ কালেও। পার্থের বীরত্বগাথা এই সত্যকে একেবারে গিলে হজম করে ফেলতে পারে নি। পুতুলযোদ্ধা পার্থের বিক্রম বারম্বার ধরা পড়ে গেছে। তবুও ইন্দ্রের নির্দেশে পার্থবিক্রমের গাওনা গেয়েছেন সকল দেবানুচর দেবর্ষিরা। উদ্দেশ্য, কুরুযোদ্ধাদের মনে ভীতির সঞ্চার করা, জনগণের মধ্যে পার্থকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রচার করা। বহুক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। একই মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে উচ্চারণ করে মানুষের মনে মিথ্যার জায়গায় সত্যের প্রতিষ্ঠা এভাবেই রাজনীতিকরা, বিশেষত স্বৈরতন্ত্রীরা, করে থাকেন। ভিনগ্রহী দেবতাদের প্রচার-কৌশলও তেমনিই ছিল। তার দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত ও সন্ত্রস্ত করেছেন প্রতিপক্ষকে।

দেবপক্ষীয় দূতগণের সারিবদ্ধ বক্তৃতার পর অভিপ্রেত যাদু কাজ সুরু করে দিয়েছিল। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপও দুর্যোধনকে সন্ধি করতে অনুরোধ করেছেন। তবে ধৃতরাষ্ট্রসহ সকলের বক্তব্যেই যে দেবপাণ্ডব মাহাত্ম্যকথা ও দুর্যোধনের প্রতি প্রযুক্ত 'পাপাত্মা' 'দুরাত্মা' বিশেষণের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেগুলি ছিল মুনিতে বানানো বাক্যসমষ্টি।

দুর্যোধন এখন পরিণত বয়সের অকুতোভয় রাজপুরুষ। তিনিই প্রকৃত রাজক্ষমতায় আসীন। তাঁকে সবাই মিলে খুশিমত গালিগালাজ করছেন, আবার তাঁরই আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করছেন এমন অসম্ভব ব্যাপার শুধু পাণ্ডবস্বার্থে মুনিরাই কল্পনা করতে পারেন। বাস্তবে তা ঘটে না।

বাস্তব ঘটনা এই রকম ঘটে থাকতে পারে: কুরুবৃদ্ধগণ হয়ত যুবরাজকে সন্ধিপ্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন, মুনিরা সেই ঘটনাকে বিকৃতভাবে প্রচার করেছেন। সন্ধিপ্রস্তাব সম্পর্কে দুর্যোধন কিন্তু কুরুবৃদ্ধদের কোনো প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নি। গল্প এমনভাবে লেখা, যেন কুরুবৃদ্ধরা ফাঁকা মাঠে মুখস্ত বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতার কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা তারপর আর উল্লিখিত হয় নি। গোটা মহাভারতে, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যখনই কল্পিত বক্তব্য কারো মুখে বসানো হয়েছে, তখনই সেই বক্তৃতা চরিত্রানুগ তো হয়ই নি, তার কোনো প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত হয় নি। তাতেই সন্দেহ হয়, সেগুলি ঘটনার বিবরণ নয়, মুনিকল্পিত গল্পকথা মাত্র।

কৃষ্ণ ও কণ্বমুনির বক্তব্যের জবাব দুর্যোধন দিয়েছেন। কৃষ্ণকে বলেছেন, দেখো কৃষ্ণ, তুমি সমদর্শীর মত কথা বলছ না। অকারণ মন্দকথার দ্বারা আমাকে তুমি বিদ্ধ করছ। স্বেচ্ছায় পাশা খেলে যুধিষ্ঠির যা খুইয়েছেন তার জন্য আমার অপরাধ কোথায়? পাণ্ডবদের বস্তুত রাজ্যে অধিকার ছিল না। পিতা দুর্বলতাবশত তাঁদের রাজ্য দান করেছিলেন আমার অল্প বয়সকালে। কিন্তু এখন আমি সাবালক। ধর্মত এ রাজ্যে আমারই অধিকার। আমি তোমাদের দেবরাজের ভয়েও ভীত নই। স্বধর্ম রক্ষা করে যদি প্রাণ দিতে হয় তা-ও দেব। কিন্তু তোমাদের অন্যায় জুলুম কথনো মেনে নেব না। (ঐ, পৃঃ ১১৮ দ্রঃ)।

না, দুর্যোধন নতি স্বীকার করলেন না। বললেন, "অজ্ঞানতাবশতই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল;" (ঐ)।

তখন কৃষ্ণ চূড়ান্ত প্রস্তাব দিলেন কুরুবৃদ্ধদের। বললেন, যদি বাঁচতে চান, তবে "দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলনন্দন শকুনিকে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রদান করুন।"

দূত বটে কৃষ্ণ মহাত্মা। তিনি দূতিয়ালী করতে আসেন নি। এসেছেন ভীতি প্রদর্শন করতে। মিত্ররূপে নয়, এসেছেন ভয়াল শত্রুরূপে।

কর্ণ-দ্যুতিতে শ্রীকৃষ্ণ মলিন

কুরুদূতেরা পাণ্ডবশিবিরে গেছলেন একাকী নিরস্ত্র অবস্থায়। তুল্যরূপ সাহস প্রদর্শন করতে পারেন নি কিন্তু পাণ্ডবদূত বাসুদেব কৃষ্ণ। বাসুদেব হস্তিনাপুরে গেছলেন বিপুল সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হয়ে। সাত্যকি ছিলেন তাঁর দেহরক্ষী। অনুগামী হয়েছিলেন অন্ধক ও বৃষ্ণি বীরেরা। বাসুদেবের ভয় ছিল, হয়ত দুর্যোধন তাঁকে বন্দী করে রাখবেন। এমন আষাঢ়ে ভয় তাঁর মনে কেন যে বাসা বেঁধেছিল মহাভারতের কোনো ঘটনায় তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কোনো মনোবিজ্ঞানীকে এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে বললে তিনি হয়ত বলবেন, যার যেমন মানসিকতা, জগতের কার্যকারণ তিনি সেই চশমা চোখেই বিচার করেন। আমন্ত্রিত নিরস্ত্র শিশুপালকে তিনিই যে গুপ্তহত্যা করেছেন, ছলনা করে বধ করেছেন জরাসন্ধকেও, তাই দুর্যোধনপক্ষ থেকেও অনুরূপ ব্যবহার কৃষ্ণের পক্ষে কল্পনা করা অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি ভয় পেয়েছিলেন দর্পণে আপন মুখ দেখেই।

দূতিয়ালিতে যাওয়ার প্রাক্কালে সভীত কৃষ্ণ বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেছিলেন আপন মঙ্গলচিন্তায়। অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তথাকথিত জগদীশ্বর ব্রাহ্মণদের পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন সংস্কারাচ্ছন্ন গৃহস্থের মত। পথে বার হওয়ার পরও হিমালয় থেকে আগত ব্রাহ্মণদের দর্শন করে জগদীশ্বর ত্রস্তব্যস্তে তাঁর রথ থামিয়ে অবতরণ করেছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে দেবচাটুকার সেই ব্রাহ্মণদের আদেশও প্রার্থনা করেছেন। এ-হেন এক যদুনেতাকে জগদীশ্বরের আসনে বসাতে স্বভাবতই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অথচ, কী আশ্চর্য, ইনিই যুগ যুগ পার্থসারথিরূপে আমাদের ভক্তি প্রণাম লুণ্ঠন করে জগদীশ্বরের আসনটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। ভারতবাসীর এই-জাতীয় প্রশ্নহীন কুসংস্কারাচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে একদিন জাতির পিতা রাজা রামমোহন রায়ও আহত বেদনার সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে সর্বেশ্বরের সর্বব্যাপক অস্তিত্বের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তিনি তাদের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।[১] কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় নি। আমরা আজ বিদেশীর কাছেও নতুন করে কৃষ্ণভক্তির তালিম গ্রহণ করছি! এই আমাদের বিধিলিপি; এমনই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-চেতনা!

মহাভারতকার গোটা দুই সংক্ষিপ্ত স্তবক রচনা করে একটি গল্প ফেঁদেছিলেন। গল্পে বলা হয়েছে, কৃষ্ণরক্ষক সাত্যকির অকস্মাৎ মনে হ'ল, কৃষ্ণকে বন্দী করার জন্য দুর্যোধন একটি চক্রান্ত করছেন তাঁর গোপন মন্ত্রণা-সভায়। কোনো দূতমুখে সাত্যকি এ সংবাদ পান নি। বলা হয়েছে, সর্বজ্ঞ সাত্যকি ঐ ধরনের আশঙ্কা মনে মনে পোষণ করে কৃষ্ণকে নিয়ে (তিনি তখন বিদুরালয়ে কুরুবিরোধী মন্ত্রণায় ব্যাপৃত ছিলেন) ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন। এই কাহিনীকাণ্ডে গল্পকার দুর্যোধনের উক্তি বলে যা লিখেছেন তারও সত্যাসত্য কোনো ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত নয়। দুর্যোধন কোনো মন্ত্রণা-সভায় বসলে সেখানে পার্ষদবর্গের উক্তি প্রতি-উক্তির কথাও থাকত। কিন্তু সেসব কিছু নেই সেখানে। গল্পকারের হাতে কলম, তিনি ইচ্ছেমত গল্প বানিয়ে বললেন, 'কৃষ্ণকে বন্দী করার জন্য দুর্যোধনের দুরাগ্রহে'র কথা। (উঃ/পৃঃ ১২১/ কালী, ১ম সং)। এই গল্পের আগে ও পরে মহাভারতীয় মাতব্বরগণ, এমন কি গান্ধারীও, দুর্যোধনকে তিরস্কার করেছিলেন; গল্পকার সবিস্তারে বহু পৌনঃপুনিকতা-দুষ্ট সেইসব মন্দ-কথা দিয়ে আবার মহাভারতকে ভারি করেছেন বটে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, দুর্যোধন-বিরোধী বক্তারা হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, কেননা যখন তাঁকে সক্রোধে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তখন সেইসব সভায় দুর্যোধন অনুপস্থিত। যুবরাজ ইচ্ছেমত তিরস্কৃত হচ্ছেন অথচ তার উত্তরে কিছুই বলছেন না, এমন সর্বংসহ চরিত্রের মানুষ ছিলেন সেই রাগী যুবক, কৈ সে কথা তো মহাভারত আমাদের কখনো বিশ্বাস করতে বলেন নি'। তাহলে কী করে মেনে নেব, বস্তুতই তিনি নির্বিচারে বিকৃত হয়েছেন ও অবনত মস্তকে সেইসব ধিক্কার শিরোধার্য করেছেন? দুর্যোধন-চরিত্রটিকে যদি কেউ প্রকৃতই বুঝে থাকি, তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুর্যোধন সে ধাতুতে গড়া পুরুষ ছিলেন না। কণ্বমুনির প্রতি তাঁর নির্ভীক উক্তি আগেই উদ্ধৃত করেছি। (উঃ/পৃঃ ১০৩/কালী, ১ম সং)। কৃষ্ণের দীর্ঘ পাণ্ডবগুণকীর্তন শুনেও দুর্যোধন দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম, তোমরা এই কয়জন সতত আমারই নিন্দা করিয়া থাক; অন্য কোনো ভূপালকে নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনার অণুমাত্রও অপরাধ ও অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না;...হে কেশব। পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময়

পাণ্ডবগণের যে-সমুদয় ধন পরাজিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাণ্ডবগণ যে দুরোদরমুখে (পাশায়) সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই।" (উঃ/পৃঃ ১১৭/কালী, ১ম সং), অর্থাৎ সেই একই কথা, পাণ্ডবরা স্বেচ্ছায় রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হন সম্মুখে আরও বড় উচ্চাশা নিয়ে, তা হল ভারত-সাম্রাজ্য।

সুতরাং যখনই দুর্যোধনকে বস্তুত আক্রমণ করা হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তার উচিত প্রত্যুত্তর দিয়ে আপন বক্তব্য দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে নীরব দেখি নি। শুধু যেখানে মিথ্যাগল্পের আয়োজন, যেখানে কল্পিত দুর্যোধনের বিরুদ্ধে কল্পিত চরিত্রের মুখে কল্পিত ঘটনা ব্যক্ত করেছেন কবিরা, সেখানেই দুর্যোধনের প্রত্যুত্তর আমরা শুনতে পাই নি, তাঁর অস্তিত্বও অনুভূত হয় নি। অতএব তা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ বলে প্রতীয়মান হয় না। গল্পে দেখা গেল, মাতা-গান্ধারীর বক্তব্যের পরেও দুর্যোধন নিরুত্তর। তিনি উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত তাও সম্যক বোঝার উপায় নেই। গান্ধারীর পক্ষেও সভায় উপস্থিত হয়ে পাণ্ডব-হিতৈষিণীর মত বক্তৃতা করা যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়। তিনি কুন্তীর মত রাজনীতি-দক্ষ মহিলা ছিলেন না। যুধিষ্ঠিরের জন্ম-সংবাদ শুনে তিনি দুঃখে ও হতাশায় নিজের গর্ভপাত করান। মনে হয়, গান্ধারীকেও এখানে স্বেচ্ছাসৃষ্ট একটি নাটকের চরিত্র বানানো হয়েছে। যথার্থ ইতিহাস এই অংশে নেই।

আমার বক্তব্যের সপক্ষে এখনই আরও প্রমাণ মহাভারতের ইতিবৃত্তই হাজির করবে। আমি সেই প্রমাণগুলি গ্রন্থণার দায়িত্বমাত্র গ্রহণ করেছি।

বলা হল, কৃষ্ণকে নিগৃহীত করার চেষ্টা ছিল দুর্যোধনের। দেখা গেল, কৃষ্ণ স্বয়ং কল্পিত এক দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে বলছেন, "হে দুর্যোধন! তুমি যে আমাকে একাকী মনে করিয়া পরাভূত ও রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছ তাহা তোমার ভ্রান্তি। পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানে বিদ্যমান আছেন।" (উঃ/পৃঃ ১২২/কালী, ১ম সং) জগদীশ্বর যে অন্ধক বৃষ্ণি প্রমুখের দ্বারা সুরক্ষিত আছেন এই কথা বলে তিনি[৪] "উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।" তাঁর সেই উচ্চহাস্য শুনে আমাদের মুখ কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হ'ল।

ভাবছি, হা ঈশ্বর্! তোমার এই অসহায়তা লক্ষ্য করে নিতান্তই হতাশ হতে হচ্ছে আমাদের। আমরা মনে করি, জগদীশ্বর আমাদের দেখা ও না-দেখা,

পরিচিত ও অপরিচিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালক। তিনি একা নন, তিনিই পরিপূর্ণ। অসংখ্য নক্ষত্ররাজির মধ্যে তিনিই উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি না-কারও পক্ষাবলম্বী, না-কারও শত্রু। তা সেই মহান ঈশ্বরকে যদি সামান্য পাণ্ডব বৃষ্ণিদের আয়ুধ এবং বাহুবলের ওপর নির্ভর করে এক আর্যাবর্তীয় রাজন্যের দুষ্ট অভিসন্ধির চক্রান্তজাল থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে আর মর্ত্যজনের ত্রাণ আর উদ্ধার কার্য তিনি করবেন কেমন করে? বডি গার্ড ছাড়া যিনি অসহায়, তাঁকেই রক্ষা করার দায়িত্ব কি অতঃপর আমাদেরই বহন করতে হবে না?

মহাভারতের কবি, তাঁর ঈশ্বরকে কেবলমাত্র এই নগণ্য মূর্তিতে সাজিয়েই পরিতৃপ্ত রইলেন না; সঙ্গে আরও গোটাকয়েক ছত্র যোগ করে বললেন, ঐ মহাক্ষমতাবান ঈশ্বরই তখনি আবার তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করলেন। সে-ও ঈশ্বরের এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক নির্বোধ রূপায়ণ।

বলা হ'ল, দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিগণকে ভগবান দিব্যচক্ষু দান করলে তাঁরা দেখলেন: কৃষ্ণ ঠাকুরের সর্বাঙ্গচ্ছেদ করে দলে দলে লিলিপুট দেবতারা এবং পাণ্ডবগণ "উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন।"

বিদুর না হয় আলোচ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ সঞ্জয়ের উপস্থিতির সংবাদ ইতিপূর্বে তো আমাদের জানানো হয় নি। সুতরাং ভগবানের এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কখন তাঁরা আবির্ভূত হলেন, বুঝলাম না। তাছাড়া বিশ্বরূপ বলতে কি ব্রাহ্মণ্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারীদের কৃষ্ণদেহচ্ছেদ করে আবির্ভাব বোঝায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা কি আর্যাবর্তের এক টুকরো জমিনে তৎকালে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল? এ কেমন বিশ্বরূপ, যেখানে অমৃতের পুত্রেরা সকলেই রাজ্যলোভী শোণিতপিপাসু এবং 'উদ্যতায়ুধ'? এবং ঈশ্বর কি ট্রয় যুদ্ধের কাঠের ঘোড়া যে তাঁর পেটের মধ্য থেকে পিলপিল করে শুধু কুরুবংশ-ধ্বংসকারীর দল মার মার রবে বেরিয়ে আসবেন? ভগবানের এহেন দুরবস্থার জন্য যে কবি দায়ী, তাঁকে শুধু এই ভেবেই ক্ষমা করা যায় যে, তিনি তৎকালীন বিজয়ী আর্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ঐ বিচিত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন। জানিনা, এজন্য সেকালে তাঁকে কোনো ব্যাসদেব পুরস্কার টুরস্কার দেওয়া হয়েছিল কিনা। তবে বুঝি, বোকা-ভোলানোর জন্য তিনি নিশ্চয় মহাত্মা আখ্যায় যথারীতি ভূষিত হয়েছিলেন। শাসক ও শোষকদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করলে খেতাব পুরস্কার জোটেই। হিটলার বিজয়ী হলে কোনো জার্মান নাৎসী কবিকে দিয়ে তিনি যদি নিজের বিশ্বরূপের ওপর কাব্যকাহিনী রচনা

করাতেন তবে তাঁর জীবিতকালে কে আর সেই বিশ্বরূপের প্রতিবাদ করে নিজেকে বিপদাপন্ন করতে এগিয়ে যেতেন ? দুর্বল অজ্ঞানেরা বরং মেনে নিতেন হিটলারী ঈশ্বরত্ব। জগতে এইভাবে অনেকেই ঈশ্বর হয়ে বসেছেন। সৌভাগ্যত, তাতে খাঁটি ঈশ্বরের সামান্যতম ঈর্ষাও উদ্রিক্ত হয় নি ; হলে, ঈশ্বর সাজার মজা এতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না।

কর্ণসহ দুর্যোধন যদি কৃষ্ণকে বন্দী করার ফন্দি এঁটে থাকতেন, তবে হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কর্ণকে নিশ্চয় কৃষ্ণের আমন্ত্রণে কৃষ্ণরথে আরোহণ করতে দেখা যেত না। অথচ দেখুন, কুন্তীর সঙ্গে সলাপরামর্শ সেরে পাণ্ডবদূত শ্রীকৃষ্ণঠাকুর দুর্যোধন-শিবিরে ভাঙন ধরানোর উদ্দেশ্যে কর্ণকে একান্তে আহ্বান করলেন এবং নিজের রথে তুলে নিয়ে তাঁর কাছে একটি ঘৃণিত প্রস্তাব রাখলেন।

বললেন, কর্ণ, তুমি কেন দুর্যোধনের দাসত্ব করবে ? তোমার আসল পরিচয় হ'ল, তুমি কুন্তীর কানীন পুত্র। তাহলেও পাণ্ডবরা তোমাকেই জ্যেষ্ঠের সম্মানে ভূষিত করে রাজচক্রবর্তী হিসেবে মেনে নেবেন। শিখণ্ডীসহ আমিও তোমারই অনুবর্তী হব। তুমি শুধু দুর্যোধনকে ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান কর।

ছি ছি ! এই কি একটা ভগবানের মত কথা হল ? ভীমের দ্বারা 'কুকুর' অভিধায় লাঞ্ছিত কর্ণকে দেবতা ও পুরোহিতদের স্বার্থে কৃষ্ণের আজ বিশেষ প্রয়োজন। তিনি তাঁকে রাজ্যলোভ দেখিয়ে দলে টানতে চান। কর্ণ যদি দলত্যাগ করে আসেন তবে স্বয়ং পরাক্রমশালী বলে নিত্য-আস্ফালনকারী, মহান ঈশ্বর (!), মহাভারতের দ্বিতীয় শিখণ্ডী শ্রীকৃষ্ণও কর্ণের অনুবর্তী হতে অরাজি নন।

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ জানতেন, দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের গোপন আসক্তি ছিল। তাই দুষ্ট অভিসন্ধিপরায়ণ মানুষের মত কৃষ্ণ একথাও উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, "দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন।"—এর চেয়ে হীন প্রস্তাব কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু কৃষ্ণ মহাপ্রভু যা বলেন, মহাভারত সে সবই গঙ্গাজলে ধুয়ে পরিবেশন করেন। তাই কর্ণকৃষ্ণ-কথা সুরুর আগে মহাভারতকার সঞ্জয়ের মুখ গঙ্গাজলে ধুইয়ে সেই শ্রীমুখ থেকে আমাদের শোনালেন পবিত্র কথা। বলা হ'ল, সঞ্জয় কহিলেন, "...মহানুভব মধুসূদন কর্ণকে যে সকল তীক্ষ্ণ, মৃদু, প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, শ্রবণ করুন।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ যা যা বলেছেন তা রেখে ঢেকে নয়, এখানে আনুপূর্বিকই বর্ণিত হয়েছে। আমি কিন্তু অসহায়, কৃষ্ণবচনের মধ্যে একটিও ধর্মযুক্ত কথা শুনতে পেলাম না। পাপাত্মা আমার যে মুক্তি নেই, আমি তা ভালো করেই জানি। কিন্তু কর্ণ? তিনিও কৃষ্ণকথায় সত্য ন্যায় ও ধর্মের লেশমাত্র খুঁজে পান নি। তবু তাঁর কিন্তু স্বর্গদর্শন হয়েছিল। তমসাতটবাসী ভারতীয়রা আজও তাঁর মন্দির বানিয়ে তাঁকে পূজা প্রণাম নিবেদন করেন।

কুপ্রস্তাবে টলানো গেল না কর্ণকে। প্রত্যুত্তরে কর্ণ বললেন, "…কুন্তী আমাকে আমার অমঙ্গল উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" বললেন, ওদিকে আমার পালক পিতা অধিরথ ও মাতা রাধা আমাকে সস্নেহে পালন করেছেন। আমি তাঁদেরই জাতিকুলে বিবাহ করে যে ভার্যা ও পুত্রপৌত্র লাভ করেছি, ভালোবাসি আমি তাদের। না না, কৃষ্ণ, "অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।"

বললেন, দুর্যোধন আমাকে রাজ্য দান করেছেন, বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমারই ওপর নির্ভর করে আছেন।

"আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্যোধনকেই প্রদান করিব ;…"

ম্লান হয়ে গেলেন কৃষ্ণ কর্ণদ্যুতির প্রখর ঔজ্জ্বল্যে।

এরপর কুমন্ত্রণাদাতা কৃষ্ণকে নিশ্চয় নতমুখে প্রস্থান করতে হয়েছিল। তাঁর ভগবান এতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যান নি বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে এই বিশ্বরূপ দর্শন করে আমার ভগবান লজ্জায়, আতঙ্কে, ঘৃণায় ও ক্ষোভে মহাভারতের রাজ্যলোভী-চক্রের দাসানুদাস যদুনেতা বাসুদেব কৃষ্ণ থেকে শত শত যোজন তফাতে সরে গেছেন। কৃষ্ণের ভগবান হিমালয়ের বহিরাগত স্বার্থচক্র ; আমার ঈশ্বর কোটি কোটি হিমালয়ের স্রষ্টা। কৃষ্ণের ভগবান আধুনিক রাজনীতিকের মত অপর দলের লোক ভাঙিয়ে দলত্যাগের নোংরা রাজনীতিতে উৎসাহ দেন ; আমার ভগবানের কাছে কোনোরূপ দলবাজিই প্রশ্রয় পায় না।

আমি আরও বুঝি, দুর্যোধন কর্ণ যা করেছেন তা একটি মহৎ সত্যকে, স্বাধীনতাকে, রক্ষা করতে চেয়েছে ; আর কৃষ্ণ-পাণ্ডবরা যা করেছেন তার প্রেরণা ছিল উদগ্র উন্মত্ত ক্ষমতালোভ। সেজন্য সব রকমের নষ্টামি ও দাসত্বকে আলিঙ্গন করতে তাঁদের তিলমাত্র বিচলিত হতে দেখা যায় নি। গ্রহান্তরের পুরুষ দেবতারা তাঁদের নিজের সভ্যতা থেকে এই মতলবী নীচতা একটি সরল

উদার সমভাবাপন্ন পৃথ্বীসভ্যতার বুকে এনে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই গুরুভার আজও বহন করে মরছি আমরা।

অর্বাচীন সভ্যতা বড় স্বার্থপর। নিজের অস্তিত্বের জন্য এমন কোনো অপরাধ নেই, যা তা না করতে পারে।

আর ঐ যে রমণী তাঁর পুত্র অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা করতে একান্ত গোপনে কর্ণের কাছে চলেছেন, মহাভারত তাঁকে সতী মনস্বিনীরূপে প্রতিষ্ঠা দানের কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু কেন? কুন্তীর মধ্যে কোন্ সদ্গুণ রমণীসমাজের আদর্শ হতে পারে? কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে (যোগবলে নয়, প্রাকৃতিক যৌনমিলনের ফলেই কর্ণের জন্ম। দা. ম. স্ব. দ্রঃ) কর্ণের জন্মদান করে যে নারী তাঁর কামনা চরিতার্থ করার পর সদ্যজাত শিশুকে নদীজলে ভাসিয়ে দেন এবং বিপৎকালে সেই পরিত্যক্ত পুত্রের গর্ভধারিণীরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করে অপর বৈধ পুত্রের প্রাণ রক্ষার প্রয়াস পান, তিনি কি আদর্শ মাতা? যে পৃথা ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে বসে চক্রান্ত করেন কুরুরাজার বংশ নাশ করার জন্য, তিনি কি পবিত্রমনা এবং অকপট? যিনি কনিষ্ঠা সপত্নীকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে পাঠিয়ে নিজে আসেন রাজমাতারূপে ভোগ ও সুখের অধিশ্বরী হতে, তিনি কি চক্রান্তকারিণী নন? যিনি তাঁর মোহিনী মায়াবলে দেবর বিদুরকে আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর আপন সংসার সম্পর্কে উদাসীন করেন এবং বছরের পর বছর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর জ্ঞাতসারে সরমহীনার মত সেই দেবরগৃহে বসবাস করেন, তিনি কি শেষ বিচারে সাধ্বী রমণী? যিনি স্বামীর কাছে নিজের কুমারী অবস্থার কুকীর্তি গোপন করে আপনাকে সতী সাধ্বী বলে প্রচার করেন, তিনি কি পতিব্রতা?

না, কুন্তী যথা অর্থে তাঁর রাজ্যলোভী পুত্রগণেরই আদর্শ মাতা। এমন আদর্শ রমণীর নামে তাই খুব কম হিন্দু পরিবারই তাঁদের কন্যার নামকরণ করেন। যাঁরা তাঁর নামে কন্যার নামকরণ করেন, প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন, তাঁরা কুন্তীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। কুন্তী বলতে জানেন, এক মুনিকথিত মহিয়সী রমণীর কথা, যেমন অর্জুন বলতে অনেকেই ধর্মযুদ্ধকারী এক বীরপুরুষকে বুঝে থাকেন।

'ভগবান' কৃষ্ণের কদভিপ্রায় ইতিপূর্বে ফাঁস হয়ে গেছে; এবার আসুন কর্ণ-কুন্তীর নিভৃত আলাপের যে তথ্য মহাভারতে লিখিতরূপে বর্তমান, সেদিকে তাকিয়ে মহিয়সী কুন্তীর মহত্বের কিছু সন্ধান নেওয়া যাক।

কর্ণের কাছে অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা করতে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে মহিয়সী

কুন্তী মনে মনে কী চিন্তা করেছিলেন জানেন ? মহাভারত বললেন, যুদ্ধচিন্তায় শঙ্কিত কুন্তী ভাবলেন, "শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, যোধাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয় বর্দ্ধন করিতেছেন।···বৃথাদৃষ্টি (মিথ্যাদর্শী) মোহানুবর্ত্তী অনর্থনিরত বলবান দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া আমার মন সতত দগ্ধ হইতেছে।"

মহিয়সী কুন্তীর কী সুমহান চিন্তাপ্রণালী। একটি শাশ্বত প্রবাদবাক্যকেও তিনি তাঁর অর্জুন-শুভকামী স্নেহধারায় ডুবিয়ে ভাসিয়ে মিথ্যে করে দিলেন। আমরা শুনে আসছি : কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কখনো নয়। কিন্তু কুন্তীকে দেখে সেই জনশ্রুতির শেষ দুটি শব্দকে সর্বত্র সত্য বলে আর গণ্য করতে পারছি না। দেখছি, সুপুত্র কর্ণের ব্যক্তিমহিমার ভাস্বর দীপ্তিতে কুমাতা কুন্তীর ভাবমূর্তি শুধু ম্লানই নয়, কদর্য ও কুৎসিত হয়ে উঠেছে। যে কর্ণকে দাতা, বীর, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ এবং নির্লোভ বলে কৃষ্ণকর্ণ-সংবাদে জানতে পারলাম, কুন্তী তাঁরই গর্ভধারিণী হিসেবে গর্বিতা নন, বরং যেহেতু কৌন্তেয়দের রাজ্যলাভে কর্ণই প্রধান প্রতিবন্ধক, তাই কুন্তী তাঁকে মিথ্যাদর্শী, মোহানুবর্তী, অনর্থনিরত এবং দুরাত্মা বলে গণ্য করছেন ! কুন্তী ও কৌন্তেয়দের চরিত্রই এমনি। এতো লোভ, এতো মিথ্যাপরায়ণতাকে হাজার হাজার বছর ভারতবাসী কুর্নিশ করে এসেছে ! এই ভ্রান্তি ও মিথ্যাচারের বস্তুত কোনো তুলনা নেই। মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ মেনে সেই ভারতীয় আমরাও হয়েছি অতুলনীয়। এই উপমহাদেশ তাই বার বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। হাসতে হাসতে নিজের স্বাধীনতা তুলে দিয়েছি আমরা বহিরাগতের হাতে। পিঠ পেতে গ্রহণ করেছি স্বৈরাচারীর খড়ম নাগরা পাদুকা। বিভীষণদের ভীষণ মূর্তি ভজনা করে ভেবেছি, ঈশ্বর রামচন্দ্রেরাই আমাদের মহান মুক্তিদাতা ও ধনদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তিনম্র মাথা নামিয়ে দিয়ে সমর্পণ করেছি সর্বস্ব। আর তাতেই তোফা আছি। আমাদের গুরু ও পুরোহিতেরা, আমাদের বিভীষণ নেতারা আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছেন। আমরা মেনে নিচ্ছি দুর্যোধন কর্ণদের বধব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগত ও ধর্মসংগতরূপে।

ষড়যন্ত্রকারিণী কুন্তী চললেন কর্ণসন্নিধানে। বাসনা : "···কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব।"

কর্ণ আগেই কৃষ্ণের মুখে নিজের জন্মবৃত্তান্ত শুনেছেন, তবু কুন্তীকে দেখা মাত্র তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "ভদ্রে ! রাধাগর্ভসম্ভূত, অধিরথের ঔরসজাত

কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন ? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?"

কী অপূর্ব সুভদ্র বাচনভঙ্গি ! এ কি ব্যঙ্গ, না কি কুমাতা কুন্তীকে পরীক্ষা ! এ কী বেদনা, নাকি মর্মভেদী ক্ষোভের অভিপ্রকাশ ! এ কী আত্মপ্রসাদ, নাকি আত্ম-লাঞ্ছনা !

আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধিই যদি কুন্তীর একমাত্র ধর্ম না হত, তবে তাঁর গর্ভজাতের মুখে এই ধীর গম্ভীর অসূয়াশূন্য বাক্যে তিনি সেখানেই মূর্ছিতা হয়ে পড়তেন। কর্ণের দ্বারা অর্জুন আক্রান্ত, এই চিন্তায় তাঁকে আমরা কুমারদের জন্য সজ্জিত নকল যুদ্ধপ্রাঙ্গণে মূর্ছা যেতে দেখেছি। কিন্তু কর্ণবাক্যে রমণীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করে অনায়াসেই তিনি বলতে পারলেন, কর্ণ তাঁরই কানীন পুত্র (বিবাহপূর্বে জাত সন্তান)। যে কথা সেদিন সেই রণক্রীড়াভূমিতে বললে ঘটনার গতি-প্রকৃতিই বদলে যেত, সেকথা আজ পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রাণভিক্ষা করতে এসে উচ্চারণ করতে কুন্তীর জিহ্বা অসাড় হয়ে গেল না। অবাক হয়ে শুনলাম, শুধু পরিচয়ই নয়, কুন্তী কর্ণকে ধর্মোপদেশও দান করছেন !

বলছেন : "হে বৎস ! তুমি আমার গৃহে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য না করিয়া এক্ষণে যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য ? মহাত্মাগণ ধর্ম্মবিনিশ্চয় বিষয়ে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ;··"

ধর্মার্থের মর্মার্থ এবার, হে পাঠক, আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন।

ধর্মের মর্মার্থ বরং প্রকৃত ধার্মিকের মুখ থেকেই শুনি !

কর্ণ বললেন, "ক্ষত্রিয়ে ! (না, মাতা বলে এ নারীকে সম্বোধন করতেও ঘৃণা বোধ করেন রাধেয় কর্ণ) আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে।···আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংকার প্রাপ্ত হই নাই ; অতএব আর কোন্ শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক ক্ষতি করিবে ? আপনি ক্ষত্রসংস্কার প্রাপ্তিকালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্য্যসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।"

দুঃখে এবং হতাশায় যে কর্ণের বুক ভেঙে যাচ্ছে, তিনি কী অপূর্ব শান্ত গম্ভীর স্বরে এই নম্রকঠিন আঘাত ফিরিয়ে দিলেন নির্লাজ অভিসন্ধিপরায়ণা

কুন্তীকে। জগতে কুন্তীর মত কু-মাতা বস্তুতই বিরল। আর কর্ণের মত সত্যনিষ্ঠ ত্যাগী মহাত্মাও অদ্বিতীয়। পুরোহিতদের ভগবান 'কৃষ্ণের' চেয়ে কর্ণ এতই মহান এবং নিষ্কলুষ যে ঐ কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করতে হলে আমাদের বিসর্জন দিতে হবে জগতে যা কিছু সুন্দর, মহান, নিঃস্বার্থ ও সত্যসেবী, সেই সমস্ত গুণাবলীকে। মাফ করবেন, অমূল্য সেই মানবিক গুণগুলির বিনিময়ে আমি ঈশ্বরকেও কামনা করি না, কেননা আমার ঈশ্বর এই সকল গুণাপেক্ষাও গুণী।

তবুও পুরোহিততন্ত্রী স্বৈরাচারীরা মহাভারতকারকে দিয়ে স্থানে অস্থানে কর্ণকে দুরাত্মা বলে অভিহিত করিয়েছেন। যে কর্ণের জীবনভোর যন্ত্রণার জন্য কুন্তীর কামনাই সর্বাংশে দায়ী, মহৎ আত্মার অধীশ্বর না হলে সেই কুন্তীকে কর্ণ অন্ততপক্ষে আরও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। তবু কর্ণ দুরাত্মা ও কুন্তী সতী মহিয়সী! আর সেই মিথ্যাচারের ওপরেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা!

যুধিষ্ঠির মাতার অপরাধে সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অভিসম্পাত করেন। বহিরাগত হিমালয়বাসী দেবতাদের আজ্ঞাবাহী হয়ে পাণ্ডবরা যখন কুরুক্ষেত্রে স্বজাতি-নিধনের হোলি-উৎসব শেষ করে রাজসুখ লাভের জন্য হিমালয় স্বর্গের দিকে দীন নেত্র তুলে ধরলেন, তখন চতুর দেবতারাই নিরস্ত্র করলেন পাণ্ডব পঞ্চককে এবং অভিসন্ধিপরায়ণ দেবানুচর পুরোহিতগণ তাঁদের কৃতঘ্ন রাজ্যলোভী বলে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। মহাভারতের শেষপৃষ্ঠাগুলি পাণ্ডবদের মহত্ত্ব-কথায় আর আগের মত সরব ও উত্তেজিত হল না। পুরোহিতব্যূহের মধ্যে পাণ্ডবরা তখন বড়ই অসহায়। বিশ্বাসহন্তার শাস্তি তাঁদের ওপর অনিবার্যভাবে নেমে আসতে সুরু করেছে। মোহমুগ্ধ রাজ্যলোভী যুধিষ্ঠিরের কাছে দেবচক্রান্ত ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন ক্ষোভে দুঃখে তিনি আপন মাতাকেও অভিশপ্ত করলেন।

শান্তিপর্বের সূচনাতেই যুধিষ্ঠিরের উদ্‌ভ্রান্ত বিমূঢ় চেহারাটি জগতের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডির নায়কের অবয়ব ধারণ করতে পারত; কিন্তু সেটুকু মর্যাদাও তিনি পেলেন না। তাঁর অরণ্যে রোদন বৃথা গেল। কেননা সেই মুহূর্তে তিনি নিজেই নিজের শয়তান রূপ দেখে বিভীষিকাগ্রস্ত। যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবদের জন্য বিন্দুকয়েক অশ্রু স্ফটিকপাত্রে ধরে রাখারও সুযোগ পেলাম না আমরা। দেখলাম, শত শত গলিত শবের কর্দমে দুই পা ডুবিয়ে ভারতবাসীর রক্তে দুই করপদ্ম রুধিরাক্ত করে যুধিষ্ঠির আর্তনাদ করছেন:

যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "জননী! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই

আমাকে বিষম দুঃখভোগ করিতে হইল ; অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না।"

হায়, জননী কুন্তী! তিনি দুই পুত্রের কাছেই শেষ জীবনে শুধু অভিসম্পাতই পেলেন। এমন যে মাতা তাঁকে তবু পুরোহিতচক্র মহিয়সী বলেছেন, এ শুধু দেবকার্য সাধনে কুন্তীর সহযোগিতার পুরস্কার ; ধর্মাধর্ম ন্যায়নীতির বিচারালয়ে যার কানাকড়ি মূল্যও নেই।

আর পুরোহিতরা যাঁকে ভগবান বানিয়েছেন, সেই কৌশলী কৃষ্ণের যে নিষ্ঠুর রূপ দেখা গেল, যুদ্ধাবসানের অনুতপ্ত বিষণ্ণতার মধ্যেও তা শুধু কুটিলতায় ভয়ঙ্করই নয়, নির্মমতায় অতুলনীয়। শোকাকুলা গান্ধারী কৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছিলেন : কুরু পাণ্ডব উভয়েরই হিতার্থে তুমিই পারতে যুদ্ধ নিবারণ করতে ; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক তুমি সে চেষ্টায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেছ ; এখন একবার তাকিয়ে দেখ পতিপুত্রহীনা রমণীগণ এই মহাশ্মশানে কী ভাবে আর্তনাদ করে উন্মাদিনীর মত ছুটে বেড়াচ্ছেন।

তখন প্রত্যুত্তরে কঠোরহৃদয় কৃষ্ণ শোনালেন পুরোহিততন্ত্রের মাননীয় অনুশাসনগুলি। বললেন : এখন দুঃখ পরিত্যাগ করুন, "আপনার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।" এবং পুরোহিততন্ত্র রক্ষার্থে পালনীয় কর্তব্য কি, শোকসন্তপ্তা মাতাকে শোনালেন সেই সব আইন-প্রথা। বললেন : "ব্রাহ্মণীপুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে, বৈশ্যা-পুত্র হইলে পশুপালন করিবে, শূদ্রাপুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে…" ইত্যাদি ইত্যাদি (স্ত্রীপর্ব)। অর্থাৎ সেই বর্ণভেদকামী শোষণভিত্তিক এক সমাজানুশাসনের মূল নীতি তিনি মহা-আহ্লাদে এবং যুদ্ধজয়ের পর পরম আস্থা সহকারে আদেশের স্বরে ব্যক্ত করলেন, যেন পরশ্রমভোগী পুরোহিততন্ত্রের অভিষেক-মুহূর্ত পালিয়ে যাচ্ছিল। 'ভগবান' তাই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া গান্ধারীর প্রতি কোনো সুভদ্র সম্মানসূচক সম্বোধনও ঐ পুরোহিতসেবী কৃষ্ণের মুখে শোনা যায় নি ; গান্ধারী কী করে আশা করেন এমন এক মানুষের হৃদয় কোটি কোটি শবদেহ দর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির মত অনুতপ্ত বোধ করবে? গান্ধারী জানতেন না কৃষ্ণের শোণিততৃষ্ণা তখনও অতৃপ্ত ছিল। আমরা সেই শোণিতপায়ী শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্বার যদুবংশ ধ্বংস করায় প্রধান সহায়করূপে দেখেছি। দেবতাদের দ্বারা যদুবংশ ধ্বংসকথা গ্রন্থান্তরে বলব। সেখানে দেখতে পাব পুরোহিতদাস শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য পাণ্ডবদের থেকেও অনেক বেশি ছিল। নিজের ছেলের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তবু তাঁর আনুগত্যে কোনো রকম চিড় ধরে নি। আর

সম্ভবত এই বিস্ময়কর অনুরক্তিরই পুরস্কার-স্বরূপ পরশ্রমভোগী পুরোহিততন্ত্র তাঁকেই ভগবানের আসনটি উপহার দিয়ে জনগণকে সর্বস্বত্যাগী, আনুগত্যের ধর্মীয় শিক্ষা দান করে গেছে। বলেছে, পরিশ্রম কর, ব্রাহ্মণসেবা কর! মা ফলেষু কদাচন!

কর্ণদ্যুতির কাছে, তাই বলছিলাম, পাণ্ডবরা তো দূরের কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও মলিন হয়ে গেছেন। যুদ্ধে দুর্যোধনেরও কিছু স্বার্থ ছিল। কেবলমাত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামই নয়, নিজের প্রভুত্ব রক্ষা করাও তাঁর স্বার্থ এবং বাসনা ছিল। কিন্তু কর্ণ ইচ্ছে করলে কৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণের নেতারূপে আর্যাবর্তের সিংহাসনে আরূঢ় হতে পারতেন। তাঁর প্রতি প্রযুক্ত সমস্ত লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর তিনি এভাবেই দিতে পারতেন পুরোহিত ও পাণ্ডবদের। কোনো প্রলোভনই কিন্তু কর্ণকে তাঁর সত্য থেকে এক চুল বিচ্যুত করতে পারে নি। বিশ্বের পুরাণে ইতিহাসে এতো বড় মহাত্যাগীর কথা আর কোথাও লিখিত আছে বলে আমরা জানি না। সমগ্র মহাভারতে সত্য এবং ধর্ম, ন্যায় এবং ত্যাগের বস্তুত প্রতিমূর্তি যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি সূতপুত্র রাধেয় কর্ণ। মহাভারতের শেষ পরিচ্ছেদে ভিন্‌গ্রহী দেবতা ও আর্য পুরোহিতরাও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে কর্ণ সত্যিই মহাত্মা। কর্ণের প্রতি সুবিচার করা হয় নি।

১। "My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error: and by making them acquainted with their scriptures, enable them to contemplate with true devotion the unity and omnipresence of Nature's God."—*Selected Works of Raja Rammohun Ray/India Govt. publication.*

সঞ্জয়-রহস্য

মহাভারতের সমর-সাংবাদিক সূতপুত্র সঞ্জয়কে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে পুণ্যবান শ্রোতাদের মনে। সকল রহস্যের নিপুণ স্রষ্টা বেদব্যাসের যাদুদণ্ড আন্দোলনের ফলেই সঞ্জয়-রহস্যের উৎপত্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উক্তি মাত্রকেই যাঁরা অবনত শিরে আবহমানকাল বিনাতর্কে মান্য করতে অভ্যস্ত তাঁরা বিশ্বাস করেন, মহর্ষি ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয় অত্যদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন এবং হস্তিনাপুরে বসেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে লাগাতারভাবে আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছিলেন তিনি ভারত-যুদ্ধ কথা। কিন্তু এই বিশ্বাসটুকু শুধুই যে জানাকথা ও শোনাকথার ফলশ্রুতি, সে সত্য নতুন করে জানতে হলে মহাভারতের তথ্যাবলীর মধ্যেই তাকে সন্ধান করতে হবে। সঞ্জয়-রহস্য উদ্ঘাটনে সেভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত। বৃথা আমাদের অন্যতর বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নেই।

সেটা ভারত-যুদ্ধের প্রাঙ্‌মুহূর্ত। হস্তিনাপুর থেকে দুর্যোধনসহ সকল কুরুবীর সসৈন্যে শিবির স্থাপন করেছেন তখন কুরুক্ষেত্রে। রাজপুরীতে নারীগণসহ পড়ে আছেন শুধু অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। এখন তিনি পাণ্ডবহিতৈষী বিদুর-রক্ষিত নামমাত্র রাজেন্দ্র। ঠিক এই সময় দেবগণের অতি বিশ্বস্ত এবং পাণ্ডবসহায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হস্তিনাপুরে ছুটে এলেন। অবশ্য পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কোনো আত্মিক টান অনুভব করে তাঁর সেই উচ্চকিত আগমন ঘটে নি, তিনি এসেছিলেন বিশেষ দেবকার্যে। উদ্দেশ্য, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকথা শোনানোর মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবাসুদেবের স্তুতিগান গাওনার, পাণ্ডবদের পক্ষে প্রচারের ও দেবব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাওয়া। যে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলে প্রচার করা হয়েছে, সেই যুদ্ধটিকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে প্রমাণ করার দরকার ছিল। এবং বেদব্যাস জানতেন, ধৃতরাষ্ট্রের সভাটিই সেই 'পবিত্র কথা' বর্ণনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কারণ, আমরা ধরে নিতে পারি, কুরুক্ষেত্রে যখন একটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, আর্যাবর্তে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় তখন উন্মুখ উদ্‌গ্রীব কিছু অসামরিক পারিষদ সে যুদ্ধের ফলাফল শ্রবণের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁরাই সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁদের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী প্রচারকার্য চলে। তাই কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে

বেদব্যাস-পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধটির সুসজ্জিত বর্ণনার প্রচারমূল্য ছিল অপরিসীম। সম্ভবত এজন্যই বেদব্যাস হন্তদন্ত হয়ে হস্তিনাপুরের রাজসভায় ছুটে এসে পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, উদ্বেগ ও শোক পরিহার কর। কপালের লিখন অখণ্ডনীয়। তাই যা ভবিতব্য তা ঘটবেই। আমি বরং তোমার উদ্বেগ অপনোদনের জন্য নিয়মিতভাবে যুদ্ধ বর্ণনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাতে তোমার মনের ভার লাঘব হবে।

মহাভারতে অবশ্য বেদব্যাসের উক্তি অবিকল এভাবেই লেখা নেই। তত্রাচ আমি যেটুকু লৈখিক স্বাধীনতা এক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি, মহাভারতের পাঠ মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে তাতে সত্যের অপলাপ ঘটে নি। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ঘটনার রাখা-ঢাকা রূপটি যথার্থ ঐভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। কালীপ্রসন্ন মহাভারতের ভীষ্মপর্ব, ১ম অধ্যায় খুলে মিলিয়ে নিন। দেখবেন, যুদ্ধের জন্য দুই শিবির যখন কুরুক্ষেত্রে প্রস্তুত তখন হস্তিনাপুরে এসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বেদব্যাস একান্তে বলছেন: "মহারাজ! তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে ;···পুত্রগণের বিনাশ দর্শনে শোকাকুল হইও না।"

অসহায় বৃদ্ধ রাজাকে এভাবেই আঘাত করেছিলেন বেদব্যাস। যেন অভিশপ্ত করে গেলেন তাঁকে বহিরাগত দেবতাদের প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠুর নির্দ্বিধায় বলতে পারলেন,—পার্থিবগণের বিনাশ আসন্ন। আর এই নির্মম অভিসম্পাত ধ্বনিত হতে শুনে সচকিত হয়ে আমরা সেই কটুগন্ধনিঃসারী, অদ্ভুতদর্শন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অপার্থিবোপম শরীরের দিকে তাকিয়ে শিহরিত হয়ে মনে মনে প্রশ্ন করতে প্রলুব্ধ হলাম,—তবে কি বেদব্যাস পার্থিবগণের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেন না? তিনিও কি দেবতাদের মতই বহিরাগত? কিন্তু সে প্রশ্ন থাক। বেদব্যাস-রহস্য উত্থাপন করে আরও এক স্তরের জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। বরং বেদব্যাসের কার্যকারিতাগুলির বিশ্লেষণে অন্যতর জটিল সমস্যাগুলির জট ছাড়াতে পারলে বহু নিহত সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে।

বেদব্যাসের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে এভাবে আক্রান্ত হতে (বাচনিক আক্রমণের কথা বলছি) ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। পিতার কাছে পুত্রগণের বিনাশ কামনা করার মত নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে? হৃদয়হীন ব্রাহ্মণরা অবশ্য এমনিই নিষ্ঠুর ছিলেন। বিদুর যে কতবার দুর্যোধনের নির্বাসন ও মৃত্যু কামনা করে ধৃতরাষ্ট্রের উপস্থিতিতে সমস্ত কুরুবংশকে অভিসম্পাত দিয়েছেন তার তালিকা হাজির করলে অপর একটি অনু-মহাভারতের সৃষ্টি হবে। কিন্তু যা বলছিলাম,—বেদব্যাস বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ছুটে এসেছিলেন হস্তিনাপুরে।

তাঁর সেই গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশিত হল, যখন তিনি বললেন, "...তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি ; তুমি সচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।"

বেদব্যাসের দিব্যচক্ষু দান করার ক্ষমতা আছে, এমন অহংকারসর্বস্ব কথা শুনলে মহাভারত-শ্রোতার চক্ষুর্দ্বয় নিশ্চয় বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে আসবে, সম্ভবত একারণেই দিব্যচক্ষু প্রদানের বাগাড়ম্বরটি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বেশ বুঝতে পারি, অমন ঐশ্বরিক ক্ষমতা বেদব্যাস কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ছিল না। ছিল না তার প্রমাণ, দিব্যচক্ষে তাঁরা নিজেরাই কিছু দেখতে পেতেন না। আর্যাবর্তের খবরাখবর তাঁদের দূত মারফতই সংগ্রহ করতে হত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাই বস্তুতই বেদব্যাসের দিব্যচক্ষু দান করার ক্ষমতা থাকলে সেই অন্ধ রাজন্ নিশ্চয় একটি বারের জন্যও অন্তত চক্ষুষ্মান হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করতেন। রাজা কিন্তু তা করেন নি। বলেছেন, জ্ঞাতিবধ সন্দর্শনের অভিলাষ তাঁর নেই। বলেছেন, "...আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ শ্রবণ করিব।" যিনি ভয়াবহ যুদ্ধকথা শুনতে চান, জন্মান্ধ সেই লৌহমানব চক্ষুলাভের সুযোগ পেলে কোন্ অধিকতর শোকে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করতেন? বেদব্যাসের 'দিব্যদৃষ্টি প্রদানে'র দম্ভোক্তিটি তাই শুধুই যে সাজানো বচন, একথা বুঝতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ঘটে না।

এই 'মিথ্যা ভাষণ'কে আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, যখন দেখি, বেদব্যাস যুদ্ধকথা বর্ণনার জন্য সঞ্জয়কে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁকে কোনো দিব্যচক্ষু প্রদান করেন না। সঞ্জয়কে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য কুরুক্ষেত্রে বার বার ছুটে যেতে হয়েছে এবং সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি কয়েকদিনের অতীত যুদ্ধঘটনা পর্বে পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিবৃত করেছেন। ব্যাসদেবের ততদূর সাধ্য থাকলে সঞ্জয়কে তিনি এভাবে কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনাপুরের মধ্যে দৌড় করাতেন না। সঞ্জয়কেই 'দিব্যচক্ষু প্রদান' করতেন আর সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসেই ঘটমান যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ধারাবিবরণী শুনিয়ে যেতেন রাজাকে। কিন্তু ঘটনা যখন তেমনভাবে ঘটানো সম্ভব হয় নি, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'দিব্যচক্ষু' দানের সাড়ম্বর ঘোষণাটি আদৌ ঘটনা ছিল না, ছিল ব্রাহ্মণ-বাগাড়ম্বর-প্রসূত রটনামাত্র। তবু কী আশ্চর্য, আজ হাজার বছর ধরে আমরা ভেবে আসছি, বেদব্যাসদত্ত 'দিব্যশক্তি' বলেই সঞ্জয় নাকি হস্তিনাপুরে রাজসমীপে বসেই ঘটমান যুদ্ধের তাৎক্ষণিক বর্ণনা করেছিলেন।[১] এই ভিত্তিহীন ভাবনাটুকুর ভিত্তি রচনা করেছে ব্যাসদেবের ঐ চতুর বচনটি, যা ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করতে চেয়েছিল বলে মহাভারতে সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়েছে। আর এমনিই

সব অলীক ভাবনারাশি নিয়েই আমরা যে অনন্ত প্রশান্তির সঙ্গে বংশপরম্পরায় মহাভারতকে মাথায় তুলে রেখেছি, তার কারণ, পরিশ্রম স্বীকার করে অল্পজনেই আমরা মহাভারত খুঁটিয়ে পড়ি। যা পড়ি তা মূল গ্রন্থ নয়, পরবর্তী মহাজনগণকৃত গল্পাকার মহাভারত। আসলকে যা ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে আরও আরও অলীক আরও আরও ধোঁয়াশাচ্ছাদিত করেছে। সেইসব গল্পকথা আমাদের শিশুপাঠ্য মহাভারতকে রূপকথা ও রাক্ষস-খোক্কসের গল্পে পরিণত করেছে। ভুল শিক্ষা দিয়ে গেছে। গড়ে তুলেছে আবহমানের কুসংস্কারের ওপর আকাশচুম্বী ভাসমান রূপকথার স্তূপ।

বিশ্বাসনির্ভর মহাভারত-ভাবনার ফলেই আজ এক শ্রেণীর জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন, সঞ্জয় কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোনো টেলিভিশন সেটে দেখেছিলেন? বিজ্ঞানী দেবতাদের মারফত সংগৃহীত একটি দূরদর্শন যন্ত্র কি হস্তিনাপুরে বসিয়ে দিয়ে গেছলেন বেদব্যাস? না, আসল ঘটনা হল, সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে যুদ্ধকথা বর্ণনা করলেও তাৎক্ষণিক ঘটমান যুদ্ধের বর্ণনা তিনি দেন নি। দ্রুতগামী রথে এক এক দফায় কুরুক্ষেত্রে ছুটে গেছেন ও তারপর হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করে রাজাকে বেশ কয়েকদিনের বিবরণ শুনিয়েছেন তিনি। কুরুবীর ভীষ্ম যতদিন সংগ্রামে শত শত পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করছিলেন, সঞ্জয় ততদিন রণক্ষেত্রের অদূরে কোনো নিরাপদ দূরত্বে বসে ব্যাসদেব-রচিত যুদ্ধ-বিবরণীর শ্রুতিলিখন তৈরী করেছেন। পরে, হয় লিখিত, নয় স্মৃতিবদ্ধ সেই রণবার্তা হস্তিনাপুরে ফিরে এসে রাজাকে শুনিয়েছেন। এজন্যই দেখি যুদ্ধপ্রত্যাগত সঞ্জয় যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সুরু করছেন একটি নাটকীয় চমকের সঙ্গে,—প্রথমেই ভীষ্মের নিধনবার্তা প্রচার করে।

মহাভারতের বিবরণ এই রকম, "...**সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত** ও চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। ভরতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন;" (ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়—ভীষ্মের নিধনবার্তা, ভীষ্মপর্ব, কালীপ্রসন্ন)। তারপর ধৃতরাষ্ট্র যখন জানতে চাইলেন, "তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে?" তখন সঞ্জয় বললেন, "...এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে (অর্থাৎ বর্ণনা করা হচ্ছে) তাহা পূর্বেই দর্শন করিয়াছি। অতএব যাঁহার প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্ত বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট আকাশগতি, শাস্ত্রবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের উৎপত্তির কারণজ্ঞান, অতীত ও অনাগত বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এবং যে

মহাত্মার বরদানে অস্ত্রের অস্পৃশ্য হইয়াছি, এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশরনন্দনকে (বেদব্যাসকে) নমস্কার করিয়া ভরতগণের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণ করুন!" (ঐ)।

সঞ্জয়ের উপরোক্ত দীর্ঘ বচনটিতেও ইচ্ছাকৃত হেঁয়ালির সৃষ্টি করা হয়েছে। বেদব্যাসের অলোকসামান্য ক্ষমতা সম্পর্কে শ্রোতৃমনে শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা এখানেও লক্ষ্য করা যায়। কতগুলি গুরুভার শব্দ আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাকে ভারাক্রান্ত করে। সুতরাং শব্দের এই জটাজুট ছাড়িয়ে আমরা আবার আখ্যানবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করব। এখন কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য থামতে হবে।

সঞ্জয়োক্তিতে মহাভারত একথা সুস্পষ্ট করে দিলেন যে, সঞ্জয় যথার্থ প্রত্যক্ষদর্শী নন। যুদ্ধটি তিনি কখনো কখনো প্রত্যক্ষ করলেও যুদ্ধের বিভিন্ন মন্তব্য ও বিচার-বিশ্লেষণসহ ধারাবিবরণীর নিপুণ রচয়িতা হলেন বেদব্যাস। সঞ্জয় বেদব্যাসের প্রসাদে সেই বিচিত্র কথা ও বিচিত্র জ্ঞান লাভ করে তারই কথকতা করছেন রাজসমীপে। ফলত আমাদের কাছে দুটি বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কার হল। এক, সঞ্জয়োবাচ যুদ্ধবর্ণনার সকল বিষয় সঞ্জয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয়, নয় তা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখা ও দেখামাত্র বর্ণিত। সেই যুদ্ধকথা ঘটনার পরবর্তীকালে বিবৃত। এবং দুই, যুদ্ধের বর্ণনাটিও যথাযথ নয়, তা পাণ্ডবপক্ষীয় মহর্ষির দ্বারা বিরচিত অর্থাৎ সেই বিবরণে পাণ্ডবদের জয়গানই গীত হয়েছে! বিজয়ীপক্ষ-রচিত ইতিহাস যেমন সর্বযুগেই বিজয়ী শিবিরের মাহাত্ম্য প্রচার করে, সঞ্জয়োবাচ বেদব্যাস-বিরচিত ঐ রণকথা ও তৎসহ ভগবদ্গীতাও তেমনি বিজয়ী দেবতা ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডবদের সর্বগুণান্বিত জয়বার্তা। সেই একদেশদর্শী বিবরণে বিজিত পক্ষের অনুকূলে একটি কথাও উচ্চারিত হওয়ার নয়। আর এজন্যই 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করে মহাভারত পাঠের নির্দেশ দেওয়া আছে। মূল মহাভারতের অংশটিও 'জয়' নামে খ্যাত ছিল।[২]

সঞ্জয় বলেছেন, তিনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। অতীন্দ্রিয় অর্থে নিজের ইন্দ্রিয়াতীতও বোঝাতে পারে। অর্থাৎ সঞ্জয় যুদ্ধের সকল ঘটনা চর্মচক্ষে দেখেন নি। ব্যাসদেব-প্রসাদাৎ যুদ্ধের বহুলাংশ তিনি শুধু ব্যাসমুখে শুনে রাজাকে পরে বলেছেন। তাই সঞ্জয়ের অপর উক্তি, তিনি যুদ্ধকথা 'দূর হইতে শ্রবণ' করেছিলেন, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ নিজে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সন্দর্শন করলে একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র উভয়পক্ষে কী ঘটছে তা জানা যায় না। "অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য"ও থাকা যায় না। হয়ত ব্যাস-সহায়তায় মাঝে মধ্যে তিনি

দেববিমানে চেপে উড্ডীন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রটির 'পক্ষীচক্ষুদর্শনে'র (বার্ড'স-আই ভিউ গ্রহণের) সুযোগ পেয়েছেন। যুদ্ধকথা আরম্ভের আগেই, মহাভারত জানিয়েছেন, দেবতারা কুরুক্ষেত্রের ওপর বিমানযোগে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। পরে আরও জানা যাবে, ঐ যুদ্ধে অর্জুনরথের আগে আগে দেবসৈন্যরাও পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেন। অর্জুন যখন তাঁর বীরত্ব ও তেজ হারিয়ে বসলেন কুরুক্ষেত্রে স্বজনহত্যাপর্ব ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে সমাধা হওয়ার পর, তখন কাতর ও অসহায় ভাবে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, আমার রথের আগে আগে যে পীতবসন যোদ্ধা কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতেন, তিনি কোথায়? অর্থাৎ অর্জুন একাই কুরুসেনানীকে পরাস্ত করতেন, এই প্রচার প্রকৃত তথ্যকে গোপন করে পার্থের বীরত্বের জয়গান গেয়েছে সেই খাণ্ডবদাহন পর্বাধ্যায় থেকেই। পীতবসন পুরুষ বলতে তো দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকেই বোঝায়।[৩]

যুদ্ধটি নিজে প্রত্যক্ষ করলে সঞ্জয় কৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র হাতে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হতে দেখতে পেতেন না। ভীষ্মের মুখে ব্রাহ্মণরাই যে কৃষ্ণস্তুতি বসিয়ে দিয়েছিলেন ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত জনগণের ভক্তি ও বিশ্বাসকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে, তারও তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা আমরা বর্তমান আলোচনায় একাধিকবার করেছি। কৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ঘটনাটিও সাজানো। কেননা, বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে গীতামৃত গাওনা করানো হলেও ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়টি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে আদৌ রচিত হয় নি। তা পরবর্তী রচনা এবং পরবর্তীকালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে সংযোজিত। পণ্ডিতজন একবাক্যেই এই মত পোষণ করেন।

মহাভারত-কথায় স্পষ্টত লক্ষণীয় বিষয় হল, যে ক্ষেত্রে কৃষ্ণের মহিমা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো আখ্যানাদি যুক্ত করা হয়েছে, সেখানেই দেখা যায়, ঐ অংশ পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযোজিত নেই। ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি। কৃষ্ণমাহাত্ম্য যাঁকে শোনানো হয়, দেখা যায়, তিনি নিজেই যেন সেই কথকতার আসরে অনুপস্থিত। কট্টর কৃষ্ণবিদ্বেষীকে মহাভারতকার ভক্ত শ্রোতার মত উপস্থিত করে আমাদেব বিশ্বাস করতে বলেন যে, কৃষ্ণশত্রুও কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করছেন বিনাপ্রশ্নে। তখনই আবার ঐ শ্রোতাকেই দেখি, মাহাত্ম্য শ্রবণের ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত (হয় বাক্য, নয় শস্ত্র দ্বারা), আবার শ্রবণের পরেও তাঁর মধ্যে কোনো চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না। কৃষ্ণের কোনো প্রভাবই লক্ষিত হয় না। সংকুল যুদ্ধাবস্থায় তাই মহাভারতকার যখন বলেন, ভীষ্ম ভক্তিভরে কৃষ্ণমাহাত্ম্য

কীর্তন করলেন আর দুর্যোধন তা বিমুগ্ধ হয়ে শুনলেন এবং তার পরেই আবার ভীষ্ম ও দুর্যোধন শত্রুজ্ঞানে কৃষ্ণের বিপক্ষে অস্ত্র তুলে ধরলেন, তখন আর মহাভারতকথকের উদ্দেশ্যপূর্ণ গল্পকথার ওপর আস্থা রাখতে পারি না। বুঝি, আখ্যানবস্তুকে পারম্পর্যক্রমে মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও যিনি রাখেন না, এমন কোনো কৃষ্ণভক্ত কবি নির্বিচারে মহাভারতীয় আখ্যানবস্তুর মধ্যে অকস্মাৎ তাঁর কৃষ্ণস্তবটি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ইতিবৃত্তকে অশ্রদ্ধেয় দুর্বল রচনার দ্বারা লঘু করে গেছেন।

সঞ্জয়কে বেদব্যাস যখন পাণ্ডবপক্ষীয় ইতিবৃত্ত-কথক হিসেবে নির্বাচন করেন, তখন সঞ্জয় যে সম্পূর্ণভাবে দেবশিবিরের বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হয়েছেন তা অনায়াসেই বুঝতে পারি। তাছাড়া এই ধারণা সঞ্জয়ের অপর এক উক্তির মাধ্যমেও সমর্থিত হয়। সঞ্জয় বলেছেন, বেদব্যাসের প্রভাবে তিনি 'উৎকৃষ্ট আকাশগতি' সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। উৎকৃষ্ট আকাশগতির প্রশ্ন এই যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার বিষয় নয়। তবু যখন সঞ্জয়মুখে সেই অদ্ভুত জ্ঞানলাভের কথা শুনি, তখন পুনরায় আমাদের উড্ডীন দেবতা ও তাঁদের অজানা উড়ন্ত যানগুলির কথা স্মরণে আসে। মহাভারত বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের আকাশে কিছু দেববিমান টহলরত ছিল।[৪] যার মানে, দেবতারা তাঁদের আকাশ-রথে চেপে আর্যাবর্তে 'ভূভার হরণে'র শেষ খেলাটি প্রত্যক্ষ করছিলেন। সম্ভবত তাঁদের অপর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমত পাণ্ডবপক্ষকে সাহায্য করা। প্রচার যেমনই হোক, মহাভারত-পাঠক তো জানেন, কৃষ্ণার্জুনের নিজস্ব বীরত্ব কত সামান্য ছিল। আগেই বলেছি, দেবতাদের সামরিক সহায়তা যেদিন প্রত্যাহৃত হয়েছে সেইদিন এঁদের বীরত্বের আস্ফালনও ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেছে। কৃষ্ণ নিহত হয়েছেন সামান্য এক ব্যাধশরে, যার অর্থ, অনার্য বীরের অস্ত্রাঘাতে তাঁকে নিতান্ত মামুলীভাবে মরতে হয়েছে। আর মহাভারতের মুখ্য চরিত্র অর্জুন অতি দীনভাবে পরাজিত হয়েছেন সামান্য কতিপয় ডাকাতের হাতে পড়ে। এঁদের বীরত্বের বহর দেবতাদেরও জানা ছিল। কৃষ্ণমুখে তার স্বীকৃতিও পাওয়া যায়। যুদ্ধান্তে কৃষ্ণ বলেছিলেন, যুদ্ধের আগেই কংস জরাসন্ধ শিশুপালের মত দেশীয় বীরদের কৌশলে নিহত করা না হলে এবং যুদ্ধের নিয়মকানুন যথাযথ মান্য করে পাণ্ডবরা যুদ্ধ করলে পাণ্ডবপক্ষের পরাজয় ছিল অনিবার্য। দেবতারা কৃষ্ণার্জুনের ক্ষমতার কথা জানতেন বলেই যুদ্ধে সেই নাবালক যোদ্ধাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বিমানে চেপে রণক্ষেত্রের ওপর টহল দিয়েছেন তাঁরা। এমন ঘটনার উল্লেখ বাইবেলেও পাওয়া যায়।[৫] তাই বলছি, রণক্ষেত্রের বর্ণনাকার

সঞ্জয় যখন বলেন, বেদব্যাস-প্রসাদে তিনি 'উৎকৃষ্ট আকাশগতি'র* জ্ঞান অর্জন করেছেন, তখন বুঝতে পারি, সঞ্জয় দেববিমানের টহলদারির কথাই এইভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝাতে চেয়েছেন। নচেৎ এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট আকাশগতির কথাটি নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক হত। সম্ভবত সঞ্জয়কে সমর-সাংবাদিক হিসেবে দেবতাদের উড়ন্তযানে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বেদব্যাসের সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর স্বচ্ছন্দে উড়েছেন ও রণক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই বলেছেন, কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা দূর থেকে ঐ যুদ্ধ দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন তিনি। আর সেটাই তাঁর 'উৎকৃষ্ট আকাশগতি' সম্পর্কে বিস্ময়কর জ্ঞান। উড়ন্ত অবস্থায় রণক্ষেত্রের ওপর অবস্থান করায় সঞ্জয় 'অস্ত্রের অস্পৃশ্য' থেকেছেন অনায়াসেই। বিনা প্রশ্নে বেদব্যাসকথিত যুদ্ধকথা রাজসভায় আবৃত্তি করার জন্য এবং দেবপক্ষের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পুরস্কারস্বরূপ বেদব্যাসের সুপারিশে কুরুক্ষেত্রের সর্বধ্বংসী যুদ্ধের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। প্রাণে বেঁচে থাকার বিনিময়েই সঞ্জয় যে বিপক্ষীয় শিবিরের কাছে আত্মসমর্পণ করে অবিকল বিদুরের ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে অনর্গলভাবে কুরুবংশ সম্পর্কে কুকথা শুনিয়ে গেছেন, আমরা তাও লক্ষ্য করি। বিদুর ও সঞ্জয়ের কুরুনিন্দার ভাষা হুবহু একই রকম হওয়ায় আরও বুঝতে পারি, ঐ দীর্ঘ নিন্দাবাদও দেবতাদের শিবিরেই লিখিত হয়েছে। সঞ্জয়কে তারই একটি অনুলিপি মুখস্থ করতে দেওয়া হয়। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয় সেই যুদ্ধকথা তাঁর স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে গেছেন। সঞ্জয়ের অপর উক্তিও আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থক।

সঞ্জয় বলেছেন, বেদব্যাসের কাছে তিনি 'শাস্ত্রবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের উৎপত্তির কারণজ্ঞান', 'অতীত ও অনাগত বৃত্তান্তের' জ্ঞান লাভ ও পরচিত্ত-বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। 'শাস্ত্র বহিষ্কৃত ব্যক্তি' বলতে এখানে শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘনকারীদের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সঞ্জয়কে বেদব্যাস ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন বা শাস্ত্র শিক্ষাও দিয়েছিলেন। দেবতাদের রচিত ব্রাহ্মণস্বার্থসংরক্ষক নিয়মবিধানই মহাভারতের ধর্ম ও শাস্ত্র। সঞ্জয়কে সেই শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘনকারীদের ভয়াবহ পরিণামের কথা শোনানো হয়েছিল এবং প্রচলিত উত্তরভারতীয় বিধিবিধানগুলিকে অশাস্ত্রীয় বলে গণ্য করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের যে অনুশাসন দুর্যোধন ও তাঁর অনুগামীরা মেনে নিতে অস্বীকৃত ছিলেন, সঞ্জয় তাই মেনে নেওয়ায় দেবপ্রসাদে 'অস্ত্রের অস্পৃশ্য' হয়েছেন। 'অতীত ও অনাগত বৃত্তান্তের জ্ঞান'-ও ঐ তথাকথিত দৈবজ্ঞান। দেবতাদের বৈজ্ঞানিক গণনায় এমন বহু অনাগত প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক

ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল যা অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই বাস্তব বলে প্রমাণিত হ'ত। বর্তমানে আমাদের বৈজ্ঞানিকরাও বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে এমন বহুতর ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। দৈনন্দিন জীবনে আমরা তার একটি নমুনার কথা সবাই বলতে পারি, আবহবার্তা। উপগ্রহের সাহায্যে আবহবিজ্ঞান ক্রমশ আরও ত্রুটিহীন হয়ে উঠছে। 'পরচিত্তবিজ্ঞান' বস্তুটি যে স্রেফ পুরোহিত-মনঃকল্পিত কাহিনীকল্প একথা বোধহয় পুনশ্চ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বর্তমান রচনায় মহাভারতের বিভিন্ন তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে আমরা সর্বত্রই দেখেছি, পুরোহিতরা সেদিন নিজেদের মনোমতভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যার ফলে প্রতিটি চরিত্রের কার্য ও চিন্তায় এমন অদ্ভুত স্ববিরোধ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, বুদ্ধিতে যার সাধারণ ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর সকল সম্ভাব্যতা এইভাবে নষ্ট হওয়ায় মহাভারত কাহিনী যতই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, সে কাহিনীকে ধর্মগ্রন্থ ভেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের পিতামহগণ ততই তার মধ্যে কল্পিত রূপকের সন্ধান করে সহজ সরল ঘটনাকেও অসাধারণ দৈবীমহিমান্বিত পবিত্র কথা বলে প্রচার করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। এইভাবে পার্থিব অতীতকাহিনী অপার্থিব দৈববাণীরূপে আমাদের মনের সকল বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সঞ্জয় এভাবেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা অবশ্য আমরা একথা বলতে চাই না যে, অপরিণত বুদ্ধিবিদ্যার দরুনই সঞ্জয়ের ওপর বেদব্যাস অনায়াসে প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে যেমন বুঝিয়েছিলেন তিনি ঠিক তেমনটিই বুঝেছেন। বেদব্যাসের প্রতি সঞ্জয়ের অগাধ বিশ্বাস ও অটুট শ্রদ্ধা জাগরূক হয়েছিল আরও এমন কিছু জ্ঞানবিদ্যা লাভ করায়, যা সেকালে আর্যাবর্তের অতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরও অধিগত বিদ্যা ছিল না। সঞ্জয়কে সেইমত অসামান্য জ্ঞান দান করে প্রথমেই তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাসকে আকর্ষণ করেছেন চতুর ব্রাহ্মণ-শিক্ষক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বেদব্যাসের কাছে সঞ্জয় শোনেন ইতিহাস ও ভূগোলের বিচিত্র কথা, জানতে পারেন হিমালয় সমেত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান, তার রাজ্যসংস্থান, নদনদী, দ্বীপ, উপদ্বীপ, দেবতাদের বাসভূমি ও প্রাণীসাধারণের কথা। জানতে পারেন, কালপর্যায় কীভাবে বিবর্তিত হয় এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। জানতে পারেন, বিভিন্ন জাতির পরিচয়াদি। জানতে পারেন, সৃষ্টিরহস্য।

পৃথিবীরহস্যের এতো কথা অত্যল্প সময়ে জেনে উপলব্ধি করে পুনরায় তা অপরকে জানাতে হলে যে বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োজন, সূতপুত্র সঞ্জয় ততদূর

অলোকসামান্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিনা তা আমরা ইতিপূর্বে জানতাম না। হঠাৎ দেখলাম, বেদব্যাস তাঁকে যুদ্ধকথা বর্ণনায় নিযুক্ত করে যাওয়ার পরেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় পৃথিবীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। যা বলছেন তা মহাজ্ঞানীর অধীত বিদ্যা। তাই সঞ্জয়ের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় আকর্ষিত ও বিস্মিত হই। এতো জ্ঞান কি কোনো মানুষ হঠাৎ-ই সংগ্রহ করতে পারেন! মহান ভারতের যে নিখুঁত মানচিত্রটি রাজার কাছে সঞ্জয় বিস্তারিত-ভাবে মেলে ধরলেন, বস্তুত সেটাই তো ভারতবর্ষ। দূর উচ্চতায় অবস্থিত হিমালয়ের বিভিন্ন পার্বত্য ভাগ বিভাগ এবং দেবতাসহ সেই পার্বত্য অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের কথা শোনানো হ'ল। নদ নদীর ও বিভিন্ন রাজ্যের নামের প্রলম্ব তালিকা সঞ্জয় বলে গেলেন অনর্গলভাবে। সামনে তালিকা রেখে তা পাঠ না করলে এভাবে বলা যায় না। সুতরাং এই মহান জ্ঞানসমুদ্রের হদিস তিনি যাঁর কাছে পেয়েছিলেন, গুরুজ্ঞানে তাঁর কাছে সঞ্জয়ের পক্ষে নতজানু হয়ে সর্বস্ব সমর্পণ করাই তো স্বাভাবিক। সঞ্জয় তা-ই করেছিলেন। (ভীষ্মপর্ব, ভূমি-পর্বাধ্যায়, ৪র্থ থেকে ১২শ অ. কালীপ্রসন্ন দ্রঃ)।

এখন সর্বশেষ প্রশ্ন, বেদব্যাস খুঁজে খুঁজে সঞ্জয়কেই বা নির্বাচন করলেন কেন? বেদব্যাসই তো ইতিহাস ভূগোল ব্যাখ্যার জন্য পাণ্ডবদের কাছে নামগুপ্ত জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে প্রেরণ করেছিলেন। বহু জ্ঞানে জ্ঞানী মহর্ষিরও অভাব ছিল না সেদিন। দেবতাদের প্রসাদে পণ্ডিত অনেক ব্রাহ্মণই তখন এক একজন বিস্ময়কর বিদ্যাসাগরে পরিণত হয়েছেন। এমন কারকেও তো নিযুক্ত করতে পারতেন বেদব্যাস। তাঁর নজর সঞ্জয়ের ওপরেই বা পড়ল কেন?

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এ প্রশ্ন মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সঞ্জয়ের নির্বাচন-পর্বটি হঠাৎ হয় নি। তিনি শুধু বারবার কুরুক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ-সংবাদই সংগ্রহ করে আনেন নি, তাঁর এই নিযুক্তির আগে তিনি বেদব্যাসের দ্বারা গোপনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেদব্যাস নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সঞ্জয়কে বহু বিষয়ে জ্ঞান দান করছিলেন। সঞ্জয়-কথিত পৃথিবীমাহাত্ম্য-কথা (যা ভূমি-পর্বাধ্যায়ে লিখিত হয়েছে) তারই প্রমাণ। প্রশ্ন তাই, কেন, সঞ্জয়ই বা এই দুর্লভ সুযোগ লাভ করলেন কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ায়?

সম্ভবত দুটি বিশেষ কারণে সঞ্জয়কেই উপযুক্ত গণনা করা হয়। প্রথমত সঞ্জয় ছিলেন কুরুশিবিরের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং স্বয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। নিজের বুদ্ধি ও মেধার গুণে যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি কুরুপক্ষের রাজদূত পদেও

উন্নীত হন। হস্তিনাপুর থেকে শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে সঞ্জয় গেছলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। রাজার বিশেষ বিশ্বাসভাজন না হলে তাঁকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যকার্যে নিশ্চয় নিযুক্ত করা হত না। তাই সঞ্জয়কে সমর-সাংবাদিক হিসেবে নিয়োগ করে তাঁর মাধ্যমে কুরুক্ষেত্র-বার্তা প্রচার করতে পারলে কুরুসভায় ও ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে একথা প্রথমেই বিচার করে দেখেছিলেন দেবশিবির। বেদব্যাস যদি কোনো ব্রাহ্মণকে এ কাজে নিয়োগ করতেন তবে তাঁর কথায় রাজমনে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হত না। দেখা যায়, বিচক্ষণ ধৃতরাষ্ট্র তথাপি সঞ্জয়ের ওপরেও আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন ক্রমশ। সঞ্জয়ের মুখে কুরুনিন্দা শুনে রাজার পূর্ববিশ্বাস আর অটুট থাকে নি। পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যের ফাঁপানো ফোলানো স্তুতিবাদ করে সঞ্জয় যখন ভীষ্মের নিধনবার্তা পুরোহিতদের মামুলী রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন তখনই ধৃতরাষ্ট্রের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি যে পাণ্ডবরা অনায়াসে ভীষ্মকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অথবা পাণ্ডবপক্ষে 'ধর্ম সহায়' হওয়ার জনাই অতুলনীয় পরাক্রমশালী কুরুপিতামহকে পরাজিত হতে হয়েছিল। তাই, ধর্ম ধর্ম শব্দের ক্লান্ত রোমন্থন সত্ত্বেও তাঁকে বলতে শোনা গেছে : "হে সঞ্জয়!···ঋষিগণ অতি নিদরুণ ক্ষাত্রধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন;" (ভীষ্মপর্ব, ১৪শ অ)। অর্থাৎ বিচক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, 'যেথা কৃষ্ণ সেথা জয়' ব'লে পুরোহিত-প্রচার যেমনই হোক, ভীষ্মনিধন-কাজটি কেবলমাত্র কৃষ্ণার্জুনের সাধ্যকর্ম ছিল না; ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় দেবতাদের বলে বলীয়ান হয়ে ক্ষত্রোচিত যুদ্ধাভিযানে একজোটে নিহত করেছিলেন শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে।

ভীষ্মবধে পাণ্ডবরা যখন উল্লাসে উৎসবমুখর, ধৃতরাষ্ট্র তখন প্রকৃতই বিমথিত হয়েছেন। তাঁর কঠিন হৃদয় যে কতদূর আহত হয়েছিল, আমরা তা জানতে পারি ধৃতরাষ্ট্র-উচ্চারিত একটি অশ্রুতপূর্ব খেদোক্তিতে। তিনি বলেছেন, "যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরুকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের বলই অধিক।" এই প্রথম ধর্মাধর্ম সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত বক্তব্য শ্রুত হল। ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মের মধ্যে কোনও গোঁজামিল দেখলাম না। দেখলাম না বিভ্রান্তিকর দার্শনিক তত্ত্বকথার পুনরুচ্চারণ। ধর্ম বলতে তিনি ন্যায়াচারকেই বুঝেছেন, যেমন বুঝতেন দুর্যোধন ও কর্ণ।

এমন এক ধৃতরাষ্ট্রের মুখে, অমন এক কুরুবীর ভীষ্মের মুখে তাই, 'যেথা কৃষ্ণ সেথা জয়' বুলি সর্বৈবভাবে অবিশ্বাস্য। সঞ্জয় কর্তৃক যুদ্ধবর্ণনায়

অযাচিত ও অপ্রয়োজনে উক্ত জ্ঞান দানের প্রয়াস স্পষ্টত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

রাজনৈতিক বিচারে সঞ্জয়ের নির্বাচন ছিল খুবই দূরদৃষ্টিপ্রসূত। বিপক্ষ শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে স্ব-শিবিরের পক্ষে প্রচারে নামানো একটা উল্লেখ-যোগ্য রাজনৈতিক কৃতিত্ব বৈ কি। তাছাড়া সঞ্জয়কে হাত করার ফলে আরও একটি মস্ত বড় লাভ হয়েছিল কুরুশত্রুদের। যুদ্ধরত দুই শিবিরেই সঞ্জয়ের অবাধ গতির সুযোগে দুর্যোধন-পক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা অবাধে। এই বিশিষ্ট সামরিক উদ্দেশ্যেও সঞ্জয়কেই সমর-সাংবাদিক হিসেবে নির্বাচন করার প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তিতে সঠিক লোক নিযুক্তির ব্যাপারে দেবতারা ছিলেন বস্তুতই দক্ষ। বলতে গেলে শক্তিশালী দুর্যোধন-শিবিরের পতনের মুখ্য কারণই ছিল গুপ্তচর মারফৎ কুরুশিবিরে ভাঙন ধরানোর কাজে দেবতাদের সাফল্য। বিচক্ষণ রাজন ধৃতরাষ্ট্র সেই সামরিক চক্রান্তটিও সম্যক বুঝতে পারেন। দুর্যোধন-শিবির যখন ভেঙে পড়েছে, তখন সেই মহান পতনের কারণ ব্যাখ্যা করে বিলাপ করেছেন বিষণ্ণ কুরুসম্রাট। কুরুবীরগণের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে দেবতারা তাঁদের দুর্বল করেছেন। দেখা গেছে, কোনো কুরু-সেনাপতিই তাদের যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করেন নি। বীরগণের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষাদ্বেষ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দুর্যোধনপক্ষে অপ্রতিবারণীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন :

যদা শ্রৌষং ভীষ্মমমিত্রকর্ষণং নিঘ্নন্ত মাজাবযুতং রথাণাম্।
নৈষাং কশ্চিদ্বধ্যতে খ্যাতরূপঃ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যুদ্ধে প্রতিদিন শত শত পাণ্ডব-সৈন্য বধ করলেও ভীষ্ম যখন পাণ্ডবদের কোনো বিখ্যাত বীরকে বধ করলেন না, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র জয়ের আশা ত্যাগ করেছিলেন। ঠিক একইভাবে দ্রোণও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কোনো বীরকে নিহত না করে দুর্যোধন-শিবিরের শক্তিক্ষয় করে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাও বুঝতে পারেন। তাঁর বিলাপোক্তিতে সেকথাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন :

যদা দ্রোণো বিবিধানস্ত্রমার্গান্ নিদর্শয়ন্ সমরে চিত্রযোধী।
ন পাণ্ডবান্ শ্রেষ্ঠতরান্ নিহন্তি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

কর্ণকে কুরুপক্ষ থেকে ভাঙিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণ ও কুন্তী একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। সেকথা আগেই বলেছি। দেখলাম, দল না ছাড়লেও কুরু-শিবিরে যে আত্মকলহ দানা বাধিয়ে তোলা হয়েছিল সেই সর্বনাশা ফাঁদে কর্ণও

শেষ পর্যন্ত পা পাততে বাধ্য হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছিলেন, দুর্যোধনের পতনের মূলে ভীষ্মকর্ণ বিবাদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছিল। তাই তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত স্বরে বললেন :

যদাকর্ণো ভীষ্মমুবাচ বাক্যং নাহং যোৎস্যে যুদ্ধমানে ত্বয়ীতি।
হিত্বা সেনামপচক্রাম চাপি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

অর্থাৎ, কর্ণ যখন ভীষ্মকে বললেন, হে ভীষ্ম! আপনি যতক্ষণ যুদ্ধ করবেন, আমি সে পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করব না। এবং যখন কর্ণ কুরুপক্ষীয় সেনাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন,—জয়ের সমস্ত আশা তখনই পরিত্যাগ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র।

যুদ্ধের মধ্যেই দ্রোণ-ভীষ্ম-কৃপের সমীপে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা বার বার গেছেন। কুরুপক্ষকে পরাজিত করার বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন কুরুবীরদের কাছেই। এই একটি ঘটনা অত্যন্ত রহস্যময়। কোনো ব্যাখ্যার দ্বারাই, এ ঘটনা যেভাবে লিখিত আছে, তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষ তো দূরের কথা, মহামানবেও তাঁর নিজের বধোপায় শত্রুপক্ষের কাছে বাবু হয়ে বসে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন বলে কেউ কোথাও শোনে নি। মহাভারত কিন্তু আমাদের এই ধরনের আষাঢ়ে গল্পই বিশ্বাস করতে বলেছেন। দেব-ব্রাহ্মণ চক্রান্তকে অবগুণ্ঠিত করাই বোধহয় এজাতীয় গল্প বানানোর আসল উদ্দেশ্য। প্রকৃত ঘটনা ছিল, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দল-ভাঙানোর প্রয়াস। এ কাজ তাঁরা একাধিকবার করেছেন। যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করাই ছিল ওঁদের ধ্যান জ্ঞান ও ধর্ম। যুদ্ধের পর বিজয়ী পক্ষের ইতিবৃত্ত-রচয়িতারা সাধ্যমত বিভিন্ন আজব অদ্ভুত অসম্ভব গল্প ফেঁদে বিজয়ী পক্ষের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাই অবিশাস্য হয়ে উঠেছে মহাভারতীয় চরিত্রগুলি। যেসব চরিত্রের ওপর এভাবে পালিশ-পলেস্তারা লাগানো হয় নি, সে চরিত্রগুলি তাদের স্বাভাবিকতাও হারিয়ে বসে নি। দুর্যোধন চরিত্রটি তার উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য।

শুধু কুরুদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যই সঞ্জয় যুদ্ধকথক হিসেবে নির্বাচিত হন নি। সঞ্জয়ের ছিল আরও দুটি বিশিষ্ট গুণ। তিনি ছিলেন অতি সুদক্ষ দ্রুতগামী রথের সার্থক সারথি। স্বয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রথচালনা করতেন তিনি। কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনাপুরে দফায় দফায় যাতায়াত করার জন্য এমন একজন দক্ষ রথচালকের প্রয়োজন ছিল বেদব্যাসের। সঞ্জয় বেদব্যাসের সঙ্গে গোপন স্থানে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। তাই স্বয়ং দক্ষ রথচালক হওয়ায় গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়ত সেকালের

রাজসারথিকে বেশ সুপণ্ডিতও হতে হত। দূরপাল্লার প্রমোদভ্রমণে রাজাকে তাঁর সারথি শোনাতেন বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ কথাকাহিনী। তাই বোধহয় সূতসম্প্রদায় হতেন একাধারে দক্ষ সারথি ও উত্তম কথক। এ বিষয়ে সঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদিত। বেদব্যাস-বিরচিত দার্শনিক ইতিবৃত্ত (গীতাসহ) গাওনার বিদ্যা সকলের ছিল না। ছিল সঞ্জয়ের। আর এই বিশেষ গুণটিও বোধহয় তাঁর প্রতি বেদব্যাসকে আকৃষ্ট করে। দেবতাদের আদেশ নির্দেশ পালন করায় দেবতারা সঞ্জয়কে রক্ষা করেছেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে সঞ্জয়ও হয়েছেন অস্ত্রের অস্পৃশ্য।

সঞ্জয়-রহস্যের উন্মোচনে দেবতাদের গুপ্তচর নিয়োগের কুটিল ও সূক্ষ্ম রাজনীতিটি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি, রাজনীতিতে দুর্যোধনের থেকে দেবশিবির অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন এবং জয়ের পথে সেটাই তাঁদের মুখ্য সহায়ক শক্তি ছিল।

১। আশ্চর্যের কথা, 'কৃষ্ণচরিত্র'-রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রও মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত তথ্য নজর না করে সাধারণ বিশ্বাসমত তাঁর দীর্ঘ রচনা 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'য় অনায়াসে লিখে দিয়েছেন : "...ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন।" —স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসই যদি এমন মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে তবে আর সাধারণ পাঠকের দোষ কী? বারম্বার উচ্চারিত অপ্রকৃত ভাবণ এভাবেই জনবিশ্বাসে পরিণত হয়।

২। "It is admitted now on all hands that our present Mahābhārata of over 80,000 stanzas (excluding the supplementary Harivamśa) has grown from an original 'Jaya' of 'Vyasa', through the 'Varata' of Vaiśampāyana, into Sauti's 'Mahā-Bhārata' with its illustrative old-world stories great and small (the *ākhyānas* and *upākhyānas*) and its ethico-philosophical disquisitions. The two additions last mentioned, extending as they do to more than twice the length of Vaiśampāyana's 'Bharata', have naturally obscured the legitimate character of the Mahābhārata as chronicled history (itihāsa)."—S. K. Belvalkar (Harvard) The Bhagavad-Gita : A General Review of Its History and Character.

৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্রাহ্মণদেরই জয় হল। প্রকৃত ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন দেবপুরোহিত সম্প্রদায়। পাণ্ডবদের অবস্থা হল স্বজনহত্যাকারী মীরজাফরের মত।

৪। বাইবেলীয় ঈশ্বর সদাপ্রভু এবং ভারতের দেববৃন্দ-ব্যবহৃত অজানা উড়ন্তযানগুলি, এবং তাঁদের রকেটভেলাসদৃশ ধাতব পক্ষিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থে।

৫। ইস্রায়েলী দেবতা সদাপ্রভু মিশরীয় ফরৌণের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলী সন্তানদের মুক্ত করেছিলেন এক শর্তে। শর্ত ছিল ইস্রায়েলীরা সদাপ্রভুর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাঁকেই ঈশ্বররূপে পূজা করবেন। অন্য কোনো দেশের, জাতির বা সম্প্রদায়ের দেবতাদের উস্কানী ও 'ফাঁদে' পা দেবেন না। মোজেসের নেতৃত্বে সদাপ্রভুর ঐ শর্ত ইস্রায়েলীরা মেনে নেন। তখন দশবার মিশরীয় ফরৌণের ওপর দশরকম আঘাত হেনে সদাপ্রভু অবশেষে তাঁর 'ইস্রায়েলী বাহিনী'কে মিশরের দাসশিবির থেকে মুক্ত করেন। বালক ছাড়া ঐ মুক্তবাহিনীর প্রজা-সংখ্যা ছিল, 'কম বেশি ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ।' সদাপ্রভুর উড়ন্তযানের পথনির্দেশ অনুসরণ করে তাঁরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা করেন। কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ দাস পরিবারকে সহজে হারাতে রাজি ছিলেন না ফরৌণ। তিনি ইস্রায়েলীদের পুনরায় ধরে আনার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য সদাপ্রভু এবং তাঁর দেবদূত বিভিন্ন উপায়ে যুদ্ধ করে ইস্রায়েলীদের রক্ষা করেন। বাইবেল বলছেন, 'সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের (ইস্রায়েলীদের) অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন।' [যাত্রা পুস্তক, ১৩/২১, ধর্মপুস্তক বা বাইবেল/ভারতের বাইবেল সোসাইটি/বাঙ্গালোর, দ্রঃ]। সদাপ্রভুর মেঘস্তম্ভে ও অগ্নিস্তম্ভে বিচরণের অর্থ যে উড্ডীন আকাশযানে ভ্রমণ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আজ তা একটি প্রমাণযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। (দা. ম. স্ব. দ্রঃ)।

হে কৃষ্ণ!—বললেন মুমূর্ষু দুর্যোধন,—"তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে?···তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবে পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।" (শল্যপর্ব, কালী)।

পার্থিব বীরগণের মেদে রক্তে কর্দমাক্ত কুরুক্ষেত্রের মহা শ্মশানে যখন দেবশক্তিপুষ্ট ব্রাহ্মণবাহিনী তাঁদের পাণ্ডব সেপাইদের সঙ্গে উত্তরীয় বিধূনিত করে মহাকলরবে জয়োল্লাস প্রকাশ করছেন, অন্যায় যুদ্ধে ভগ্ন-উরু রাজা দুর্যোধন তখনও অকুতোভয়ে উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণ নিন্দা!—শুনে জগদ্বাসী স্তম্ভিত হলেন; কিন্তু কৃষ্ণের জগদীশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠায় গলদঘর্ম মহাভারতকারগণ আশ্চর্য রকম সহনশীলতা প্রদর্শন করলেন! এই সময় পাণ্ডবগণসহ কৃষ্ণ সাত্যকির সদম্ভ উক্তি ও আত্মশ্লাঘাকে মলিন ও অকিঞ্চিতকর প্রমাণ করে ভারতাত্মার সকল আর্তনাদের হাহাকার ছাপিয়ে বলরামের ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হল। বলরামের মুখে ধ্বনিত সারসত্য অবিকৃতভাবে শ্লোকবদ্ধ করে মহাভারতের কবি এই প্রথম পৌরাণিক ভারতের সকল স্বাধীনচেতা রাজন্যবর্গের অবিসংবাদী নেতা পুণ্যাত্মা দুর্যোধনের প্রতি অকুণ্ঠিতচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার সুযোগ পেলেন। দেবশিবিরের জয় যখন দুর্যোধন-পতনের সঙ্গে সঙ্গে অসংশয়িতভাবে করায়ত্ত হয়েছে, তখন আর প্রয়োজন হল না পাণ্ডব-পক্ষাবলম্বন করে মিথ্যাপ্রচারের। পাণ্ডবরা তখন ব্যবহৃত। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কুটউদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত। অতঃপর আর যুধিষ্ঠিরের ভাবমূর্তি অথবা কৃষ্ণের মহান ঈশ্বরোপম রূপ অক্ষত রাখার সবিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। কাজ হাসিল হয়েছে। ভারতীয় পার্থিব বীরগণ রণক্ষেত্রে মৃত অবহেলিত পরিত্যক্ত। এখন চতুর্দিকে শুধু স্বৈরতন্ত্রী ব্রাহ্মণদের ভয়াল ভয়ঙ্কর তৎপরতা ভারতবর্ষীয়গণের ওপর চাতুর্বর্ণের অভিশাপ পাকাপোক্ত করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এমন ক্রান্তিকালে অন্যায় অনাচারও আর দিবালোকে মুখব্যাদান করতে লজ্জিত ও শঙ্কিত হয় না।

তাই শোনা গেল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একমাত্র নিরপেক্ষ যদুবীর বলরাম দুর্যোধনের শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বজাতিদ্রোহী কৃষ্ণ ও কৌন্তেয়দের সম্বোধন করে জগৎবাসীকে শুনিয়ে বলছেন,—"রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত

হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন।" (বলরামোবাচ, শল্যপর্ব)।

ইতিপূর্বে উচ্চারিত মহাভারতের সব বাগাড়ম্বর এই ঐতিহাসিক উক্তিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, এ কথায় কৃষ্ণ, পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত আর ধ্বনিত হল না। হেঁটমুণ্ডে মেনে নিলেন তাঁরা সেই অকপট সত্যভাষণ। এবং তারপরে অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে নিপাতিত করার জন্য ক্ষুব্ধ বলরাম যখন ভীমকে আক্রমণে উদ্যত, তখন কপটাচারী তথাকথিত জগদীশ্বর কৃষ্ণ নিরুপায় হয়ে অগ্রজকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। সেই প্রথম নিজের নিকৃষ্ট স্বার্থের কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি। বললেন, "হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন! পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের যোনি-সম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য আছে; সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"

জগদীশ্বরের মুখে এই নীচ অভিসন্ধি ব্যক্ত হতে শুনে বলরাম সেদিন সঘৃণায় ভ্রাতা কৃষ্ণকে যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, মহাভারতকার তা-ও নথিবদ্ধ করে গেছেন আমাদের স্তম্ভিত ও আশ্চর্য করে। কৃষ্ণের জগদীশ্বর-সত্তা তৈরীর জন্য সমবেত প্রয়াসকে এই পর্বে চূর্ণবিচূর্ণ করে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম তথাপি "কহিলেন, কৃষ্ণ! সাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কাম-প্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষনে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন, ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।" (ঐ)।

বলরামের এই অনমনীয়তাকে কোনক্রমেই শাসন করতে না পেরে তাই বোধহয় ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁর নামে কাদা ছিটিয়েছেন। বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন মধুপায়ী গঞ্জিকাসেবী হলধর, যার অর্থ, চাষা। ঠিক একই কারণে পাল্টি শিবিরের বস্তুবাদী দার্শনিক চার্বাকের কুশপুত্তলিকা তাঁরা দগ্ধ করেন।

শুধু বিপক্ষীয় দুর্যোধনই নয়, কৃষ্ণাগ্রজ বলরামও এইভাবে স্বয়ং কৃষ্ণকে অর্থ কামাসক্ত অধর্মাচারী বলে ঘোষণা করলেন। ব্যর্থ হল মহাভারতের 'ধর্ম' 'ধর্ম' শব্দের চর্বিত চর্বণ; ব্যর্থ হল, কৃষ্ণের জগদীশ্বর মূর্তি।

কবি বুদ্ধদেব বসু বড় সুন্দর করে কৃষ্ণচরিত্রের সুসংযত ছবি লিখেছেন তাঁর

'মহাভারতের কথা'য়। লিখেছেন, "কোনো পাঠককে কি মনে করিয়ে দিতে হবে কৃষ্ণ কতবার সত্যভঙ্গ করেছিলেন, কত অকথ্য অন্যায়ের তিনি অনুষ্ঠাতা ? …অভ্যস্তভাবে অসাধু, পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতকারী।" তারপর বিস্তারিত করেছেন তিনি কৃষ্ণের অসাধু আচরণের প্রলম্ব তালিকা। এবং স্বীকার করেছেন,—"কৃষ্ণ-কৃত অপরাধপুঞ্জের শিখরদেশে পাণ্ডবেরা তাঁদের হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন—এমন নিরানন্দ রাজ্যপ্রাপ্তি ইতিহাসে আর লিপিবদ্ধ হয়নি।" (বুদ্ধ কাণ্ডারী দ্রঃ)। তবুও, এই 'ধর্মনাশকারী' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সকল অধর্মাচরণ সম্পর্কে পূর্ণ সত্যদর্শনের পরও বুদ্ধদেব আমাদের আশ্চর্য করে আবার বললেন,—"এই সব-কিছুর মধ্যে এক মহান ঔচিত্য অনুভব করে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই—আমাদের হৃদয়ে এমন একটি আস্বাদ ছড়িয়ে পড়ে যা শান্ত ও পবিত্র ও সুখ-দুঃখ-বিস্ময়ের অতীত।" (ঐ)।

বুদ্ধদেবের এই সমর্পিত-প্রাণ উপসংহারের স্বার্থে তিনি কিন্তু আর কোনো জোরালো যুক্তি উপস্থিত করলেন না। আমাদের চিন্তাকে তার চিরায়ত শূন্যগর্ভ সংস্কারের মধ্যেই পুনশ্চ কূপস্থ করে বিদগ্ধ কবি তাঁর সকল সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও দোলাচলচিত্ততার অবসান ঘটিয়ে একটি পরিতৃপ্ত আশ্রয়ে প্রীতিমুগ্ধভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই প্রীতি, এই আত্মসমর্পণের লক্ষ্যস্থল যে বস্তুত কে, আমরা তা জানি না। যুগ যুগ শুধু এভাবেই সমস্ত তর্কের ইতি ঘটিয়ে গুহায় নিহিত ধর্মের প্রতি আমাদের চিরনিষ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে চলেছি, চলেছি ও চলেছি। কিন্তু কেন ?—ভারতবর্ষীয়গণ এ বিষয়ে আশ্চর্যরকম নীরব।

যাই হোক, দুর্যোধনসহ কুরুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর এইভাবে এবং অন্যত্রও কৃষ্ণের অভিসন্ধি ও ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা বহুবার বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আত্মশ্লাঘা প্রকাশের ব্যাকুলতায় স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁর নিজমুখে সেসব স্বীকৃতি উচ্চারণ করেছেন। বলে ফেলেছেন, পাণ্ডবদের যুদ্ধনৈপুণ্য ছিল দুর্যোধন-কর্ণের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

জয়লাভের জন্য কৃষ্ণকূটনীতিই ছিল বস্তুত সহায়কশক্তি। আমরা অবশ্য আরও জেনেছি যে, কৃষ্ণের এই কূটবুদ্ধিও একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক-প্রজ্ঞা নয়, সবকিছুরই নেপথ্যে ছিল ব্রহ্মার পরিকল্পনা। তাই কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বা পাণ্ডবদের জয় হল না-বলে বলা উচিত, ভারতযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বহিরাগত বিজ্ঞানীরা, যাঁদের তৎকালীয় জাতীয় নাম, দেবতা। হিমালয়-শিবির ত্যাগ করে দেবতাদের রথী-মহারথীরা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে মহাপ্রস্থান করলে ক্ষমতাসীন ব্রাহ্মণরা দেবতাদের সকল কৃতিত্ব বাসুদেব কৃষ্ণের অলৌকিক

ক্ষমতারূপে প্রচার করতে স্বরু করেন, সৃষ্টি করেন তাঁরা বিষ্ণুর অবতার-ধনুর্ধারী কৃষ্ণের এক অপ্রাকৃত মহিমময় মূর্তি। বলা বাহুল্য, রণোন্মত্ত কৃষ্ণ ঠাকুরটিকে তবু তাঁরা ভারতবাসীর মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। বিষ্ণু সূর্য ও মহাদেব মঠ মন্দির দখল করে টিকে গেছেন। ধনুর্ধারী রামচন্দ্রের পূজাও প্রচলিত আছে, নেই কিন্তু পার্থ-সারথির আরাধনা-মন্দির। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত, সেখানেই তিনি মধুর রসের বংশীবাদক পরমাত্মা।

পাণ্ডবদের জয় হল, এই প্রচারের মধ্যে সত্য শুধু এইটুকু যে, দেবতারা কুরুক্ষেত্রে পার্থিব বীরগণের শবস্তূপ সৃষ্টি করে সেই শ্মশানভূমিতে ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসন কায়েম করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বানিয়েছিলেন পুতুলরাজা। স্বজন-হত্যাকারীর ভাগ্যে তার চেয়ে বড় পুরস্কার কোথাও কেউ লাভ করেন নি। এজন্য পাণ্ডবপক্ষীয়গণের মনে সর্বদাই পাপচিন্তা ও আত্মগ্লানি বর্তমান ছিল। দ্রোণনিধন পর্বে সেই হীমমন্যতা পাণ্ডবশিবিরভুক্ত রথীদের পারস্পরিক বিতণ্ডার মধ্যে আপন স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছিল।

কৃষ্ণের পরামর্শে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে হীনবল করার জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অক্লেশে সেই অমিতপরাক্রমশালী কুরুবীরকে নিহত করলেন। দ্রোণের সঙ্গে এই কপটতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন অর্জুন। অগ্রজকে প্রকাশ্যে সেই প্রথম দোষারোপ করে পার্থ বললেন, "আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক গুরুর বধসাধন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদ-নন্দনকে (ধৃষ্টদ্যুম্নকে) পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব।" অর্থাৎ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অর্জুন নির্গলিত করলেন তাঁর মনের ক্ষোভ ও জ্বালা। স্বদলীয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করা যে কৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠিরের সাধ্যকর্ম নয়, অর্জুন ও সাত্যকি তা বিলক্ষণ জানতেন। তাঁরা কুরুপক্ষের আক্রমণের হাত থেকে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করায় অস্বীকৃতি প্রকাশ করলেন। মহাভারতে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্ষুব্ধ অর্জুনের কণ্ঠে তখন ঘৃণা ও বিদ্বেষ সকল বিবেচনাবোধ এবং কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞানও হারিয়ে বসেছে। তাঁর কণ্ঠে ঘোষিত হল যুধিষ্ঠিরের প্রতি নির্মম শ্লেষবাক্য। বললেন তিনি,—"আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার (দ্রোণাচার্যের) প্রাণনাশ করিলেন।—আমরা রাজ্য লালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্যের প্রাণ সংহার করিলাম।"

(দ্রোণপর্ব/পৃঃ ২১১-২১২/কালী, ১ম সং) ৮

পাণ্ডবদের কণ্ঠে এবং বিশেষত যুধিষ্ঠিরের স্বীকারোক্তিতে এই রাজ্যলালসার কথা বারম্বার উক্ত হয়েছে। ধর্মযোদ্ধা নন, কোনো ধর্মসংস্থাপনাও লক্ষ্য নয়, তাঁরা যে নিতান্তই রাজ্যলোভী—এই কথা পাণ্ডবরাই সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট এবং ভালোভাবেই জানতেন। বহু দুর্বল মুহূর্তে যুধিষ্ঠির তাই বারবার রাজ্যলালসা ও তার সমুচিত ফলাফলের কথা স্বীকার করে অনুতাপ করেছেন, এমন কি মাতা কুন্তীকেও এজন্য তিনি অভিসম্পাত দিতে কসুর করেন নি। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রবঞ্চনা যখন ধরা পড়ে গেছে; দেব-ব্রাহ্মণরা নিরস্ত্র করেছেন বিভীষণ পাণ্ডবদের; হুতাশনগ্রস্ত হয়েছে পার্থের সেই কপিধ্বজচিহ্নিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত রথ; যুধিষ্ঠিরের রথচক্র স্পর্শ করেছে মেদিনীকর্দম; স্বয়ং বেদব্যাস নির্মম নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলেছেন, তোমাদের করণীয় কর্ম সমাধিত হয়েছে, সুতরাং এবার ক্ষান্ত হও!—তখন চতুর্দিক স্বজনশূন্য (নিঃক্ষত্রিয়) অবলোকন করে মহাভয়ে বিলাপ করেছেন প্রথম পাণ্ডব। মহাভারতের শেষ পর্বগুলি যুধিষ্ঠির-বিলাপে হতাশাচ্ছন্ন।

যে সাত্যকি উদ্যোগপর্বে যুধিষ্ঠিরের দোষ প্রদর্শন করায় বলরামকে উত্তেজিত ভাবে কটুভাষণের দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন, দ্রোণপর্বে অর্জুনকর্তৃক ধর্মরাজকে তিরস্কৃত হতে শুনে তিনি রুষ্ট তো হলেনই না, বরং ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাক্যশরে জর্জরিত করে বললেন, "হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই।" প্রসঙ্গত তিনি শিখণ্ডীরও উল্লেখ করেছেন এইখানে।

পাণ্ডবপক্ষের এই বিতণ্ডায় স্পষ্টত প্রমাণিত হয়ে গেল যে, স্বজনহত্যাকারী এই যুদ্ধের ভয়াল ভয়ঙ্করতা দর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয়গণও মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথচ তখন তাঁদের প্রত্যাবর্তনের আর কোনো উপায় নেই। ব্রাহ্মণ্যচক্রান্তের ফেরে ফেরে বাঁধা পড়ে গেছেন পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয় নেতৃবৃন্দ। চোখের সামনে দেখছেন, ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় হতে চলেছে। তাঁরাও ব্রাহ্মণ ও বহিরাগত দেবজাতির দাসত্ব-শৃঙ্খলে আরও কঠিনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন। ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। এই অবস্থায় স্বভাবিকভাবেই তাঁদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, যদিও এখন আর এই উত্তেজনার কানাকড়ি মূল্যও নেই। কেননা তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতা বহিরাগতের কাছে বিক্রী করে বসে আছেন অসহায়ভাবে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক দোষারোপই বুঝি প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র উপায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রায়শ্চিত্ত তখনও বিলম্বিত ছিল। ধর্মরাজ তখনও রাজচক্রবর্তী হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছেন। তাই কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির স্তোকবাক্যে আবার সেই ক্ষুব্ধ রথীদের শান্ত করেছেন। সুরু হয়েছে লড়াই।

কিন্তু এই বিচিত্র লড়াই সম্পর্কে নানা প্রশ্ন অর্জুনের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। নিজের নামে তিনি চতুর্দিকে যে জয়ধ্বনি শুনেছেন তা অলীক মিথ্যা ঘোষণা বলে মনে হয়েছে তাঁর। মনে হয়েছে, একটা দারুণ অকল্পনীয় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে রথচালনা করে চলেছেন তাঁরা, পার্থসারথি।

তাই দ্রোণপর্বেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে তাঁর বিস্মিত প্রশ্ন: "হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশ্চিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবকসন্নিভ কোনো পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন পূর্ব্বক যে যেদিকে ধাবিত হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমা হইতেই সমুদয় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তৎকর্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে পীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষি! সেই সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শূলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদস্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল।"

উত্তরে দ্বৈপায়ন বললেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি···দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ।" (দ্রোণ/পৃঃ ২২২/ঐ)।

এখানে স্মরণ করি আমাদের পূর্ব বক্তব্য। বলেছিলাম, অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, আসলে যুদ্ধ করেছেন দেবতারা, জয়ও তাঁদেরই। খাণ্ডবদাহন পর্বে উড্ডীন দেবতারাই অনার্য রাজা তক্ষকের তালুক নাগশূন্য করেন। বিরাটপর্বে অর্জুনরথে দেবনির্মিত রোবট এবং রথাগ্রভাগে দেবতারাই প্রকৃতপক্ষে লড়াই করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রেও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধের সৈন্যাপত্য করেছেন দেবসেনাধিনায়ক মহাদেব বা শঙ্করজী। এখানে মহাদেবকে এককভাবে উড্ডীন অবস্থায় যুদ্ধরত দেখা যাচ্ছে। আর স্বয়ং শঙ্করই যে ত্রয়োদশবর্ষ পর হিমালয়-শিবির থেকে দক্ষিণাবর্তন করে কুরুসৈন্য ধ্বংস করবেন, বেদব্যাস সেকথাও বলে গেছলেন যুধিষ্ঠিরকে— সেসব ঘটনা আগেই উল্লেখ করেছিলাম। দ্রোণপর্বে সেই কথাগুলিই ঘটনাপ্রবাহে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। প্রমাণিত হল, কাল্পনিক রহস্যগল্প শোনাই নি আমি মহাভারতভক্ত পাঠকবর্গকে। আমার প্রধান সাক্ষী স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহামান্য পাঠক-আদালতে আমি তাঁকেই অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই রেখে-যাওয়া মহা-ইতিবৃত্তটিকে প্রধান সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করেছি। অতঃপর বিচারের ভার মহামান্য আদালতের।

মান্যবর বিচারকগণই বলুন, এ যুদ্ধে প্রকৃত জয়ী কে? দুর্যোধন, না যুধিষ্ঠির?

পাণ্ডবরা, না কি দেবশক্তিপুষ্ট শিখা-উপবীতধারী দানযজ্ঞলোভী শ্রমকাতর স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণ লুণ্ঠনকারীরা?

যুধিষ্ঠির যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ ও পরাজিত, তা তিনি নিজমুখে বিমর্ষভাবে বারবার কবুল করেছেন। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ভারতের দুর্ভাগ্য, বিভীষণ ও যুধিষ্ঠিররা অমর অক্ষয়। এঁদের লোভে পাপস্তূপ যথারীতি সঞ্চিত হলেও পাপে মৃত্যু হয় নি। বিভীষণ নাকি অমর, আর যুধিষ্ঠির গেছেন দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের অজানা উড়ন্ত রথে চেপে মহাকাশের মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে। বৈজ্ঞানিক ম্যাটেস্ট আগ্রেস্টের গণনা যদি অভ্রান্ত হয়, হয়ত তিনি ভবিষ্যতে আবার কখনো এই গ্রহে ফিরে আসবেন, পৃথিবী থেকে অপহৃত আরও কিছু পুরা পিতাদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে আসবেন দেবতারা। তবে সেই প্রত্যাবর্তন তাঁদের পুনরায় ঈশ্বরীয় মর্যাদায় আর বিভূষিত করবে না। মহাকাশবিজ্ঞানে পার্থিবগণ ততদিনে আরও অনেক বেশি উন্নত হবে। সঙ্ঘর্ষ হবে অনিবার্য।

দেবতারাই এই যুদ্ধের পার্টি শিবির, কর্ণপর্বে তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কর্ণার্জুন যুদ্ধের সময় দেবতাদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। দেবগোষ্ঠীতে সূর্য তখন কোণঠাসা। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। ঘোষণা করলেন, সূর্যাত্মজ কর্ণকে রক্ষা করার জন্য সূর্যগোষ্ঠী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন। এই সংবাদে হিমালয়ের স্বর্গরাজ্যে সুরু হল চাঞ্চল্য, সুরু হল রাজনৈতিক তৎপরতা।

সংবাদ পেয়ে ইন্দ্র ছুটলেন দেববুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার দরবারে। উদ্দেশ্য আপন ঔরসজাত সন্তান অর্জুনকে রক্ষা করা। সুরু হল দেবরাজ ইন্দ্রের শিবিরে সূর্য-বিরোধী প্রচার ও দল সংগঠন।

এই ইতিবৃত্ত সম্পর্কে মহাভারতীয় প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করছি:

"অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণের (লক্ষণীয়, 'দেব-গণের' শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি) পরস্পর মহা বিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। ...আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের ও ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল।" (এক্ষেত্রে 'আকাশ-মণ্ডল' বলতে অধিকাংশ দেবতা ও 'ভূমণ্ডল' বলতে পুরোহিততন্ত্রী পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়কেই হয়ত ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে)।

"অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—'অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ

করিবে।' সূর্যদেব কহিলেন,—'আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রী লাভে কৃতকার্য হইবে।' এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয়লাভ করিবে?·· হে ব্রহ্মণ্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।'· ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, 'হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, 'বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়।' তখন ভগবান ব্রহ্মা···মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে (ইন্দ্র) কহিলেন, '···সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; (অর্থাৎ দুর্যোধন-শিবির দানবপক্ষ বলে অভিহিত হলেন) অতএব তাহার পরাজয় হওয়া উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই।' এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য।" [কর্ণপর্ব/পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫/ঐ/(ব্র্যাকেট আমার)]।

মিটিং শেষ হল ব্রহ্মার ভেটো প্রয়োগে। ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সঙ্গে ব্রহ্মা ও মহাদেবের সিদ্ধান্ত বিবদমান দেবতাদের মধ্যে প্রচার করে দিলেন। বললেন, "· ভগবান ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উঁহাদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন।"

সূর্যের উত্থান রহিত হল। বহিরাগত শিবির আকাশরথে চড়ে উড়ে গেলেন আবার কুরুক্ষেত্রের ওপর।

ব্রহ্মার সভায় একটিও ধর্মকথা উচ্চারিত হয় নি। আমরা শুনলাম, দেবতারা পরস্পরে আপনাপন এবং দেবজাতির স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন। আদি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে নির্বংশ করে দেবস্তাবক বংশধারাকে আর্যাবর্তের শাসক বানানোই দেবস্বার্থ। আমাদের বোঝানো হয়েছে, সেটাই ধর্ম। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'পবিত্র শান্ত ও মহান ঔচিত্যপূর্ণ' আধ্যাত্মিক কর্ম!

কিন্তু থাক সে কথা। আবার ফিরে আসি কুরুক্ষেত্রে। লোভ হচ্ছে আরও একবার সেই পৌরাণিক যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভারতনেতার দর্শন লাভের জন্য। কিন্তু তারও আগে শুনে নিই স্বয়ং বেদব্যাস-নিযুক্ত সমর-প্রতিবেদক

সঞ্জয় দুর্যোধনের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কী সংবাদ প্রদান করেছিলেন,—সেই অমৃতকথা।

• "পাণ্ডবগণসহ দুর্য্যোধনের একক যুদ্ধ" শিরোনামাঙ্কিত শল্যপর্বের দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ে কি জানি কেন, সঞ্জয় স্বীকার করে বসলেন,—"তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।"

তা হোক, আমরা কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হই নি। মহাভারত পাঠের পর দুর্যোধনের যে অতুলনীয় দৃপ্ত বীরত্বব্যাঞ্জক মূর্তিটি আমাদের সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অসমসাহসী ও সত্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ যে বস্তুতই মহাভারতীয় যুগের নায়ক ছিলেন, এ বিষয়ে আর দ্বন্দ্ব সংশয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তাঁর সেই অভ্রভেদী সুউন্নত সংকল্পদৃঢ় সুগঠিত দেহকান্তির পাশে ম্লান হয়ে যান বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ-পদলেহী কৃষ্ণ আর লোলুপ রাজ্যলোভী আত্মসুখী যুধিষ্ঠির। ম্লান হয়ে যান পাণ্ডবসেপাই অতিভুক বৃকোদর।

দুযোধন ও ভীমসেনের শৌর্যের তুলনা কবে সঞ্জয় বলেছেন,—"মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিয়া ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।"

দুর্যোধনের বলবিক্রমকে কৃষ্ণ যে কতদূর সমীহ করতেন তা-ও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর কটূক্তিতে। ব্রাহ্মণ-নির্বাচিত রাজা বলে কৃষ্ণ চিরকাল অবনত শিরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি মান্য প্রদর্শন করে এসেছেন, ক্ষমা করেছেন তাঁর শত নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু রণক্লান্ত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ দুর্যোধনকে দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে টেনে বার করলেন যখন বিজয়ী কৌন্তেয়রা, যখন জয় করায়ত্ত ভেবে নির্বোধ যুধিষ্ঠির দুম্ করে বলে বসলেন: পাণ্ডবদের মধ্যে যে কারো সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারলেই দুর্যোধনের জয় স্বীকৃত হবে, তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ওপর প্রচণ্ডভাবে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মূর্খ যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন, রুধিরাক্ত-কলেবর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দুর্যোধনকে কাবু করা অতঃপর একটি শিশুসাধ্য ব্যাপার। তাই অমন একটি বেহিসেবী শর্ত তিনি জয়ের আনন্দ ঘোষণা করে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপদ গণনা করলেন কৃষ্ণ। সর্বনাশ! দুর্যোধন যদি এখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই গদাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে তো ধর্মরাজ্যের স্বর্গপ্রাপ্তি কেউ আর আটকাতে পারবেন না। বিরক্ত কৃষ্ণ তাই যুধিষ্ঠিরকে বললেন,—"...আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, 'তুমি আমাদিগের মধ্যে একজনকে

বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর ?'…ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।…এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

লক্ষণীয়, জগদীশ্বর কৃষ্ণ, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তারূপে কীর্তিত,—তিনি স্বমুখে বলছেন, 'বিধাতা উহাদিগকে…' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ও বিধাতায় স্বর্গমর্ত্য পার্থক্যটি এখানে কৃষ্ণ নিজেই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

হ্যাঁ, কৃষ্ণও জানতেন, দুর্যোধন কতবড় বীর ছিলেন। বীরত্বে শ্রেষ্ঠতা না থাকলে তামাম আর্যাবর্তের নেতৃত্বে তিনি কি সমারূঢ় হতে পারতেন, না কি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শল্য অশ্বত্থামা শুধু শুধুই মেনে নিতেন তাঁর প্রাধান্য? কৃষ্ণ জানতেন, একজন মুমূর্ষু দুর্যোধনও বহুঢক্কানিনাদিত ভীম-পরাক্রম ভীমসেন অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী। তাই দুর্যোধন যখন অবহেলাভরে মূষিকতুল্য যোদ্ধা পার্থ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে নগণ্য বিবেচনা করে তথাকথিত মহাবীর পবননন্দন ভীমচন্দ্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন, তখনও স্বস্তি পেলেন না কৃষ্ণ।

তাই দেখা গেল, কৃষ্ণসহ পাণ্ডবরা পরিশ্রান্ত জলসিক্ত রুধিরাপ্লুত দুর্যোধনকে নিকৃষ্ট কয়েদীর মত হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর বধ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে। দুর্যোধনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর বিশাল ও ভারি গদাটি। উদ্দেশ্য, দুর্যোধনকে আরও ক্লান্ত আরও হীনবল করা। এই চক্রান্ত জরাসন্ধ বধের প্রাক্কালেও করা হয়েছিল,—সেকথা আগে বলেছি।

সঞ্জয়ের মুখে সেই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা শুনে মূর্ছিতপ্রায় স্নেহশীল পিতা ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করে বলেছিলেন,—"দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। ভূপতিগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা পালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধনকে গদাধারণ-পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! আমার পুত্র সমুদয় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল।" (শল্য/সপ্তপঞ্চাশত্তম অ.)।

মানুষের ইতিহাস এমনিই নির্মম। দুর্যোধনের বধ্যভূমিতে গমনের এই দৃশ্যের সঙ্গে মানবেতিহাসের আর একটি কলঙ্কজনক ইতিহাসের সাদৃশ্য দূরলক্ষ্য নয়। দুর্যোধন ধর্মের নামে এক স্বৈরতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাওয়ার অপরাধে যে শাস্তি ভোগ করলেন, শোষক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে

ধর্মীয় বিপ্লব সংগঠিত করার অপরাধে মানবত্রাতা যীশুখ্রীষ্টকেও ঠিক অনুরূপ শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বৈরাচারী ও আত্মপরায়ণ শোষক-সম্প্রদায় দুর্যোধনের মত তাঁকেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে করতে তাঁর কাঁধে তাঁরই মৃত্যুস্বরূপ কাষ্ঠখণ্ডটি বেঁধে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যান বধ্যভূমির দিকে। জগতে এইভাবে সত্যধর্ম বারম্বার নিহত হয়েছে কুচক্রী স্বৈরাচারী শোষক সম্প্রদায়ের দ্বারা। ভারতের দুর্ভাগ্য, আজও সে সেই কুচক্রী-বাসনার হদিস-সন্ধান করে উঠতে পারে নি। দুর্যোধনের বধ্যভূমি, ভারতের অগণিত স্বাধীনতা-যোদ্ধার শোণিতসিক্ত সেই পাপভূমি, ভারতপুত্রদের তীর্থক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র!

হে পাঠক! বলরামের মত আমিও বলতে বাধ্য,—মানি না, মানি না। তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ অথবা যে কোনো গণ্যমান্য প্রভু হও না কেন; আমি মেনে নিতে অক্ষম, ধর্মসংস্থাপনের জন্য, অসাধুগণের বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার জন্য, কুরুক্ষেত্রে একদিন একটি মহাসমর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি বলতে বাধ্য, সত্যধর্ম রক্ষার্থেই মানুষকে প্রাণ আহুতি দিতে হয়েছে এ জগতে। সেটাই জগতের ইতিহাস! তবুও ভূ-ভারের ভার লাঘব হয় নি।

ভারতযুদ্ধের পর স্বজাতির শ্মশানভূমির ওপর যুধিষ্ঠিরের যে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হল, তা পাপে ক্লেদে হতাশায় অনুতাপে বিদ্ধ কতিপয় রাজ্যলোভীর দীর্ঘশ্বাসসম্বল এক ঊষর ক্ষেত্রমাত্র। এমন অভিশপ্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির বিবাগী হয়ে গেলেন। কুচক্রী বিদুরকে দেখলাম, উন্মাদ উলঙ্গ অবস্থায় বোধশক্তি রহিত হয়ে দেহত্যাগ করতে। কুন্তী প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবাধর্ম সম্বল করে। কৃষ্ণ নিহত হলেন অনার্য ঘাতকের বিষ-তীরে। ধ্বংস হল যদুবংশ। আর বিষণ্ণ একাকী বলরাম দেহত্যাগ করলেন স্তব্ধ অবসন্ন অন্তরে। ধর্মরাজ্যের কী মহিমময়ী রূপ!

আর দুর্যোধন? মৃত্যুপথযাত্রী সেই সত্যনিষ্ঠ বীর পরম দুঃখ-বিষাদ সত্ত্বেও এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেন যে, তিনি "ধর্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ" করবেন। বললেন, "সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?" বললেন, "হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।" (শল্য/পৃঃ ৯৫/কালী, ১ম সং)।

ভারতের পৌরাণিক যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতা ভারতবাসীকে সাবধান

করে বলে গেলেন,—বিশ্বাস করো না! হে ভারত! ভুলো না শঠ কুচক্রী প্রবঞ্চক মৎলববাজদের খেলায়। তারা অমর, সাবধান থেকো তাদের থেকে!

শল্যপর্বের উপসংহার করে সঞ্জয় বললেন, "রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে দশদিকে ধাবমান হইলেন।" (ঐ)।

পুনশ্চ আরও একটি স্বীকৃতি। 'তত্রত্য সকলেই' মানে কি ভারতবাসীগণ? উত্তরাখণ্ডের আকাশ বাতাস কি সেদিন তাঁদেরই হাহাকারধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল? 'দশদিকে,' অর্থাৎ সর্বত্রই জনগণ কি তাঁদের প্রিয় নেতার করুণ মৃত্যুতে সর্বহারা সন্ত্রস্ত সন্তানবর্গের মত বিলাপ-ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছিলেন? ভারতমাতা হয়েছিলেন সাশ্রুনেত্র ও শোকস্তব্ধ?

আর সেই ব্যথিত ধরিত্রীর বুক চিরে সেদিন যখন ভয়াল ভয়ঙ্কর কলরবের মত শ্রুত হল পুরোহিত বাহিনীর শকটচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, তখন সঞ্জয় বললেন,—"দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল।" (ঐ)।

আশ্চর্য! পাণ্ডবদের হতাশায় অথবা কৃষ্ণের নিতান্ত এক জান্তব মৃত্যুতেও কিন্তু কেউ কোথাও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন বলে মহাভারতে এক ছত্রেরও বর্ণনা নেই!

বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও বহিরাগতের অভিসন্ধি-পূরণের জন্য ছেড়ে দেন নি আমরণ-যোদ্ধা দুর্যোধন। মা ধরিত্রীর কোলে অন্তিম নিঃশ্বাস পতনের প্রাক্কালে তিনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে নীরবে বিষণ্ণ-হৃদয়ে "রুধিরাক্ত কলেবরে সেই সর্বভূতভয়াবহ ঘোর-রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।" (শল্য/পৃঃ ৯৭)।

এক নজরে কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ—অগ্রহায়ণ মাস।
ঐ যুদ্ধকাল—আঠার দিন।
ঐ যুদ্ধ-বিরতি—অমাবস্যা।

কুরুক্ষেত্র পরিচিতি—কুরুক্ষেত্রের নামই ব্রহ্মাবর্ত। উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই দুই নদীর মধ্যবর্তী। পাঞ্জাব ও কারনালের অন্তর্গত থানেশ্বর ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চল। ইতিহাস-প্রখ্যাত 'পানিপথ' থেকে বিশ ক্রোশ উত্তরে সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রের বিস্তার।

যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের বয়স—যুধিষ্ঠির ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল ও সহদেব ৬৯।

দুর্যোধন ছিলেন ভীমের সমবয়সী। একই দিনে তাঁদের জন্ম। কৃষ্ণ ছিলেন যুধিষ্ঠিরের ছোট, ভীম-দুর্যোধন অপেক্ষা বড়।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ—পোষ মাসে শুক্লা প্রতিপদে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রবাদ : কারো পোষ মাস, কারো সর্বনাশ।

ঐ রাজত্বকাল—ছত্রিশ বছর। তারপর মহাপ্রস্থানের পথে ছ'মাস পরিক্রমা। সব মিলে যুধিষ্ঠিরের বয়স হয়েছিল একশ আট বছর ছ'মাস।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, (আধুনিক মত)—১৪৩০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ১০০০/৯০০ খৃঃ পূর্বাব্দ।

কৌরব শিবিরভুক্ত রাজ্যগুলি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন-শিবিরে সমবেত হয়েছিল কাশ্মীরের একটি ক্ষুদ্রাঞ্চল, 'অভিসার' রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উঃ পঃ ভারত এবং সমগ্র পূর্ব ভারত। মধ্যদেশ থেকে একটিমাত্র রাজ্য কুরুশিবিরে যোগ দেয়। এছাড়া যুদ্ধার্থী হিসেবে সমবেত হয়েছিলেন, দ্বিধাবিভক্ত যদুদের বিরাট এক বাহিনী (নারায়ণী সেনা); বৃষ্ণি, অন্ধক, মালব, নিষধ, শাল্ব, কিরাত, ভোজ হার্দিক্য ও ভূরিশ্রবার নেতৃত্বাধীন বীরবৃন্দ। রাজ্যগুলির আধুনিক নাম পরিচয় এই রকম :

সিন্ধু সৌবীর (নেতা জয়দ্রথ)—বিতস্তা ও সিন্ধু নদীর নিকটবর্তী অ.।

গান্ধার (নেতা শকুনি)—রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার অ.। মতান্তরে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—সিন্ধুর উভয় তীরে কাবুল অ.।

ত্রিগর্ত (নেতা সুশর্মা)—কাংরা ভ্যালি অ.।

কেকয় (নেতা সিবি)—গান্ধার ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী। মতান্তরে, গুজরাট ও শাহপুরের বা ঝেলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী।

মদ্র (নেতা শল্য)—চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অ.। পাণ্ডু-পত্নী মাদ্রী, নকুল-সহদেবের মাতা, এই দেশের মেয়ে। তবু পাণ্ডব-মাতুল শল্য যোগ দেন কুরুপক্ষে।

কম্বোজ (নেতা সুদক্ষিণ)—কাশ্মীরের উত্তরে অথবা মতান্তরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

মাহিষ্মতী (নেতা নীল)—ইন্দোর থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা-তীরে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (নেতা ভগদত্ত)—সম্ভবত আসামের গৌহাটি অ.। কামরূপ দেশ।

কোশল (নেতা বৃহদ্বল)—অযোধ্যা ও সন্নিহিত অ.।

অম্বষ্ঠ—পাঞ্জাবের অন্তর্গত স্থান বিশেষ।

বাহ্লিক—তাতারের অন্তর্গত বল্‌খ্ প্রদেশ।

ক্ষুদ্রক—সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ্য।

বিদর্ভ—বেরার প্রদেশ। হায়দ্রাবাদের উঃ পঃ। কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা। কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করেন।

অবন্তী—মালওয়ার অন্তর্ভুক্ত অ.।

বিদেহ—উত্তর বিহার।

বৎস্য—এলাহাবাদ সন্নিহিত অ.।

কলিঙ্গ—উড়িষ্যা।

অঙ্গ—আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা।

পূর্ব মগধ—দক্ষিণ বিহার। [পশ্চিম মগধ ছাড়া পূর্বাঞ্চলের সকল রাজ্যই দুর্যোধন-পতাকাতলে সমবেত হয়]।

পুণ্ড্র ও বঙ্গ—ঢাকা চট্টগ্রাম অ.। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ।

অহিছত্র—দ্রোণাচার্য অধিকৃত উত্তর পাঞ্চাল। গঙ্গাতটবর্তী সাহাবাদ অ. থেকে বেরিলী (আধুনিক রামনগর এলাকা)।

শূরসেন—মথুরা (আগ্রা) অ.। কৃষ্ণের 'এক ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করায় কংস নিহত হলেও জরাসন্ধের তাড়নায় কৃষ্ণ এখান থেকে উৎখাত হয়ে দ্বারকায় পলায়ন করেন।

কুকুর দেশ—প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের উত্তরে কুকুর-নামক আদিম জাতির বাস ছিল।

হস্তিনাপুর—মীরাট ও দিল্লী সন্নিহিত অ.।

পাণ্ডব শিবিরভুক্ত রাজ্যগুলি

পাঞ্চাল (দ্রুপদ)—গঙ্গার দক্ষিণতটে চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী ছিল, কাম্পিল্য। বুদ্ধের সময় নাম হয়, কান্যকুব্জ। দ্রোণাচার্যের কাছে দ্রুপদ পরাস্ত হলে উত্তর পাঞ্চাল তাঁর অধিকারে রেখে করুণাবশত দ্রোণাচার্য বন্ধু দ্রুপদকে সমগ্র পাঞ্চালের অর্ধাংশ দান করেন। উত্তরাংশ অহিছত্র।

মৎস্য (বিরাট)—জয়পুর আলোয়ার ভরতপুর অ.। মতান্তরে ঢোলপুরের পশ্চিমাঞ্চল।

চেদী (ধৃষ্টকেতু)—নর্মদা গোদাবরীর মধ্যবর্তী স্থান। মতান্তরে যমুনার দক্ষিণ-তটস্থ বুন্দেলখন্দ্ ও মধ্যপ্রদেশের অংশ।

করূষ—কাশীর দক্ষিণে বর্তমান রেওয়া অ.।

কাশী—বারাণসী।

পশ্চিম মগধ—পাণ্ডবদের দ্বারা সদ্য অধিকৃত জরাসন্ধের রাজ্য। পাণ্ডবরা জরাসন্ধকে হত্যা করে তাঁর পুত্র জয়ৎসেনকে শাসকপদে বসান।

এ ছাড়া

যাদবদের একটি ভগ্নাংশ দক্ষিণ পশ্চিম যাদব এবং দেবশিবির।

কয়েকটি প্রখ্যাত প্রাচীন জনপদ

কুরুজাঙ্গল—কুরুক্ষেত্রের উত্তর অ.।

উত্তরকুরু—তিব্বতের উত্তর পশ্চিমে। অন্যমতে পামীর উপত্যকা।

নৈমিষারণ্য—লক্ষ্ণৌ-বালামৌ-সীতাপুর লাইনে নৈমিষারণ্য স্টেশন। স্থানীয় নাম, নিমসর। প্রাচীনকালে এখানে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ ঋষির বাস

ছিল। তার আগে ছিল আদি অসুর ভূমি। দেবতা বিষ্ণু সেই অসুরদের নিশ্চিহ্ন করেন।

পুষ্কর—আজমীঢ় থেকে ছয় মাইল দূরে শহর ও হ্রদ। হ্রদের চারদিকে মন্দির। এখানে ছাড়া ব্রহ্মার মন্দির আর কোথাও নেই।

দ্বারকা (বা দ্বারাবতী)—পশ্চিম সৌরাষ্ট্রে আরব সাগরের ধারে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের তটভূমি। পৌরাণিক দ্বারকা জলমগ্ন। কচ্ছ উপসাগরে একটি ছোট দ্বীপ বা 'বেট দ্বারকা' পৌরাণিক দ্বারকার অবশেষ বলে কথিত। বর্তমান দ্বারকা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার। দ্বারকার প্রাচীন নাম ছিল কুশস্থলী। দ্বারকার দ্বারকাধীশের মন্দিরে শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি আছে। 'বেট দ্বারকায়' দ্বারকাধীশের মূর্তির হাতে আছে ঢাল তরোয়াল। [শ্রীশতদল ভট্টাচার্য/দ্বারকার আঙিনায় নিবন্ধ/দেশ, ১২।৪।৮০ দ্রষ্টব্য]।

প্রভাস—কাথিয়াবাড়ের একাংশের পৌরাণিক নাম।

একচক্রা—বিহারের আরা শহর।

ইন্দ্রপ্রস্থ—বর্তমান দিল্লীর পুরাণা কেল্লা অ.। পুরাণা কেল্লা এলাকায় ইন্দ্রপৎ নামে জায়গা আছে। এই জায়গায়ই ছিল খাণ্ডবারণ্য।

প্রাতিস্থান—প্রয়াগ অ.।*

* উল্লিখিত তথ্যাদি রচনায় মহর্ষি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পণ্ডিত সুবলচন্দ্র মিত্র, গবেষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ এ. ডি. পুশলকর প্রমুখের রচনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করেছি।